ভূমিকা

১৮৪৫ সালে হেনরি ডেভিড থরো নিভৃতে বাস করবার জন্য ওয়ালডেন পণ্ড অঞ্চলের বনে আশ্রয় নেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এই বই ওয়ালডেন-এর উৎপত্তি। কেন তিনি সেখানে গিয়ে ওঠেন, তার বিবরণে তিনি এর মধ্যে বলছেন, "সংকল্পনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম বলে বনবাসে গিয়েছিলাম। জীবনের মূল সত্যের সম্মুখীন হয়ে দেখতে চেয়েছিলাম, সে যে পাঠ দিতে পারে তা শিক্ষা করতে পারি কি না। মৃত্যুকালে যেন দুঃখ না পাই যে, জীবন-ব্রত সাধনা করা হয় নি।" (৭৫ পৃষ্ঠা)।

ওয়ালডেন পণ্ড ম্যাসাচুসেট্‌সের কনকর্ডের কাছে। দুশো বৎসর আগে শহরটার পত্তন। সুতরাং থরো কিছু অরণ্যচারীর জীবন কাটাতে প্রাগৈতিহাসিক কোন বনে গিয়ে ওঠেন নি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীবন যাপনার্থে শহর থেকে দূরে যান মাত্র।

একটা কুড়ুল ধার নিয়ে তিনি নিজের জন্য দশ ফুট চওড়া, পনের ফুট লম্বা একটা কুঁড়ে ঘর তুলে নেন। ঘুমোবার মতো একটু জায়গা, আর গরম কালে বৃষ্টি বাদল, কি শীত কালে শীতের দেশ নিউ ইংলণ্ডের বরফপাতের মধ্যে মাথা গুঁজবার মতো একটু ঠাঁই জুটল। আর যা দরকার থাকল তাঁর, তা সামান্য : যৎকিঞ্চিৎ আহার্য, খানকয়েক বই আর প্রচুর সময়।

সময়ের আর নির্জনতার দরকার ছিল তাঁর। প্রকৃতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তার সদুত্তর পেতে চেয়েছিলেন তিনি। সোজা কথায়, তিনি চিন্তার সাধনা করতে চেয়েছিলেন। শুধু চিন্তা করে "সময় নষ্ট" করার জন্য অন্যেরা মধ্যে মধ্যে থরোকে ভর্ৎসনা করেছেন; এতে বিরক্ত বোধ করতেন তিনি। অনেক লোকই যা কখনও বুঝে উঠতে পারেন না, থরো তা উপলব্ধি করেছিলেন—চিন্তার সাধনাই মানুষের পক্ষে কঠিনতম সাধনা।

তাঁর চারদিকের পাখিদের আর জীবজন্তুদের, ঋতু পরিক্রমার আর জলহাওয়ার রকম-সকম সব নিরীক্ষণ করতেন তিনি। ওলন দড়ি দিয়ে হ্রদের গভীরতা মাপা, গাছগুলোর উচ্চতা নির্ধারণ—এমনি যা দেখতেন, সব

মাপজোক করে লিপিবন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করতেন। থরো যে ভাবে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন, আজকালকার বৈজ্ঞানিকদের হিসেবে তা পন্ডশ্রম। তিনি যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে নিজের চোখ দিয়ে দেখা পছন্দ করতেন, মাপজোক করার জন্য একটা লাঠি ছাড়া তেমন কোন যন্ত্র থাকত না। অতঃপর পন্ডিতদের আর পুঁথিপত্রের লেখার একেবারেই সাহায্য না নিয়ে নিজের মনের নিরিখে সব বিচার করে তা থেকে নিজের মতো নিজে সিদ্ধান্ত করে নিতেন। থরো বলেছেন, "আমাদের সমপ্রাণতার তুলনায় আমাদের বিজ্ঞান সর্বদা নিষ্ফলা আর ভুলভ্রান্তিতে ভরা।"

ওয়ালডেন পন্ডে থাকার সময় থরো ওয়ালডেন লেখেন নি, তবে তাঁর বিরাট বত্রিশ খন্ডে সম্পূর্ণ রোজনামচায় অনেক কিছু লিপিবন্ধ করেন সেখানে। আকরের মতো সেই দিনলিপি থেকে ওয়ালডেন খুঁড়ে তোলা, কিন্তু তার অনেক বেশি ভাগ সারা জীবন ধরে থরো যে সুপ্রচুর পড়াশোনা আর চিন্তা করেন তা থেকে পাওয়া। যেমন প্রাচ্য দর্শনেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ওয়ালডেন-এর অনেক জায়গাতেই তিনি ভারতীয় সাহিত্যকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, বোধ হয় 'শীতের জলাশয়' পরিচ্ছেদের শেষাংশই তার সব চাইতে মনোজ্ঞ সাক্ষ্য, যেখানে তিনি লিখছেন, "ঊষাকালে আমি ভগবদ্গীতার বিরাট বিশ্বরূপের দর্শনে নিজের ধীকে অবগাহন স্নান করাই, এই রচনার পর কত ভাগবদ্‌বর্ষ কেটে গেছে, তবু তার তুলনায় বর্তমান কাল আর তার সাহিত্যকে কি নগণ্য আর তুচ্ছই না মনে হয়; এর বিরাটত্বের ধারণা আর আমাদের ধারণার মধ্যে এত ব্যবধান যে, এতে প্রাক্তন কোন সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। পুঁথি বন্ধ করে ঘাট থেকে জল তুলতে গেলাম আমি, চেয়ে দেখি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্রের সেই পূজারী ব্রাহ্মণের শিষ্য, এখনও যিনি গঙ্গার ধারে তাঁর মন্দিরে বসে আছেন, কি লাঠি-লোটা নিয়ে গাছের তলা সার করেছেন। তাঁর শিষ্যের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁর গুরুর জন্য জল নিতে এসেছেন তিনি, আমাদের দুজনের ঘটই যেন একত্র এক ঘাটে ঝনাৎ করে বেজে উঠল। ওয়ালডেনের নির্মল জলের সঙ্গে গঙ্গার পুণ্যোদক এক হয়ে গেল।" (২৫৬ পৃষ্ঠা)।

এর লেখক যখন বনে গিয়ে ওঠেন, তার দশ বৎসর পরে, ১৮৫৪ সালে ওয়ালডেন প্রকাশিত হয়। অনেক সপ্রশংস সমালোচনা লাভও ঘটে এর। প্রথম সংস্করণের দু' হাজার কপি যথাসময়ে বিক্রি হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগে দ্বিতীয় সংস্করণের কোন ব্যবস্থা হয় নি। ক্রমে ক্রমে বইটার কদর বাড়তে থাকে। বৃটিশ লেবার পার্টি বইটাকে অবশ্যপাঠ্য করেন। বইটা পৃথিবীময় বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে নানা সংস্করণের ওয়ালডেন পাওয়া যায়, আবার একটা সুলভ সংস্করণও আছে, আমেরিকার

সর্বত্র তার বিক্রি। অনেক ভাষাতেই এর অনুবাদ হয়েছে, এখন সুখ্যাত ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমী গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হ'ল। থরো খুশি হ'তেন!

গ্রন্থাকারের জীবনকাল অপেক্ষা মৃত্যুর পর যে গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, সত্যকার মহৎ গ্রন্থ তো তাই। আগের চাইতে, ওয়ালডেন আজ বেশি জীবন্ত। এর ভাবরূপের জন্যই বইটা জীবন্ত, ভাবরূপ যে মৃত্যুহীন। অপেক্ষাকৃত কম নামকরা থরোর একটা ছোট বই, 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স', একটা পুস্তিকা মাত্রের ফল থেকে এর সত্যতা সুন্দর বোঝা যায়। লেখা হবার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' মোহনদাস গান্ধীর হাতে পড়ে, তিনি তখন প্রিটোরিয়ার জেলে। গান্ধীজী পরে বলেছেন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিষয়ে থরোর ভাবে আর তাঁর ভাবে সাদৃশ্য ছিল, আর ভারতের বিরাট স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কথাটাও তিনি ব্যবহার করেন।

ওয়ালডেন অনেক মহৎ আর মৃত্যুহীন ভাবের ভাণ্ডার। তাদের মধ্যে একটা এই বিশ্বাস, মানুষের সত্যকার শক্তির অনেকখানি তার নিজের মধ্যে, তার সংস্থাগুলোর মধ্যে নয়। মোহনদাস গান্ধী যেমন তাঁর 'সিভিল ডিসও-বিডিয়েন্স' থেকে পেয়েছিলেন, সম্ভবত এখনও অনেকে থরোর ওয়ালডেন থেকে তেমান পুনরাশ্বাস লাভ করবেন।

নিউ ইয়র্ক
১৬ই জুন ১৯৫৯

রবার্ট এল ব্রাউয়েল

পত্রাংক

॥ ১ ॥ আর্থিকী

বইটা যখন লিখেছিলাম, তখন আমি নিঃসঙ্গ বনবাসী। এর বেশির ভাগ যখন লিখি বলাই ঠিক হবে। একটা আস্তানা স্বহস্তে খাড়া করেছিলাম ম্যাসাচুসেট্‌সে কনকর্ডের অন্তর্বর্তী ওয়ালডেন পন্ডের ধারে। কায়িক পরিশ্রমে জীবিকার্জন করতাম। দুবছর দুমাস কাটাই সেখানে। এখন আবার সভ্য-সমাজে আমি পরবাসী।

কি ভাবে দিন কাটাতাম, আমার শহরবাসীরা তার খুঁটিনাটি জানতে উদ্‌গ্রীব না হলে আমার নিজস্ব ব্যাপার সাত কাহন করে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করতাম না। অনেকে হয়তো ভাববেন এ তাঁদের অনধিকারচর্চা। আমার কাছে কিন্তু মনে হয় নি যে তাঁরা অনধিকারচর্চা করছেন। বরং সব অবস্থা বিচার করে অত্যন্ত স্বাভাবিক আর অধিকার-সঙ্গতই মনে হয়েছে। অনেকে জানতে চেয়েছেন কি খাদ্য খেতাম; নিঃসঙ্গ বোধ করতাম কি না; ভয় করত কি না ইত্যাদি। কেউ কেউ জানতে আগ্রহ দেখিয়েছেন আমার আয়ের কত ভাগ খয়রাত করতাম। যাঁদের পরিবার বৃহৎ তাঁরা জানতে চেয়েছেন কতগুলি অনাথ শিশু পালন করেছি। এই বইয়ে এসব প্রশ্নেরই কিছু কিছুর উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। তাই আমার পাঠকদের যাঁদের আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল নেই তাঁদের মার্জনা ভিক্ষা করছি। অধিকাংশ বইয়ে উত্তম পুরুষ যে আমি সে বাদ পড়ে থাকে। এ বইয়ে সে স্বস্থানে সমাসীন রইল। অহমিকার ক্ষেত্রে এর প্রাধান পার্থক্য সেইখানে। আমরা সাধারণত মনে রাখি নে যে, শেষ পর্যন্ত মুখপাত্র সর্বদা উত্তম পুরুষ। আর কাউকে যদি জানতাম যাকে নিজের চাইতেও ভাল জানি, তবে নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলতে হ'ত না। দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের অভিজ্ঞতার সংকীর্ণতার ফলে এই প্রসঙ্গেই গন্ডীবন্ধ থাকতে হয়েছে আমাকে। উপরন্তু আমি নিজেও তো এই চাই যে, ভাল-মন্দ সব লেখকই শুধু অন্যের জীবনের শোনা কথা না লিখে অকপটে নিজের জীবনের সহজ কথাই লিখুন। যেন দূরদেশ থেকে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে কোন বিবরণ পাঠাচ্ছেন। কেন না, তিনি যদি অকপটে জীবন যাপন করে থাকেন, আমার কাছে তা নিশ্চয়ই দূরদেশ। এ বই বিশেষ করে গরিব ছাত্রদের উদ্দেশেই লেখা হয়েছে হয়তো। বাকি সব পাঠক এর যে অংশ নিজেদের ভাল লাগবে সেইটুকুই মানবেন। আমার নিবেদন, পিরানটা পরতে গিয়ে কেউ

যেন সেটাকে ছিঁড়ে না ফেলেন। কেন না, যার গায়ে ঠিক হবে তার উপকারেই লাগবে এটা।

আপনারা যাঁরা বইটা পড়ছেন, নিউ ইংলণ্ডের বাসিন্দা বলে যাঁদের পরিচয়, সেই আপনাদের নিয়েই, এই দুনিয়াতে, এই শহরের মধ্যে, আপনাদের যে অবস্থা বাইরে থেকে চোখে পড়ে, বিশেষ করে সেই বিষয় নিয়েই যাকিছু লেখার সংকল্প আমার—চীনাদের আর স্যান্ডউইচ দ্বীপের অধিবাসীদের জন্য তো নয়ঃ সেটা কি, সেটা যে পরিমাণ মন্দ ঠিক ততটা হওয়াই আবশ্যক কি না, উন্নতি সাধন করা চলে কি না তার, এই সব বিষয় নিয়েই যৎকিঞ্চিৎ লেখা। কনকর্ড অঞ্চলে, সর্বদা, দোকানপাটে, অফিস-আদালতে, মাঠে ঘাটে অনেক ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। খালি মনে হয়েছে আমার এর বাসিন্দারা হাজার হাজার ব্যাপারে প্রায়শ্চিত্ত ,করে চলেছে। এই যে শুনতে পাই ব্রাহ্মণেরা চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে, খালি গায়ে তাতে পুড়ছেন আর সোজা সূর্যের দিকে চেয়ে আছেন, কিংবা নিচে আগুন জেবলে তার দিকে মাথা দিয়ে উপর থেকে ঝুলছেন, কিংবা ঘাড় ফিরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছেন "যে পর্যন্ত না স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়, সংকুচিত কণ্ঠদেশের অভ্যন্তর দিয়ে তরল দ্রব্য ছাড়া পাকস্থলীতে আর কিছু না প্রবেশ করতে পারে"; কিংবা বৃক্ষকান্ডে নিজেকে শৃংখলবদ্ধ করে কেউ জীবন কাটাচ্ছেন, কিংবা শুক-কীটের মত বুকে হেঁটে কেউ বিরাট মহাদেশের বিস্তৃতি মেপে চলেছেন, কিংবা কোন খুটির মাথায় একপায়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন—এই সব স্বেচ্ছা-প্রণোদিত তপশ্চর্যাও, প্রতিদিন যে সব দৃশ্য দেখছি, তাদের তুলনায় খুব বেশি অবিশ্বাস্য বা বিস্ময়কর বোধ হয় না। আমার পড়শীরা যা করেন কাহিনীর হারকিউলিসের দ্বাদশ বীরত্ব তার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। কেন না, সংখ্যায় যা দ্বাদশ তার শেষ আছে। কিন্তু এই সব লোক কোন দৈত্য-দানবকে বন্দী বা নিহত করেছেন, অথবা কোন রকম বীরত্ব সাধন করেছেন বলে কখনও আমার নজরে পড়ে নি। তাদের ইওলাউসের মতো কোন মিত্রও নেই, যিনি রূপকথার সহস্রশির দৈত্যের মুণ্ড তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে দগ্ধ করতে পারেন, যে দৈত্যের একটা মুণ্ডের বিনাশ সাধন করতে না করতেই আর দুটো গজিয়ে ওঠে।

আমার শহরবাসী যুবকদের, যাদের জোতজমি বাড়িঘর খামার গরু চাষবাসের যন্ত্রপাতি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করার দুর্ভাগ্য হয়েছে, তাদের তো দেখছি। কেন না, এগুলো লাভ করা যত সহজ, তা থেকে মুক্তি লাভ তত সহজ নয়। এর চাইতে উন্মুক্ত প্রান্তরে জন্মানো আর নেকড়ের স্তন্যপান ভাল ছিল; তা হ'লে সাদা চোখে দেখতে শিখত, কেমন জমিতে আবাদ করতে জন্ম তাদের। তাদের ভূমিদাস করেছে কে? ষাট একর জমির খাদ্যের কি

দরকার তাদের, যখন ধূলিমুষ্টি গলাধঃকরণ করে বেঁচে থাকার অভিশাপ নিয়েই মানুষ জন্মেছে? জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের কবর খুঁড়তে আরম্ভ করে কেন এরা? এই সব কিছুকে সামনে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে তবেই মানুষের মতো বাঁচতে হয় এদের। এই ভাবে যথাসাধ্য ভাল থাকতেও হয় এদের। কত না শক্তিধর হতভাগ্য পুরুষ দেখেছি, যারা পঁচাত্তর ফুট লম্বা চল্লিশ ফুট চওড়া এই একটা গোলাঘর সামনে ঠেলতে ঠেলতে বোঝার ভারে প্রায় চাপা পড়ে দম আটকে আধমরা হয়েছে, জীবনের পথে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে, রাজা অগিয়াসের আস্তাবল সারির মতোই তার জঞ্জাল কোন দিন সাফ হয় নি। সঙ্গে আবার একশ একর জমি, তার চাষ-আবাদ ঘাস কাটা গো-চারণ, তা ছাড়া তো বনবাদাড়। যাদের জোতজমা নেই, তাদের এই সব অনাবশ্যক উত্তরাধিকৃত উৎপাতের ঝামেলা পোহাতে হয় না। তবু কয়েক হাত পরিমাণ মাংসপিন্ডকে তাঁবে রেখে তার পুষ্টিসাধনের জন্যই তাদের প্রাণান্ত।

কিন্তু এই শ্রমস্বীকার মানুষের ভুল। মানুষের বেশির ভাগটাই তো লাঙলের ফলার চাপে অচিরাৎ মৃত্তিকাসাৎ হয়ে সারে রূপান্তরিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থে যেমন উল্লেখ আছে, যাকে সাধারণত প্রয়োজন-বোধ বলা হয়ে থাকে, সেই আপাত দৈববশে তারা পোকায় কেটে মরচে পড়ে নষ্ট হবার জন্য, চোরের সিঁদ কেটে চুরি যাবার জন্য, ধনরত্ন সঞ্চয় করতে রত। জীবনযাত্রার এই ধারাটা যে নির্বোধোচিত, জীবন সাঙ্গ হয়ে এলে, হয়তো বা তার আগেই মানুষ বুঝতে পারে। গল্পে আছে, ডিউকালিয়ন আর পিরা নিজেদের মাথা ডিঙিয়ে পিছন দিকে যে পাথর ছুঁড়েছিলেন, মানুষের সৃষ্টি তাই থেকে।

র‍্যালে তাঁর নিজস্ব ধ্বন্যাত্মক ভঙ্গিতে যা নিয়ে কবিতা লিখেছেনঃ

"সেই দিন হ'তে মানুষের জাত কঠিন-হৃদয় রহে,
দুঃখ-বেদনা সহে,
মানুষের দেহ পাথরের ধাত বহে।"

দৈববাণীতে এমনই অন্ধ বিশ্বাস যে, বিভ্রান্তিকর হলেও পিছনে না তাকিয়ে পাথর ছুঁড়ে চলে, কোথায় পড়ছে দেখে না।

এদেশ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। কিন্তু এখানেও অনেক লোকই নিছক অজ্ঞতা আর বিভ্রান্তির ফলে জীবনের যত কাল্পনিক দুশ্চিন্তা আর অবান্তর নিকৃষ্ট কাজকর্ম নিয়ে এমন ব্যস্ত যে, তার উৎকৃষ্ট সব ফল তারা সংগ্রহ করে উঠতে পারে না। অত্যধিক শ্রমে তাদের আঙুলগুলো এমনি আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে যে এ কাজ করতে গেলে কাঁপতে থাকে সেগুলো। সত্যিই দিনমজুর লোকের পক্ষে দৈনন্দিন প্রকৃত সততার অবকাশ নেই। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে মনুষ্যত্ব বজায় রাখা তার পোষায় না, বাজারে তার মজুরির হার কমে যেতে

পারে। এক যন্ত্র ছাড়া আর কিছু হবার অবসর নেই তার। নিজের অজ্ঞতা সে কি করে পুরোমাত্রায় স্মরণে রাখতে পারে—আত্ম-বিকাশের জন্য যা অত্যাবশ্যক? তাকে যে ক্রমাগতই বিজ্ঞতার বেসাতি করতে হয়। তাকে বিচার করার আগে আমাদের উচিত তাকে কখনও কখনও নিখরচায় খেতে পরতে দেওয়া, তাকে দলভুক্ত করতে তার স্ফূর্তির ব্যবস্থা করা। আমাদের স্বভাবের যা শ্রেষ্ঠ গুণ, ফলপাকড়ের রাঙিমার মতো, অতি সন্তর্পণ ব্যবহারেই তা বজায় থাকে। কিন্তু কি নিজের সঙ্গে কি অপরের সঙ্গে এত সহৃদয় ব্যবহার করে চলি না তো আমরা।

আমরা সকলেই জানি, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ দরিদ্র। বেঁচে থাকাই যাঁদের পক্ষে কষ্টসাধ্য, যাঁদের কখনও কখনও যেন নিঃশ্বাস নিতেই দম আটকে আসে। আমার সন্দেহ নেই, আপনারা যাঁরা এ-বই পড়ছেন, তাঁদের কেউ কেউ বাস্তবিকই যতবার আহার্য গ্রহণ করেছেন, কিংবা যে জামা-জুতো দ্রুত জীর্ণ হয়ে আসছে বা ইতিমধ্যেই জীর্ণ হয়ে এসেছে, তাদের মূল্য দিতে অপারগ এবং এ-বই পড়তে এসেছেন সময় ধার কি চুরি করে, যে এক ঘণ্টা কাল আপনাদের পাওনাদারদের ফাঁকি দিয়েছেন। আপনাদের অনেকে কি রকম চোরের মতো আর ইতর জীবন যাপন করেন, তা চোখের উপর ভাসছে, কারণ আমার দৃষ্টি যে অভিজ্ঞতায় শাণিত হয়েছে। সব সময়েই মরি কি পড়ি, কাজে ঢুকে পড়ার চেষ্টা, ধার-কর্জ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা, অতি পুরাতন সেই পাঁক, লাটিন-ভাষী লোকেরা বলতেন অপরস্য পিত্তলম্। তাঁদের কোন কোন মুদ্রা পিতলের তৈরী ছিল কি না। শুধু বেঁচে থাকা আর মরা আর গোরে যাওয়া, সবই অপরস্য পিত্তলম। সব সময়েই কথা দেওয়া টাকা দেবই দেব, কাল দেব, তারপর আজই দেউলে হয়ে মরা, অনুগ্রহ কুড়িয়ে বেড়ানো, বাজারে চালু হওয়ার কত ফন্দি-ফিকির, জেলে যেতে হয় এমন অপরাধ গুলো বাদ। মিথ্যাবাদ, তোষামোদ, ভোটাভুটি, ভব্যতার খোলসের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে ফেলা, কি ফেঁপে ফুলে ওঠা অতিমিহি ভাপেভরা দিলদরিয়া আবহাওয়ায়, যাতে আপনার পড়শীকে রাজী করাতে পারেন যে তার জুতা-জোড়ার, কি হ্যাটের, কি কোটের, কি গাড়িটার অর্ডার, কিংবা তার মাল-মশলা আমদানির ভারটা আপনাকেই সে দেয়; ভবিষ্যৎ বিপদের আশংকায় নিজেদের বিপন্ন করে যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করা—পুরনো সিন্দুকের মধ্যে তুলে কি বেড়ার আড়ালে মোজাটায়, কি বেশি নিরাপদ হতে হ'লে পাকা-পোক্ত ব্যাঙ্কে মজুদ্ রাখা, কোথায়, কেমন করে, যত বেশি হ'ক কম হ'ক, কিছুতেই কিছু যায় আসে না।

উত্তর তথা দক্ষিণ উভয়ত্রই আমাদের এত সব সুচতুর আর হুঁসিয়ার প্রভুরা রয়ে গেছেন। মধ্যে মধ্যে তাই অবাক লাগে আমার, এত অর্বাচীনও

হতে পারি আমরা যে—মুখে এসে পড়েছে—নিগ্রো-দাসত্ব-প্রথা আখ্যাত এত স্থূল আর হাজার হলেও ভিনদেশি দাসত্বের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই। তদারকওয়ালা দক্ষিণদেশি হলে মুশকিল, উত্তরদেশি হলে আরও মুশকিল, কিন্তু সব চাইতে মুশকিল হচ্ছে যখন নিজেকে নিজের তদারকওয়ালা হতে হয়। নর-নারায়ণের কথা বলা হয়। বড় রাস্তার ঘোড়ার পালের তদারক-ওয়ালাকে চেয়ে দেখ, দিনে রাতে হাটের দিকে ছুটছে। তার মধ্যে কি নারা-য়ণের সাড়াশব্দ পাওয়া যায়? তার চরম কর্তব্য হচ্ছে ঘোড়াগুলোকে দানা-পানি দেওয়া। মালপত্র জাহাজ বোঝাই করার হিতাহিতের কাছে তার নিজের হিতাহিতের কি মূল্য? মহামহিম হুমকিরাজের ঘোড়া চালায় না সে? দেবোপম নন কি তিনি? অমর লোকের অধিবাসী নন্? লক্ষ্য করুন, কি রকম কাঁচুমাচু আর চোরের মতো ব্যবহার ওর, কি যেন ভয়ে ভয়েই আছে সারাদিন। নিজে অমরও নয়, দেবতাও নয়, শুধু নিজের সম্বন্ধে নিজের মতামতের দাসানুদাস, তার বেড়াজালে বন্দী। নিজের কৃতকর্মেই সে কীর্তিমান। আমাদের নিজস্ব মতামতের কাছে জনমত হীনবল প্রজাপীড়ক মাত্র। মানুষ নিজেকে নিজে যা ভাবে তাই তার অদৃষ্ট বিধান করে, বরং বলি, অদৃষ্ট নির্দেশ করে। নিজের ধারণা আর কল্পনার যে ওয়েষ্ট ইন্ডিয়া অঞ্চল, সেখানে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কোন উইলবারফোর্সকে পাওয়া যাবে? পাছে নিজেদের ভাগ্য সম্বন্ধে বালোচিত কোন কৌতূহল দেখানো হয়, তাই শেষকৃত্যের জন্য যে দেশের মেয়েরা নিজেরাই বিলাস-শয়ন বয়ন করে, তাদের কথাও ভাবুন। যেন অনন্ত কালের অনিষ্ট সাধন না করে কাল ক্ষয় করা চলে।

বেশির ভাগ লোকই বিনা প্রতিবাদে হতাশা নিয়েই জীবন কাটিয়ে চলে। যাকে আত্ম-সমর্পণ বলা হয় তা দৃঢ়মূল হতাশা। হা-হুতাশময় শহর ছেড়ে বরাভয়ময় অঞ্চলে প্রস্থান করে মিংক আর মাস্করাটদের বীরত্ব দেখলেও সান্ত্বনালাভ হয়। মনুষ্যসমাজে খেলাধুলো আর আমোদ-প্রমোদের নামে যা চলিত, তার অন্তরালেও একটা গতানুগতিক অথচ নিশ্চেতন হতাশার ভাব গোপন আছে। খেলাটাও নেই এ সবের মধ্যে। কেন না কাজ করার পরেই তো খেলার পালা আসে। কিন্তু হতাশ ভাবে কাজকর্ম না করাই বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ।

যদি বিবেচনা করে দেখি, শিশু-শিক্ষার ভাষায় বলা যাক্ মানুষের প্রধান লক্ষ্য কি, আর জীবনের আসল প্রয়োজন তথ্য পন্থা কি, তবে মনে হয় মানুষ তার এই সাধারণ জীবনযাপনের ধারা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে, আর সব কিছুর চাইতে এ-ধারা তার মনোমত হয়েছে বলেই। তবু তারাই আবার সত্য সত্যই ধরে নিয়েছে যে, এ-ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই। কিন্তু প্রকৃতি

যাদের সজাগ, সুস্থ, তাদের মনে পড়ে, উদয়কালে সূর্য অবারিত ছিল। অন্ধবিশ্বাস বর্জন সব সময়েই করা যায়—তার কালাকাল নেই। বিনা প্রমাণে কোন চিন্তা কি কাজের পদ্ধতিতে আস্থা রাখা চলে না—যত সনাতনই হোক সে-পদ্ধতি—সবাই আজ যার প্রতিধ্বনি করে, কি যাকে সত্য বলে নীরবে মেনে নেয়, কাল প্রমাণ হতে পারে তা মিথ্যা, শুধু মতবাদের ধোঁয়া। অনেকে মেঘ বলে যার ভরসা করেছিল, যার বর্ষণে নিজেদের মাঠ সরস হবে ভেবেছিল। প্রাচীন লোকেরা যে কাজ তুমি করতে পার না বলেছেন, চেষ্টা করে দেখ করতে পারবে তা। প্রাচীন লোকদের কাজের ধরন সেকেলে। নবীনদের একেলে। প্রাচীন লোকেদের একদা এমন জ্ঞান হয়তো ছিল না যে, নতুন করে জ্বালানি-কাঠ দিয়ে তবেই আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হয়। নবীনরা একটা পাত্রের নিচে কয়েকটা শুকনো কাঠ রাখছে, আর ভূমণ্ডলের চারপাশ পাখির মত দ্রুত পরিক্রমণ করছে, কথায় যেমন বলা যায় যেন প্রাচীনের মরণ-কামনায়। শিক্ষাদাতা হিসাবে প্রাচীন নবীনের চাইতে যোগ্যতর নন, নবীনের সমান যোগ্যতাও তাঁর আছে কি না সন্দেহ, কারণ যত ব্যয় হয়েছে তাঁর তত লাভ করেন নি তিনি। শুধু বেঁচে থেকেই প্রাজ্ঞতম ব্যক্তিও তেমন নিরঙ্কুশ মূল্যবান কোন শিক্ষা লাভ করেছেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। হাতে কলমে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন নির্দেশও প্রাচীন ব্যক্তি তরুণকে দিতে পারেন না। তাঁদের অভিজ্ঞতা এত খণ্ডিত, তাঁদের জীবন এমন মারাত্মক রকমে ব্যর্থ হয়েছে—তাঁরা হয়তো মনে করেন—ব্যক্তিগত কারণেই। এমনও হতে পারে তাঁদের যে সামান্য আস্তিক্যবুদ্ধি আজও অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তাতে সে-অভিজ্ঞতাও মূল্যহীন বলে মনে হয়। শুধু তাঁরা যতখানি তরুণ ছিলেন, ততখানি আর নেই। এই গ্রহে প্রায় ত্রিশ বৎসর বাস হ'ল আমার, বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে মূল্যবান, এমন কি অকপট কোন উপদেশের প্রথম পদ শুনতে আজও আমার বাকি। তাঁরা আমাকে কিছুই বলেন নি, হয়তো যথোচিত কিছু বলবারও নেই তাঁদের। এই যে জীবনরূপ পরীক্ষা—তার অধিকাংশই আমার কাছে অপরীক্ষিত রয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা যে চেষ্টা করেছেন, তাও আমার কাজে লাগে নি। আমার যদি কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, মূল্যবান বলে যা মনে করি, এই আচার্যবৃন্দ সে সম্বন্ধে আমাকে কোন নির্দেশই দেন নি, চিন্তা করলেই নিশ্চিত বুঝি তা।

জনৈক চাষী আমাকে বলে, শুধু শাকসবজি খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না, তাতে অস্থি গঠন করতে পারে এমন কিছু নেই। সুতরাং দিনের একাংশ সে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের দেহে অস্থিরূপ কাঁচামাল সরবরাহে ব্যস্ত থাকে। যে-বলদজোড়ার পিছন পিছন ক্রমাগত বকবক করতে করতে হাঁটে সে, তারা তাদের উদ্ভিজ্জ-গড়া হাড়েই সমস্ত রকম বাধা সত্ত্বেও, চাষী আর তার ছ্যাকড়া

লাঙলটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে। জীবনধারণের পক্ষে বিশেষ বিশেষ জিনিষ বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে অত্যাবশ্যক। যেমন নিতান্ত দুর্বল আর অসুস্থদের ক্ষেত্রে। অপর ক্ষেত্রে সেগুলো শুধুই বিলাস-সামগ্রী, আবার অন্য কোন স্থানে সেগুলো এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

কেউ কেউ মনে করেন, মনুষ্য-জীবনের সমগ্র ভূমিতেই, তাঁদের পূর্ব-পুরুষেরা বিচরণ করে গেছেন—কি পাহাড়ের ঢিপি—কি উপত্যকা, সর্বত্রই। এবং সব জিনিসেই অবহিত হয়েছিলেন তাঁরা। ইংরেজ লেখক এভলিনের মতে বিচক্ষণ সলোমন বৃক্ষে বৃক্ষে কতটা দূরত্ব থাকবে সে-বিধিও নির্দিষ্ট করেন এবং রোমের প্রিটরগণ স্থির করেন, কতবার তুমি তোমার প্রতিবেশীর জমিতে ওক গাছের ফল কুড়োতে অনধিকার প্রবেশ না করে যেতে পার এবং তার কত অংশই বা ঐ প্রতিবেশীর প্রাপ্য। আমাদের নখ কি করে কাটা উচিত, হিপো-ক্রেটিস তারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন; অর্থাৎ আঙুলের ডগার সমান সমান হয় যেন তারা, ছোটও না বড়ও না। জীবনের আনন্দ আর বৈচিত্র্য নিঃশেষ হয়ে বিরক্তি আর অবসাদের ভাবটাও নিঃসন্দেহে মান্ধাতার আমলের ব্যাপার। কিন্তু মানুষের ক্ষমতার কোন পরিমাপ কোনদিন হয় নি। আর এ বিষয়ে এত কম চেষ্টা হয়েছে যে পুরনো নজির দেখে বিচার করাও সাজে না সে কি করতে পারে। তোমার যত অকৃতকার্যতাই হয়ে থাক এ পর্যন্ত, "ক্লেশ বোধ ক'রো না বৎস, তোমার কি করা হল না, কে তোমাকে তা নির্ধারণ করে দেবে?"

হাজার রকম সামান্য সামান্য সংকেত সূত্রে আমাদের জীবনকে আমরা চালিত করতে পারি। যথা, যে সূর্য আমার বিনগুলো পাকাচ্ছে সেই একই সূর্য আবার আমাদের পৃথিবীর মতো কত গ্রহকে আলোকিত করছে। এ-কথা মনে থাকলে আমার কিছু ভুল-চুক নিবারণ হ'ত। এ আলোতে তো আবাদ করা হয় নি আমার। নক্ষত্রগুলো কি আশ্চর্য সব ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু। দূর দূর থেকে কত বিভিন্ন প্রাণীই না বিশ্বভুবনের বিচিত্র-সব হর্ম্য থেকে একই ক্ষণে একই বিষয় ধ্যান করছে। আমাদের যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাসন-তন্ত্র, প্রকৃতি আর মনুষ্য-জীবনও তেমনি বিচিত্র। কে বলবে, কার জীবনের ভবিষ্যৎ কি দেবে কাকে? পরস্পর এক মুহূর্তের দৃষ্টিবিনিময়ের চাইতে বেশি অলৌকিক ঘটনা আমাদের পক্ষে আর কি ঘটতে পারে? এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পৃথিবীর যুগে যুগে, সকল যুগের সকল পৃথিবীতে জীবন অতিবাহিত করে আসতে হবে যে। ইতিহাস, কাব্য, পুরাণ! অপরের অভিজ্ঞতার এমন কোন পঠনই আমার জানা নেই, যাতে সে-রোমাঞ্চ আর সে-জ্ঞান লাভ হ'তে পারে।

অমার প্রতিবেশীরা যা ভাল বলে, তার বেশির ভাগকেই অন্তর থেকে মন্দ বলে বিশ্বাস করি আমি। যদি কোন কিছুর জন্য আমি অনুতাপ বোধ করি, খুব সম্ভব তা আমার সদাচরণের। কোন ভূতে আমাকে পেয়েছিল যে,

আমি অত ভাল হয়ে চলতাম। যত সৎ পরামর্শই দিন না কেন, বৃদ্ধ আপনি, সত্তর বৎসর কাল বেঁচে আছেন, চলনসই সম্মানলাভও ঘটেছে খানিকটা, কিন্তু আমি যে আমার কানে অনিরুদ্ধ বাণী শুনেছি। সব কিছু থেকে দূরে যাবার আমন্ত্রণ করেছে সে। এক যুগ অন্য যুগের সব তোড়জোড় চড়ায়-আটকে-পড়া জাহাজের মতো বর্জন করে চলে।

আমার মনে হয়, সচরাচর যেটুকু করে থাকি তার চাইতে অনেক বেশি আস্তিক্যবোধ আমরা নিঃসংশয়ে পোষণ করতে পারি। মন-প্রাণ দিয়ে পরার্থ চিন্তা করলে তবেই তো সেই পরিমাণ চিন্তা স্বার্থের ক্ষেত্রে বাতিল করা চলে। প্রকৃতি, যেখানে আমাদের দৌর্বল্য সেখানেও যেমন, আমাদের শক্তি যেখানে, সেখানেও তেমনই সামঞ্জস্য করে নেবার ক্ষমতা রাখে। কারও কারও পক্ষে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা আর অত্যধিক খাটুনির চাপ প্রায় দুরারোগ্য ব্যাধির সমান। যে-টুকু কাজ করি, তার গুরুত্ব অতিরিক্ত রকমে বাড়িয়ে তোলার ধাত আমাদের। কিন্তু আরও কত কিছু আমাদের না-করা থেকে যায়। অসুখ হলে কি হত? কি না সজাগ থাকার রকম আমাদের! এড়াতে যদি পারি, তবে আস্তিক্যবোধহীন হয়েই জীবন কাটাবার জন্য বদ্ধপরিকর সব। সারাদিন হুঁসিয়ার থাকি, রাত্রে কোন ক্রমে প্রার্থনার বাঁধা বুলি আউড়ে অনিশ্চিতের কাছে নিজেদের গচ্ছিত রাখি। এমন নিখুঁত ভাবে, নিষ্ঠার সঙ্গে জীবন যাপনে বাধ্য হই আমরা, জীবনের নাম-জপ করি যে এর পরিবর্তন হবার কোন সম্ভাবনা পর্যন্ত আমল দিতে চাই নে। আমরা বলে থাকি একমাত্র পন্থা এই। কিন্তু কোন কেন্দ্রবিন্দু থেকে যতগুলি ব্যাসার্ধ টানা চলে পন্থা যে ততগুলিই। ভেবে দেখতে গেলে সব পরিবর্তনই অলৌকিক। কিন্তু এই অলৌকিক কাণ্ডই তো প্রতি মুহূর্তের লৌকিক ঘটনা। কনফুশিয়াস বলে গেছেন, "যা জানি তা জানি, যা জানি না, তা জানি না, এইটে জানাই সত্যকার জ্ঞান।" একজন লোকও যখন তার কল্পনার বস্তুকে বোধগম্য বস্তুতে পরিণত করতে পেরেছে, সব মানুষই তাহলে অবশেষে সেই ভিত্তিমূলেই নিজেদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, তারই পূর্বাভাস এ।

একটু বিবেচনা করে দেখা যাক, যে-সব দুঃখ দুশ্চিন্তার কথা বললাম তার বেশির ভাগ কি নিয়ে, আর সেজন্য দুশ্চিন্তা করার, অন্তত সতর্ক হবার দরকার কতখানি। বহির্মুখী সভ্যতার অন্তর্বর্তী হ'লেও আদিম আর অন্তেবাসী জীবন যাপন করার কিছু সুবিধা আছে। অন্তত বোঝা যায় জীবনযাত্রার মোটামুটি উপকরণগুলো কি, আর সেগুলো পাওয়ার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি, ব্যাপারিদের পুরনো দৈনিক হিসাবের খাতা উলটিয়ে দেখলেও ধারণা হয়, লোকে সাধারণত সব চাইতে বেশি কি কিনত, কিই বা

গন্দামে মজন্দ রাখত তারা; অর্থাৎ যা নইলে নয়, মন্দিখানার তেমন মাল-মশলা কি। কেন না এই যে যন্গ-যন্গের সব উন্নতি বিধান মানন্ষের বেঁচে থাকার মৌলিক বিধি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে নি তারা। আমাদের কঙ্কালের সঙ্গে সম্ভবত আমাদের পন্র্বপন্রন্ষের কঙ্কালের যেমন কোন তফাত করা চলে না।

জীবনযাত্রার উপকরণ—এই কয়টি কথার অর্থ আমি করি এই ভাবে। মানন্ষ নিজে পরিশ্রম করে যা পায় তার মধ্যে কিছন্ কিছন্ প্রথম থেকে, কিংবা দীর্ঘকাল ব্যবহারে, মানন্ষের জীবনে এত জরন্রি হয়ে পড়েছে যে কেউই প্রায় সেগন্লো ছাড়া জীবন কাটাবার চেষ্টা করে না — তা সে বর্বরতা, কি দারিদ্র্য, কি তত্ত্বজ্ঞান যে-জন্যই হ'ক। এই অর্থে অনেক জীবের কাছে জীবনযাত্রার উপকরণ একটি মাত্র — খাদ্য। প্রেয়ারি অঞ্চলের বাইসনের পক্ষে হচ্ছে, কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ সন্খাদ্য তৃণ, আর পানীয় জল;—অবশ্য যদি তার বনের কি পাহাড়ের ছায়ায় আশ্রয় কামনা না থাকে। কোন জীব-জন্তুর খাদ্য আর আশ্রয়ের বেশি কিছন্ দরকার হয় না। এখানকার জল-বায়ন্ অনন্সারে মানন্ষের পক্ষে জীবনযাত্রার এই উপকরণকে ঠিকঠাক কয়েকটা অংশেই ভাগ করা যায় — খাদ্য, আশ্রয়, পরিধেয় আর জন্বালানি। এই সবের সন্ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে স্বাধীন ভাবে, সাফল্যের আশা রেখে জীবনের প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করার কথা ওঠে না। মানন্ষ শন্ধন্ বাড়ি-ঘর আবিষ্কার করে নি, কাপড়-চোপড় আর পাক-করা খাবার-দাবারও আবিষ্কার করেছে। তা ছাড়া, দৈবক্রমে আগন্নের তাপশক্তির আবিষ্কারের ফলে প্রথম যদি বা বিলাস-দ্রব্য, পরে এর ব্যবহার থেকে পাশে বসে আগন্ন পোহাবার ব্যবস্থা এসেছে। কুকুর বিড়ালকেও দেখি. এটা তাদের সংস্কারের সামিল হয়ে গেছে। যথোপযন্ক্ত আশ্রয় আর পরিধেয় পেলেই আমরা যথাসঙ্গত আমাদের আভ্যন্তর তাপ রক্ষা করে থাকি। কিন্তু এই সব, কিংবা জন্বালানি, প্রয়োজনাতিরিক্ত হওয়ায় আমাদের আভ্যন্তর তাপের চাইতে বাইরেকার তাপ বেশি হ'ল যখন, তখন থেকেই পাক-কার্যের প্রকৃত সন্চনা বলা চলে না কি? টিয়েরা-ডেল-ফন্য়েগোর অধিবাসীদের সম্বন্ধে প্রকৃতিবিজ্ঞানী ডারন্ইন বলেছেন যে, তাঁর দলের লোকেরা যথেষ্ট কাপড়-চোপড় পরে আগন্নের খন্ব কাছাকাছি বসে থেকেও যখন যথেষ্ট গরম হতে পারে নি, তখন সেই উলঙ্গ অসভ্যেরা আরও দন্রে বসে থাকা সত্ত্বেও এই ঝলসানোর জন্বালায় দরদর করে ঘামছে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়েছিলেন। এই রকম কেউ কেউ বলেন, যখন ইউরোপীয়েরা কাঁপড়-চোপড় পরেও কাঁপতে থাকেন, তখন নগ্নাবস্থায় থেকেও নিউ হলান্ডের লোক অস্পৃষ্ট থাকে। সভ্য মানন্ষের মেধাবিত্বের সঙ্গে অসভ্যদের কষ্ট-সহিষ্ণন্তার সম্মেলন কি অসম্ভব? লিবিগের মতে

মানুষের দেহ চুল্লীবিশেষ, খাদ্যরূপ জ্বালানিই ফুস্‌ফুসের ভিতরকার তাপক্রিয়া বজায় রাখে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বেশি খাই আমরা, গরমে কম। জীব-দেহের উত্তাপ মন্থর দহনের ক্রিয়া, অতিরিক্ত প্রবল হলে ব্যাধি হয়, মৃত্যু ঘটে। আবার জ্বালানির অভাবে, কি হাওয়ার দোষে আগুন নিভে যায়। অবশ্য প্রাণস্পন্দনকে আগুনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা না হয়। ওটা উপমা মাত্র। উপরের হিসাব থেকে বোঝা যাবে, প্রাণপ্রাচুর্য আর জীবদেহের উত্তাপ— কথা দুটি প্রায় সমার্থ-বোধক। খাদ্যকে দেহের তাপসাধক জ্বালানি বলে ধরে নেওয়া চলে। জ্বালানি শুধু এই খাদ্যকে পাক করে, অর্থাৎ বাইরে থেকে অতিরিক্ত কিছু নিয়ে আমাদের দেহের তাপ বৃদ্ধি করে। আবার এই ভাবে যে তাপ সঞ্চার হ'ল, দেহ যাকে শোষণ করল, আশ্রয় ও পরিধেয় তাকেই রক্ষার সাহায্য করছে।

সুতরাং আমাদের দেহের পক্ষে সর্বপ্রধান প্রয়োজন তাপ রক্ষা, প্রাণশক্তির তেজ রক্ষা। সেই জন্যই তো আমাদের এই কষ্টস্বীকার। শুধু আমাদের খাদ্য, বস্ত্র আর আশ্রয় নিয়ে নয়, আমাদের রাত্রির যে পরিধেয় সেই শয্যা নিয়েও। পাখিদের নীড় আর বুকের পালক কেড়ে নিয়ে আশ্রয়ের মধ্যে আশ্রয় নির্মাণ করা। যেন গন্ধমূষিক তার গর্তের শেষ প্রান্তে ঘাস-পাতার শয্যা রচনা করছে। হৃদয়তাপহীন দুনিয়ার সম্বন্ধে অভিযোগ দরিদ্রদের প্রায়ই করতে শোনা যায়। আমাদের অধিকাংশ পীড়ার প্রসঙ্গে শারীরিক তথা সামাজিক অগ্নিমান্দ্যের উল্লেখ করি। কোন কোন জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে মানুষের জীবন স্বর্গসুখতুল্য হয়। খাদ্য পাক ছাড়া তাপ তখন অনাবশ্যক। সূর্যতাপেই কাজ চলে যায়। অনেক ফলেই সূর্য-করে যথেষ্ট পাক ধরে। নানা রকমের খাবার-দাবার পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত সুলভও হয়। পরিধেয় আর আশ্রয় একেবারেই দরকার হয় না — হলেও অর্ধেক মাত্র। বর্তমান কালে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই দেশের জীবনযাত্রার উপকরণের অতিরিক্ত দরকার শুধু গোটাকয়েক যন্ত্রপাতি, যেমন একটা ছুরি, একটা কুড়ুল, একটা কোদাল, আবর্জনা ফেলার গাড়ি একটা, আরও দুএকটা খুঁটিনাটি। যে পড়াশোনা করে, তার জন্য আলো একটা, কিছু কাগজপত্র, হাতের কাছে খান-কতক বই। সামান্য মূল্যেই এসব মেলে। তবু অপরিণত-বুদ্ধি কেউ কেউ ভূমণ্ডলের বিপরীত দিকে, বর্বর, অস্বাস্থ্যকর সব অঞ্চলে গিয়ে দশ বিশ বছর ধরে ব্যবসায়ে মেতে থাকেন — জীবনধারণকল্পে, অর্থাৎ যাতে আরাম পাওয়া যায় এমন তাপের ব্যবস্থাকল্পে এবং অবশেষে নিউ ইংলণ্ডে এসেই জীবনাবসান হয় তাঁদের। বিলাসের উপযোগী ঐশ্বর্য যাঁদের, তাঁরা শুধু আরাম পাওয়ার মতো তাপ উপভোগ করেন না, অস্বাভাবিক রকমের উত্তাপ ভোগও করেন। কিন্তু আগে যে ইঙ্গিত দিয়েছি — শুধু পাকেরই ব্যবস্থা হয় তাঁদের। অবশ্য ফ্যাসানদুরস্ত রকমে।

বেশির ভাগ বিলাস-সামগ্রীই, জীবনের অনেক তথাকথিত আরামের উপকরণই, শুধু যে অনপরিহার্য তাই নয়, মানুষের ক্রমোন্নয়নের পক্ষেও বিষম অন্তরায়। বিলাস আর আরাম-সামগ্রীর ব্যাপারে জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সব সময়েই দরিদ্রের অপেক্ষাও সরল আর অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। চৈনিক, হিন্দু, পারসিক আর গ্রীক, সব জাতির প্রাচীন দার্শনিকদের চাইতে সম্প্রদায় হিসাবে বেশি দরিদ্র কেউ নয়। বাইরের ঐশ্বর্যের দিক থেকেই, কিন্তু অন্তর-সম্পদে এত ঐশ্বর্যবানও কেউ নন। তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না আমরা। আশ্চর্য যে তাঁদের যতটুকু আমরা জানি ততটুকুও আমাদের জানা সম্ভব হয়েছে। একথা সব জাতির অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কারক আর কল্যাণকারীদের সম্বন্ধেও সত্য। যাকে স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য বলা যায় সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ না করলে কেউই নিরপেক্ষ কি বিচক্ষণ ভাবে মানুষের জীবন পর্যবেক্ষণ করতে পারে না। কৃষি, ব্যবসা, সাহিত্য, শিল্প, সব ক্ষেত্রেই বিলাসের জীবনের ফল বিলাস মাত্র। এ-যুগে দর্শনের অধ্যাপক মেলে, দার্শনিক মেলে না। একদা জীবনে প্রয়োগ করা যা প্রশংসার্হ ছিল আজ তা আওড়ানোও প্রশংসার্হ। কেবল সূক্ষ্ম চিন্তায় ব্যাপৃত থাকলে, এমন কি শিক্ষালয় খুললেই দার্শনিক হওয়া হল না। জ্ঞানানুরাগ এমন হওয়া আবশ্যক, যাতে তার নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাত্রা সরল, স্বাধীন, উদার আর আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। শুধু পুঁথিগত ভাবেই নয় কার্যতও তাঁদের জীবনের কিছু কিছু সমাধান করতে হবে। বড় বড় চিন্তাবীরের কৃতিত্ব সভাসদ্‌সুলভ কৃতকার্যতা মাত্র, রাজোচিত নয়, পুরুষোচিত নয়। তাঁদের পূর্বপুরুষগণ যা করে গেছেন, তাই বজায় রেখেই তাঁরা কৌশলে জীবন কাটিয়ে দেন। কোনক্রমেই তাঁদের মহত্তর বংশধরদের পিতৃ-পিতামহ বলা চলে না। কিন্তু অধঃপতন ঘটে কেন মানুষের বংশে? বড় বড় বংশ নষ্ট হয়ে যায় কেন সব? জাতি কে জাতি ক্লৈব্য প্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয় যে ভোগ বিলাসে, তার প্রকৃতিটা কি? আমাদের বেলায় তার কোন অস্তিত্ব নেই, এ-বিষয়ে আমরা কি এতই সুনিশ্চিত? দার্শনিক যিনি, তিনি ভবিষ্যৎ জীবনের অগ্রদূত, এমন কি বাইরের জীবন-যাত্রার ধরনেও। খাদ্য, আশ্রয়, পরিধেয়, তাপন—কিছুই তাঁর সমসাময়িকদের মতো নয়, অন্য সব লোকের চাইতে উন্নত ধরনে জীবনের ক্রিয়া পালন না করতে পারলে সে-ব্যক্তি দার্শনিক হবেন কি করে?

যে কয় প্রণালীর বিবরণ দিলাম তার আরাম ভোগ করা হ'ল যখন, তখন মানুষ কি চায়? ঐ-সব আরামেরই নতুন নতুন সংস্করণ নিশ্চয়ই নয়— যেমন আরও বেশি করে আরও পোলাও-কালিয়া, আরও বড় করে আরও বেশি জমকাল বাড়ি-ঘর, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড়-চোপড়, আরও রকমারি, বিরামহীন সুতপ্ত সব তাপের ব্যবস্থা, নিশ্চয়ই নয়। এই সব

জীবন-যাত্রার দরকারী উপকরণ আয়ত্ত হলে, ছোটখাট ব্যাপারের জন্য পরিশ্রম থেকে মুক্তি লাভের পর আরও বাড়তি জিনিসে লোভ না করে তার পরিবর্তে অন্য কর্তব্যও আছে—জীবন নিয়ে—দুঃসাধ্য সাধন। দেখা যাচ্ছে মাটিটা বীজের উপযোগী কেন না উপমূলদের মাটির নিচে পাঠাতে পেরেছে, এখন ভরসা করে অঙ্কুরকে মাটির উপরেও পাঠানো যায়। মর্ত্যভূমিতে নিজেকে এমন দৃঢ়মূল করায় মানুষের কি লাভ, যদি সে সেই পরিমাণে স্বর্গের দিকে না উঠতে পারে। যারা উঁচু জাতের গাছ শেষ পর্যন্ত তাদের দাম তো দেওয়া হয়, মাটি থেকে অনেক উপরে আলো-হাওয়ায় তাদের যে-ফল ফলে, তাদের জন্যই। তাদের দেখা-শোনার ব্যবস্থাও নিচে-গজানো ভক্ষ্য জাতের ফল-মূলের মতো নয়। এরা দোফলা হতে পারে, কিন্তু এদের মূলের পূর্ণবৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্তই এদের উপর মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। সেই উদ্দেশ্যেই এদের ডগার দিক প্রায়ই এমন করে ছাঁটা হয় যে এদের ফুল দেবার সময় হলেও অনেকেই জানতে পারে না।

যাঁরা বলবান আর নির্ভীক-প্রকৃতি—সেরকম কেউ যদি থাকেন, স্বপ্ন দেখা হয় যা—তাঁরা স্বর্গ কি নরক যেখানেই হ'ক নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেবেন, হয়তো নিজেদের কোন ধনক্ষয় না করেই তাঁরা ধনিশ্রেষ্ঠের চাইতেও অনেক সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন, অজস্র অর্থব্যয় করেন; তাঁদের জীবনযাত্রার কায়দাটা না জানা থাকায় তাঁদের জন্য কোন নিয়মকানুন বাতলাতে চাই না আমি। কিংবা কিছু পরিমাণে আমি নিজে যে দলভুক্ত বলে মনে করি নিজেকে, বর্তমান ঘটনাসংস্থানের মধ্যেই যাঁরা উদ্দীপনা আর প্রেরণা খুঁজে পান, প্রণয়াস্পদের উৎসাহ আর উত্তেজনা নিয়ে মনে তার ধ্যান করেন, তাঁদেরকেও কিছু বলবার নেই আমার। যে-ভাবের হ'ক, যাঁরা কোন ভাল কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁরা নিজেরা জানেন তাঁদের সে-কাজ ভাল কি না, আমার বক্তব্য তাঁদের উদ্দেশেও নয়। আমার বক্তব্য প্রধানত যাঁরা অসুখী, যাঁরা দিনকাল বড় খারাপ, দুরবস্থার চরম হয়েছে কবে তার উন্নতি সাধন করতে পারবেন, এই সব নিয়ে নিশ্চেষ্ট অভিযোগ করেন তাঁদের উদ্দেশে। আবার এমন কেউ কেউ আছেন, সর্বাপেক্ষা সোৎসাহে অভিযোগ করেন তাঁরা, সান্ত্বনায় কর্ণপাত করেন না। কেন না, তাঁদের কথা হচ্ছে তাঁরা কর্তব্য করছেন। আবার যাঁদের ধনী মনে করা হয় কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক রকমে দারিদ্র্যগ্রস্ত যে-সম্প্রদায়, যাঁরা শুধু জঞ্জাল বোঝাই করেছেন, কিন্তু কি ভাবে তা ব্যবহার করবেন বা তার হাত থেকে রেহাই পাবেন জানেন না এবং এই ভাবে যাঁরা নিজেদের স্বর্ণ কি রৌপ্য শৃংখল গঠন করেছেন, আমার মনে তাঁরাও জাগছেন।

যদি বলতে চেষ্টা করি, অতীতে কি ভাবে জীবনযাপনের অভিলাষ ছিল আমার, তবে যেসব পাঠক তার বাস্তবিক ইতিহাসের সঙ্গে খানিকটা

পরিচিত, তাঁরা হয়তো আশ্চর্য হবেন। যাঁরা তার বিন্দু-বিসর্গও জানেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবেন। যে-সব উদ্যোগে ব্যাপৃত ছিলাম আমি, তাদের কয়েকটি মাত্রের আভাস দিচ্ছি।

সব ঋতুতে দিবারাত্রির প্রত্যেকটি ক্ষণে কালচক্রের লগ্নমান শোধন করবার জন্য উৎকণ্ঠিত অবস্থায় দিন কেটেছে আমার, চিহ্ন তক্ষণ করে গেছি নিজের মানদণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে। অনন্তকালের দুইটি যে ভাগ, অতীত আর ভবিষ্যৎ, বর্তমান ক্ষণটি সেই উভয়ের মিলনস্থল। সেই দুই অনন্তের মিলন-বিন্দুটিতে দাঁড়িয়ে উন্মুখ প্রতীক্ষায় দিন কেটেছে আমার। সামান্য কিছু দুর্বোধ্যতা মার্জনা করে নিতে হবে। কেন না, অধিকাংশ ব্যক্তির ব্যবসায়ের অপেক্ষা আমার এই ব্যবসায়ে মন্ত্রগুপ্তি বেশি। কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয় তা, এর প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়ে যেটুকু জানি, তার সবটা জানিয়ে দিতে পারলেই খুশি হতাম। আমার ফটকে "প্রবেশ নিষেধ" এঁকে দিতাম না কখনও।

অনেক দিন হয় একটা কুকুর, কটা রংয়ের ঘোড়া একটা, আর একটা কপোত হারিয়েছে আমার। আজ পর্যন্ত ওদের খোঁজে কাটছে। অনেক পথচারীকেই ওদের কথা বলেছি। কোন্ দিকে গেছে, কি ডাকে সাড়া দেয় তার বিবরণ দিয়েছি। দু-এক জনের সঙ্গে দেখা হয়েছে, যারা কুকুরটার ডাক, ঘোড়াটার ক্ষুরের শব্দ কানে শুনেছে, এমন কি কপোতীটাকেও মেঘের আড়ালে মিলিয়ে যেতে দেখেছে। ওদের ফিরে পেতে এমন আগ্রহ দেখেছি তাদের যে, মনে হয়েছে যেন তারা নিজেরাই হারিয়েছে ওদের।

কেবল সূর্যোদয় আর ঊষাকাল নয়, সম্ভব মতো স্বয়ং প্রকৃতি দেবীর প্রতীক্ষায় থাকা। আমার সেই কাজে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে আমাকে কত কত সকালে, শীত-গ্রীষ্মে, কোন পড়শী তার কাজ সুরু করার আগে। তবে, আবছা আলোয় বস্টনের পথে চলেছে চাষীরা, নিজেদের কাজে বেরিয়েছে কাঠুরেরা, শহরের এমন অনেকেই নিশ্চয়ই আমাকে সেই অভিযান থেকে ফেরার সময় দেখে থাক্‌বে। হাতে-নাতে সূর্যকে উঠতে সাহায্য করি নি সত্য, কিন্তু, সন্দেহ ক'র না, সেই লগ্নটিতে উপস্থিত থাকা কত জরুরি।

শরৎ কালে, তথা শীত কালেও কত দিনই না শহরের বাইরে কাটিয়ে এসেছি। চেষ্টা করেছি শুনতে হাওয়ায় কি বলে, শুনতে শুনতে ছুটেছি দ্রুত পায়ে। আমার সব মূলধনই প্রায় ডুবে যাবার দাখিল হয়েছে একাজে, লাভের মধ্যে বাতাসের উলটো মুখে ছুটে দম ফুরোয় আর কি। রাজনীতির দু'দলের কোনটার ব্যাপার হ'লে আর দেখতে হ'ত না, সংবাদপত্রে তাজা-খবরের মধ্যে ছাপা হ'ত ঘটনাটা। আবার কখনও খাড়া পাড়ের উপর কি

গাছের ডগার মান-মন্দিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছি, কেউ নতুন এলে তার করতে হবে। সন্ধ্যাবেলায় পাহাড়ের মাথায় চড়ে অপেক্ষা করেছি আকাশ ভেঙে পড়লে যদি কিছুর নাগাল পাই। বিশেষ কিছুই জোটে নি কোন দিন। যাও বা জুটেছে, স্বর্গ-সুধার মতো অচিরাৎ গলে গেছে সূর্যতাপে।

বেশ কিছুদিন একটা কাগজের সংবাদদাতা ছিলাম। তেমন কাটতি ছিল না কাগজটার। তার সম্পাদক আমার লেখার বেশির ভাগই এখন পর্যন্ত ছাপার যোগ্য বিবেচনা করে উঠতে পারেন নি। লেখকদের সব সময়েই যা জোটে, আমারও শুধু নাকের বদলে নরুন জুটেছে। তবু এক্ষেত্রে যা হ'ক কষ্টটাই হয়েছে পুরস্কার।

অনেকগুলো বছর তুষার-ঝটিকার আর বৃষ্টি-বাদলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরিদর্শক ছিলাম। নিষ্ঠার সঙ্গেই কর্ত্তব্য করতাম। সদর রাস্তার না হলেও বন-জঙ্গলের আর আড়া-আড়ি মেঠো পথের জরিপ করতাম, লোক চলাচলের উপযুক্ত রাখতাম তাদের, খাল-নালায় সাঁকোর ব্যবস্থা করে সব ঋতুতে যাতায়াতের যোগ্য রাখতাম—সেখানে লোকজনের পায়ের দাগে প্রমাণ পাওয়া গেছে কাজে লেগেছে সে সব।

শহরের অগৃহপালিত জন্তু-জানোয়ারদের খবরদারি করেছি। তারা বেড়া-টেড়া ডিঙিয়ে কর্তব্যনিষ্ঠ চালককে বিষম বিপদে ফেলে। লোকজনের চলাফেরা নেই, ক্ষেত-খামারের এমন সব গলিঘুঁজিতেও নজর রেখেছি। অবশ্য সব সময়ে কোন্ জমিটায় কবে জোনাস আর কবে কোন্‌টায় বা সলোমন কাজ ক'রল সে খবর রাখি নি। তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। রাঙা-হাক্‌ল বেরি, স্যান্ডচেরি, আর বিছুটি গাছে, লাল-পাইন আর কাল-অ্যাশ, সাদা আঙুর আর হলদে-ভায়োলেটে জল দিয়েছি। নইলে খরার সময় সব শুকিয়ে মরত।

সংক্ষেপত, বড়াই না করেই বলছি, এমনি নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কাজ করে দীর্ঘকাল কেটে যায় আমার। কিন্তু ক্রমেই বেশ বোঝা গেল, আমার শহরবাসীরা তবু আমাকে কিছুতেই শহর-কোতোয়ালদের তালিকায় ঠাঁই দেবেন না, কিংবা সামান্য বৃত্তি দিয়ে আমার আসনটাকে লোভনীয় করে তুলতেও চান না। আমার হিসাবপত্র কিন্তু নিখুঁত ভাবে রাখা ছিল, এ-কথা হলফ করে বলতে পারি। অবশ্য পরীক্ষার জন্য পেশ করা হয় নি কোন দিন, সুতরাং গ্রাহ্য হবার কথা ওঠে না। হিসাব নিকাশ কি তা বুঝিয়ে দেবার কথা তো ওঠেই না। যাই হ'ক, সে-কাজে আমার মন ছিল না।

বেশি দিনের কথা নয়, জনৈক যাযাবর ইন্ডিয়ান আমার পাড়ার কোন নাম-করা উকিলের বাড়ি ঝুড়ি বিক্রি করতে গিয়েছিল। গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ঝুড়ি কিনতে চান আপনারা? উত্তর পায়, না, আমাদের ঝুড়ির দরকার

নেই। ফটক দিয়ে বেরোবার সময় ইন্ডিয়ানটি একটু চেঁচিয়েই বলে যায়, তবে! আমরা না খেয়ে মরি এই চান আপনারা? পরিশ্রমী শ্বেতকায় পড়শীদের এত সমৃদ্ধি, উকিলের শুধু তর্কের জাল বুনতে হয় আর ভোজবাজির মতো টাকাকড়ি আর প্রতিপত্তি এসে যায়, দেখে লোকটা মনে মনে ঠাওরে নেয়ঃ আমিও ব্যবসা করব, ঝুড়ি বুনব আমি, ও-কাজটা তো আমার জানা আছে। ভেবেছিল, ঝুড়ি তৈরি করে ফেললেই তার কাজ হয়ে গেল, তখন তা কেনার দায় সাদা চামড়া-ওয়ালা লোকদের। তলিয়ে দেখে নি সে যে অন্যের পক্ষে কেনবার মতো করে সেগুলো বানানো দরকার, অন্তত যাতে অন্যে বোঝে কথাটা তা করতে হবে, অথবা অপরের কেনবার যোগ্য করে অপর কোন মাল তৈরি করতে হবে। আমিও এক ধরনের ঝুড়িই বুনেছিলাম, অতি সূক্ষ্ম তার বুনানি। কিন্তু আর কারও কেনবার যোগ্য করে আমি তা বুনি নি। আমার ক্ষেত্রে তাই বলে বিন্দুমাত্রও মনে হয় নি যে, এসব আর বুনব না। বরং কি করে আমার ঝুড়ি লোকের কেনবার মতো করে বোনা যায়, তার উপায় না খুঁজে সেগুলো কি করে বেচবার প্রয়োজন এড়ানো যায়, সেই কথাই ভেবেছি। যে-জীবনকে লোকে প্রশংসা করে আর সার্থক বলে মনে করে সেটা একটা রকম। কিন্তু অন্য সব রকমকে বাতিল করে আমরা একটা রকমকেই বড় করে দেখব কেন?

স্ব-শহরবাসীদের* চতুঃসীমায় আমার কোন স্থান লাভের, কিংবা যাজকবৃত্তি কি অন্যত্র কোন জীবিকা-ব্যবস্থার কোনই সম্ভাবনা নেই, নিজেকেই নিজের উপায় করে নিতে হবে, এ-কথা যখন বুঝলাম, তখন পূর্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ ভাবে বনাভিমুখী হলাম—সেখানে আমার পরিচয় বেশি। মনস্থ করলাম, আবশ্যক মূলধন সংগ্রহের অপেক্ষা না রেখে অবিলম্বে ব্যবসায় সুরু করব। যা আমার সামান্য পুঁজি আছে তাতেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। নির্ঝঞ্ঝাটে নিজস্ব এই ব্যবসায় চালনাই আমার ওয়ালডেন পন্ডে যাবার উদ্দেশ্য। সেখানে গিয়ে ঊনার্ঘ কি মহার্ঘ জীবন যাপন নয়। সামান্য কান্ডজ্ঞান, সামান্য উদ্যম আর ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাবে তা সম্পূর্ণ না করে পশ্চাৎপদ হয়ে আসা যতটা দুঃখের বিষয় মনে হয়, ততটা নির্বুদ্ধিতার নয়।

কড়া বেনিয়াসুলভ আচরণ অভ্যাস করতে আমি সর্বদা চেষ্টা করেছি। সব মানুষের পক্ষেই ওটা অপরিহার্য। স্বর্গরাজ্যের সঙ্গেও যদি আপনার ব্যবসায় চালাতে হয়, তবু সালেমের কোন বন্দরে, উপকূলের উপরেই, ছোট-খাট একটা কাছারির কাজে জড়িয়ে পড়তে হবে। অবশ্য দেশের মধ্যে যা পাওয়া যায় সেইসব মালপত্রই রপ্তানি করবেন আপনি। সব সময়েই স্বদেশি জাহাজ বোঝাই খাঁটি স্বদেশি মাল সব—অনেক বরফ, অনেক পাইনের কাঠ, কিছু গ্রানিট

পাথর। কাজে নামার পক্ষে ভাল এগুলো। নিজে উপস্থিত থেকে সব খুঁটি-নাটি দেখাশোনা; কর্ণধার নায়ক অধিকারী, বীমাকর্মচারী—সব কাজই নিজে করা; কেনা আর বেচা আর হিসাব রাখা; যে চিঠি আসছে তার প্রত্যেকটি পড়া, যে চিঠি যাচ্ছে তার প্রত্যেকটি লেখা আবার পড়া; দিন রাত্রে আমদানি মাল খালাস করার তদারক; উপকূলের অনেক জায়গাতে প্রায় কাছাকাছি সময়ে হাজির থাকা; মধ্যে মধ্যে জারসির কোন কূলে খুব দামী মাল নামিয়ে দেওয়া; নিজে নিজের তারবাহক হওয়া; যেসব জাহাজ কূলে ভিড়তে আসছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা; দূর-দূর আর মারাত্মক মাগ্যির বাজারে চালান বজায় রাখতে নিয়মিত মালপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা; নতুন নতুন অঞ্চল আবিষ্কারের ফল, নতুন নতুন জলপথ আর উন্নত পোতচালনা পদ্ধতি কাজে লাগানো—সব কিছুর সাহায্যে বাজারের হাল-চাল, যুদ্ধবিগ্রহ কি শান্তি কোথায় কি হয় না হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য আর সভ্যতা কি মোড় নেবে আগে থাকতে বুঝে সব বিষয়ে নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখা; লা-পেরুজের অভিযানের অপ্রচারিত অদৃষ্টের দৃষ্টান্ত আছে, যে-জাহাজের নিরাপদে থামবার জায়গায় পৌঁছুবার কথা, হিসেবের ভুলেই কখনও কখনও তা পাহাড়ে ধাক্কা খেতে পারে—মনে রেখে, চার্ট মেলাতে হবে, জলের তলায় কোথায় পাহাড় ঠিক করে নতুন আলো আর বয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে, আর ক্রমাগত লগারিথ্‌ম সংশোধন করে যেতে হবে; কার্থেজের হ্যানো আর ফিনিসীয়দের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যত বড় বড় আবিষ্কারক, নৌ-চালক, বড় বড় দুঃসাধ্য-সাধক আর বাণিজ্যবীর হয়েছেন, সকলের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে বিজ্ঞান-বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হবে; আর শেষত আপনার ঠিক কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে জানবার জন্য মধ্যে মধ্যেই মজুদ মালের হিসাবনিকাশ করতে হবে। মানুষের সমগ্র শক্তির প্রয়োগ-পরীক্ষার কাণ্ড এ-লাভ-লোকসান, সুদ-কষাকষি, বাটা-বাটোয়ারা করতা-পড়তার এমন সব রকমারি সমস্যা, যে সবজান্তা না হলে চলে না।

ভেবে দেখেছি ওয়ালডেন পণ্ড ব্যবসার উপযুক্ত জায়গা। কেবল যে রেল-লাইন আর বরফের কারবারের জন্য তা নয়। এর যেসব সুবিধা, তা ব্যক্ত করে দেওয়া মূলনীতিসঙ্গত না হতে পারে। জায়গাটা ঘাঁটি হিসাবে উত্তম, বুনিয়াদও পাকা। স্বহস্তে খোঁটা গেড়ে সর্বত্রই এখানে ঘর তোলা যায়। রুশিয়ার নেভা নদীর মতো জলা-জমি ভরাট করে নেবার দরকার নেই। শোনা যায় নেভায় যখন বরফ জমে থাকে, তখন পশ্চিম থেকে হাওয়া বইলে যদি জোর জোয়ার আসে, তবে সেন্টপিটার্সবার্গকে পৃথিবীর বুক থেকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আবশ্যক মূলধন ছাড়াই ব্যবসায়ে নামতে হ'ল। তবু কোন কারবারে নামতে যে-পুঁজি না হলেই চলে না, আগে থেকে অনুমান করা সহজ হয়

নি, তাই বা কোথায় মিলবে। একেবারে প্রশ্নটার ব্যবহারিক দিকটায় আসা যাক। পরিধেয়ের কথাই ধরা যাক, পরিধেয় সংগ্রহে বোধ হয় উপকারিতার চাইতে নতুনের উপর টান আর অন্যে কি বলবে না বলবে সেই দিকটাই বেশি দেখা হয়। যাঁকে কাজ করতে হয়, তিনি চিন্তা করে দেখুন পরিধেয়ের প্রধান উদ্দেশ্য কি। প্রথমত, দেহতাপ রক্ষা; দ্বিতীয়ত, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থানুযায়ী নগ্নতা আবরণ। এইবার তিনি বিচার করলে বুঝতে পারবেন, দরকারি আর জরুরি কাজের কত ভাগ তা হলে কাপড়-চোপড়ের বোঝা না বাড়িয়েই সাঙ্গ করা সম্ভব। রাজারাজড়ারা, রাণিসাহেবারা এক একটা পোষাক, মহামহিমান্বিত তাঁদেরই দরজি আর পোষাকওয়ালাদের তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, একবার মাত্রই পরে থাকেন। মাপসই একটা পোষাক পরার আরামটা কোনদিন বুঝতেই পারেন না তাঁরা। পরিষ্কার কাপড়-চোপড় ঝুলিয়ে রাখবার কাঠের আলনার চাইতে বেশি কিছু নন তাঁরা। দিনে দিনে আমাদের গায়ে খানিকটা খানিকটা করে লাগসই হ'তে থাকে কাপড়-চোপড়, পরনে-ওয়ালার চরিত্রের ছাপ নিতে থাকে। দেহত্যাগ করতে যত দেরি, বা চিকিৎসার ঘটা, কি ঐ ধরনের একটা কোন সমারোহ ছাড়া, সে পোষাক ত্যাগ করতে অনিচ্ছা এসে যায়। জামা-কাপড়ে তালি থাকার অপরাধে কোন মানুষের দাম আমার কাছে কমে নি। কিন্তু সাধারণত নির্মল বিবেকের চাইতে কেতাদোরস্ত না হক, অন্তত পরিষ্কার তালি না দেওয়া কাপড়-চোপড়ের জন্য লোকের বেশি আগ্রহ—এ আমি ঠিক জেনেছি। অথচ ছিদ্রটা যদি রিপু করা না হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে সব চাইতে বড় অপরাধ যা ধরা পড়ছে, তা অপরিণামদর্শিতার। মধ্যে মধ্যে আমার পরিচিতদের এই ভাবে পরীক্ষা করি ঃ হাঁটুর কাপড়ে একটা তালি কি ড্যাবডেবে দুটো সেলাইএর ফোঁড় নিয়ে কে ঘোরাফেরা করতে পারে? বেশির ভাগ লোকই এমন ভাব দেখায়, যেন এমন কিছু করতে গেলে তাদের যা কিছু আশা ভরসা সব গোল্লায় যাবে। তাদের পক্ষে ভাঁজভাঙা পাৎলুন পরে শহরে বার হবার চেয়ে মচকানো পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাওয়াও অনেক সহজ। প্রায়ই দেখা যায়, কোন ভদ্রলোকের পায়ে চোট লাগলে তাপ্পাতুপ্পি দিয়ে কোন গতিকে চলে যায়, কিন্তু তাঁর পাৎলুনের পায়ে ঐ রকম একটা কিছু হ'ক তখন আর কোন উপায় থাকবে না। কেন না তাঁর বিবেচনার বিষয়—লোকে সম্ভ্রম দেখাক, সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত না হলেও চলবে। আমরা যাদের চিনি, তাদের অধিকাংশই শুধু চাপকান আর পায়জামা, মানুষ কদাচিৎ। একটা কাকতাড়ানো খুঁটিকে আপনার পোষাকি কাপড় পরিয়ে নিজে তার পাশে তেমন পোষাক না পরে দাঁড়িয়ে থাকুন, এমন কে আছে যে আগেভাগে খুঁটিটাকেই নমস্কার না জানাবে? একটা ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছি সেদিন, একটা খুঁটির উপর

হ্যাট-কোট ঝুলছে নজরে এল। পরে চিনতে পারলাম স্বয়ং ক্ষেতের মালিক। গতবার যা দেখেছি, তার চাইতে সামান্য একটু পোড় খেয়েছেন। একটা কুকুরের গল্প শুনেছি, জামা-কাপড়-পরা অচেনা কাউকে তার প্রভুর অট্টালিকার দিকে আসতে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে উঠত, কিন্তু জামা কাপড় না পরা চোরকে দেখে বেশ শান্ত হয়ে থাকত। কাপড়-চোপড় খুলে নিলে মানুষের পদমর্যাদা কতটা রক্ষা পাবে, প্রশ্নটায় কৌতূহল জাগে। এই রকম অবস্থায়, সভ্যতা প্রাপ্ত একদল লোকের মধ্যে থেকে আপনি কি বেছে ঠিক বলতে পারেন, তাদের মধ্যে কারা সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত? জারমান পর্যটনকারিণী মাডাম ফাইফার তাঁর অসমসাহসিক ভূ-প্রদক্ষিণ কাহিনীতে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের মুখে স্বদেশের খুব কাছাকাছি এশিয়ার অন্তর্গত রুশিয়ায় এসে যখন পৌঁছিয়েছেন তখন বলছেন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় তাঁর মনে জাগল, এবার ভ্রমণের পোষাক ছেড়ে অন্য পোষাক পরার সময় এসেছে, কেন না তিনি "এখন সভ্য জগতে, যেখানে····কাপড়-চোপড় দেখে মানুষের বিচার।" এই যে আমাদের গণরাষ্ট্র নিউ ইংলণ্ডের সব শহর, এখানেও ঘটনাচক্রে ধন-দৌলতের অধিকার লাভ করে কেবল সাজসজ্জায় আর গাড়ি-ঘোড়ায় যিনি সেসবের পরিচয় দিতে পারবেন, তিনি প্রায় সকলের সম্মান-ভাজন হতে পারেন। কিন্তু যারা এই শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করছে, তারা এখনও পর্যন্ত পৌত্তলিক, কোন মিশনারিকে তাদের কাছে পাঠালে ভাল হয়। উপরন্তু সীবন-কাণ্ডের সূচনা তো এই কাপড়-চোপড় থেকেই। এ কর্মের যা রকম, তাতে তাকে অন্তহীন আখ্যা দেওয়া যায়। অন্তত মেয়েদের পোষাক তো কোনদিন শেষ হয় না।

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষান্তে কোন রকম একটা কাজ যার জুটে গেছে, তা করতে গিয়ে কোন নতুন পোষাকের দরকার পড়ে না তার। পুরনোটাতেই বেশ কাজ চলতে পারে, যেটা অনেক দিন থেকেই চিলে কোঠায় ধুলোয় ঢাকা পড়ে রয়েছে। আর পুরনো জুতো পুরুষসিংহের পায়ে তাঁর খানসামার পায়ের চেয়ে বেশি দিন টেকে—যদি অবশ্য পুরুষসিংহের খানসামা থাকে। তাঁর কাজ তিনি জুতোর চাইতেও পুরনো পদযুগল দিয়েই বেশ চালিয়ে নিতে পারেন। মাইফেল আর ব্যবস্থা-পরিষদে যাতায়াত করেন যাঁরা, রংদার আচকানের দরকার কেবল তাঁদের। নিজে তাঁরা যতবার রং বদলাবেন, ততবার আচকানেরও রং বদলাতে পারবেন। আর যে জামা-পাজামা, টুপি-জুতো পরে আমার ভগবানের নাম করা চলে, তাতেই কাজ চলবে,—চলবে না? কে কবে তার পুরনো কাপড়-চোপড় তার পুরনো পিরান এমন জীর্ণ হতে দিচ্ছে, একেবারে যা দিয়ে তৈরি সেই অবস্থা করে ছাড়ছে যে কোন গরিব ছেলেকে সেটা দিয়ে দিলে দানের মর্যাদা পাবে না? হয়তো বা সে

আবার সেটাকে তার চাইতেও গরিব কাউকে দিতে পারে। তার চাইতে আরও ধনবান বলব না কি? প্রয়োজন তো এরই কম। আমি বলি, যে সব কাজে কাপড়-চোপড় পরা নতুন লোকের বদলে নতুন কাপড়-চোপড়ের দরকার হয় সে সব থেকে দূরে রহো। লোকটাই যদি নতুন না হয়, নতুন কাপড়-চোপড় তাকে মানাবেই বা কেন? হাতে কাজ এলে মলিন বসন পরেই করে ফেল। মানুষ কাজ চায়, কাজের মানুষ হ'তে চায়, কি পরে কাজ করবে, নয়। আমার মতে, পুরনো জামা-কাপড় যত জীর্ণ আর মলিনই হ'ক যতদিন না কোন নবীন ভাবে ভাবিত হয়ে নবীন উদ্যমে বিশেষ লক্ষ্যপানে ছুটি, পুরনো জামা-কাপড় সত্ত্বেও নিজেকে যখন নতুন লাগে, অনেকটা পুরনো বোতলে নতুন মদ রাখার মতো, ততদিন নতুন কাপড়ের কোন দরকার পড়ে না। পালক ছাড়ার কালটা পাখিদের মতোই আমাদের জীবনেও নিশ্চয়ই সংকট কাল। লুন-পাখি এই কালটি নির্জন কোন হ্রদে কাটিয়ে আসে। এমনি নেপথ্য সাধনা আর সম্প্রসারণে সাপ খোলস ছাড়ে, শুঁয়ো-পোকা শোঁয়ার আবরণ ত্যাগ করে। কাপড়-চোপড় তো কেবল আমাদের বাইরের খোলস, গলার ফাঁস। অন্যথা ঘটলে জাল-নিশান উঁড়িয়ে সাগর পাড়ি দেবার অনর্থে ধরা পড়তে হবে। এবং শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই নিজের তথা জগতের বিচারে বরখাস্ত হ'তে হবে।

একটার পর একটা পরিচ্ছদ অঙ্গে চড়াচ্ছি আমরা। যেন কলমের গাছ, বাইরে বাইরেই বেড়ে চলেছি। আমাদের ফিনফিনে রকমারি বহিরাবরণ আমাদের ঝুটো চাম, বহিস্ত্বক মাত্র। আমাদের জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, মারাত্মক কোন ক্ষতি না করে এখানে-সেখানে খসিয়ে ফেলা যায়। সদাসর্বদা যা পরে থাকি এই আটপৌরে পোষাকটা খোল, কোষাবরণ। কিন্তু আমাদের পিরানটা মৌলিক বঙকল, অন্তস্ত্বক। কোন অন্তঃসজ্জা ছাড়া অর্থাৎ অন্তরের মানুষটা না বদলিয়ে ওটা খোলা চলে না। আমার বিশ্বাস, সকল জাতিই কোন কোন ঋতুতে পিরান জাতীয় কিছু না কিছু পরে থাকে। সামান্যই জামা-কাপড় পরা উচিত মানুষের, যাতে অন্ধকারের মধ্যেও বুকে হাত দিতে পারে। মানুষের জীবন-যাত্রা সর্বথা এমন অনাড়ম্বর আর অবহিত হওয়া দরকার যে, শত্রু শহর দখল করলে, সেই প্রাচীন দার্শনিকের মতো সঙ্গে সঙ্গে বিনা দুশ্চিন্তায় সে খালি হাতে ফটক দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যখন মোটা কাপড়ের একটা জামা তিনটে পাতলা জামার সামিল, খরিদ্দারের সাধ্যমতো দামে সস্তা জামা-কাপড় পাওয়াও যায়, মোটা কাপড়ের একটা জামা কিনতে যখন পাঁচ ডলার মাত্র লাগে আর কয়টা বৎসর টিকেও যায়, মোটা কাপড়ের পাৎলুন দুই ডলারে, জুতা একজোড়া দেড় ডলারে, গরম কালের উপযোগী হ্যাট একটা সিকি ডলারে, আর শীতকালের উপযোগী ক্যাপ একটা সাড়ে বাষট্টি সেন্টে পাওয়া যায়, বা নামমাত্র খরচে বাড়িতে বানিয়ে

নেওয়াও চলে, তখন নিজস্ব উপার্জনের এই জামা-কাপড় পরে কাকে এত গরিব দেখাতে পারে যে তাকে শ্রদ্ধা দেখাবার মতো বিচক্ষণ লোকের অভাব হবে?

কোন বিশেষ ধরনের জামা চাইলে আমার দরজিটি গম্ভীর ভাবে শুনিয়ে দেয় "এ-ধরনের জামা কেউ বানায় না এখন।" 'কেউ' কথাটা বলবার সময় একটু ইতস্ততও নেই, যেন নিয়তির মতোই কোন নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তির নাম উচ্চারণ করছে সে। ফলে, আমি যেমনটি চাই, তেমনটি তৈরি করিয়ে নেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। শুধু এই জন্য যে, দরজি বিশ্বাসই করে উঠতে পারে না, আমি এহেন একরোখা, যা বলেছি, ঠিক তাই আমার চাই। দৈববাণীর মতো বাক্যটি যেই শুনি, একটু সময় লাগে চিন্তা করে এর অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করে নিতে। আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা কথার উপর জোর দিয়ে বুঝতে চাই অর্থটা। বুঝতে চাই আমার সঙ্গে কি পরিমাণে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত এই 'কেউ'-রা, যে-ব্যাপারটায় আমারই যায় আসে শুধু, তার উপর 'কেউ'-দের এই কর্তৃত্ব কেন। অবশেষে 'কেউ' কথাটার উপর তেমন জোর না দিয়ে সমান পরিমাণে সেটাকে রহস্যাবৃত করে তার জবাবে বলে ফেলি, "কথাটা সত্যি, কিছুদিন কেউ বানায় নি, কিন্তু এখন কেউ কেউ বানাচ্ছে।" আমার স্বভাবের পরিমাপ না করে কেবল যদি কেউ আমার কাঁধের পুট মাপতে যায়, তেমন মাপ-জোক কি কাজে লাগবে আমার? আমি কি কেবল পিরান ঝুলিয়ে রাখবার গজাল মাত্র? মানুষের জন্মমৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী পারসিদের নয়, সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী গ্রেসদের নয়, আমরা পূজো করি কেবল ফ্যাশন দেবীর। সুতো কাটতেও তিনি, বুনতেও তিনি, সেলাই-ফোঁড়াই করতেও তিনি। তাঁরই রাজত্ব। প্যারিসে বানর-রাজা মাথায় পরিব্রাজক-টুপি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনের যত বানরও তাই করলেন। কিন্তু লোকজনের সাহায্যে এই দুনিয়ায় অতি সহজ কোন সৎকার্য করানোর ব্যাপারেও কখনও কখনও হতাশা জাগে আমার। প্রথমত, মাথা থেকে যত পুরনো ধারণা সব নিংড়ে বার করে ফেলতে জবর রকমের জাঁতাকলে পিষতে হবে তাদের, যাতে শীগ্‌গির সেগুলো মাথা খাড়া করে না উঠতে পারে। কিন্তু দেখা যাবে দলের মধ্যে আছেন এমন এক ব্যক্তি, মাথায় যাঁর পোকা, ডিমে তা দিয়ে বার করা হয়েছে সেটা, কেউ বলতে পারে না কবে পাড়া ডিম, আগুনে পোড়ালেও মরে না এসব—বুঝতে পারবেন আপনার সব পরিশ্রম মাটি। তৎসত্ত্বেও যেন ভুলে না যাই যে, মিশর-জাত কোন এক প্রকার গম আমরা পেয়েছি মামির হাত থেকে।

মোটের উপর এদেশে কি অন্য কোন দেশে প্রসাধনের ব্যাপারটা কুত্রাপি আর্টের মর্যাদা লাভ করেছে, কথাটা সমর্থন করা যায় না বলেই আমি মনে করি। বর্তমানে, যা পাওয়া যায় তাই পরেই লোকজন কাজ চালিয়ে দেয়।

যেমন মাঝিমাল্লারা জাহাজ ডুবির পর ডাঙায় উঠে যা হাতের কাছে পায় তাই পরে নেয়। তারপর স্থান কি কালের সামান্য একটু ব্যবধানেই পরস্পরের সং-এর বেশ দেখে বেশ একচোট হেসে নেয়। একাল চিরকালই সে-কালের ফ্যাশন দেখে হেসেছে। কিন্তু একটা নতুন কিছুকে আবার নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নিয়েছে। অষ্টম হেন্‌রি কি রাজ্ঞী এলিজাবেথের সাজ-পোষাক দেখে মজা লাগে আমাদের, যেন নরখাদকদের কোন দ্বীপের রাজা-রাণীকে দেখছি। মানুষের অঙ্গে না থাকলে সব সাজ-পোষাকই করুণ আর কিম্ভূতকিমাকার লাগে। শুধু সাজ-পোষাকের অন্তরালে সুগভীর দৃষ্টি, সংকল্পনিষ্ঠ জীবনযাত্রাই হাসিঠাট্টা থামিয়ে রেখে কোন জাতির পোষাকের পবিত্রতা বজায় রাখতে পারে। সুশোভন-পরিচ্ছদ নট যখন অম্লশূলে আক্রান্ত হয়, তার সাজ-সজ্জাও মুহূর্তের মধ্যে অনুরূপ ভাবভঙ্গির প্রতিরূপ হতে বাধ্য। কামানের গোলায় আহত সৈনিকের অবস্থায় জীর্ণ কি জমকাল সাজ, দুই-ই সমান।

নর-নারীর শিশুসুলভ আর বর্বরোপম রুচির কল্যাণে এই যে পোষাক পরিচ্ছদের নতুন নতুন প্যাটার্নের আকাঙ্ক্ষা তাদের, এর ফলে আজকের দিনে আধুনিক যুগের কি আদর্শ পরিধানের প্রয়োজন, তৎ সন্ধানকল্পে নিয়ত পরিবর্তনশীল দৃশ্যাচিত্রের সম্মুখে কত জনের কত হৃৎকম্প, কত ভ্রকুঞ্চন। পোষাকনির্মাতারা বুঝে নিয়েছেন এই রুচিটা খামখেয়াল মাত্র। দুটো প্যাটার্নের মধ্যে মোটামুটি তফাত দেখা যাচ্ছে কোন একটা রংয়ের কয়েকটা মাত্র সুতোর। কিন্তু একটা ক্রমাগত বিক্রি হচ্ছে, অন্যটা আলমারিতে পড়ে থাকছে। আবার একটা মরসুম কেটে গেলেই এই পোষাকটিই সব চাইতে হাল ফ্যাশানের হয়ে ওঠে। উল্কি পরার রীতিটা বীভৎস বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু তুলনায় দেখা যায়, ঠিক তা নয়। চর্মান্তিক আর অপরিবর্তনীয় বলেই সেটা কিছু বর্বরোচিত হতে পারে না।

আমাদের এই ফ্যাকটরি-ব্যবস্থাই মানুষের পরিধেয়-লাভের সর্বজন-হিতকর পন্থা বলে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। এদেশের ফ্যাকটরি-কর্মীদের অবস্থাও দিন দিন ইংরেজদের তুল্য হতে চলেছে। এতে আশ্চর্য হবারই বা কি থাকতে পারে। যতদূর শুনতে কি দেখতে পাই, এর আসল উদ্দেশ্য এ নয় যে মানুষে ভাল কাপড় পরে ভাল থাক, আসল উদ্দেশ্য যে ব্যবসায়ীরা ভাল রকম টাকাকড়ি করুক—এতে কোন সন্দেহ নেই। যাদৃশী ভাবনা, মানুষের সিদ্ধিও তাদৃশী হয়ে থাকে। সুতরাং বর্তমানে অসার্থক হলেও, লক্ষ্য উঁচুতে রেখে চলাই মানুষের পক্ষে ভাল।

এইবারে আশ্রয় সম্বন্ধে। এখন যে এটা জীবন-যাত্রার পক্ষে অপরি-হার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমি অস্বীকার করতে চাই নে। কিন্তু এমন

দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় যে আমাদের চাইতেও শীতপ্রধান অঞ্চলে মানুষ এক সময়ে দীর্ঘকাল বিনা আশ্রয়েই কাটিয়ে দিত। স্যামুয়েল্ ল্যাঙ্ বলে গেছেন, "লাপল্যাণ্ডের লোকেরা চামড়ার পোষাক পরে, মাথা আর কাঁধ চামড়ার থলি দিয়ে ঢেকে রাতের পর রাত বরফের উপর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়...... এমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে যে, কেউ সব রকম গরম জামাকাপড় চড়িয়েও তার মধ্যে কাটাতে চাইলে প্রাণনাশ হবে তার।" তিনি এই অবস্থায় ঘুমোতে দেখেছেন এদের। তিনি এও বলেছেন, "অন্য জাতের লোকের চাইতে এরা যে বেশি কষ্টসহিষ্ণু তাও নয়।" কিন্তু সম্ভবত বাড়িঘর আর গার্হস্থ্য সুখ বলতে যে সুবিধা বোঝায় তা আবিষ্কার করে নিতে পৃথিবীতে বেশি দিন লাগে নি মানুষের। আদিতে গার্হস্থ্য সুখ কথাটার অর্থই হয়তো পরিবারের চাইতে বাড়িঘরের সুবিধা বেশি বোঝাত। কিন্তু যে সব জলবায়ুতে শীত অথবা বর্ষাকালের কথা মনে পড়ে বাড়িঘরের নামে আর বৎসরের মধ্যে আট মাস যেখানে ছাতি ছাড়া কাজ চলে না, সে সব জায়গায় এর সুখ অত্যন্ত সামান্য আর সাময়িক ছিল। আমাদের দেশের জলবায়ুতে গরম কালে আগে রাত্রে একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই হলেই মোটামুটি কাজ চলে যেত। ইণ্ডিয়ানদের সমাচার দর্পণে গাছের গায়ে তাদের বাসগৃহ উইগওয়াম একটা কাটা বা আঁকা থাকলে একটা দিনের পদযাত্রার চিহ্ন বোঝাত, আর একসার উইগওয়াম থেকে বোঝা যেত ততবার তারা সেখানে ছাউনি ফেলেছে। মানুষের দেহ এমন বৃহৎ নয়, এমন সবলও নয় মানুষ; যেটুকু জায়গা জুড়ে জীবন কাটাতে হয়, ততখানি জায়গা প্রাচীরে ঘিরে তার মধ্যে নিজের পৃথিবীকে ছোট করে না নিলে চলত না তার। প্রথমে উলঙ্গ অবস্থাতে বাইরে বাইরেই কাটিয়েছে মানুষ। প্রশান্ত আর নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে দিনের বেলায় সে অবস্থা মোটামুটি সুখের ছিল। কিন্তু বর্ষাকাল, শীতকাল, তদুপরি আছে প্রচণ্ড সূর্যতাপ। অবিলম্বে বাড়িঘরের আশ্রয়ে নিজের আচ্ছাদন ব্যবস্থা না করে নিত যদি, তবে মানুষের জাত কোরকেই বিনষ্ট হয়ে যেত। গল্পই রয়ে গেছে, প্রাক্-পরিধান-পর্বে আদম-ঈভ কুঞ্জাশ্রয়ী ছিল। মানুষ কামনা করল ঘর, আরামে অর্থাৎ সুখে থাকবার মতো ঠাঁই একটু। প্রথমটায় দেহের আরাম, পরে মনের আরাম।

আমরা কল্পনা করতে পারি, একদা মনুষ্যজাতির শৈশবে কোন উদ্যোগী পুরুষ আশ্রয়ের খোঁজে কোন গতিকে পর্বতগুহায় প্রবেশ করলেন। খানিকটা এই ভাবেই শিশুমাত্রেরই জীবন-সূচনা। বাইরে বাইরে কাটাতেই ভাল লাগে তার, এমন কি বৃষ্টি আর শীতের মধ্যেও। কিন্তু সংস্কার রয়ে গেছে তাই বাড়ি-বাড়ি, ঘোড়া-ঘোড়া খেলা করে। ছেলেবেলায় কি কৌতূহল নিয়ে ক্রমনিম্ন পাহাড়ের দিকে, কি কোন গুহার প্রবেশপথের দিকে চেয়ে চেয়ে

কেটেছে, কার না মনে পড়ে সে কথা? এ হচ্ছে আমাদের আদিমতম পূর্ব-পুরুষের যেটুকু আজও আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে, তার স্বভাব-ব্যাকুলতা। গুহাশ্রয় থেকে ক্রমশ অগ্রসর হয়ে এলাম তালপাতার, গাছের ছাল আর ডাল-পালার, বোনা আর টান্‌টান্‌ কাপড়ের, তৃণ আর খড়ের, মোটা আর পাতলা তক্তার, পাথর আর টালির আশ্রয়ে। অবশেষে এখন উন্মুক্ত আকাশের নিচে জীবন কাটানোটা কি, তার ধারণাই করে উঠতে পারি নে। আমাদের জীবন এখন, আমরা যা ভাবি, তার চাইতে একাধিক অর্থে গৃহাশ্রয়ী। গৃহকোণ থেকে প্রান্তর অনেক দূরের পাড়ি। আমাদের আর জ্যোতিষ্কদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই, এমন অবস্থায় আরও দিবারাত্রের বেশি সময় কাটাতে পারলে, কবিরা ছাদের আশ্রয় থেকে এত বাক্যবর্ষণ না করলে, সাধুবাবারা কোন আশ্রয়ে এত দীর্ঘকাল না কাটালে, ভাল হ'ত সম্ভবত। গুহাশ্রয়ে পাখিরা গান গায় না, খোপের আশ্রয়ে কপোত-কপোতীর অপাপবিদ্ধতা রক্ষা পায় না।

যাই হ'ক, গৃহাশ্রয় নির্মাণের বাসনা যদি কারও থাকে আর শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই গৃহের পরিবর্তে কোন ব্যারাকবাড়ি, কি রন্ধ্রহীন গোলকধাঁধা, কি যাদুঘর, কি আতুরাশ্রম, কি জেলখানা, কি চমৎকার কবরের মধ্যে জীবন যদি তিনি না কাটাতে চান, তবে ইয়াঙ্কিকসুলভ যৎকিঞ্চিৎ বিষয়বুদ্ধি কাজে লাগাতে হবে তাঁকে। প্রথমে ভেবে দেখুন কতটুকু আশ্রয় একেবারে না হলেই নয়। এই শহরেই পেনব্‌স্কট ইন্ডিয়ানদের দেখেছি, তুলোর পাতলা কাপড়ের তাঁবুর তলায় দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছে। তার চারপাশে প্রায় এক ফুট উঁচু হয়ে বরফ জমেছে। মনে হয়েছে আরও উঁচু হয়ে জমে হাওয়া ঢোকার পথ বন্ধ করলে তারা খুশি হ'ত। নিজের মতো নিজের কাজ করবার স্বাধীনতা বজায় রেখে, কি উপায়ে সৎভাবে জীবিকার্জন করা চলে আগে তা নিয়ে ভাবতাম। প্রশ্নটা এখনকার তুলনায় তখন অনেক বেশি ভাবিয়েছে আমাকে। কেন না, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাপারটা এখন এক রকম গা-সওয়া হয়ে গেছে। সেই সময় রেলরাস্তার পাশে ছয় ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া বড় একটা বাক্স প্রায়ই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। মজুররা তাদের যন্ত্রপাতি তার মধ্যে রাত্রের মতো তালাবন্ধ করে রাখত। সেটা দেখে মনে হ'ত আমার, কোনক্রমে জীবন কাটাতে হয় যাদের, এক ডলার মূল্যে এই রকম একটা বাক্স তাদের জুটে গেলে, শুধু বাতাসটা যাতে ঢুকতে পারে তুরপুন দিয়ে তেমন ক'টা ছিদ্র এর গায়ে ফুঁড়ে দিলে, বৃষ্টিবাদল হলে কি রাত্রে এর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে এর ঢাকনিটা নামিয়ে শিকলটা টেনে দিলেই চলে যেতে পারে। তাহলে মানুষের প্রেম মুক্ত হ'তে পারে, চিত্ত ভয়শূন্য হ'তে পারে। ব্যবস্থাটা নিকৃষ্ট লাগে নি। কোন ক্রমেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মতো ব'লেও মনে হয় নি। যত রাত্রি হ'ক তার ভিতরে স্বচ্ছন্দে জেগে বসে থাকা চলত। আর ঘুম ভাঙলেই

বেরিয়ে পড়া যেত। জমি কি বাড়ির কোন মালিক পিছু-পিছু ধাওয়া করত না ভাড়ার তাগাদায়। অনেক লোকেরই তো এর চাইতে সামান্য বড়, একটু বিলাসযোগ্য একটা বাড়ির ভাড়া টানার যন্ত্রণায় প্রাণান্ত হ'তে হয়। যে বাক্সটার কথা বলছি, তার মধ্যে কিছু ঠাণ্ডায় প্রাণ যেত না কারও। হাসি-ঠাট্টা করছি নে আমি। অর্থঘটিত ব্যাপার নিয়ে হাসিঠাট্টা করলে হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে তো এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। কাটখোট্টা, কষ্টসহিষ্ণু একটা জাত, বাইরে বাইরেই জীবন কাটত যাদের, তাদের আরাম-দায়ক একটা বাড়ির প্রায় সমগ্রটাই প্রকৃতির নিজের হাতে তুলে দেওয়া সব তৈরি মাল দিয়ে সেদিনও বানানো সম্ভব ছিল। ম্যাসাচুসেট্‌স কলোনির অন্তর্গত ইণ্ডিয়ানদের তদারকদার ছিলেন গুকিন। ১৬৭৪ সালে তিনি যা লিখে গেছেন, তাতে বলছেন, "ওদের বেশ ভাল ভাল বাড়ি যেগুলো, গাছের বাকলের ছাদ সেগুলোর। অতি পরিপাটি, আটসাঁট। বেশ গরমও হয়। গাছের গায়ের রস শুকিয়ে জমে যায় যে সময়টায়, তখন সেখান থেকে তা খসিয়ে নিয়ে কাঁচা থাকতে থাকতেই ভারি ভারি ভারি তক্তা চাপা দিয়ে পর্দা করে ফেলা হয়....ছোটখাট বাড়িগুলোর মাদুরের ছাদ, এক রকম নলখাগড়া থেকে বানায় সেগুলো। মোটামুটি আঁটসাঁট, গরমও হয়, কিন্তু আগের গুলোর মতো অত ভাল নয়। কয়েকটা বাড়ি দেখেছি, ষাট থেকে একশ ফুট লম্বা, ত্রিশ ফুট চওড়া....ওদের এই রকম কুঁড়ে-ঘরে অনেক সময় কাটিয়েছি আমি, ইংলণ্ডের সেরা সেরা বাড়ির মতোই আরাম বোধ করেছি সেখানে।" আরও বলেছেন, সেগুলোর অধিকাংশই সুন্দর হাতের কাজ করা নক্সা তোলা মাদুরের কার্পেট, আস্তরণ, নানা বাসনপত্রে সাজানো দেখা যায়। ইণ্ডিয়ানরা উন্নতও ছিল। ছাদে ছেঁদা করে সেখান থেকে মাদুর ঝুলিয়ে দড়ি দিয়ে টেনে বাতা-সের গতি নিয়ন্ত্রণ করত। এ রকম বাড়ি একটা বানাতে লাগত প্রথমত এক দিন বড় জোর দুদিন, আর সেটাকে নিয়ে জায়গামতো খাড়া করতে লাগত কয়েক ঘন্টা। প্রত্যেক পরিবারই এই রকম একটা বাড়ির, কি বাড়িটার একটা ঘরের মালিক ছিল।

অসভ্য অবস্থায় প্রত্যেক পরিবারই তার সাদামাটা আটপৌরে দরকার মেটাবার আর কাজ চালিয়ে নেবার উপযোগী একটা আস্তানার মালিক থাকে। অসভ্যদের যেমন দরকার মতো কুঁড়েঘর থাকে, আকাশচারী পাখিদের নীড় থাকে, খেঁকশিয়ালেরও গর্ত থাকে। কিন্তু বর্তমান সভ্য সমাজে অর্ধেকের বেশি পরিবার কোন রকম আশ্রয়ের মালিক নয়,—বোধহয় আমার সীমা লঙ্ঘন না করেই একথা আমি বলতে পারি। সভ্যতার যেখানে সর্বাধিক প্রকোপ, বড় বড় সেই সব শহরে, গঞ্জে বাড়ির মালিক লোকসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। আর শীতে কি গ্রীষ্মে যা না হ'লে এখন আর চলে না, সেই নিতান্ত বাইরের

একটা আচ্ছাদনের জন্য, অবশিষ্ট লোক আজীবন কেবল গরিব হয়েই বেঁচে থাকবার অধিকার লাভার্থ বাৎসরিক যে ভাড়া টেনে চলে, সে টাকায় ইণ্ডিয়ানদের কুঁড়ে-ঘর সমেত গোটা একটা গ্রাম কেনা যেত। বাড়ির মালিক হওয়ার তুলনায় ভাড়াটে হওয়ার অসুবিধা সম্বন্ধে প্রচার করার উদ্দেশ্য নেই আমার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাদের বাড়ি করতে খরচা কম পড়ে বলেই অসভ্যেরা বাড়ির মালিক হ'তে পারে, আর খরচায় কুলিয়ে উঠতে পারে না বলেই সভ্য মানুষ সচরাচর ভাড়া বাড়িতেই জীবন কাটিয়ে দেয়, এর মালিক হওয়া ঘটে ওঠে না তার, শেষ পর্যন্ত ভাড়া জুগিয়ে যাবার সাধ্যও যে বাড়ে তার, তাও নয়। কিন্তু কেউ কেউ বলবেন, সামান্য মাত্র ভাড়া দিয়ে সভ্যদের মধ্যে যারা গরিব, তারা অসভ্যদের তুলনায় প্রাসাদকল্প অট্টালিকায় আশ্রয়াধিকার লাভ করছে। এ দেশের হার অনুযায়ী পঁচিশ থেকে একশ ডলার বাৎসরিক ভাড়া লাগে তার, কিন্তু তাই দিয়ে কয়েক শতাব্দীর উন্নতির সুখ-সুবিধা ভোগ করে—বড় বড় কামরা, খাসা রং, দেয়াল ঢাকার কাগজ, রামফোর্ডের চুলা, পিছনে পলেস্তারা করা, ভিনিসীয় খড়খড়ি, তামার পাম্প, স্প্রিংএর তালা, প্রশস্ত ভাঁড়ার ঘর আরও কত সব সুবিধা। কিন্তু এমন কাণ্ড ঘটে কি করে যে, যে-ব্যক্তি এই সব সুবিধা ভোগ করছে বলা হচ্ছে, সে সভ্য অথচ সাধারণত বিত্তহীন, আর যে অসভ্য ব্যক্তির এসব কিছুই নেই, সে অসভ্য হওয়া সত্ত্বেও বিত্তবান? বলা হয়ে থাকে যে সভ্যতা মানুষের অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধন করেছে। আমিও কথাটা সমর্থন করি, কিন্তু সে উন্নতির সুযোগ গ্রহণ কেবল বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। ও কথাটা যখন বলা হয়, তখন এ সভ্যতায় বেশি মূল্য না দিয়ে উৎকৃষ্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, তাও দেখিয়ে দেওয়া উচিত। কোন দ্রব্যের মূল্য বলতে বুঝি ঐ দ্রব্যের জন্য আমার অভিধানে যা জীবন, এখন অথবা পরে তার যে পরিমাণ বিনিময় করতে হয়। এ অঞ্চলে হয়তো একটা চলনসই বাড়ি খাড়া করতে লাগে আটশ ডলার। মাথাপিছু মজুরির অর্থ-মূল্য দৈনিক এক ডলার ধরলে, কেউ কিছু বেশি, কেউ কিছু কম পায়, টাকাটা সঞ্চয় করতে হলে জনমজুরের জীবনের দশ থেকে পনের বছর লাগবে, তাও যদি তার পুষ্যির ঝামেলা না থাকে। সুতরাং তার মাথা গুঁজবার ঠাঁই লাভ করতে গিয়ে তার সাধারণ আয়ুষ্কালের অর্ধেকেরও বেশি খরচা হয়ে যায়। বরং তার ভাড়াটে হয়ে থাকাই ভাল ধরে নিলে দাঁড়াচ্ছে দুই সসেমিরে অবস্থার মধ্যে একটা বেছে নেওয়ার ধাঁধা। এই হিসাব ধরলে, অসভ্যের পক্ষে মাথা গুঁজবার মতো তার নিজস্ব যে ঠাঁই সেই উইগওয়ামের বিনিময়ে প্রাসাদলাভ বিচক্ষণতার ব্যাপার হয় কি?

ভবিষ্যতের সংস্থানার্থ মজুদ তহবিল হিসাবে এই অতিরিক্ত সম্পত্তিটার গোটা সুবিধাই আমি বাদ দিয়ে দেখছি, কেউ হয়তো এমন সিদ্ধান্ত করবেন।

কিন্তু লোকটার নিজের দিক থেকে দেখতে গেলে এর যা সুবিধা, তা শুধু তার শ্রাদ্ধের ব্যয়নির্বাহে লাগছে। বোধহয় নিজেই নিজের শ্রাদ্ধব্যবস্থা করার কথা নয় মানুষের। সভ্য আর অসভ্য জাতির মধ্যে একটা গুরুতর রকমের পার্থক্য মোটামুটি এই থেকে বোঝা যাবে। অবশ্য সভ্য মানুষের জীবন-যাত্রাকে এক সংঘ করে গড়ে তুলবার জন্য, সমষ্টিজীবন রক্ষা ও ত্রুটিহীন করার উদ্দেশ্যেই যে ব্যষ্টিজীবনের অনেকাংশে গ্রাস করা এবং এসব পরিকল্পনাই যে আমাদের উপকার কল্পে, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কি পরিমাণ ব্যয় করে বর্তমানে সুবিধালাভ হচ্ছে তাই দেখানোই আমার উদ্দেশ্য, তার সঙ্গে কোন রকম অসুবিধা কি কষ্ট স্বীকার না করেই বা কি উপায়ে সব রকম সুবিধা লাভ করে জীবন যাপন সম্ভব, আমি সে পথের সন্ধানও দিতে চাই। মানুষের সমাজে চিরকালই একদল দরিদ্র থাকে, আর পূর্বপুরুষ যে কারণে অম্ল ভক্ষণ করেছেন, সেই অপরাধে উত্তর পুরুষের দাঁতকে দুর্ভোগ ভুগতে হবে, এ সব কথার কি অর্থ হতে পারে ?

"আমি যতদিন আছি, ভগবান বলেছেন, ইস্রেলে এই প্রবাদের শরণ নেবার কোন কারণ ঘটবে না।"

"জেনে রাখ, সব আত্মাই আমার আশ্রিত। পিতাপুত্র দুয়েরই আত্মা আমার আশ্রিত। পাপাশ্রয়ী আত্মারই মৃত্যু ঘটে।"

কনকর্ড অঞ্চলে আমার চাষী প্রতিবেশীদের কথা ভেবে দেখি, অবশ্য অন্য শ্রেণীর লোকদের সমান সচ্ছল অবস্থা তাদের, কিন্তু বেশির ভাগ সময়টাই তাদের খেটে কাটে। বিশ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ধরে খেটে চলেছে সব, তাদের ক্ষেত-খামারের প্রকৃত মালিক হবার আশায়। সাধারণত সেগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে দেনাদায় সমেত পাওয়া কিংবা টাকা ধার করে কেনা তাদের। শোধ হয় নি আজও, তাদের খাটুনির তিন ভাগের এক ভাগ যাচ্ছে বাড়ির কল্যাণে, এ তো অবধারিত। দেনার পরিমাণ কখনও সত্য সত্যই ক্ষেত-খামারের মূল্যের চাইতে বেশি বলে দেখা যায়, ফলে গোটা খামারটাই তখন দায় হয়ে ওঠে। তবু উত্তরাধিকার লাভ করা চাই তাদের, কেন না ঐ যে বলে তারা কত ঘনিষ্ঠতা ওটার সঙ্গে। কর-নির্ধারকদের কাছে খবর নিতে গিয়ে হতভম্ব বনে গেছি, ক্ষেত-খামারের মালিকানা-স্বত্ব নির্ঝঞ্ঝাটে নির্দায়ে ভোগ করে, শহরের মধ্যে এমন বারোজন লোকের নামও তারা এক নিঃশ্বাসে বলতে পারে নি। ব্যাঙ্কে খবর নিলে এই সব ভূসম্পত্তির ইতিহাস, কোথায় ওগুলো বন্ধক আছে, জানা যাবে। খামারের পিছনে খেটে তার দাম উশুল করতে পেরেছেন এমন লোক দুষ্প্রাপ্য, পড়শীরা দেখিয়ে দেবে কে কে। কনকর্ডে এমন লোক তিন জন আছে কি না আমার সন্দেহ। ব্যাপারিদের সম্বন্ধে যেমন বলা হয়ে থাকে, তাদের অধিকাংশই, একশর মধ্যে সাতানব্বই জনই দেউলিয়া

বনবেনই, কথাটা চাষীদের সম্বন্ধেও খাটে। ব্যাপারিদের সম্বন্ধে তবু, ওদের একজন ঠিক কথাই বলে দিয়েছে, বস্তুত ঠিক অর্থাভাবেই অধিকাংশ দেউলিয়া হয় না, হয় চুক্তির খেলাপ করে, কেন না চুক্তি রাখায় তাদের অসুবিধা। অর্থাৎ ওদের নৈতিক চরিত্রটাই ধ্বসে গেছে। এজন্য ব্যাপারটার চেহারা যৎপরোনাস্তি খারাপ লাগে। মনে হয়, ঐ সাতানব্বই জনের উপরে বাকি যে তিন জন, এরা বোধহয় তাদের তুলনায় নিকৃষ্টতর অর্থে সর্বস্বান্ত। আমাদের সভ্যতার এই যে হরেক রকমের ডিগবাজির কেরামতি, সে হচ্ছে দেউলিয়া হওয়া, চুক্তির খেলাপ করা ইত্যাদি স্প্রিং-বোর্ড থেকেই, কিন্তু অসভ্যেরা দাঁড়িয়ে তাদের অন্নকষ্টের অনড় তক্তার উপরে। তথাপি, মিডলসেক্স গবাদি পশু প্রদর্শনী বৎসর বৎসর এখানে সমারোহের সঙ্গে সংঘটিত হচ্ছে, যেন কৃষিযন্ত্রে যাবতীয় কলকব্জা সব চালু আছে।

যে-সূত্রে কৃষক তার জীবিকা-সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট, মূল সমস্যার চাইতেও সেটা জটিল। এ যে তার জুতার ফিতে লাভ সংকল্প করে গরুর পাল নিয়ে ফটকাবাজি। স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বাধীনতা শিকারের উদ্দেশ্যে নির্ভুল নৈপুণ্যে যে-ফাঁদে অতিসূক্ষ্ম কল খাটিয়েছিল সে, পিছন ফিরতে গিয়ে সেই ফাঁদে নিজেরই পা আটকে গেছে তার। এই কারণেই সে দরিদ্র এবং এই একই কারণে সোপকরণ বিলাসে বেষ্টিত হয়েও বর্বরসুলভ হাজারো আরামের অভাবে আমরা সকলেই দরিদ্র। কবি চ্যাপমান গেয়ে গেছেন ঃ

"মনুষ্যের অলীক সমাজে —
—মর্ত্য-মহিমার তরে
অমর্ত্য-আনন্দ সব হাওয়ায় মিশায়।"

অবশেষে চাষী অবশ্য গৃহ লাভ করে। কিন্তু ফলে সে অধিক-বিত্ত না হয়ে অধিক-নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে। সম্ভবত, গৃহই তাকে লাভ করে। মিনার্ভাদেবী যে-গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে মোমাসের যে-আপত্তি, সে-আপত্তি আমার ব্যাখ্যায় এই দিক থেকে সার্থক যে, "গতিশীল করেন নি তিনি তাকে। করলে অবাঞ্ছনীয় পরিবেশ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারতেন।" আজও সে প্রতিবাদ নিরর্থক মনে হয় না। কেন না আমাদের বাড়িঘর এমন গুরুভার সম্পত্তি যে, তার মধ্যে আশ্রয় লাভ করি নে আমরা, লাভ করি বন্দিত্ব! আর অবাঞ্ছনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি তো চাই-ই, কিন্তু সে পরিবেশ যে আমাদেরই নীচাশয় আমিত্ব। এক পুরুষ ধরে শহর প্রান্তের বাড়ি বিক্রি করার ইচ্ছা পোষণ করে আসছেন এমন অন্তত দুই একটা পরিবার জানি এ শহরে। গ্রামে গিয়ে জীবন যাপন করা তাঁদের ইচ্ছা, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠে নি। ইচ্ছার সমাপ্তি হবে মৃত্যুতে।

ধরা গেল যে, অধিকাংশ লোকই শেষ পর্যন্ত যুগোপযোগী সুসজ্জিত

বাড়ি একটা কিনে নিল, নয় ভাড়া করে থাকল। কিন্তু সভ্যতার ফলে আমাদের গৃহেরই উন্নতি সাধিত হচ্ছে, গৃহে যে-গৃহস্থেরা থাকবে তাদের সেই অনুপাতে কোন উন্নতি দেখা যায় না। রাজ-প্রাসাদ সৃষ্টি করেছে, রাজতুল্য ব্যক্তি কি রাজা সৃষ্টি সহজ হয় নি। আর যদি সভ্য মানুষের জীবনের লক্ষ্য অসভ্যের তুলনায় উন্নতই না হ'ল, তাকেও যদি আয়ুষ্কালের বেশির ভাগ নিতান্তই কেবল অন্নবস্ত্র আর আরামের ব্যবস্থা করতেই নিযুক্ত থাকতে হ'ল, তবে অসভ্যদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বাসস্থানে তার কি অধিকার?

ওদিকে যারা অভাগা, সংখ্যাল্প, তাদেরই বা কি অবস্থা? তাদের জনকয়েক হয়তো দেখা যাবে বাইরের অবস্থা বিচারে অসভ্যদের অপেক্ষা উপরে উঠে গেছে, কিন্তু বাকি লোকগুলো আবার সেই পরিমাণে তাদের চাইতেও নিচে নেমে গেছে। একের ঐশ্বর্য, অন্যের দারিদ্র্য উভয়ে মিলে ভারসাম্য রক্ষা করছে। এক দিকে রাজপ্রাসাদ, অন্য দিকে অনাথ-আশ্রম আর যত "মূঢ় মূক"। ফারাওদের সমাধির জন্য পিরামিড গড়েছিল অগণ্য নগণ্য ব্যক্তি রশুন খেয়ে প্রাণ ধারণ করে। তাদের নিজেদের মৃত্যুর পর কোন রকম কবরই হয় তো জোটে নি তাদের। প্রাসাদোপম অট্টালিকার কার্নিশ গেঁথে শেষ করছে যে রাজমিস্ত্রি, ফিরে গিয়ে যে খুপ্রিতে সে রাত কাটাবে, ইন্ডিয়ানদের উইগওয়ামের আরামও নেই হয়তো সে-খুপরিতে। কোন দেশে সভ্যতার কতকগুলো মামুলী সাক্ষ্য খাড়া দেখা যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে সে দেশের অধিকাংশ লোকের অবস্থা অসভ্যদের মতো হীন নয়। হীনাবস্থা ধনবানদের কথা বলছি নে এখানে, অবস্থাহীন দরিদ্রদের কথাই বলছি। এটুকু জানতে হ'লে বেশি কিছু দেখবার দরকার নেই, আমাদের সভ্যতার সর্বাধুনিক সমুন্নয়ন এই যে রেলপথ তার দুইধার জুড়ে আছে যে সব বস্তি সেগুলো দেখলেই হবে। প্রতিদিন বেড়াতে গিয়ে নজরে পড়ে, মানুষ খোঁয়াড়ের মধ্যে বাস করছে সেখানে, সমগ্র শীতকালটা আলোর জন্য দরজা খুলে রাখতে হয়, আগুন পোহাবার কাঠ কল্পনার বস্তু, প্রায় অদৃশ্য। দীর্ঘ কাল শীতে আর শোকে দুঃখে কুঁকড়ে থেকে থেকে বৃদ্ধ-যুবকনির্বিশেষে দেহ তাদের স্থায়িভাবে দুমড়ে গেছে। শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, কর্মশক্তির বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত। যে লোকগুলোর পরিশ্রমে এ যুগের বৈশিষ্ট্যসূচক কীর্তি সব সাধিত হচ্ছে, তাদের দেখা নিশ্চয়ই সঙ্গত। সারা দুনিয়ার সবসে সেরা কারখানা যে ইংলন্ড, সেই ইংলন্ডের সব স্তরের শ্রমিকদের হাল অল্পাধিক এই একই রকম। কিংবা আয়ারল্যান্ডের উল্লেখও করতে পারি, মানচিত্রে অন্যতম শ্বেতকায় অথবা প্রাগ্রসর অঞ্চল হিসাবেই যার পরিচয় দেখা যায়। সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে অধঃপতিত হবার আগে পর্যন্ত উত্তর-আমেরিকার ইন্ডিয়ান, দক্ষিণ-সাগর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী, অথবা যে-কোন অসভ্য জাতির সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের

অধিবাসীদের বাহ্যাবস্থার তুলনা করুন। অথচ এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, এ সব জাতির শাসনকর্তারা সভ্য জাতির গড়পড়তা শাসনকর্তার মতোই বিচক্ষণ। সভ্যতার সঙ্গে কি পরিমাণ দুঃখ-দুর্দশা সংশ্লিষ্ট, তাদের অবস্থা তার সাক্ষ্য। আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির শ্রমিকশ্রেণী, দেশের সেরা মাল উৎপাদন করে যারা, যারা নিজেরাই দক্ষিণের তৈরি সেরা মাল, তাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয়। মধ্যবিত্ত হিসাবে যাঁরা পরিচিত তাঁদের প্রসঙ্গই আলোচনা করা যাক।

গৃহাশ্রয়টা কি অধিকাংশ ব্যক্তিই সে সম্বন্ধে বিবেচনা করে দেখেন বলে মনে হয় না এবং অকারণে হলেও সত্যই আজীবন দরিদ্রাবস্থায় কাটিয়ে যান। তার কারণ এই যে তাঁরা মনে করেন প্রতিবেশীদের যেমন আছে, তাঁদেরও তেমনি বাড়ি থাকতে হবে। এ যেন দরজির মরজি মাফিক ছাঁটা পিরানটা পরা, কি তালপাতার হ্যাট আর উডচাকের চামড়ার ক্যাপ ক্রমশ বর্জন করে সোনার শিরোপা কেনবার সংস্থান হয় নি বলে নিজের দুরবস্থায় হাহু-তাশ করার ব্যাপার। আমাদের গৃহাশ্রয়ের অপেক্ষা আরও অধিক আরামের আর বিলাসব্যবস্থা সমেত বাসভবন উদ্ভাবন সম্ভব। কিন্তু তার খরচা সাধ্যাতীত হতে পারে, একথাও সকলকে মানতে হবে। এসব বস্তু আরও পাবার জন্যই কি সর্বদা উঠে পড়ে লাগতে হবে, কমে খুসী থাকলে চলবে না? সম্ভ্রান্ত নাগরিক তাঁর জীবনান্ত ঘটার পূর্বে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে তরুণদের জন্য কি এই নির্দেশ আর দৃষ্টান্তই দিয়ে যাবেন যে, নিষ্প্রয়োজনীয় কতকগুলো জুতা আর ছাতি, এবং শূন্যগর্ভ অতিথিদের জন্য শূন্যকক্ষ অতিথিশালার নিতান্তই দরকার তাদের? আরব অথবা ভারতবাসীদের মতো অনাড়ম্বর গৃহসজ্জায় আমাদের চলে না? অমৃতস্য বার্তাবাহী, পরমপুরুষের আশীর্বাদবাহী বলে অভিহিত করে দেবত্ব আরোপ করেছি যাদের, মনুষ্য জাতির সেই সব ত্রাণকর্তার ধ্যান করতে গেলে, কই, সঙ্গে লোকলস্কর বা গাড়ি বোঝাই ফ্যাশানদুরস্ত আসবাব-পত্রের চিত্র তো চোখে ভাসে না; কিংবা যদি বলি, চরিত্রে আর বুদ্ধিতে আমরা আরববাসীদের তুলনায় যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, সেই পরিমাণেই আমাদের আসবাব-পত্রও আড়ম্বরবহুল হতে পারে, সিদ্ধান্তটা একটু অদ্ভুত হবে না? বর্তমান কালে আমাদের ভবনগুলি আসবাবে বোঝাই, বিপর্যস্ত। সুগৃহিণী কেউ এর অধিকাংশই জঞ্জালস্তূপে ফেলে দেবেন এবং তার জন্য প্রাতঃকৃত্য অসমাপ্ত রাখবেন না। প্রাতঃকৃত্য! অরোরার লজ্জার অরুণিমা আর মেম্‌ননের গানের মূর্ছনার নাম নিয়ে জিজ্ঞাসা করা যাক, পৃথিবীতে পুরুষের প্রাতঃকৃত্য কি হবে? আমার ডেস্কের উপর তিন টুকরো চুনাপাথর জমে ছিল, মনের সরঞ্জাম যেখানে ধুলোয় মলিন রয়ে গেছে, সেখানে আবার রোজ সেগুলোর ধুলো ঝাড়তে হবে, ভেবে ভড়কে গেলাম। সেগুলোকে জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে

দিলাম বিতৃষ্ণায়। অতএব সুসজ্জিত গৃহ আমার মিলবে কি করে? তার চাইতে বরং খোলা হাওয়ায় বসে কাটুক আমার। মানুষ গিয়ে যদি না জুটে থাকে, ঘাসে তো ধুলো জমবে না।

বিলাসপরায়ণ আর অমিতাচারী ব্যক্তিরাই ফ্যাশান প্রবর্তন করে আর গড্ডালিকার দল নিষ্ঠার সঙ্গে তার অনুসরণ করে। তথাকথিত সেরা সরাইখানায় গিয়ে উঠলেই কেউ অতি সত্বর বুঝতে পারবেন, সরাইওয়ালা তাঁকে নবাব খাঞ্জা খাঁ ঠাউরে নিয়েছে, আর তিনি যদি তাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেন, তবে তাঁকে নিঃশেষ করে ছাড়বে। রেলের গাড়িগুলোকে নিরাপদ কি সুবিধাজনক করার কথা না ভেবে আমরা সেগুলোর বিলাসদ্রব্যেই বেশি ব্যয় করে থাকি বলে আমি মনে করি। ফলে গাড়িগুলো নিরাপদ আর সুবিধা-জনক না হয়ে, হয়ে উঠছে সব আধুনিক বৈঠকখানা। এই তার হেলান-দেওয়া পর্যঙ্ক, গদি-আঁটা চৌকি, রোদ-রক্ষক, আরও কত সাজসজ্জা যে আমরা এদেশে আমদানি করেছি; প্রাচ্য দেশের হারেমের বেগম আর 'স্বর্গীয় সাম্রাজ্যের' ক্লীব অধিবাসীদের জন্যই তৈরি সে সব, এ দেশের লোকের পক্ষে যে সবের নাম জানাও লজ্জার ব্যাপার। লাউ-কুমড়োয় ঠেস দিয়ে হলেও আমি বসতে রাজী নিজের মতো জুত করে বসতে পাই যদি, তবু ঠেসাঠেসি করে মখমলের গদীতে বসতে চাই নে। খোলামেলা গরুর গাড়ি চেপেই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব, তবু সেই অভিযাত্রী-গাড়ির সুসজ্জিত কামরায় বসে সারাপথ দুর্গন্ধ নাকে নিয়ে স্বর্গে যেতে চাই নে।

আদিম যুগের মানুষের জীবনযাত্রার সারল্য আব নগ্নতার একটা ভাল দিক ছিল এই যে তখনও মানুষ প্রকৃতির বাসভূমেই পরবাসী ছিল। আহার ও নিদ্রার পর শরীর ঠান্ডা হলে সে আবার তার পথযাত্রার কথা চিন্তা করত। যেন এই দুনিয়ায় তাঁবুতে বাস করতে এসেছে সে, তাকে কখনও উপত্যকা ভেদ করতে হবে, কখনও সমতল পাড়ি দিতে হবে, আর কখনও বা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হবে। কিন্তু হায়! আজ মানুষ তার নিজের যন্ত্রপাতির হাতের যন্ত্র হয়ে পড়েছে। ক্ষুধাবোধ হলে ইচ্ছা মতো ফল পেড়ে খেত যে মানুষ, সে আজ চাষী। মাথা গুঁজতে গিয়ে দাঁড়াত যে গাছতলায়, সে আজ গৃহস্থ। এখন আর রাত্রের মতো তাঁবু খাটাতে আমাদের আসা নয় পৃথিবীতে, আড্ডা গেড়েছি সেখানে এবং স্বর্গ ভুলে গেছি। আমাদের খ্রীস্ট-ধর্ম চর্যা উন্নত সংস্করণের কৃষি-চর্যা মাত্র। ইহলোকে পারিবারিক সৌধ নির্মাণ করেছি, পরলোকে খাড়া করছি সমাধিস্তম্ভ। এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভপ্রয়াসের প্রকাশই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি। কিন্তু আমাদের শিল্পসৃষ্টির ফলশ্রুতি দাঁড়াচ্ছে শ্রেয়কে ভুলিয়ে এই নীচাশ্রয়কেই সুখকর করা। সত্যই ললিতকলার কাজের কোন স্থান নেই এ গ্রামে। যদি কোন সূত্রে কোন একটা এসে পড়ে গ্রামে,

তবে কি আমাদের জীবনযাত্রায়, কি আমাদের গৃহকোণে, কি আমাদের পথে, কোথায় এমন পাদপীঠ যেখানে তাকে খাড়া করে রাখতে পারি? না আছে ছবি টাঙিয়ে রাখার উপযুক্ত গজাল একটা, না বীর কি মহাপুরুষের আবক্ষ মূর্তি রাখবার উপযুক্ত তাক। যখন ভেবে দেখি আমাদের এই বাড়িঘর কি ভাবে তৈরি, কি ভাবে তার দাম দেওয়া হয়েছে কি হয় নি, আর তার মধ্যে গৃহস্থালি পরিচালনা আর রক্ষার কি ব্যবস্থা, তখন আশ্চর্য লাগে আমার যে কোন অভ্যাগত এসে তাকের উপর টুকিটাকি দেখে তারিফ করার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নিচে মেজেটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে তাঁকে একেবারে ভূগর্ভ প্রকোষ্ঠে নিয়ে ফেলছে না। মাটির বুনিয়াদ হলেও খানিকটা মজবুদ সেটা, ফাঁকি নেই। কিছুতেই না ভেবে পারি নে যে এই তথাকথিত সুসচ্ছল, সুমার্জিত জীবনযাত্রা মানুষের উদ্বাহু-প্রয়াসের সাক্ষ্য, ফলে এর ললিতকলাসজ্জার আনন্দ উপভোগে ব্যাঘাত ঘটে আমার, এর উল্লম্ফনের প্রক্রিয়াটাই সমস্তটা মন জুড়ে থাকে। স্মরণ করি, কেবল মাংসপেশীর উপর নির্ভর করে মানুষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ লম্ফন-কীর্তি হচ্ছে, জনকয়েক আরব বেদুইনের সমতল ভূমির পঁচিশ ফুট এক লাফে পার হওয়ার কাহিনী। কোন রকম কৃত্রিমতার সহায়তা লাগবে না, অনেক অধিক দূর পাড়ি দিয়ে মর্ত্যে অবতীর্ণ হবার সামর্থ্য রাখে মানুষ। এই অসঙ্গত রকমের সঙ্গতিশালী ব্যক্তিকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা জাগে আমার, তোমার খোঁটার জোর কে যোগায়? তুমি কি সেই বাতিল সাতানব্বই জনের মধ্যে, না কৃতী তিনজনের মধ্যে? এ প্রশ্নের তেমন উত্তর যদি যোগায় তোমার, তখন না হয় দেখা যাবে তোমার ঐ হাতের খেলনা, দেখা যাবে কত তারা চটকদার। ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতলে দেখতেও ভাল লাগে না, কাজও চলে না তাতে। গৃহ সজ্জামণ্ডিত করার পূর্বে গৃহ-প্রাচীরের নির্মোক দূর হ'ক, আমাদের জীবন যাত্রা নির্মল হ'ক। তখন ভিত্তিস্থাপন হবে গৃহশ্রীর, জীবনশ্রীর। সৌন্দর্যশ্রী প্রসাধন ভাল হয় ঘরের বাইরে। এই খোলা মাঠে। যেখানে ঘরও নেই, ঘর গোছাবার লোকও নেই।

প্রবীণ লেখক জনসন এই শহরের প্রথম অধিবাসীদের সমসাময়িক ব্যক্তি। তাঁর 'ওয়াণ্ডার ওয়ার্কিং প্রভিডেন্স' পুস্তকে তিনি এদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন, "তারা পাহাড়ের তলায় মাটি খুঁড়ে গর্তের মধ্যে সেঁধিয়ে তাদের প্রথম মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিল, আর সব চাইতে উঁচু দিকটায় তক্তা ফেলে তার উপর মাটি চাপিয়ে মাটির উপর খানিকটা ধোঁয়াটে আগুন জ্বালিয়ে নিল।" তিনি বলছেন, "ভগবানের দয়ায় যে পর্যন্ত না মাটি তাদের খাওয়ার রুটি যুগিয়ে দিয়েছে," "তারা কোন বাড়িঘর তোলে নি," আর প্রথম ফসল এত কম হয় যে, "অনেক দিন পর্যন্ত তারা অত্যন্ত পাতলা করে রুটি কাটতে বাধ্য হয়েছিল।" যারা সে অঞ্চলে জমি নিতে ইচ্ছুক তাদের অবগতির জন্য ১৬৫০

সালে নিউ নেদারল্যান্ড প্রদেশের সেক্রেটারি ওলন্দাজ ভাষায় আরও বিশদ বর্ণনা দেন, "নিউ নেদারল্যান্ডে, বিশেষত নিউ ইংলন্ডে, যে রকম ইচ্ছা খামার-বাড়ি বানিয়ে নেবার যাদের প্রথমটায় সঙ্গতি ছিল না, তারা সেলারের মতো করে মাটিতে চৌকোণা একটা গর্ত খুঁড়ে নিত ছয় কি সাত ফুট গভীর, লম্বা আর চওড়া যতটা দরকার বুঝত, ভিতরের দেয়ালের চারপাশের মাটি কাঠ দিয়ে ঢেকে দিত, আর মাটিতে গর্ত না হয়ে যায় সেই জন্য গাছের বাকলা কি আর কিছু দিয়ে তক্তায় আস্তরণ দিত একটা, তক্তা দিয়েই সেলারের মেজেটা বানিয়ে নিত, মাথার উপর তক্তায় ঢেকেই সিলিং খাটিয়ে গোটাকয়েক খুঁটি খাড়া করে ছাদ একটা তুলে ফেলত, খুঁটিগুলো গাছের বাকলা কি সবুজ ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিত, যাতে করে এর মধ্যে সপরিবারে শুষ্ক থেকে আরাম করে দুই তিন কি চারটে বছর কাটিয়ে দিতে পারে। বলাই বাহুল্য, পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে, সেলারের মধ্যে পার্টিশন দিয়ে নেওয়া হ'ত। নিউ ইংলন্ডের ধনশালী আর শীর্ষস্থানীয় সকলেই উপনিবেশ সূচনা-কালে তাঁদের আস্তানা এই ভাবেই পত্তন করেছিলেন। দুটো কারণেঃ প্রথমত, বাড়ি তুলতে গিয়ে সময় নষ্ট না করা, যাতে সামনের বছরে খাদ্যাভাবে না পড়তে হয়; দ্বিতীয়ত, দেশ থেকে যেসব শ্রমজীবী গরিব লোক তাঁরা সঙ্গে আনতেন, তারা নিরুদ্যম হয়ে না পড়ে। তিন চার বছর কাটিয়ে মাটি চাষের উপযোগী হলে তখন তাঁরা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে নিজেদের জন্য সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি করে নিতেন।"

আমাদের পূর্বপুরুষরা এই যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তার মধ্যে আর কিছু না হ'ক পরিণামদর্শিতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মনে হয় যেন তাঁদের মূল নীতি ছিল, যেসব দরকার বেশি জরুরি, প্রথমে সে সব অভাব দূর করতে হবে। কিন্তু এখন কি জরুরি দরকারগুলো আগে পূরণ করা হচ্ছে? এই সব বিরাট বাড়ির একটার মালিক হবার কথা যখন ভাবি মনে বাধা বোধ করি। কেন না, বলতে গেলে, দেশ আজও মনুষ্যত্ব আবাদের উপযোগী হয় নি এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা গমের রুটি যত পাতলা করে কাটতেন, তার চেয়েও পাতলা করে আমাদের আধ্যাত্মিক রুটি কাটতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। এমন নয় যে স্থাপত্যশিল্পের শ্রীসৌন্দর্য অত্যন্ত অব্যবস্থার যুগেও অগ্রাহ্য করে চলতে হবে। কিন্তু বসত বাটির সঙ্গে আমাদের জীবন অঙ্গে অঙ্গে খোলক-মৎস্যের আবাসের মতোই সংলগ্ন, আমাদের বাটির সেই ভিতর দিকটা আগে সৌন্দর্যাস্তীর্ণ হ'ক, যেন সৌন্দর্যের প্রলেপ মাত্র না হয় তা। দুঃখ এই যে, এই বাড়িগুলোর যে দু একটার অভ্যন্তরের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে আমি জানি সেগুলো কি দিয়ে আস্তীর্ণ।

পর্বতগুহা কি উইগওয়ামের আশ্রয়ে পশুচর্ম পরিধান করে আমাদের

জীবন কাটাতে হবে, এতখানি অধঃপতিত আমরা নেই আজ। এত যে সুখ-সুবিধা, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আর উদ্যমশীলতাই যা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, অনেক মূল্য দিতে হলেও এ সব গ্রহণ করাই কর্তব্য। তা ছাড়া আমাদের এ অঞ্চলে প্রয়োজনানুরূপ পর্বতগুহা, মোটা মোটা কাঠ, যথেষ্ট পরিমাণে গাছের বাকলা, এমন কি ঠিকমতো মিশাল-দেওয়া কাদা আর পাত পাথরের চাইতে বরং ছোট-বড় তক্তা, নুড়িপাথর, চুন আর ইটের মূল্য কম, সহজলভ্যও বটে সেগুলো। এ সব বিষয়ে পুঁথিগত বিদ্যা এবং কার্যত অভিজ্ঞতা দুইই আছে আমার, সুতরাং বিবেচনা করেই কথা বলছি। এই সব কিছুই সামান্য বুদ্ধি প্রয়োগে এমন ভাবে কার্যকর করা যায় যে, বর্তমানে যাঁরা ধনিশ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও ধনবান হওয়া সম্ভব হয়, আমাদের এই সভ্যতাই স্বর্গে পরিণত হ'তে পারে। সভ্য মানুষ বলতে তো একটু বেশি অভিজ্ঞ, বেশি বিচক্ষণ অসভ্য মানুষ। কিন্তু আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছিল, বিলম্ব না করে তার কথাই বলি এবার।

১৮৪৫ সনে মার্চ মাসের শেষাশেষি হবে, একটা কুড়ুল ধার করে ওয়ালডেন পণ্ডের পাশের বনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার আস্তানাটা যেখানে তুলব ঠিক করেছিলাম, তার নিকটতম একটা জায়গা বেছে নিয়ে তীরের ফলার মতো দেখতে কয়েকটা দীর্ঘ শ্বেত পাইন গাছ কাটতে সুরু করে দিলাম। তখনও সেগুলো কচি। বিনা সাহায্যে কোন কাজে অগ্রসর হওয়া কষ্টসাধ্য। তবু কোন কাজে প্রতিবেশীর কৌতূহল উদ্রেকের সুযোগ দান করার পক্ষে সম্ভবত এইটাই প্রশস্ততম পন্থা। কুড়ুলের মালিক সেটাকে তাঁর হাতছাড়া করার সময় আমাকে জানান, সেটা ওঁর চোখের মণি। কিন্তু নিতে যদি বা সময় লেগে থাকে আমার, ফেরত দিতে দেরি হয় নি। যেখানে কাজ করতাম, পাহাড়ে ঘেরা পাইন বনের আড়ালে মনোরম জায়গাটি। বনের ফাঁক দিয়ে হ্রদটার দিকে আর বনের মধ্যে এক ফালি খোলা মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে কাটত। পাইন আর হিকোরির চারাগুলো সবে মাথা খাড়া করেছে সেখানে। হ্রদের বরফ তখনও গলে নি। যদিও এখানে ওখানে খানিকটা খানিকটা ফাঁক নজরে পড়ত। সমস্তটা মিশ কাল আর জলে ভর্তি। সে সময়টা অল্প অল্প করে এক এক ঝাপটা বরফ পড়ত। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বাড়ি ফিরবার পথে রেলরাস্তার কাছ বরাবর এসে দেখতাম, ঝাপসা আলোয় রেলরাস্তার সোনালী বালি অনেকটা জায়গা জুড়ে ঝিকমিক করছে, আর রেল লাইনটা বসন্তকালের সূর্যকিরণে ঝকমক করছে। শুনতে পেতাম লার্ক আর পিউই আর অন্য অনেক পাখির ডাক, আমাদের সঙ্গে আর একটা বৎসর কাটাবার জন্য তারা এর মধ্যেই আসতে আরম্ভ করেছে। বসন্তকালের মনোরম দিন, যেমন মাটির উপর বরফ তেমনি মানুষের শীতার্ত অতৃপ্তিও গলে আসছে। জীবন

অসাড় হয়ে ছিল, আড়মোড়া ভাঙা আরম্ভ হয়েছে তার। একদিন কুড়ুলটার বাঁটটা খুলে গেল। গোঁজ তৈরি করতে হবে, গোটা একটা কচি হিকোরি গাছ পাথর ঠুকে ঠুকে গুঁতিয়ে উপড়ে নিয়ে ডোবায় জল শুষতে ফেলেছি সেটাকে, দেখি একটা ডোরা-কাটা সাপ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়ে অনেকক্ষণ, অন্তত আমি যতক্ষণ ছিলাম, প্রায় পনের মিনিটেরও বেশি সময়, জলের তলায় থেকে গেল, মনে হ'ল না কোন অসুবিধা বোধ করছে। বোধহয় তখনও জড়ত্ব থেকে মুক্তি পায় নি সে। কি জানি আমার মনে হ'ল এই যে হীন আর আদিম জীবন কাটিয়ে চলেছে মানুষ, কোনক্রমে যদি পরম বসন্তের ছোঁয়াচ লাগে তার, তবে এই মানুষই নিশ্চয় ঊর্ধ্বস্তরে কোন পরমানন্দময় জীবনে স্বতস্ফূর্ত নবজন্ম লাভ করবে। সাপগুলোকে এর আগে দেখেছি, কুয়াসাচ্ছন্ন সকালে যাতায়াতের পথের উপর পড়ে আছে, শরীরের খানিকটা তখনও অসাড়, নাড়াতে পারে না, কেবল প্রতীক্ষা, কখন সূর্য উঠবে, জড়ত্ব থেকে মুক্তি পাবে। পয়লা এপ্রিল বৃষ্টিপাত হ'ল, বরফ গলল। সকালের দিক-টায়, তখনও খুব কুয়াসা করে আছে, কানে এল নিঃসঙ্গ মরালের ডাক, যেন হ্রদে পথ হারিয়ে সন্ধান করছে পথের, অথবা যেন কুজ্ঝটিকার আত্মা।

আমার সেই একরত্তি কুড়ুলে কাঠ কাটি, তক্তা ফুঁড়ি, গজাল বরগা বানাই, এমনি ভাবে চলতে লাগল দিনগুলো। শোনবার মতো কি সুধী-জনোচিত বিশেষ বাণীর সন্ধান মিলল না। নিজের মনে মনেই গুঞ্জন করি :

মানুষে কয় তারা জানে অনেক জানা ;
চাইয়া দেখো, তারা মেলেছে ডানা—
কলা আর বিজ্ঞান
হাজার-হাজার যান;
হাওয়া দেখো বয়
কেবল তারেই প্রেত্যয়—।

আসল তক্তাগুলো ছয় ইঞ্চি চৌকো করে ফেড়ে নিলাম, বেশির ভাগ গজাল দুধার থেকে, বর্গাগুলো আর মেজের তক্তা দুধার থেকে, বাকি অংশটা বাকলা সমেত রেখে দিলাম। করাত কাটার মতোই বেশ সমান হয়েও আরও বেশি মজবুদ হ'ল। এর মধ্যে আরও কয়েকটা যন্ত্রপাতি চেয়েচিন্তে এনেছিলাম, প্রত্যেকটি খুঁটিতে সযত্নে খাঁজ কাটলাম, ডগাটা সরু করে আল বার করে নিলাম। বনে দিনের বেশিটা সময় না কাটলেও মধ্যাহ্ন-ভোজনের রুটি আর মাখন বয়ে নিয়ে যেতাম সাধারণত। খাবারটা খবরের কাগজে মুড়ে আনতাম, মধ্যাহ্নে বসে সেটা পড়তাম। চারপাশে গাদা করে কাটা কচি কচি পাইনের ডালপালার সুগন্ধ খানিকটা আমার খাবারের সঙ্গে মিশে যেত। আমার হাতজোড়ায় পুরু এক তাল পিচের পোঁচ সত্ত্বেও। গোটা কয়েক

পাইন গাছ আমার হাতে প্রাণ হারায় বটে, কিন্তু আমার কাজটা করতে করতে ওদের আর শত্রু থাকলাম না, মিত্র হয়ে উঠলাম। পরস্পরের পরিচয় নিবিড় হ'ল। মধ্যে মধ্যে কেউ বা বনভ্রমণে এসে আমার কুড়ুলের আওয়াজ পেয়ে জুটে যেতেন, আমার কাটা কাঠের টুকরো গুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হ'ত কিছুক্ষণ।

কাজে কোন ত্বরা ছিল না আমার। বরং যতদূর সম্ভব সময়ক্ষেপ করেই কাজ করতাম। এপ্রিলের মাঝামাঝি নাগাদ আস্তানাটার কাঠাম তৈরি হ'ল। এখন খাড়া করলেই হয়। তক্তার দরকার। জেম্‌স কলিন্সের কুঠরিটা সকলেরই খুব পছন্দ। কিনে ফেললাম সেটাকে। লোকটা আইরিশ, ফিচবার্গ রেলে কি কাজ করত। যখন দেখতে যাই, তখন বাড়িতে ছিল না। বাইরে ঘুরে ঘুরে সেটাকে দেখলাম। আয়তন ক্ষুদ্র, শিঙ-ওঠা চুড়ো করা ছাদটা ছাড়া বিশেষ করে কিছু দেখা যায় না। চারপাশ পাঁচ ফুট জমাট সারগাদার মতো ধুলোতে ঢাকা। বেশ খানিকটা দোমড়ানো আর রোদে পুড়ে ঝরঝরে হয়ে গেলেও পদার্থ বলতে ঐ ছাদটাই যা-কিছু। দরজায় কপাটের ফাঁকে মুরগীদের অবাধ চলাফেরা, চৌকাঠের নামগন্ধ নেই। জানালাটা বেশ উঁচুতে আর ভিতরে ঢোকানো, তাই প্রথমটায় কেউ আমাকে দেখতে পায় নি। এতক্ষণে শ্রীযুক্তা কদোরের কাছে এগিয়ে এসে আমাকে ভিতরে গিয়ে দেখতে বললেন সব। আমি যেতে মুরগীগুলো ভিতরে গেল। অন্ধকার; মেজেটা সর্বত্র ধুলোয় ঢাকা, স্যাঁতসেঁতে, চটচটে, নড়বড়ে। এখানে ওখানে দু'একটা তক্তাই আস্ত আছে শুধু, খুলে ফেলার অবস্থা নেই। ছাদ আর দেয়ালের ভিতর-দিকটা দেখাতে আলো জ্বালাতে হ'ল তাঁর। শয্যান্তরালে মেজের অংশটাও যে তক্তার তাও দেখালেন। সেলারে অর্থাৎ দুফুট গভীর ধুলোর গর্তে যেন পা না পড়ে যায়, এ বিষয়ে আমাকে হুঁসিয়ার করে দিলেন। তাঁর জবানি, "উপরের তক্তাও শক্ত পাশের তক্তাও শক্ত, আর এই যে জানালা, তাও খাসা" —গোড়ায় একজোড়া পুরোচৌকোই ছিল, বিড়াল সম্প্রতি ফাঁক দিয়ে যাতা-য়াত করেছে, এই যা। একটা স্টোভ, একটা বিছানা, একটা বসবার জায়গা, শিশু একটা—বাড়িতেই ভূমিষ্ঠ হয় সে, একটা সিল্কের ছাতা, গিল্টিকরা ফ্রেমে বসানো একটা আরসি, আর এক টুকরো কাঠে পেরেক দিয়ে লটকানো কফি তৈরির নতুন পেটেন্ট একটা জাঁতা—সর্বসমেত। জেম্‌স ইতিমধ্যে এসে জুটে-ছিল, দরদস্তুরে দেরি হ'ল না কোন। আমাকে সেই রাত্রেই চার ডলার পঁচিশ সেন্ট দিতে হবে, কাল সকাল পাঁচটায় খালি করে চলে যাবে সে, এ সময়টুকুর মধ্যে আর কাউকে বিক্রি করতে পারবে না। সকাল ছটায় দখল পাব আমি। তবে জানিয়ে দিল, আরও সকাল-সকাল পৌঁছতে পারলেই ভাল। জমির খাজনা আর জ্বালানির কাঠ বাবদ সম্পূর্ণ অন্যায্য হলেও সুনির্দিষ্ট বাকি-বকেয়া মেটাতে হ'তে পারে দেনাদায় বলতে এই যা, আশ্বাস দিল আমাকে।

ছটার সময় তাকে সপরিবারে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসা গেল। তাদের সর্বস্ব, বিছানা, কফির কল, আরসি, ম্যয় মুরগীগুলো, সবই একমা বড় গোছের মোটে এ'টে গেল। বিড়ালটা বাকি ছিল, সেটা বনে বেরিয়ে গিয়ে বোধ করি বনবিড়ালই বনে গেল। পরে শুনেছিলাম, উডচাকের জন্য পাতা ফাঁদে পা আটকে শেষ পর্বে সেটার মরা বিড়ালে রূপান্তর ঘটে।

সেইদিন সকালেই পেরেকগুলো তুলে খুলে ফেললাম কাঠরাটা, তারপর কিস্তিতে কিস্তিতে গাড়ি বোঝাই দিয়ে হ্রদের ধারে নিয়ে গিয়ে তুললাম। খানিকটা রোদ লেগে বীজাণুমুক্ত আর সিধে করার জন্য তক্তাগুলো সব ঘাসের উপর বিছিয়ে দেওয়া গেল। গাড়ি ঠেলে বনের পথ দিয়ে চলেছি, ভোরের থ্রাশ পাখির কলতান অভিনন্দন জানাল। পৌঁছতেই প্যাট্রিক নামে এক ছোকরা চুপি চুপি আমাকে জানিয়ে দিলে, ঐ যে পাশে থাকে আইরিশ সীলি. গাড়ি বোঝাই করার ফাঁকে ফাঁকে এসে সব ব্যবহারযোগ্য পেরেক, স্টেপল, গজাল পকেটজাত করে নিয়ে গেছে। অতঃপর যখন দিনের বাকি সময়টা কাটাতে ফিরলাম, তখন নতুন কিছু পায় কি না দেখতে ঠিক এসে দাঁড়াল লোকটা; বললে, কাজকর্ম মেলে না। একেবারে কিছু জানে না যেন, মনে কোন গ্লানি নেই, শুধু ধ্বংসমেধ দেখতে চায়। যেন দর্শক সম্প্রদায়ের সে প্রতিনিধি মাত্র, বাহ্যত সামান্য এই ঘটনাকে ট্রয়ের দেবমূর্তি স্থানান্তর করার সঙ্গে এক পর্যায়ভুক্ত করে তুলবার সাহায্যে লাগতে চায়।

দক্ষিণে ঢালু একটা পাহাড়ের ধারে ছয় ফুট লম্বায় ও চওড়ায় আর সাতফুট গভীর করে আমার সেলারটা খুঁড়ে নিলাম। একটা উডচাক সেখানে সুমাক আর ব্ল্যাকবেরির শিকড়, উদ্ভিদের সর্বশেষ চিহ্ন অতিক্রম করে আগে গর্ত খুঁড়েছিল। সুন্দর বালিমাটি, যত শীত হ'ক, ঠান্ডা লেগে আলু নষ্ট হবে না। আশপাশে প্রস্তর-গাঁথুনি না দিয়ে এমনি রেখে দিলাম। সূর্য-তাপ না লাগায় সেখানে বালি স্থানচ্যুত হয় না। কাজটাতে লাগল মাত্র দুঘন্টা। এই মাটি খোঁড়ার কাজটায় বিশেষ আনন্দ বোধ করতাম। প্রায় সব ভূ-বৃত্তেই তাপ-সাম্যের উদ্দেশ্যে মানুষ মাটির নিচে গর্ত খোঁড়ে। শহরের সর্বোৎকৃষ্ট বাড়ির তলায় ভূ-গর্ভে এখনও প্রাচীন কালের মতোই ভক্ষ্যমূল সঞ্চয় করে রাখার সেলার দেখা যাবে। এর উপরকার বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার বহু পরেও পরবর্তী যুগের লোকেরা ভূনিম্নে এর খাঁজের খোঁজ পাবে। আজ পর্যন্ত বাড়িঘর শুধু বিবর-প্রবেশে ছাদ-ওয়ালা ফটক বিশেষ।

অবশেষে মে মাসের প্রথম দিকে জনকয়েক পরিচিত ব্যক্তির সহায়তায় আমি আমার আস্তানার কাঠামটা খাড়া করে তুললাম। সৌহার্দ্যের সম্পর্ক দৃঢ়মূল করার এমন সুযোগ হেলা না করবার জন্যই, প্রয়োজন ততটা ছিল না। চরিত্রগুণে আমার সহকারীরা এমন যে সহকারী-গর্বে গৌরবান্বিত বোধ

করার এত সুযোগ কারও কোনদিন হয় নি। একদিন যে ভবিষ্যতে তাঁরা উৎকৃষ্টতর সংগঠন উন্নয়নের সহায়তায় লাগবেন এই আমার বিশ্বাস। তক্তা আর ছাদ খাটানো হবার পরই ৪ঠা জুলাই থেকে বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করলাম। তক্তাগুলোর সংযোগস্থল পাখির পালক দিয়ে সযত্নে আবৃত করায় বাড়িটা বৃষ্টির জলের পক্ষে দুর্ভেদ্য হ'ল। তক্তা খাটানোর আগেই অবশ্য আমি হ্রদ থেকে দুহাতে বয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে দুই গাড়ি পরিমাণ পাথর এনে একদিকে চিমনির ভিত গেড়েছিলাম। মাঠে নিড়ানির কাজটা শেষ করে হেমন্তে আগুনের দরকার বোধ হবার আগেই চিমনিটা তুলে ফেললাম। ইতিমধ্যে খুব সকাল থাকতেই বাইরে খোলা জায়গায় রান্নাটাও সেরে নিতাম। সাধারণত যে ভাবে কাজ করা হয়, তার তুলনায় এই পদ্ধতিটা কোন কোন হিসাবে সুবিধা আর আনন্দজনক বলেই আজও আমার ধারণা। আমার রুটি তৈরি শেষ হবার আগেই ঝড় উঠত যে দিন, কয়েকটা তক্তা খাড়া করে দিতাম আগুনের উপরে। তার নিচে বসে রুটি পাহারা দিতে দিতে কয়েক ঘন্টা আরামে কাটিয়ে দেওয়া যেত। এই সময়টা কাজের চাপে পড়াশোনা হ'ত না বললেই চলে। কিন্তু মাটিতে হয়তো পড়ে আছে এক টুকরো কাগজ, মুঠোতে ধরে আছি কিছু, টেবিল ঢাকা কাপড়টা, এতেই ইলিয়াড পড়ার তুল্য আনন্দ লাভ করতাম। বাস্তবিক পক্ষে যে উদ্দেশ্যে ইলিয়াড পড়া, তা পূরণ হ'ত।

যতখানি বিচার-বিবেচনা করে গৃহপ্রতিষ্ঠায় আমি অগ্রসর হয়েছিলাম, তদপেক্ষা অধিক বিচার-বিবেচনা করে, যথা কোন্ মানুষের প্রকৃতিতে দরজা, জানালা, সেলার কি চিলেকোঠা, কার কতটা ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই সব বিচার করে কাজ করায় সার্থকতা আছে। হয়তো বা নিতান্ত পার্থিব প্রয়োজন ছাড়া উৎকৃষ্টতর কোন যুক্তি না থাকলে উপরকার গাঁথুনি তোলাই উচিত নয়। মানুষের নিজের বাড়ি নিজে, আর পাখির নিজের নীড় নিজে নির্মাণ, সমীচীনতার হিসাবে, দুইই প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। মানুষ যদি স্বহস্তে স্বগৃহ নির্মাণ করত, আর নিজের, তথা নিজের পরিবারবর্গের জন্য সরল পথে সদুপায়ে খাদ্য সংস্থান করত, তবে কবিত্ব-শক্তির সার্বজনীন উন্মেষ দেখা যেত কি না কে জানে, সব পাখিই তো সর্বত্র এই কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের আচরণ কাউবার্ড পাখি আর কোকিলের মতো। অপর পাখির তৈরি নীড়ে তারা ডিম পেড়ে রাখে, বেসুরো লাগে তাদের কিচিরমিচির, পথিককে আনন্দ দিতে পারে না। এই যে গড়ে তোলার আনন্দ, চিরকাল ধরে তা ছুতোর মিস্ত্রির জন্যই তোলা থাকবে? জনগণের মনে স্থাপত্য শিল্পের মূল্য কি? ভ্রমণ কালে কোনদিন কোন ব্যক্তিকে স্বগৃহ স্বহস্তে নির্মাণ করার সহজ স্বাভাবিক কর্মে নিযুক্ত

দেখি নে। আমরা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কেবল দর্জি তো মানুষের নয় ভাগের এক ভাগ নয়, পুরোহিত আছে, ব্যাপারি আছে, চাষী আছে। এহেন শ্রমবিভাগের পরিণতি কোথায়? আর শেষ পর্যন্ত কি উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে এতে? অপর কেউ আমার হয়ে চিন্তাটাও করে দিতে পারে ঠিকই। কিন্তু তাই বলে আমার নিজের ভাবনা নিজে ভাবলাম না, অপর কেউ সেটা করে দিল, এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ দেশে তথাকথিত সব স্থপতি আছেন সত্য। অন্তত এক ব্যক্তির কথা শুনেছি যিনি স্থাপত্যশ্রীকে সত্য, অর্থাৎ উপযোগিতা সুতরাং সৌন্দর্য-কেন্দ্রিক করবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, যেন প্রত্যাদেশ লাভ করেছেন। তাঁর দিক থেকে দেখতে গেলে, হয়তো ভালই, কিন্তু সাধারণ শৌখীন শিল্পানুরাগের চাইতে একটু ভাল মাত্র। স্থাপত্যশিল্পের সংস্কার তাঁর বিলাস, তাই ভিত্তি থেকে কাজ আরম্ভ না করে, করেছেন কার্নিশ থেকে। এ যেন অলংকারের ভিতরে সত্যের পুর দেবার উপায় সন্ধান। অধিবাসী যিনি, ভিতরে যিনি থাকবেন, অলংকরণ অগ্রাহ্য করে ভিতর-বাহির সমস্তটা তিনি গঠন করে নিন, এ তা নয়। আসলে চিনির ডেলা, কিন্তু ভিতরে বাদাম কি যমানিকা বীজ। আমার মতে কিন্তু চিনিহীন হলেই বাদাম সর্বাপেক্ষা পুষ্টিকর। অলংকরণ বহিরাবরণ মাত্র, কেবল চর্মাবরণ—ব্রডওয়েবাসীদের পক্ষে ট্রিনিটি চার্চ লাভ যেমন ঠিকাদারি মাত্র, কচ্ছপের চিত্রবিচিত্র খোলস আর খোলক মৎস্যের মুক্তা-সদৃশ বর্ণও তাই, এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কবে কল্পনা করতে পেরেছেন? কচ্ছপের সঙ্গে তার খোলসের যে সম্বন্ধ, মানুষের নিজের সঙ্গে তার আবাসের স্থাপত্য-কারুর সম্বন্ধ তদপেক্ষা অধিক নয়। সৈনিকের পক্ষেও তার ঝাণ্ডায় বীরধর্মের বর্ণলেপ নিরর্থক। শত্রু ঠিক সেটা ধরে ফেলবে। পরীক্ষাকালে ভয়ে বিবর্ণ হওয়া তার পক্ষে বিচিত্র নয়। মনে হয় যেন কার্নিশের উপর ঝুঁকে পড়ে এই স্থপতি তাঁর অর্ধ-সত্য ষণ্ডামার্কা গৃহাধিবাসীদের ভয়ে ভয়ে বলে চলেছেন। তাঁর তুলনায় এ বিষয়ে তারা বেশি জানে। স্থাপত্যের যে সৌন্দর্য আমি আজ দেখে থাকি, আমি জানি তা অন্তর্চেতনা থেকেই ক্রমে ক্রমে তার বাহ্যরূপ লাভ করেছে, অধিবাসীর প্রয়োজন-বোধ থেকে, স্বভাব থেকে, সেই তো একমাত্র নির্মাতা—সত্য ও মহত্ত্ব থেকে অজ্ঞাতসারে, বাইরের রূপ সম্বন্ধে কোন খেয়ালই না করে—আর এও জানি এই ধরনের অভিনব সৌন্দর্যের যে আবির্ভাব ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, জীবনে অনুরূপ কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্যচেতনায় তার পূর্বাভাস সূচিত হবে। দীন দরিদ্রদের সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন কাঠরা আর কুটিরই যে সাধারণত এ দেশের সর্বাপেক্ষা মনোরম বাসস্থল, চিত্রশিল্পী জানেন একথা। কেবল মাত্র বাইরের কোন বিশেষত্ব নয়, অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট বহিরাবরণ সেগুলো, তাই তারা চিত্রাত্মক। যেদিন শহরবাসীদের জীবনযাত্রার ধারা সহজ-সরল আর মনোহারী হবে, তাদের বাসস্থানের ঠাটে চটকদারি দেখাবার প্রয়াস থাকবে না, সেদিন তাদের শহরতলীর কোটরও সমান মনোহর হয়ে উঠবে। স্থাপত্যশিল্পের এই যে সাজসজ্জা, এর অধিকাংশই অন্তঃসারশূন্য, আশ্বিনে ঝড়ের মুখে পড়লে ধার করা ময়ূরপুচ্ছের মতোই উড়ে যাবে, সারের কিছুমাত্র হানি হবে না তাতে। সেলারে রাখতে যাদের সুরা নেই, অলিভ ফল নেই, স্থাপত্য শিল্পেরও দরকার নেই তাদের। বহিরঙ্গের কারুকার্য নিয়ে এত মাথা ঘামাতে গেলে সাহিত্য কি হ'ত? আমাদের চার্চ-সৌধের কার্নিশ নিয়ে স্থপতিরা যে সময় ব্যয় করেন, বাইবেলের রচয়িতারা রচনার বাহ্যাড়ম্বর নিয়ে যদি তাই করতে যেতেন তবে কি হ'ত? এই তো রম্য রচনা আর রম্য কলার তথা উভয়ের অধ্যাপকদের জন্মকথা। গোটা-কয়েক লাঠি কাত করে উপরে না নিচে খাড়া করা হবে, বাক্স-প্যাঁটরায় কোন রঙের পোঁচ লাগবে,—মানুষের কি সত্যই এসবে কিছু এসে যায়? তাও যদি কেউ নিজে অন্তর থেকে লাঠিগুলো কাত করত কি বাক্স-প্যাঁটরায় পোঁচ লাগাত, তবু না হয় বলতে থাকত। কিন্তু অধিবাসীর অন্তরাত্মার যখন দেখা মেলে না, গৃহনির্মাণ তখন শবাধার নির্মাণ তুল্য হয়, কারুকার্য সমাধির কারুকার্য সদৃশ হয়। ঘরামি কফিন-নির্মাতা হয়ে ওঠে। আবার এমনও কেউ আছেন, হতাশা কি জীবনে বিতৃষ্ণা থেকে তিনি বলবেন পায়ের তলার কাদা নাও একতাল, বাড়িতে রঙ লাগাও ঐ থেকে। বাজি রেখে বলা চলে, জীবনান্তে শেষ সংকীর্ণ শয্যার কথা ভাবছেন তিনি। কি প্রচুর সময় তাঁর হাতে। একতাল কাদা নেবে কেন? তার চেয়ে নিজের গায়ের রঙে বাড়ির রঙ কর। যাতে নিজের ভয় নিজের লজ্জা ফুটে ওঠে তার মধ্যে। আবার দেখি, কুটির-স্থাপত্য-কারু-রীতি-উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠান! আমার মনোমত অলংকার তৈরি করতে পার যদি, তখন পরা যাবে।

শীত পড়ার আগেই চিমনিটা খাড়া করে ফেলা গেল। দেওয়ালগুলো বৃষ্টির পক্ষে দুর্ভেদ্য ছিল, তবু আরও তক্তা জুড়ে দিলাম। একেবারে কাঁচা গাছফাড়া কাঠ, স্যাঁতা স্যাঁতা, চিলতে চিলতে হ'ল জুতসই হ'ল না ঠিক। র‍্যাঁদা ঘষে সমান করে নিতে হ'ল।

এই করে বাড়ি হ'ল আমার। আঁট-সাঁট; পাতলা তক্তার উপর পলেস্তারার কাজ, দশ ফুট চওড়া পনের ফুট লম্বা, আট আট ফুট খুঁটি, একটা চিলে কোঠা, একটা ছোট কুঠুরি, দুই দিকে দুটো বড় জানালা, দুটো চাপ-দরজা, আবার একপ্রান্তে বড় দরজা একটা, তার বিপরীত দিকে ইটের আগুন পোহাবার জায়গা, ফায়ারপ্লেস। যেসব মাল-মশলায় কাজ সারি তাদের বাজার দর হিসাবে—আমার নিজের কাজের মূল্য অবশ্য ধরছি নে—আমার বাড়ি

তৈরি করতে মোট খরচা যা পড়েছিল নিচে দিচ্ছি। খুব কম লোকই ঠিকঠাক বলতে পারবেন তাঁদের বাড়ি তৈরি করতে কি খরচা পড়েছিল, আর মালপত্র যা লাগে আলাদা করে তাদের দাম কি পড়ে, সে সম্বন্ধে আরও কম লোক বলতে পারবেন। তাই সব খুঁটিনাটি উল্লেখ করেছি।

তক্তা	..	৮·০৩ই ডলার	..খুপরির তক্তা বেশির ভাগ।
পুরানো পাতলা তক্তা (ছাদ আর দেয়ালের জন্য)		৪·০০	"
বাখারি	..	১·২৫	"
পুরনো জানালা দুটো, কাচ সমেত		২·৪৩	"
পুরনো ইট, এক হাজার	..	৪·০০	"
চুন দু'বস্তা	.. ..	২·৪০	"..দাম বেশি পড়ে
রোম	.. ..	০·৩১	"..দরকারের চাইতে বেশি
লোহার শিক	.. ..	০·১৫	"
পেরেক	.. ..	৩·৯০	"
কব্জা আর স্ক্রু	.. ..	০·১৪	"
ছিটকিনি	.. ..	০·১০	"
খড়িমাটি	.. ..	০·০১	" বেশির ভাগ নিজের
পরিবহণ	.. ..	১·৪০	" পিঠে বয়ে আনি
মোট	..	২৮·১২ই ডলার	

মোট মাট এই মালমশলা লাগে। এ ছাড়া জবর-দখল বাবদ কাঠ, পাথর, বালির মালিকানা পেয়েছিলাম। যে মাল বাঁচে বাড়ি তৈরির পর, তাই থেকে ছোট একটা কাঠের ছাউনিও হয়।

খেয়াল যদি যায়, তবে এবাড়ি করতে যা খরচ হয়েছিল তার চাইতে একটুও বেশি খরচা না করে কনকর্ডের বড় রাস্তার যে কোন বাড়িকে জাঁক-জমকে ও সাজসজ্জায় হারিয়ে দেবে, এমন একটা বাড়ি বানাতে ইচ্ছা আছে আমার।

এই থেকে বুঝতে পারি যে, কোন শিক্ষার্থীর যদি তেমন ইচ্ছা থাকে, তবে ভাড়া বাবদ বাৎসরিক এখন তার যে খরচা হয়, সেই খরচা করেই সে আজীবনের মতো মাথা গুঁজবার ঠাঁই একটা জুটিয়ে নিতে পারে। কারও যদি মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি রকমের বড়াই করা হচ্ছে, আমার কৈফিয়ত এই যে নিজের জন্য নয়, বড়াইটা মানুষের উপকারার্থেই। আমার ত্রুটি-অসামঞ্জস্য আছে, কিন্তু তাই বলে আমার বক্তব্যের সত্যতা কমে না। অনেক ফাঁকি, ভণ্ডামি আছে আমার, গম থেকে ভুষি আলাদা করা কঠিন। এ সবের জন্য অন্য পাঁচজনের মতো কষ্টও বোধ করি। কিন্তু সব সত্ত্বেও এই বিষয়ে

পুরোদমে বুক ফুলিয়ে গর্ব করব। করলে দেহ-মনের গ্লানি দূর হবে। আর আমার দৃঢ় পণ, সত্যের পক্ষ সর্বদা সমর্থন করব, বিনয় প্রদর্শন করতে গিয়ে অসত্যের পক্ষ সমর্থন করব না। এক ছাদের তলায় পাশাপাশি বত্রিশটি ঘর তৈরি করবার সুযোগ সত্ত্বেও কেম্ব্রিজ কলেজের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কাছ থেকে আমার ঘরটার চাইতে সামান্য একটু বড় ঘরের বাৎসরিক শুধু ভাড়াই আদায় করেন ত্রিশ ডলার। উপরন্তু পাশাপাশি অনেকে থাকবার অসুবিধা, গোলমাল ভোগ করতেও হয় সে ঘরে, আর ঘরটা পাঁচতলাতেও হ'তে পারে। এই সব বিষয়ে প্রকৃত পরিণামদর্শিতা আমাদের থাকলে, বিদ্যার্জন এমনিতেই বেশি হ'ত, এত বিদ্যালাভের দরকারও হ'ত না, একথা আমি না ভেবে থাকতে পারি নে; সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষালাভের আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণও অনেক হ্রাস পেত। কেম্ব্রিজে কি যেখানেই হ'ক, শিক্ষার্থীদের পক্ষে যে-সব সুখ-সুবিধার দরকার এবং সেজন্য তার কিংবা অপরের যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, দু পক্ষের ব্যবস্থা সুপরিচালিত হ'লে যা হ'ত তদপেক্ষা তা দশগুণ অধিক। যে-সব জিনিষের জন্য বেশি পরিমাণ টাকা দাবি করা হয়, ছাত্রের কিন্তু সে সবে দরকার বেশি নয়। যথা, বৎসরের একটা মোটা খরচা হয় লেখাপড়া শেখানোর খাতে, কিন্তু বেশি কাজে লাগে যে শিক্ষা, বিদগ্ধ সতীর্থদের সঙ্গে মেলামেশা করে যা লাভ হয়, সে খাতে কোন খরচা দাবি করা হয় না। কোন কলেজ প্রতিষ্ঠার মামুলী কার্যসূচি হচ্ছে, কিছু টাকা-পয়সা চাঁদা সংগ্রহ করা এবং অতঃপর শ্রম-বিভাগ পন্থার যতদূর সম্ভব অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলা। অথচ এ পন্থার অনুসরণ অতি সাবধানে পা টিপে টিপে ছাড়া করা উচিত নয়। ফলে আসেন ঠিকাদার। তাঁর কাছে এটা শুধু লাভ-লোকসানেরই ব্যাপার। তিনি জন-কয়েক আইরিশ কি অপর জাতীয় মিস্ত্রি-মজুর ভিত্তি প্রতিষ্ঠার কাজে বহাল করেন। অথচ ভবিষ্যৎ ছাত্রদের যে এই কাজের পক্ষেই উপযোগী করা হবে, এটা প্রচার করা হ'ল। অতএব বংশানুক্রমে এই ত্রুটির ঋণশোধ চলতে থাকল। আমি মনে করি, ছাত্রেরা এবং অন্যান্য সুযোগগ্রহণেচ্ছুরা নিজেরাই ভিত্তিস্থাপনের কাজটা করলে, সে ব্যবস্থায় তাদের পক্ষে অন্তত এর চাইতে ভাল হ'ত। মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক যে পরিশ্রম সংকল্প করে সেটা এড়িয়ে গিয়ে শিক্ষার্থী যে অভীপ্সিত অবসর আর বিশ্রাম ভোগ করে, তার ফলে অবসর থেকে ইষ্টলাভের উপযোগী যে-অভিজ্ঞতা জীবনে একান্ত প্রয়োজন, তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে এবং অবসরকে অনিষ্টজনক এবং নিকৃষ্টজনোচিত করে তোলে। কেউ হয়তো বলবেন, "কিন্তু ছাত্রেরা মস্তিষ্কের কাজ না করে হাতে কাজ করুক, আপনি নিশ্চয়ই তা চান না?" আমি ঠিক তা চাই নে নিশ্চয়ই কিন্তু আমার কথার অর্থ সে হয়তো প্রায় তাই করে তুলবে। আমি চাই যে

দেশ যখন এই ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থার দায় বহন করছে, তখন তারা যেন জীবনটাকে খেলা বা কেবল পড়াশোনার ব্যাপার না ভেবে সাধনা ভাবে, জীবন যাপন যেন তাদের আদ্যোপান্ত ঐকান্তিক হয়। জীবনযাপন পরীক্ষায় সোজাসুজি দীক্ষালাভ অপেক্ষা তরুণের পক্ষে উৎকৃষ্ট শিক্ষা আর কি হতে পারে? আমার মনে হয়, এই অনুশীলন শিক্ষার্থীর মনের পক্ষে গণিত অনুশীলনেরই তুল্যমূল্য। ধরুন যথা, আমি যদি এই কামনা করি, কোন বালক কলা তথা বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করুক, তবে প্রচলিত পন্থার অনুসরণ করব না। অর্থাৎ কোন অধ্যাপকের সান্নিধ্যে প্রেরণ করব না তাকে—জীবনরূপ কলাবিদ্যা ছাড়া আর সব কিছুর অধ্যাপনা আর অভ্যাস শিক্ষা হয় সেখানে; দূরবীক্ষণ কি অণুবীক্ষণ সাহায্যে বিশ্ব-পর্যবেক্ষণ শিক্ষা হয়, কিন্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ শিক্ষা হয় না; রসায়ন পাঠ হয়, কিন্তু কি ভাবে আহার্য প্রস্তুত হয়, সে শিক্ষা হয় না; যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা হয়, কিন্তু জীবিকার্জন কি ভাবে হয় সে শিক্ষা হয় না; নেপচুন গ্রহের উপগ্রহ আবিষ্কার হয়, কিন্তু নিজের চোখে ধূলিকণা পড়লে তার সন্ধানলাভের শিক্ষা হয় না, কিংবা কোন কক্ষহীনের সে উপগ্রহ সে শিক্ষা হয় না; এক ফোঁটা ভিনিগারে কোন জীবাণু আছে তার গবেষণা শিক্ষা হয়, কিন্তু তার পরিবেশে কোন সব জীব তার সর্বনাশ সাধন করছে, সে শিক্ষা হয় না। মাসান্তে কে বেশি উন্নতি দেখাবে? যে ছেলে খনি খুঁড়ে ধাতু নিষ্কাশন করে তা গলিয়ে তার সর্ব কার্যে উপযোগী বড় ছুরি তৈরি করল আর এই কাজ করার পক্ষে যেটুকু পড়ার দরকার, সেটুকু পড়ে নিল, সে? না যে ছেলে এই সময়ে ইনস্টিট্যুটে ধাতুবিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা শুনল, কিন্তু বাপের কাছ থেকে রজার্সের তৈরি পেনসিলকাটা ছুরি নিয়ে তার কাজ চালালে, সে? ছুরিতে আঙুল কেটে ফেলবার সম্ভাবনা কার পক্ষে বেশি?.. আমার কলেজ ছাড়ার সময় আমি শুনে অবাক হই যে, আমি না কি পোত-চালনা শাস্ত্র পাঠ করেছি!—কিন্তু যে কোন বন্দরে এক দফা ঘুরে আসতে পারলে আমার সে বিষয়ে ঢের বেশি জ্ঞান লাভ হ'ত। এমন কি দরিদ্র ছাত্রও অর্থশাস্ত্র পাঠ করছে, তাকে এ বিষয়ে শিক্ষাদানও করা হচ্ছে। অথচ দর্শন-বিদ্যার সমার্থবোধক যে শাস্ত্র, সেই জীবন নির্বাহের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপনায় মনোযোগ দেওয়া হয় না আমাদের কলেজে। ফলে, সে যখন অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, সে-র অর্থশাস্ত্র পাঠ করছে, তখন তার পিতাকে চিরকালের জন্য ঋণজালে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে।

আমাদের কলেজগুলোর যে অবস্থা, আধুনিক যুগের শত শত উন্নতির ব্যাপারেও ঠিক তাই। মিথ্যার মোহ মাত্র, সত্য সত্য অগ্রগতি নয় সর্বদা। তার প্রথম তথা পরবর্তী বহুবিধ লগ্নি বাবদ শয়তান কড়াক্রান্তিতে সুদ আদায় করে চলেছে চক্রবৃদ্ধি হারে। রঙচঙে খেলনার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে

আমাদের সব উদ্ভাবন, গুরুতর বিষয়ে মনঃসংযোগে বাধা সৃষ্টি করে। অনুন্নত লক্ষ্যে পৌঁছাবার উন্নত পন্থা মাত্র। এমন লক্ষ্য যেখানে অতি সহজে উপনীত হওয়া চলে, যেমন রেলরাস্তা ধরে বস্টন কি নিউ ইয়র্কে গিয়ে ওঠা যায়। ম্যেন থেকে টেক্সাস পর্যন্ত চৌম্বক টেলিগ্রাফ বসাবার জন্য আমরা ব্যস্ত। কিন্তু ম্যেন কি টেক্সাস থেকে কারও পাঠাবার মতো কোন খবর নাও তো থাকতে পারে। শহর দুটোর অবস্থা অনেকটা সেই ভদ্রলোকের মতো সংকটজনক, যিনি কোন যশস্বিনী বধির মহিলার সঙ্গে পরিচিত হ'তে উদ্‌গ্রীব ছিলেন, কিন্তু পরিচয় করিয়ে তাঁর শ্রবণযন্ত্রের একটা মুখ যখন হাতে তুলে দেওয়া হ'ল, তাতে বলবার মতো কথা খুঁজে পেলেন না। মুখরতাই যেন মুখ্য লক্ষ্য, সুবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া নয়। কয়েক সপ্তাহ সময় সংক্ষেপ করতে আমরা আটলাণ্টিকের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে নতুন আর পুরাতন পৃথিবীকে নিকটতর করতে মহাব্যস্ত। কিন্তু সেই পথে যে সংবাদ মার্কিন জাতির উৎকর্ণ শ্রবণরন্ধ্রে এসে প্রথম বাজবে তা হয়তো এই যে, রাজকুমারী অ্যাডিলেডের হুপিংকাসি হয়েছে। কোন লোক ঘোড়া ছুটিয়ে মিনিটে মাইল কাবার করতে পারলেই যে সে বিশেষ খবর আনবে তা নয়, পঙ্গপাল আর মধু খেয়ে পথ-চলা বাইবেলের দেবদূত হয়েও কিছু ওঠে না সে। রেসের ঘোড়া ফ্লাইং চাইলডার্স একমুঠো ধান কোন দিন ধান-মাড়াই কলে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে কি না সন্দেহ।

কোন ব্যক্তি আমাকে বলছিলেন, "কেন যে অর্থ সঞ্চয় কর না তুমি জানি না। দেশ ভ্রমণ করতে ভাল লাগে তোমার, গাড়িতে চাপলে আজই ফিচবার্গ চলে যেতে পার, দেশটা দেখা হয় তোমার।" কিন্তু আমি যে বেশি বুদ্ধি রাখি এ বিষয়ে। এ জ্ঞান আমার হয়েছে যে, সবার আগে যায় সেই, চরণজুড়ি চড়ে যেই। বন্ধুকে বললাম, এস পাল্লা দেওয়া যাক কে আগে সেখানে পৌঁছাতে পারে। মাইল ত্রিশেক পথ, ভাড়া নব্বইটি সেণ্ট। অর্থাৎ প্রায় পুরো একদিনের রোজগার। আমার মনে আছে, সেদিনও এই রাস্তায় মজুরদের দিনমজুরি ছিল ষাট সেণ্ট। দেখ, আমি যদি এক্ষুনি পদব্রজে যাত্রা সুরু করি, রাত হবার আগেই পৌঁছে যাব সেখানে। হপ্তার পর হপ্তা এই হারে হাঁটার অভ্যাস আছে আমার। আর এই সময়ের মধ্যে তোমাকে ভাড়ার টাকাটা রোজগার করতে হবে, আর সেখানে গিয়ে উঠছ আগামী কাল যখনই হ'ক, কিংবা বড়জোর আজ সন্ধ্যায়, তাও যদি কপালগুণে সময়মতো একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পার। সুতরাং ফিচবার্গ না গিয়ে আজ প্রায় পুরো বেলাটাই তোমাকে এখানে মেহনত করতে হচ্ছে। অর্থাৎ, রেলে চেপে সারাটা পৃথিবী ঘুরে এলেও, সব সময়েই আমি তোমাকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি। আর দেশ

দেখা কি ঐ রকম কোন অভিজ্ঞতালাভের কথা যদি তোল, আমাকে তোমার সঙ্গে পরিচয়ই একেবারে নাকচ করে দিতে হবে।

বিশ্বসৃষ্টির বিধানই এই, মানুষ বুদ্ধিতে তার নাগাল পায় না। আর রেলপথ সম্বন্ধেও কথা এই যে, যত লম্বাই হ'ক বহরও ঠিক তত তার। পৃথিবী জুড়ে রেল পেতে সমস্ত মানুষের নাগালে রেলগাড়ি আনতে গেলে এ গ্রহের সর্বত্রই মাপজোক করতে হয়। লোকে কেমন ভাসাভাসা ধারণা করে নিয়েছে যে বেশ কিছু দিন যৌথ কারবার আর গাঁইতি চালিয়ে যেতে পারলেই সবাই মিলে অনতিবিলম্বে এবং বিনামূল্যে কোথাও না কোথাও গিয়ে উঠবেই। ভিড় করে সবাই ছুটছে স্টেশনে, কন্ডাক্টর হাঁকছে, বলছে "উঠে পড়", তারপর যেই ধোঁয়া মিলিয়ে যায়, বাষ্প ভারি হয়, দেখা যায় গাড়িতে উঠেছে মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোক, বাকি সবাই পড়েছে গাড়ি চাপা। জানানো হচ্ছে "করুণ দুর্ঘটনা", বটেও তাই। শেষ পর্যন্ত বেঁচে বর্তে থেকে ভাড়ার সংস্থান যাদের হ'ল, গাড়িতে চড়তে হয়তো পারে তারা, কিন্তু ততদিনে তাদের দৌড়ঝাঁপ করার শক্তি লোপ পায়, এদেশ ওদেশ করার ইচ্ছাও থাকে না আর। জীবনের মূল্য যখন সব চেয়ে কম, সেই সময় অনিশ্চিত রকমের কোন স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সেই ইংরেজের কথা মনে পড়ছে, যিনি টাকাকড়ি জমিয়ে ফিরে এসে ইংলণ্ডে কবির জীবন যাপন করবেন, এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন। সোজাসুজি চিলেকোঠায় গিয়ে উঠলেই ঠিক করতেন তিনি। কিন্তু দেশময় যেখানে যত গুমটি-ঘর আছে, সবগুলো থেকে দশলক্ষ আইরিশম্যান চমকে উঠে বলে বসবেন, "কি! এই যে রেলপথ গড়লাম আমরা, ভাল নয় জিনিসটা?" আমার উত্তর, মন্দের ভাল, অর্থাৎ এর চাইতেও খারাপ কিছু করতেও তো পারতে। কিন্তু বলতে ইচ্ছা করে, তোমরা যখন আমার ভাই, তখন এই জঞ্জাল না খুঁড়ে, সৎকাজে ব্যয় করলেই পারতে সময়টা।

আমার বাড়িটা তখনও শেষ হ'তে বাকি, হিসাবের বাইরে গোটা কয়েক খরচ মেটাবার জন্য ইচ্ছা হ'ল, পছন্দসই কোন সদুপায়ে দশ বারো ডলার রোজগার করি। কাছাকাছি আড়াই-একরটাক চাষযোগ্য বালুজমির বেশিটায় বিন লাগিয়ে দিলাম, বাকিটায় আলু, ভুট্টা, মটরশুঁটি আর শালগম লাগালাম। গোটা জমিটা এগার একর হবে, বেশির ভাগটা পাইন আর হিকোরি গাছের রাজ্য। গত বৎসর একর পিছু আট ডলার আট সেন্টে বেচে দেওয়া হয়। জনৈক চাষী বললেন, জমিটা একেবারে অকেজো, কেবল কিচিরমিচির করা কাঠবিড়ালেরই চাষ চলে।" আমি মালিক নই শুধু জবরদখলকার। তাই কোন রকম সার দিই নি জমিটায়। এতটা জমি আবার চাষ করব প্রত্যাশাও করি নি, তাই সবটার একেবারে আগাছা সাফ করাও হয় নি। লাঙল চালাতে

কতকগুলো গাছের গোড়া উপড়ে বার হয়ে পড়ে, অনেক দিন ধরে সেগুলোয় আমার জ্বালানি কাঠের কাজ চলে যায়। ফলে, জায়গায় জায়গায় অনাবাদী জমি খানিকটা খানিকটা পাওয়া যায়, বিনগাছের বাড়ের দরুণ সেগুলো বেশি করে চোখে পড়ত। অবশিষ্ট জ্বালানি সরবরাহ করে আমার আস্তানার পিছনের মরা, বেশির ভাগ পণ্যের অযোগ্য, গাছ-গাছালি আর পুকুরের ভাসা কাঠকুটো। লাঙল চষার জন্য একজোড়া ঘোড়া আর একটা লোক ভাড়া করতে বাধ্য হয়েছিলাম, যদিও নিজের হাতেই লাঙল ধরতাম। প্রথম বৎসর যন্ত্রপাতি, বীজ আর অন্যান্য কাজ বাবদ আমায় চাষবাসের খরচা দাঁড়ায় ১৪·৭২½ ডলার। বীজ পেয়েছিলাম। এ বাবদ তেমন খরচা নাই, দরকারের বাড়া যদি চাষ না করা যায়। বারো পালি বিন পাই, আঠার পালি আলু, তা ছাড়া মটরশুঁটি আর কিছু মিঠা ভুট্টা। হলদে ভুট্টা আর শালগম হ'তে এত দেরি লাগায় যে, কোন কাজে আসে নি তারা। চাষবাস থেকে আমার মোট আয় দাঁড়ায়

	২৩·৪৪ ডলার
খরচা হয়	১৪·৭২½ "
হাতে থাকে	৮·৭১½ ডলার

এছাড়া কিছু ফসল খাওয়া হয় এবং হিসাবটার সময়ে হাতে যা ছিল, তার মূল্য ৪·৫০ ডলার—সুতরাং দাঁড়াচ্ছে, কিছুটা ঘাস অবশ্য চাষ করে পেতে হয় নি, তার মূল্য পুষিয়েও, হাতে যা ছিল তা বেশ বেশি। আমি মনে করি, সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে, ঐহিক এবং পারত্রিক মূল্যেও বিচার করতে হবে, পরীক্ষা অল্পসময়ব্যাপী হওয়া সত্ত্বেও—অংশত সেই ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যই আমার কাজ কনকর্ডে সে বছর যেকোন চাষীর কাজের তুলনায় ভালই হয়েছিল।

পরের বছর এর চাইতেও কাজ ভাল হয় আমার। কেন না যতটা জমি আমার দরকার, প্রায় একের-তিন একর হবে, তার সবটাই কোদাল কুপিয়ে বানিয়ে নিয়েছিলাম। দু'বছর হাতে কলমে কাজ করে এই অভিজ্ঞতা লাভ হয় যে, স্বহস্তে চাষকরা ফসল আহার করে কেউ যদি সাদাসিধা জীবন যাপনে রাজী থাকেন এবং যদি আহার্যের অতিরিক্ত এতটুকু ফসলও না ফলান, এবং যৎসামান্য বিলাসদ্রব্য বা ব্যয়বহুল সামগ্রীর জন্য সেই ফসল বিনিময় না করেন, তবে—চাষবাস সম্বন্ধে আর্থার ইয়াং ও অন্যান্য লোকের বহু নামকরা বইয়ের উল্লেখে ঘাবড়ে না গিয়ে বলছি, কয়েক রড মাত্র জমি চাষ করলেই তাঁর প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। সেই পরিমাণ জমি বলদ জুতে লাঙল না দিয়ে নিজের হাতে কোদাল চালিয়ে তৈরি করে নিলে খরচা কম পড়ে। আর যদি পুরনো জমিতে সার না দিয়ে মধ্যে জমি বদলে নতুন জমি বাছাই করে নেওয়া যায়, তা হলে ক্ষেতের জন্য যেটুকু কাজ দরকার, তা বলতে গেলে বাঁহাত

দিয়েই গ্রীষ্মকালে যখন তখন করে ফেলা যায়। এখন যেমন বলদ, ঘোড়া, গরু, শুয়োর সব লাগে, তখন কিছুরই মুখাপেক্ষী থাকতে হবে না। এ বিষয়ে আমি আমার যা বক্তব্য বর্তমান কালের আর্থিক কি সামাজিক ব্যবস্থা সফল হ'ক কি বিফল হ'ক, যে লোকের তাতে লাভ-লোকসান কিছুই নেই, তার মতো নিরপেক্ষ থেকেই বলতে চাই। কোন বাড়ি কি খামারে আমার নোঙর ফেলা ছিল না, কনকর্ডের যে-কোন চাষীর তুলনায় তাই মুক্ত ছিলাম। প্রত্যেক ব্যাপারে অতিমাত্রায় বক্র নিজস্ব স্বাভাবিক বুদ্ধির গতি অনুসরণ করে চলতে পারতাম। তা ছাড়া তাদের চাইতে আমার অবস্থা তো পূর্বাপর বেশি সচ্ছল ছিলই, উপরন্তু যদি আমার বাড়িটা পুড়ে যেত কি ক্ষেতে অজন্মা হ'ত, তথাপি আমার অবস্থা প্রায় পূর্বের মতোই সচ্ছল থাকত।

পশুরা মানুষের যতটা পালক, মানুষ পশুদের ততটা কি না, অনেক সময়েই ভাবি কথাটা। মানুষের তুলনায় এরা কত মুক্ত। মানুষে আর বলদে কাজের বিনিময় দেখা যায়। কিন্তু যদি শুধু প্রয়োজনীয় কাজের হিসাব করি, বলদেরই জিত বলে মনে হয়, তাদের কাজের ক্ষেত্র কত বড়। বিনিময় সূত্রে, মানুষের একটা কাজ বিচালি কেটে শুকিয়ে তোলা, করতে পুরো ছয়টি সপ্তাহ লাগে তার এবং সে কাজ ছেলেখেলা নয়। সর্বতোভাবে সরল জীবন যাপন করে চলেন এমন কোন জাতি, অর্থাৎ যে জাতির লোকেরা দার্শনিক, তাঁরা নিশ্চয়ই জীবজন্তুকে নিজেদের কাজে খাটাবার মতো বিষম ভ্রমে লিপ্ত হবেন না। অবশ্য সবাই দার্শনিক, এমন জাতি কোন দিন ছিল না, এবং অদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না। আর সে রকম কোন জাতি হওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধেও আমি নিঃসন্দিগ্ধ নই। কোন ঘোড়া কি ষাঁড়কে পোষ মানিয়ে দানাপানি খাইয়ে আমার হয়ে কোন কাজ করিয়ে নেব, আমি তো কখনও এমনটা হতে দিতে চাই নে। ভয় হয় পাছে আমি বিলকুল ঘোড়ার সহিস কি পশুপালক বনে যাই। আর এইরকম কাজ করে লোকসমাজ যদি ভাবতে চায় তারা লাভবান হচ্ছে, তবু একজনের যাতে লাভ অন্যের তাতে অনিষ্ট হচ্ছে না, সে বিষয়ে কি আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারি; না, আস্তাবলের সহিস আর তার মনিব, দুই জনেই একই কারণে সমান খুশি হ'তে পারে? ধরা গেল, জনহিতকর অনেক কাজই এদের সহায়তা ছাড়া খাড়া হ'ত না, আর ঘোড়া-বলদের সরিকানা হিস্যায় সে গৌরব না হয় মানুষ ভোগও করল, কিন্তু এ থেকে কি এই বুঝতে হবে যে মানুষ যোগ্যতর কাজ কিছু করতে পারত না? মানুষ যখন এদের সহায়তায় কেবল অনাবশ্যক বা আর্টিস্টিক, নয় বিলাস এবং আলসাজনক কাজে হস্তক্ষেপ করে, তখন জনকতক লোককে যে তার বদলে বলদের কাজ করতে হবে; ভাবান্তরে, তাদের শক্তের ভক্ত হতে হবে, এ তো অনিবার্য। মানুষকে তাহলে তার মধ্যে

যে পশু আছে কেবল তারই কাজ করতে হচ্ছে না, বাইরের পশুর হয়েও কাজ করতে হচ্ছে। আমাদের ইট-পাথরে গড়া অনেক বড় বড় বাড়ি রয়েছে বটে, কিন্তু আজও কৃষকের উন্নতির পরিমাপ করতে গেলে দেখা হয়, তার গোলাঘর বাড়িটাকে ছাড়িয়ে কতটা উঠল। বলা হয়ে থাকে, এ অঞ্চলে ঘোড়া গরু বলদের সর্ববৃহৎ আস্তাবল এই শহরেই এবং সরকারি বাড়ির ব্যাপারেও শহর পিছিয়ে নেই, কিন্তু সমগ্র জেলার মধ্যে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রার্থনামন্দির কি স্বাধীন মতামত ঘোষণার জন্য সভাগৃহ নেই বললেই হয়। সব দেশের লোকেরই চেষ্টা স্থাপত্যশিল্পের জোরেই নাম রেখে যাবে, কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্তাশক্তির জোরে না কেন? প্রাচ্যের তাবৎ প্রাচীন ভগ্ন-স্তূপ অপেক্ষা ভগবদ্গীতা কত অধিক গৌরবের! মিনার আর মন্দির রাজ-রাজড়ার বিলাস। সরল ও স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তি কোন রাজার হুকুম মেনে চলে না। নবাব-বাদশাদের হুকুমবরদার নয় প্রতিভা, নামমাত্র ছাড়া সোনারুপো মারবেল পাথরও লাগে না তার কাজে। বলি, হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে এত পাথর কুচো করে কি লাভ হচ্ছে? একদা যখন আর্কেডিয়ায় ছিলাম, কোন পাথর পেটানো দেখি নি সেখানে। হাতুড়ি-পেটা পাথর কারা কত রেখে যেতে পারে, তার জোরেই অমরত্ব পেতে হবে এমনি একটা উন্মাদ আকাঙ্ক্ষাই পেয়ে বসেছে সব জাতিকে। স্বভাব শোধন করতে, শোভন করে তুলতে এই কৃচ্ছ্রসাধন করলে হত না? বিন্দু পরিমাণ বোধি চন্দ্রচুম্বী স্মৃতিস্তম্ভ অপেক্ষা স্মরণীয় হ'তে পারে। পাথরকে যথাযোগ্য স্থানে দেখতেই ভাল লাগে আমার। থিব্‌স-রাজ্যের জাঁকজমক কুরুচির ঘটা। সহস্র-দ্বার থিব্‌স জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল, তার তুলনায় যেকোন সাধু ব্যক্তির ক্ষেত্রবেষ্টনীর সামান্য প্রস্তর প্রাচীরও অনেক সদ্‌বুদ্ধির পরিচায়ক। অত্যাশ্চর্য সব মন্দির নির্মাণ বর্বরসুলভ পৌত্তলিক ধর্ম আর সভ্যতার কাজ: প্রকৃত অর্থে যাকে খ্রীষ্ট ধর্ম বলা যায়, সে একাজ করে না। যত পাথর কুচি করে মরে কোন জাতি, তার বেশির ভাগ লাগে তার সমাধি নির্মাণ করতেই। সে জাতি জীবন্তেই নিজেদের কবরস্থ করে। পিরামিড দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, আশ্চর্য শুধু এই যে হামবড়া কোন হাঁদারামের সমাধি নির্মাণে জীবন কাটাতে পারে, এমন অধঃপতিত এতগুলো লোকও ছিল। বেকুবটাকে নীল নদীর জলে ডুবিয়ে মেরে তার দেহটা ডালকুত্তাদের দিয়ে দেওয়াই বুদ্ধির তথা পৌরুষের কাজ হ'ত। ঐ লোকগুলোর আর ঐ লোকটার কাজের একটা কৈফিয়তও খুঁজে পেতে বার করতে পারি হয় তো, কিন্তু আমার সময় নেই। এই সব সৌধকারদের ধর্ম আর শিল্পানুরাগ, সারা দুনিয়াতেই ও-ব্যাপারের একই হাল—তা সে সৌধটা মিশর দেশের মন্দিরই হ'ক, কি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্কই হ'ক। যা খাড়া হয়, তার চাইতে খরচা বেশি পড়ে। উৎসটা অতি দর্প—রসুন আর রুটি আর মাখনের

লোভে পুষ্ট। উদীয়মান তরুণ স্থপতি শ্রীব্যালকম ভিট্রুভিয়াস রচিত গ্রন্থের পৃষ্ঠায় শক্ত পেনসিল আর রবার দিয়ে পরিকল্পনা খাড়া করলেন একটা। কাজটার ঠিকা দেওয়া হ'ল প্রস্তর-কারু ডবসন এন্ড সন্‌সকে। ত্রিশটা শতাব্দীর কৃপাদৃষ্টি অতিবাহিত হবার পর মানুষ উপরে চেয়ে দেখতে আরম্ভ করল তাকে। আর তোমাদের উচু মিনার আর স্মৃতি-স্তম্ভের কথাই যদি তোল, মনে পড়ছে একদা এই শহরেই এক বায়ুগ্রস্ত লোক ছিল, সে পণ করেছিল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে চীন যাবে, আর সে যা বলে, গিয়েও ছিল এতটা দূর যে নাকি চীনাদের হাঁড়িকুড়ি, কেতলির ঠংঠং আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পেয়েছিল সে। কিন্তু তার কাজের তারিফ করতে গিয়ে নিজের কাজে কামাই দিই, এমন ইচ্ছা নেই আমার। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্ত্যের স্মৃতি-সৌধ নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামিয়ে থাকেন—কারা কোনটা নির্মাণ করে জানবার বাসনায়। আমার কিন্তু জানতে ইচ্ছা হয়, কারা সেকালে ঐ সব নির্মাণ করতে ছোটে নি, কারা এই সব তুচ্ছতার আওতার বাইরে ছিল। কিন্তু যে হিসাবের কথা হচ্ছিল, সেটা শেষ করি।

ইতিমধ্যে জরিপ করে, ছুতোরগিরি করে বা গ্রামে অন্যান্য নানারকম দিনমজুর খেটে—যতগুলো আঙুল ততগুলো কাজে দখল আছে আমার—১৩.৩৪ ডলার রোজগার করি আমি। জায়গাটাতে দুই বছরের বেশি সময় কাটাই। ৪ঠা জুলাই থেকে ১লা মার্চ—এই আট মাসের হিসাব ধরলে—আলু কিছু সব্জী, কিছু মটরশুটি চাষ করেছিলাম আর আখেরে আমার হাতে যা ছিল, বাদ দিয়ে আমার খাই-খরচ হয় :—

চাল	..	১·৭৩½ ডলার		
গুড়	..	১·৭৩ ”	..সব চাইতে সস্তা মিষ্টি	
জোয়ারের আটা	..	১·০৪¾ ”		
ভুট্টার আটা	..	০·৯৯¾ ”	জোয়ারের চাইতে সস্তা	
শুয়োরের মাংস	..	০·২২ ”		
ময়দা	..	০·৮৮ ”	অর্থ এবং পরিশ্রমে ভুট্টা অপেক্ষা বেশি খরচ	এগুলোর পরীক্ষা বিফল হয়
চিনি	..	০·৮০ ”		
শুয়োরের চর্বি	..	০·৬৫ ”		
আপেল	..	০·২৫ ”		
শুকনো আপেল	..	০·২২ ”		
মিঠা আলু	..	০·১০ ”		
লাউ একটা	..	০·০৬ ”		
তরমুজ	..	০·০২ ”		
লবণ	..	০·০৩ ”		

সব জড়িয়ে ৮·৭৪ ডলার উদরসাৎ করি, একথা ঠিক। কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠকই এই একই অপরাধে অপরাধী, এবং তাঁদের কৃতকর্মও ছাপার অক্ষরে এর চাইতে কিছু ভাল দেখাবে না, একথা যদি না জানতাম, তাহলে আমার এই অপকর্মের বিবরণ নির্লজ্জের মতো প্রকাশ করতাম না। এর পরের বছর মধ্যে মধ্যে আমি মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য জালে কিছু কিছু মাছ ধরেছি এবং একবার এক কান্ড করি, একটা উডচাক আমার বিন-ক্ষেতের ক্ষতি করেছিল, সেটাকে জবাই—অর্থাৎ তাতারদের ভাষায় যাকে বলে দেহান্তর সাধন—করে উদরস্থ করি, কিছুটা পরখ করে দেখার জন্যও বটে। বোটকা একটা গন্ধ সত্ত্বেও ক্ষণিক তৃপ্তি বোধ করেছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারি যে অনেক দিন ধরে খেয়ে গেলে ফল ভাল দাঁড়াবে না—সেই উডচাক গ্রামের কসাই যখন বানিয়ে দেয় তখন যাই কেন মনে হক না।

হিসাব দেখে যদিও এ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা কঠিন, এই সময়ের মধ্যে জামাকাপড় আর আনুষঙ্গিক ব্যাপারে খরচ হয়

	৮·৪০ $\frac{3}{8}$ ডলার
তেল আর ঘরকরনার বাসন	২·০০ ”

তাহ'লে কাপড় ধোলাই আর সেলায়ের কাজ বাদ দিয়ে, এগুলো বাইরে থেকে করিয়ে নিতাম, তার বিল এখনও পাই নি, পৃথিবীর এই অঞ্চলে যে সব খাতে টাকা নির্ঘাত খরচ হবেই, সেসব বাবদ সর্বসমেত আর্থিক ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ঃ

বাড়ি	..	২৮·১২$\frac{1}{2}$ ডলার
চাষবাস, এক বৎসরে	..	১৪·৭২$\frac{1}{2}$ ”
খাই-খরচ, আটমাসে		৮·৭৪ ”
জামাকাপড় ইত্যাদি		৮·৪০$\frac{3}{8}$ ”
তেল ইত্যাদি		২·০০ ”
মোট	..	৬১·৯৯$\frac{3}{8}$ ডলার

আমার পাঠকদের মধ্যে যাঁদের জীবিকা অর্জন করতে হয়, তাঁদের উদ্দেশ করে এবার আমার বক্তব্য। এই ব্যয় সংকুলনার্থ কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করে আমার

সংস্থান হয়		২৩·৪৪ ডলার
দিন মজুরির রোজগার		১৩·৩৪ ”
মোট	..	৩৬·৭৮ ”

মোট খরচা থেকে এই টাকাটা বাদ দিলে একদিকের বক্রী হচ্ছে ২৫·২১$\frac{3}{8}$ ডলার—আমি যা নিয়ে কাজে নামি প্রায় সেই টাকাটা, এই থেকে খরচা যা লাগে, তার আন্দাজও পাওয়া যায়—আর উপরন্তু এই ভাবে যে অবসর এবং

স্বাধীনতা এবং স্বাস্থ্য লাভ করি, সে সব বাদ দিয়ে পেয়েছিলাম যতদিন ইচ্ছা আরামে বাস করতে পারি এমন একটা বাড়ি।

এই হিসাব যতই আকস্মিক বা অকাজের মনে হ'ক, এর সুসম্পূর্ণতা আছে একটা এবং সেই জন্য একটা বিশেষ মূল্যও আছে। কেউই এমন কিছু আমাকে দেয় নি, যা কোন না কোন রকম কাজে না লাগিয়েছি। উপরের হিসাব থেকে দেখা যাবে, শুধু খাই-খরচা বাবদ হপ্তাপিছু আমার লাগত সাতাশ সেন্ট। প্রায় দুই বৎসর ধরে আমার খাদ্য অতঃপর দাঁড়ায়, খামি বিহীন জোয়ার আর ভুট্টা, আলু, ভাত, খানিকটা শুয়োরের মাংস, গুড় আর লবণ; পানীয় স্রেফ জল। আমি যে প্রধানত ভাত খেয়েই জীবন ধারণ করি, এ আমার ভারতের দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগের হিসাবে ঠিকই। বন্ধ-নিন্দুক-দের সমালোচনার উত্তরে বলে রাখা ভাল যে মধ্যে মধ্যে আমি বাইরে ভোজন করেছি বটে, সদাসর্বদাই যেমন করি এবং সে সুযোগ আরও পাব বলেই আমার ধারণা, কিন্তু প্রায়ই এজন্য আমার ঘরের খাবার নষ্টই হয়েছে। অর্থাৎ বাইরে খাওয়াটা যেহেতু সব সময়েই আছে, তাতে আমার এই তুলনা-মূলক বক্তব্যের গুরুত্ব হ্রাস পাবে না।

এই দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই জ্ঞান লাভ করি যে, অবিশ্বাস্য রকম সামান্য কষ্ট করেই মানুষের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক খাদ্যের সংস্থান হ'তে পারে; এমন কি এদেশের ভূসংস্থানেও। আর, জীবজন্তুর মতো সাদাসিধে আহার্য খেয়েও মানুষের স্বাস্থ্য এবং শক্তি বজায় থাকতে পারে। ক্ষেত থেকে খানিকটা সালাড শাক (পর্তুলাকা অলিরাসিয়া) তুলে নিয়ে এসে সিদ্ধ করে একটু নুন ছড়িয়ে খেয়ে আমার ভোজপর্ব সন্তোষজনক ভাবে সমাধা করেছি। একাধিক কারণেই সন্তোষজনক। চলতি নামে পাছে নাকে গন্ধ লাগে, তাই লাটিন নামটা উল্লেখ করলাম। যুদ্ধবিগ্রহ যখন না থাকে, সাধারণ ভাবে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য সিদ্ধ, একটু লবণ ছড়ানো, টাটকা, উপাদেয়, যথেষ্ট পরিমাণে শাকসব্জীর বেশি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকের আর কি চাওয়ার থাকতে পারে? একটু যে সামান্য রকমারি ব্যবস্থা করতাম আমি, সে শুধুই রসনার বিলাসে, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নয়। তবু মানুষের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রায়ই অনাহারে কাটাতে হয় তাদের—প্রয়োজনীয় খাদ্যা-ভাবে নয়, উপাদেয় খাদ্যাভাবে। একটি ভালমানুষ স্ত্রীলোককে চিনি, যে ভাবে, স্রেফ জল পান করা ধরেছিল বলেই তার পুত্রের মৃত্যু ঘটে।

বিষয়টার শুধু আর্থিক দিকটাই আলোচনা করছি আমি, খাদ্যতাত্ত্বিক দিক নয়, পাঠক যেন তা উপলব্ধি করেন এবং তাঁর ভাঁড়ার বেশ ভর্তি না করে আমাকে কেবল মিতাহারিতার পরীক্ষা দিতেই যেন আমন্ত্রণ না করে বসেন।

প্রথমটায় শুধু মকাই আর নুন মিশিয়ে রুটি পাকাতাম—অকৃত্রিম হাত-রোটি। বাড়ি বানাবার সময় করাত-কাটা ঝড়তি-পড়তির এক টুকরো লকড়ির মুখে বিঁধে, কিংবা একফালি তক্তায় চাপিয়ে সেগুলো বাইরের উননের আঁচে সেঁকে নিতাম. কিন্তু প্রায়ই ঘরে গিয়ে কেমন পাইন কাঠের গন্ধ বেরোত। ময়দাও পরীক্ষা করে দেখি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করেছি, জোয়ার আর ভুট্টা মেশানই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, উপাদেয়ও বটে। মিশরবাসীরা ডিম ফোটাবার জন্য যেমন করে, তেমনি যত্ন নিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে এই রকম ছোট ছোট কয়েকটা চাপাটি এপাশ ওপাশ করে ক্রমাগত তা দিয়ে সেঁকতে মজা মন্দ লাগে না। সত্য সত্য শাস্যদানায় যেন আমার হাতে সদ্য সদ্য পাক ধরে উঠছে। অন্য যেসব দুষ্প্রাপ্য ফল কাপড়ে মুড়ে যতদিন সম্ভব তুলে রাখি, আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে তাদের মতোই সুঘ্রাণ এদের। রুটি বানানোর সনাতন অপরিহার্য পদ্ধতি নিয়ে পড়াশোনা করেছি আমি। এ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ যা পাওয়া যায় সব উল্টে পাল্টে দেখেছি। একেবারে আদিম যুগ, অসন্ধিত খাদ্যের প্রথম উদ্ভাবনের যুগ থেকে সুরু করে যখন গাছের বুনোফল আর কাঁচা মাংস থেকে খাদ্যকে একটু নরম আর পরিষ্কার করে তুলবার অবস্থায় উপনীত হ'ল মানুষ এবং তারপর পড়তে পড়তে ক্রমশ যখন সন্ধিত খাদ্য দৈবক্রমে অম্লত্ব প্রাপ্ত হ'ল, যা থেকে মানুষ খাদ্যকে গাঁজিয়ে তোলার শিক্ষা পায় বলে ধরা হয় এবং অতঃপর নানারকম পাচন ক্রিয়া আর উপক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবশেষে জীবনের সার উপাদান "উৎকৃষ্ট, সুমিষ্ট স্বাস্থ্যকর রুটিখাদ্য"-এ এসে পৌঁছান গেল। অম্লবীজকেই অনেকে রুটির প্রাণ বলে গণ্য করেন, রুটির কোষময় সত্তার আত্মা স্বরূপ। যজ্ঞাগ্নির মতো নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষাযোগ্য বস্তু। অতি মূল্যবান দ্রব্য হিসাবে একে আধার ভর্তি করে মে-ফ্লাওয়ার জাহাজে বহন করে আনা হয়েছিল বলে আমার ধারণা। মার্কিন দেশকে স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে এই এবং এরই প্রভাব সমগ্র দেশের বুকে যেন রবিশস্যের তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধি, স্ফীতি আর প্রসার লাভ করে চলেছে। আমি নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রাম থেকে আনাতাম এই বীজ। তারপর একদিন নিয়মে রুটি হওয়ার ফলে দেখলাম, তা অগ্নিস্পৃষ্ট হয়েছে। সেই আকস্মিক ঘটনার ফলে আমি আবিষ্কার করি এও অপরিহার্য নয়। আমার আবিষ্কারের পদ্ধতি সংশ্লেষণাত্মক নয়, বিশ্লেষণাত্মক। তারপর থেকে সানন্দে আমি একে পরিহার করে আসছি, যদিও অনেক গৃহিণীই সনির্বন্ধে বলেছেন, অম্লবীজ ছাড়া রুটি স্বাস্থ্যকর হয় না, খাওয়া নিরাপদও নয় এবং প্রাচীন ব্যক্তিরা আমার প্রাণশক্তির দ্রুত অবনতির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু আমি দেখলাম, এও অত্যাবশ্যক উপাদান নয় আর এই একটা বছর এর সংস্পর্শে না এসেও বেশ মর্ত্যভূমিতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি এবং

পকেটের মধ্যে একটা বোতলে ভরে একে বয়ে বেড়াবার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে খুশিই আছি—কোন সময় ছিপি খুলে গিয়ে মধ্যকার বস্তু ছিটকে পড়ে কত অসুবিধায় না ফেলতে পারত আমাকে। একে বর্জন করাই বরং অনেক সোজা এবং ভদ্রোচিত ব্যবস্থা। মানুষ এমন এক জীব যে সব জীবজন্তুর চাইতে যে কোন জলবায়ু আর অবস্থার সঙ্গে বেশি খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আমার রুটিতে আর কোন সোডা, কি অম্ল, কি ক্ষার কিছুই দিতাম না। বোধহয় দুই শত খৃীষ্ট পূর্বাব্দে মারকাস পোরশিয়াস কেটো যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী রুটি বানাতাম আমি। * * * আমি সে ব্যবস্থার অর্থ করেছি, "রুটির জন্য ময়দা ডালতে হবে এই ভাবে। হাত আর বারকোস ভাল করে ধুয়ে নাও। ময়দা বারকোসে রেখে আস্তে আস্তে তাতে জল মেশাও। তারপর ঠাসতে থাক জল না শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। যখন ঠাসার কাজ শেষ হবে, তাল পাকাবে, তারপর সেঁকবে ঢাকা দিয়ে" অর্থাৎ রুটি সেঁকবার পাত্রে। অম্লবীজের উল্লেখ মাত্র নেই। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য এও জোটে নি আমার সব সময়। একটা সময়ে, যখন ভাঁড়ে-মা-ভবানী আমার, একটা মাসের বেশি এসব চোখেও দেখি নি।

নিউ ইংলণ্ডের যে কোন লোক এই ভুট্টা আর জোয়ারের দেশে তার ডাল-রুটির কাঁচামাল সবটাই চাষ করে পেতে পারে, সেই কোন মুল্লুকের বাজার-দরের ওঠা-নামার উপর নির্ভর করবার দরকার হয় না। কিন্তু জীবন-যাত্রার সোজা আর স্বাধীন উপায়কে এত দূরে ঠেলে আমরা চলি যে কনকর্ড অঞ্চলের কোন দোকানেই টাটকা আর উপাদেয় খাদ্য বিক্রির জন্য রাখা হয় না। আর মোটা ভুট্টাসিদ্ধ কি আটা কারও রোচেই না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চাষীরা নিজের নিজের ক্ষেতের ফসল গরু মোষ শুয়োরদের দিয়ে নিজে দোকান থেকে ময়দা কিনে খায়—খাদ্য হিসাবে সেটা বেশি পুষ্টিকর নয়, দামও বেশি পড়ে। আমি দেখেছি যে প্রয়োজন মতো দুই এক পালি জোয়ার কি ভুট্টা অনায়াসেই চাষ করে নেওয়া যায়, প্রথমেরটা তো যে-কোন জমিতেই চাষ করা চলে, দ্বিতীয়টা চাষ করতেও খুব ভাল জমির দরকার হয় না। জাঁতায় এগুলো পিষে নিলেই হ'ল, সুতরাং ভাত-মাংসের কোন তোয়াক্কাই না রেখে চলে যায়। এর উপর যদি কিছু মিঠাই দরকার হয়, পরীক্ষা করে দেখেছি যে হয় লাউকুমড়ো নয় বিট, যার থেকেই হ'ক, সুন্দর গুড় তৈরি করা যায়, আর কয়েকটা মেপ্‌ল গাছ পুঁতলেই আরও সহজে সেটা পেতে পারি, এও জানতাম। এসব জন্মাতে যে সময়টা লাগে, সে সময় আর কিছু দিয়ে মুখ বদলান যায়—যেগুলো উল্লেখ করলাম, তারা তো আছেই। যেহেতু পিতৃপিতামহেরা তো গেয়েই রেখেছেন,

"সরুরা বানাই ঠোঁটে মিঠাই ঠুকরোতে,
লাউ, গাজর আর আখরোটের সব টুকরোতে।"

অবশেষে লবণের কথা। মুদীখানার সব চাইতে বাজে মাল, এই লবণ যোগাড় করতে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসা যেতে পারে। অথবা যদি একেবারেই এর ব্যবহার না করে থাকি, তা হ'লে হয়তো কম করে জল খেয়েছি। ইণ্ডিয়ানরা এজন্য কোনদিন মাথা ঘামিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এই ভাবে খাবার-দাবারের ব্যাপারে কেনা-বেচার বা বিনিময়ের হাত থেকে রেহাই পাই। আর মাথা গুঁজবার ঠাঁই তো ছিলই—বাকি থাকে জামাকাপড় আর জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা। যে পাঁতলুন এখন পরে আছি আমি, কোন কৃষক পরিবার সেটা তৈরি করে দিয়েছে, ভগবানকে ধন্যবাদ, মানুষের মধ্যে এখনও এতখানি ধর্মবুদ্ধি আছে। আমি মনে করি, চাষী থেকে কারখানার মজুরে অবনতি, মানুষ থেকে চাষীতে অবনতির মতোই গুরুতর আর মনে রাখবার মতো ঘটনা। তাছাড়া নতুন দেশে জ্বালানি একটা ঝামেলা। বাসস্থানের ব্যাপারে, জবর-দখলের অনুমতি না জুটলে আমি একর পরিমাণ জমি, আমি যে জমি চাষ করি সেটা যেমূল্যে বিক্রি হয়েছিল, অর্থাৎ আট ডলার আট সেন্টে খরিদ করে নিতে পারতাম। কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়ায়, আমি স্থির ধরে নিয়েছিলাম, জবর-দখল করে আমি জমি-টার দাম বাড়িয়েই দিয়েছি।

এক শ্রেণীর অবিশ্বাসী লোক আছেন, যাঁরা এমন প্রশ্নও করেন—যেমন আমি কি মনে করি যে শুধু নিরামিষ খাদ্য খেয়েই আমি জীবন ধারণ করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যাপারের মূলোৎপাটন করার জন্য—কেন না বিশ্বাসমাত্রই মূল—উত্তর এই দিই যে আমি তক্তার পেরেক খেয়েও জীবন ধারণ করতে পারি। তাঁরা যদি একথাটা না বুঝে থাকেন, তাহ'লে আমি যা বলতে চাই, তারও তেমন বিশেষ কিছু বুঝতে পারবেন না। আমার কথা বলতে পারি, এই ধরনের পরীক্ষা কোথাও হচ্ছে জানতে পারলে খুশি হই। যেমন শুনলাম কোন যুবক শক্ত কাঁচা ভুট্টার দানা খেয়ে জীবন ধারণ করেছে এক পক্ষ কাল, শিল হিসাবে স্রেফ দাঁত ব্যবহার করে। কাঠবিড়াল জাতি এই পরীক্ষা করেছে, করে কৃতকার্য হয়েছে। মনুষ্যজাতির এই সব পরীক্ষায় আগ্রহ আছে, যদিও জনকয়েক বৃদ্ধা যাঁদের সে ক্ষমতা নেই, অথবা যাঁরা কলের তিন ভাগ শেয়ারের মালিক, তাঁরা ভয় পেয়ে যেতে পারেন।

আমার আসবাবপত্রের কিছু-কিছু আমি নিজে তৈরি করে নিই। বাকীটার জন্যও এমন কোন খরচ লাগে নি, যার হিসাব না দাখিল করা হয়েছে। থাকার মধ্যে ছিল একটা খাট, একটা টেবিল, একটা ডেস্ক, তিনটে চেয়ার, তিন

ইঞ্চি ব্যাসের আয়না একটা, চিমটে একটা, আর শিক, একটা কেতলি, একটা হাতলওলা পাত্র, একটা কড়াই, একটা হাতা, একটা হাতমুখ ধোওয়ার গামলা, দুটো ছুরি কাঁটা, তিনটে প্লেট, একটা পেয়ালা, একটা চামচ, একটা তেলের বৈয়াম, একটা গুড়ের বৈয়াম আর একটা জাপানী কাজ করা শেজ। লাউ-কুমড়োর উপর বসে জীবন কাটাতে হবে, এমন নিঃস্ব কেউ নেই। সেটা শুধুই অক্ষমতা। গ্রামের সব বাড়ির গুদামে এমন অনেক পছন্দসই চেয়ার আছে, যা কেবল নিয়ে আসার অপেক্ষা। আসবাবপত্র! ভগবানের দয়ায় বসবার আর দাঁড়াবার জন্য আমার কোন আসবাবের গুদামঘর লাগে না। নিজের আসবাব-পত্র গাড়ি বোঝাই করে দিনের আলোয় খোলা অবস্থায়—শুধুই কয়েকটা খালি বাক্সের কাঙালপনা—লোকের চোখের উপর দিয়ে নিয়ে যেতে দেখলে এক দার্শনিক ছাড়া আর কে না লজ্জা পাবে। ঐ যে স্পলডিংয়ের ফার্নিচার যায়। এই ধরনের বোঝা দেখে আমি কখনও ঠাহর করে উঠতে পারি নে, তথাকথিত কোন বড়লোকের না গরিবলোকের মাল সেগুলো—মালিক যেই হ'ক, সর্বদাই তাকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মনে হয়। সত্যিই, এসব মাল লোকের যত বেশি হবে, ততই দরিদ্র মনে হবে তাকে। প্রত্যেকটা বোঝা দেখলে মনে হয় যেন বারোটা বস্তির মালপত্র জড়ো করা হয়েছে, অর্থাৎ একটা বস্তির দারিদ্র্যের চাইতে বারোগুণ দারিদ্র্য এর। বলুন, আমাদের বাড়ি বদলের কি দরকার যদি এই সব আসবাব-পত্রের, এই সব ছাল-চামড়ার হাত থেকে রেহাই না পাওয়া যায়। শেষে এ লোক থেকে নবসজ্জিত লোকে যেতে হবে না, ফেলে রেখে যেতে হবে না এসব পুড়িয়ে ফেলার জন্য? উঁচু-নিচু ভূমির উপর দিয়ে ছুটে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু কোমরবন্ধে জবরজঙ সাজসজ্জা সমেত যেতে হলে যে অবস্থা হয়, তাই। ফাঁদে যে শেয়ালের লেজই শুধু কাটা যায় সে তো ভাগ্যবান। মাস্করয়াট ফাঁদ থেকে মুক্ত হবার জন্য তৃতীয় পা-টাই দাঁতে কেটে ফেলে। মানুষ যে স্থিতি-স্থাপকতা হারিয়ে ফেলেছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সব সময়েই তো মড়া আগলে বসে আছে সে। "মহাশয়, যদি সাহস দেন, মড়া আগলানো কাকে বলেন জিজ্ঞাসা করি?" যদি দেখবার চোখ থাকে, কোন লোককে দেখা মাত্র বুঝতে পারবেন কত জিনিসের সে মালিক, অসাক্ষাতে দেখবেন আরও কত জিনিস, মুখে কিন্তু বলবে সেগুলো তার নয়। ম্যয় তার রান্নাঘরের সাজসরঞ্জাম, কত সব চকচকে আবর্জনা, জমিয়ে রেখেছে সে, পুড়িয়ে ফেলবে না কিছুতে, জিনলাগাম জোতা ঘোড়ার মতো, ঘাড়ে নিয়ে ছুটেছে যতদূর পারে। আমার মতে, মড়া আগলে বসে আছে সেই, যে ব্যক্তি একটা গর্ত কি ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, কিন্তু সেখান দিয়ে তার গাড়িবোঝাই আসবাবপত্র কিছুতেই ঢুকতে পারছে না। অনুকম্পা বোধ না করে পারি না আমি, যখন শুনি দিব্য পরিচ্ছন্ন ছিমছাম দেখতে কেউ, ঝাড়া-হাত-পা বলেই যাঁকে মনে হয়, মনে হয়

সব বাঁধা-ছাঁদা শেষ করেই যেন পা বাড়িয়ে আছেন, তিনিও তাঁর আসবাবপত্র সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করছেন, সেগুলো বীমা করা হ'ল কি না, "কিন্তু আমার আসবাবপত্র নিয়ে কি করি আমি?" সুন্দর একটা প্রজাপতি মাকড়সার জালে আটকে গেছে দেখতে পাই। অনেক দিন পর্যন্ত যাঁদের মনে হবে এ'দের কিছু নেই, একটু খোঁজ করে দেখুন, আর কারও গোলাঘরে তাঁদেরও যৎকিঞ্চিৎ মজুদ আছে। ইংলণ্ডকে আজ আমার মনে হয় বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক প্রচুর মালপত্র সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন, কত চকচকে পোঁটলাপুঁটলি, বহু দিনের গৃহস্থালিতে সব জমা হয়েছে, সাহস নেই পুড়িয়ে ফেলবেন, বড় আর ছোট ট্রাঙ্ক, টুকিটাকি রাখবার বাক্স, আর গাঁটরি। হাতের কাছের গোটা তিনেক অন্তত ফেলে দাও। বিছানা কাঁধে করে বেড়ানো আজকাল কোন সুস্থ ব্যক্তিরও সাধ্যের বাইরে, কিন্তু যে অসুস্থ তাকে নিশ্চয়ই পরামর্শ দেব, বিছানা পড়ে থাক, ছুট লাগাও। এক অভিবাসীকে দেখেছিলাম, যথাসর্বস্ব বোঝাই এক পোঁটলা কাঁধে টাল সামলাতে সামলাতে চলেছে—বিরাট একটা আঁবের মতো পোঁটলাটা কাঁধের উপর খাড়া হয়ে উঠেছে—অনুকম্পা হয়েছিল তার উপর, এই তার যথাসর্বস্ব ভেবে নয়, তাকে বোঝাটা বইতে হচ্ছে দেখে। নিজের ফাঁদ নিজের ঘাড়ে নিয়ে যদি চলতেই হয়, নিশ্চয় খেয়াল রাখতে হবে সেটা যাতে হাল্কা হয় আর আমার কোন আসল অঙ্গ পাকড়ে না ধরে। কিন্তু সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ও ফাঁদে কখনও পা না ফেলা।

প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, পর্দার খাতে কোন খরচা নেই আমার, উঁকি মারবার মতো এমন কেউ নেই যার দৃষ্টি এড়াতে চাই। এক সূর্য-চন্দ্র, কিন্তু তারা উঁকি মেরে দেখুক, তাই তো চাই। চাঁদ টকিয়ে দেবে এমন দুধ, কি পচিয়ে দেবে এমন মাংস নেই আমার। সূর্য রং নষ্ট করে দেবে এমন আসবাব-পত্র কি কার্পেট নেই আমার। যদি কখনও তার বন্ধুত্বের তাপ বেশি বোধ হয়, তা হ'লে আমার গৃহস্থালির খুঁটিনাটির সংখ্যা বৃদ্ধি না করে, প্রকৃতি যে পর্দার ব্যবস্থা করেছে তার আড়ালে আশ্রয় নেওয়াকে অধিক মিতব্যয়িতা বলে বিবেচনা করি। কোন ভদ্রমহিলা একবার একটা পাপোষ দিতে চান আমাকে, কিন্তু না ছিল ঘরের মধ্যে অতিরিক্ত স্থান, না ছিল ঘরে-বাইরে এমন অতিরিক্ত অবসর যে সেটার ঝাড়পোঁছ করি, সুতরাং সেটা নিতে অস্বীকার করি। দরজার সামনে যে ঘাসের চাপড়া আছে, তাতেই পা মোছা বরং ভাল মনে হয়। আরম্ভেই পাপের মূলোচ্ছেদ করা ভাল।

বেশি দিন হয় নি, জনৈক ডিকনের মালপত্র নিলামের সময় উপস্থিত ছিলাম। তাঁর জীবনে মালের অভাব ঘটে নি ঃ—

"অপকর্ম যত মানুষের, টিঁকে থাকে মরণেরও পরে।"

যথারীতি, মালপত্রের বেশ মোটা অংশ তাঁর পিতার আমল থেকে জমতে সুরু করে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে একটা শুকনো-কাট ফিতে-কৃমিও ছিল, এ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সব তাঁর গুদাম-ঘর আর কুলুঙ্গি অধিকার করে এসেছে, কিছুই পোড়ানো হয় নি। আর এখন অগ্নিশুদ্ধি অর্থাৎ সৎকার দ্বারা বংশ নাশ না করে নিলামে পাঠিয়ে বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাড়া-পড়শীরা অধীর আগ্রহে জমায়ত হয়েছিল সেগুলো দেখতে, কিনেও নিলে সব। সযত্নে বয়ে নিয়েও গেল সব নিজেদের গুদাম-ঘরে আর কুলুঙ্গিতে মজুদ রাখতে। যতদিন পর্যন্ত না তাদের সম্পত্তির আবার কোন বিলি-ব্যবস্থা হয়, সেগুলো সেখানে মজুদ থাকবে। তারপর আবার এর পুনরভিনয় হবে। মৃত্যুকালে ধূলিকণা পর্যন্ত পা থেকে ঝেড়ে ফেলে যেতে হয় মানুষকে।

কোন কোন অসভ্য জাতির রীতি-নীতি অনুকরণ করলে আমাদের হয়ত ভাল হতে পারে। কেন না, তাদের অন্তত বৎসরান্তে খোলস ত্যাগ করার ব্যবস্থা আছে। জিনিসটা সম্বন্ধে ধারণা আছে তাদের, আসলে কিছু হক না হক। বারট্রাম বর্ণিত মুক্লাসে-ইন্ডিয়ানদের নবান্ন অনুষ্ঠান— 'বাস্ক' অথবা "'প্রথম ফলের প্রসাদ ভোজ" কি ঐ রকম কোন উৎসব অনুষ্ঠান করলে ভাল হত না আমাদের? বারট্রাম বলছেন, "যখন কোন মণ্ডলে বাস্ক-এর অনুষ্ঠান হয়, আগে থাকতে লোকে নতুন কাপড়-চোপড়, নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি-ঘর-গেরস্থালির নতুন বাসন-কোসন আর আসবাব যোগাড় করে, তারপর তাদের যত পুরনো কাপড়-চোপড় আর বকেয়া মাল, বাড়িঘর, রাস্তার মোড়, সমগ্র মণ্ডল ঝেঁটিয়ে সাফ করা যত ময়লা, সেগুলোর সঙ্গে অবশিষ্ট শস্য আর বাসি খাবার-দাবার সব জড়ো করে মিলিয়ে একটা বারোয়ারি গাদা খাড়া করে তাতে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে ফেলে। তারপর ঔষধপত্র খেয়ে, তিন দিন উপবাস করে সমগ্র মণ্ডলের অগ্নি নিভানো হয়। এই উপবাসকালে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কি অন্য সব রিপুর তৃপ্তিসাধনে তারা বিরত থাকে। সার্বজনীন ক্ষমা ঘোষণা করা হয়; অন্যায়কারীরা আবার মণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করে।"

"চতুর্থ দিন সকালে প্রধান পুরোহিত শুকনো কাঠে কাঠ ঘষে সাধারণের জমায়ত হবার জায়গায় নতুন আগুন জ্বালান। সেখান থেকে মণ্ডলের সমস্ত আবাসে নতুন বিশুদ্ধ অগ্নিশিখা সরবরাহ হয়।"

অতঃপর তারা অন্ন ও ফলমূল খেয়ে তিন দিন ধরে নৃত্য-গীত করে, "এবং তার পরের চারদিন তারা অতিথি সৎকার করে এবং পার্শ্ববর্তী মণ্ডলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করে। সেখানকার লোকেরাও এই ভাবে শুদ্ধি লাভ করে প্রস্তুত হয়ে আসে।"

মেক্সিকোবাসীরাও প্রত্যেক বাহান্ন বছরে এই রকম একটা শুদ্ধিপর্বের

অনুষ্ঠান উৎসব করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এই সময় অন্তে পৃথিবীতে প্রলয় হয়।

এর চাইতে সত্যতর কোন সংস্কারের কথা শুনি নি আমি। অভিধানে সংস্কারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, "অন্তরে আধ্যাত্মিক করুণালাভের, বাইরে দৃশ্যমান প্রতীক।" আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে সোজাসুজি ভগবানের কাছ থেকে তারা এর প্রথম প্রেরণা লাভ করে, যদিও বাইবেলের প্রত্যাদেশের মতো কোন নথি নেই তাদের।

এই ভাবে পাঁচ বছরের বেশি শুধু নিজের শ্রমের দ্বারা নিজের জীবিকার্জন করেছিলাম। এই থেকে আমার অভিজ্ঞতা হয়, ছয় সপ্তাহ কাল পরিশ্রম করলে বৎসরের জীবনযাত্রার সকল ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হয়। সমগ্র শীতকালটা আর গ্রীষ্মকালের বেশি ভাগ সময় হাতে থাকে অধ্যয়নের জন্য। ইস্কুল চালানোর আদ্যোপান্ত পরীক্ষা আমি করেছি, দেখেছি যে আমার আয়ের অনুপাতে ব্যয় সমান-সমান হয়, বরং বেশি হয়, কেন না আমাকে যথাযোগ্য পোষাক-পরিচ্ছদ পরতে হ'ত, আবার তৈরিও হতে হ'ত—চিন্তা ও বিশ্বাসের কথা নাই উল্লেখ করলাম। ফলে, সে কারবারে আমার সময়ের দিক থেকে ক্ষতিই হ'ত। কিন্তু স্বদেশবাসীর কল্যাণকল্পে তো শিক্ষা দান করতাম না, করতাম জীবিকার্জন কল্পে। সুতরাং নিষ্ফল হয় সব। ব্যবসায়ের চেষ্টা করেছি, কিন্তু দেখেছি যে ব্যবসা চালু করতে দশটি বৎসর লাগে এবং ততদিনে হয়তো আমি উৎসন্নের পথে চলেছি। বাস্তবিক পক্ষে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, যদি ঐ সময়ের মধ্যে, ব্যবসা যাকে জমা বলে, তাই হয়ে যায়। আগে যখন জীবিকার্জনের জন্য কি করা যায় সেই খোঁজে ছিলাম, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা স্বরূপ বন্ধুবান্ধবের ইচ্ছার সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার সকরুণ অভিজ্ঞতা দগদগে ছিল, তখন প্রায়ই গম্ভীর ভাবে হাকলবেরি পেড়ে বিক্রির কথা ভেবেছি। কাজটা নির্ঘাত করতে পারতাম, আর অল্প যে লাভ হ'ত তাতেই চলে যেত, কেন না আমার যা শ্রেষ্ঠ গুণ সে তো শুধু এই যে যৎসামান্যতেই আমার চলে যায়। বোকার মতোই ভেবেছি, মূলধন লাগবে কম, আমার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি থেকে বিচ্যুতি ঘটবে কম। আমার পরিচিত অনেকে যখন বিনা দ্বিধায় কোন ব্যবসায় কি পেশায় ঢুকে পড়তেন, আমার এই পেশাকেও আমি তাদেরই মতো ভাবতাম। সারা গ্রীষ্ম ধরে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতাম আর নাগালের কাছে পেলেই বেরি পাড়তাম, তারপর যদৃচ্ছা ফেলাছড়া করতাম সেগুলো, অ্যাডমিটাসের গোধন পালিত হত। বুনো গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করার কিংবা গ্রামবাসীদের যারা বনের কথা মনে করিয়ে দিলে খুশি হতে পারে, তাদের জন্য এমন কি শহর পর্যন্ত বিচালির গাড়ি বোঝাই করে চিরহরিৎ লতাপাতা বয়ে নিয়ে যাবার

কল্পনাও করেছি। কিন্তু অতঃপর আমার শিক্ষালাভ হয় যে ব্যবসায়ের স্পর্শমাত্র সব কিছুর পক্ষে অভিশাপ, এমন কি অমৃতস্য বার্তাকেও ব্যবসায়ের বিষয় করলে তাও ব্যবসায়স্পর্শে দুষ্ট হয়।

কতক কতক জিনিস অপর কতকগুলোর চাইতে বেশি ভাল লাগত আমার, বিশেষ করে আমার স্বাধীনতাকে মূল্যবান মনে করতাম, কষ্ট স্বীকার করতে হলেও সার্থক বোধ করতে পারতাম। তাই মূল্যবান কারপেট কি আর কোন সুন্দর গৃহসজ্জা, অথবা শৌখীন রন্ধন-শিল্প, কিংবা গ্রীসিয়ান অথবা গথিক স্থাপত্যাদর্শে গৃহনির্মাণে কালক্ষেপ করার ইচ্ছা আমার কোনদিন হয় নি। এমন যদি কেউ থাকেন, যাঁর পক্ষে এই সব বস্তুলাভ প্রতিবন্ধক নয় এবং পেলে কি ভাবে তাদের সদ্ব্যবহার করতে হবে যাঁর জানা আছে, তাঁর জন্যই মতলব ত্যাগ করলাম। অনেক উদ্যোগী পুরুষ আছেন যাঁরা পরিশ্রম করেই খুশি বলে মনে হয়, কিংবা হয়তো কোন অনিষ্টাচরণ থেকে এই ভাবে নিজেদের নিবৃত্ত রাখেন, তাঁদের উদ্দেশে বর্তমানে আমার কোন বক্তব্য নেই। যাঁরা জানেন না, এখনকার চাইতে বেশি পরিমাণ অবসর পেলে তা নিয়ে কি করবেন, তাঁদেরকে আমি বলব, এখন যা খাটছেন তার দ্বিগুণ খাটুন, যতক্ষণ না নিজেদের খোর-পোষের খরচ ওঠে, যতক্ষণ না ছাড়পত্র পাওয়া যায়, ততক্ষণ খেটে যান। আমার অভিজ্ঞতায় দেখলাম, দিনমজুরের কাজই সব চাইতে স্বাধীন কাজ, বিশেষ করে ভরণপোষণের জন্য বছরের ত্রিশ কি চল্লিশ দিন খাটলেই যখন চলে যায়। সূর্য অস্ত যায়, দিনমজুরেরও কাজ শেষ হয়, খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তখন সে ইচ্ছামতো কাজ করতে পারে। কিন্তু তার নিয়োগকর্তা মাসের পর মাস তেজীমন্দী করে চলেছে, বছরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্রাম নেই তার।

মোদ্দা কথা, আমি নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছি যে, বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতা উভয়তই, পৃথিবীতে নিজের ভরণপোষণের সংস্থান করা কষ্টের নয়, অবসর বিনোদনের ব্যাপার। শুধু সরল ভাবে বুদ্ধিমানের মতো বাঁচতে হবে, যেমন, যেসব জাতির জীবনযাত্রা সরল, তাদের জীবন রক্ষার উপায়, যেসব জাতির জীবনযাত্রা অসরল, তাদের তুলনায় আজ পর্যন্ত খেলাধুলোর ব্যাপার। পেটের ভাত করার জন্য মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার দরকার নেই, অবশ্য যদি কারও ঘাম আমার চাইতে অল্পতে না পড়ে।

আমার পরিচিত এক যুবক উত্তরাধিকারসূত্রে কয়েক একর জমি পেয়েছে। আমাকে এসে বলে সে, যদি তার উপায় থাকত, আমার মতো জীবন কাটাত। আমি চাই না যে কেউ আমার ধরনে জীবন চালিত করুক, কেন না ধরনটা ভাল করে আয়ত্ত করতে যতদিন তার লাগবে, তার আগেই হয়তো আমি নিজের জন্য অন্য একটা ধরন ধরে ফেলতে পারি। তাছাড়া আমি চাই দুনিয়াতে যত বেশি

সম্ভব, আলাদা আলাদা ধরনের লোক থাকুক এবং এও চাই যে, কারও বাবা কি মা, কি পাড়াপড়শী কারও পথে না গিয়ে প্রত্যেকে অতি যত্নে নিজের নিজের পথ খুঁজে বের করুক আর সেই পথে চলুক। তরুণরা ঘরবাড়ি করতে চায় করুক, চাষ-আবাদ করতে চায় করুক, জাহাজে পাড়ি দিতে চায় দিক, শুধু যা করতে চায় বলে, তা করতে যেন তাকে বাধা না দেওয়া হয়। নাবিক কি পলাতক ক্রীতদাস যেমন ধ্রুবতারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, তেমনি ভাবে গাণিতিক বিন্দুর দ্বারাই আমরা জ্ঞানী হ'তে পারি। জীবনভোর সেই এক নির্দেশই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের বন্দরে নির্ণয়যোগ্য সময়ের মধ্যে পেঁছুতে নাও পারি, কিন্তু সত্য পথে যেন অবিচলিত থাকি।

নিঃসন্দেহে, এক্ষেত্রে একজনের পক্ষে যা সত্য, বহুলোকের পক্ষে তা আরও সত্য। যেমন একটা বড় বাড়ি অনুপাতে ছোট বাড়ির চাইতে বেশি খরচের হয় না, কারণ একটা ছাদে ঢাকা পড়ে, একটা সেলারে চলে, আর একটা দেয়াল অনেকগুলো ঘর আলাদা রাখতে পারে। কিন্তু আমার নিজের জন্য আমি সংগীবিরহিত আবাসই পছন্দ করেছিলাম। তাছাড়া, এক দেয়ালের সুবিধা সম্বন্ধে অন্যকে বুঝিয়ে রাজী করানোর চাইতে সমস্তটা নিজের মতো নিজে তৈরি করে নেওয়া সাধারণত অনেক সহজ। তার উপর, যদিই বা সেটা করা গেল, মধ্যেকার দেয়ালটা সস্তা করতে গেলে পাতলা হওয়া চাই, এবং অপর ব্যক্তি পড়শী হিসাবে বদলোক হ'তে পারেন, নিজের অংশটা ঠিকঠাক নাও রাখতে পারেন। পরস্পরের মধ্যে যে সহযোগিতা সম্ভবযোগ্য তা আংশিক এবং ভাসাভাসা। প্রকৃত সহযোগিতা—যা না থাকার সামিল, সে এমন ঐকতান যে মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। লোকের যদি আস্তিক্যবোধ থাকে, সর্বত্র সেই আস্তিক্যবোধ থেকেই সহযোগিতা করে চলে, আর আস্তিক্যবোধ না থাকলে যার সংস্পর্শেই আসুক না কেন, সে অবশিষ্ট লোকসমাজের মতোই জীবন যাপন করবে। সর্বোৎকৃষ্ট আর সর্বনিকৃষ্ট যে অর্থেই হক, সহযোগিতা বলতে বোঝা যায় সহ-জীবন-যাত্রা। সম্প্রতি শুনলাম, দুটি যুবক সহযাত্রায় ভূপ্রদক্ষিণ করবেন, একজন নিঃস্ব, পথে প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করে করে যেতে হবে তাঁকে, কখনও মাস্তুলের সামনে, কখনও লাঙল চালিয়ে, অপর জন যাবেন পকেটে করে হুণ্ডি নিয়ে। সহজেই বোঝা যায় তাঁরা বেশিকাল সহকর্মী থাকতে পারেন না। কেন না, একজন তো কোন কর্মই করছেন না। এই অভিযাত্রায় প্রথম স্বার্থঘটিত সংকটের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবেন। সর্বোপরি, আমি যার ইঙ্গিত দিয়েছি আগে, যে একলা যাবে সে এখুনই রওয়ানা হ'তে পারে, আর সাথীর সঙ্গে যেতে হ'লে অপরে যতক্ষণ না প্রস্তুত হচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে। তাদের যাত্রায় অনেক বিলম্ব ঘটতে পারে।

কিন্তু এ সবই অত্যন্ত স্বার্থপরের কথা—আমার শহরবাসীদের কেউ কেউ এই কথা বলেছেন বলে কানে এসেছে আমার। এ পর্যন্ত খুব কম লোকহিতের কাজে আমি হস্তক্ষেপ করেছি, এ অপরাধ স্বীকার করছি। কর্তব্যবোধে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছি এবং আরও অনেক কিছুর মতো এর আনন্দকেও সেই জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে। এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা শহরের দুই একটা দরিদ্র পরিবারের অন্নসংস্থানের কাজে আমাকে প্রবুদ্ধ করতে তাঁদের সর্ববিধ কলাকৌশল প্রয়োগ করেছেন। শয়তান তো নিষ্কর্মার কাজ যোগায়, তাই আমার যদি কিছু না করবার থাকত, এই রকম কোন অবসর বিনোদনের কাজে আমি হাত লাগিয়ে দেখতে পারতাম। যাই হ'ক, যখন এই কাজে প্রবৃত্ত হয়ে কয়েক জন দরিদ্র ব্যক্তির সর্বাংশে আমার মতো আরাম সংস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁদের ভগবানকে দায়বদ্ধ করব স্থির করলাম, এমন কি প্রস্তাব পর্যন্ত করার সাহসও দেখালাম, তখন তাঁরা সবাই ইতস্তত না করে দরিদ্র থাকাই বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করলেন। যখন এই শহরবাসী সব নর-নারীই নানা ভাবে প্রতিবেশীদের কল্যাণকল্পে নিযুক্ত রয়েছেন, তখন অন্তত একজনকে অন্য কোন এবং অনধিক লোকহিতকর কাজের জন্য বাদ দেওয়া যেতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি। অন্য সব কাজের মতো লোকসেবার কাজেও নিজস্ব প্রবৃত্তির প্রয়োজন। আবার যে সব বৃত্তিতে স্থানাভাব, সেবাব্রত তাদের অন্যতম। তাছাড়া এদিকে খানিকটা চেষ্টা করেও দেখেছি এবং বুঝেছি যে ওটা আমার ধাতে সয় না। আশ্চর্য মনে হতে পারে যদিও। সমাজ আমার কাছ থেকে যেটুকু হিত দাবী করতে পারে, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে জ্ঞাতসারে এবং স্বেচ্ছাক্রমে আমার সেই নির্দিষ্ট কাজকে পরিহার করা বোধ হয় উচিত হবে না। অন্য কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ, অনেকাংশে অধিক পরিমাণ স্থির প্রতিজ্ঞাই পৃথিবীকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কোন ব্যক্তি এবং তাঁর স্বকীয় প্রবৃত্তির মধ্যে আমি বাধার সৃষ্টি করতে চাই না। সুতরাং যে কাজ করতে আমি রাজী নই, যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে সেই কাজ করতে ব্যাপৃত আছেন, তাঁকে বলতে চাই, লেগে থাক, যদিও পৃথিবীময় লোক হয়তো বলবে, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বলবে, কাজটা গর্হিত হচ্ছে।

আমার অবস্থাটা অনন্যসাধারণ এমন ধারণা আমি একেবারেই পোষণ করি নে। আমার পাঠকদের মধ্যে অনেকে হয়তো আত্মরক্ষার্থে ঐ কথাই বলবেন। কোন কাজকর্মের বরাত দেবার পক্ষে—হলফ করে অবশ্য বলতে পারি নে যে আমার পড়শীরা সেকাজ ভাল বলে মেনে নেবেন—আমি চমৎকার ব্যক্তি। কিন্তু কাজটা কি, আমার নিয়োগকর্তাকেই স্থির করে নিতে হবে। কথাটার প্রচলিত অর্থে সৎকাজ যেটুকু আমি করি, আমার আসল উদ্দেশ্য থেকে সেটা

আলাদা বলে ধরতে হবে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা অনিচ্ছাকৃত। লোকে যা বলে, তার অর্থ দাঁড়ায় যেখানে যেভাবে আছ, সেখান থেকেই সুরু কর, যোগ্যতর হবার চেষ্টার দরকার নেই, শুধু আগে থেকে দয়াধর্মের কথা স্থির করে নিয়ে সৎকাজ করে চল। আমাকে যদি এই ভাবের কোন প্রচার-কার্য করতে হ'ত, আমি বরং বলতাম, সৎ হবার সাধনা কর। যেন, সূর্যের স্বকীয় প্রাণদ তাপ এবং উপকারিতার ক্রমশ বৃদ্ধির পরিবর্তে, মর-মানব তার দিকে চেয়ে দেখতে না পারে এমন মহাদ্যুতিলাভের পরিবর্তে, যেই সে চাঁদের কিংবা ষষ্ঠমানের কোন তারকার ঔজ্জ্বল্যের সমান দীপ্তমান হয়েছে অমনি তাকে থেমে যেতে হবে এবং সদাশয় রবিনের মতো তাকে প্রত্যেক কুটিরের জানালা দিয়ে উঁকি মারতে হবে, উন্মাদকে প্রেরণা জোগাতে হবে, মাংসে ছাতা পড়াতে হবে এবং অন্ধকারকে দৃশ্যমান করে তুলতে হবে, অতঃপর, তথা এই সময়েই স্বকক্ষে পরিভ্রমণ আর ভূ-প্রদক্ষিণ করে ইষ্ট সাধন করতে হবে, কিংবা সত্যতর দর্শনের যা আবিষ্কার ভূমণ্ডলই তাকে প্রদক্ষিণ করে ইষ্টলাভ করবে। সূর্য-পুত্র ফিটন যখন কল্যাণকৃতি দ্বারা স্বীয় দেব-ঔরস প্রমাণ করতে একদিনের জন্য সূর্য-শকট লাভ করে অভ্যস্ত কক্ষ থেকে বহিষ্ক্রমণ করেন, তখন তিনি স্বর্গপুরীর নিম্নপথের কতকগুলো ঘরবাড়ি দগ্ধ করেন, ধরিত্রীবক্ষ অগ্নি-স্পৃষ্ট করেন, প্রত্যেকটি নির্ঝর শুকিয়ে ফেলেন এবং মহা-মরুভূমি সাহারার সৃষ্টি করেন। অবশেষে জুপিটার-দেব বজ্রনিক্ষেপ করে তাঁকে অধোমস্তকে ভূপাতিত করেন এবং সূর্যদেব পুত্রের মৃত্যুশোকে বৎসরকাল কিরণ সংহৃত রাখেন।

বিকৃতিগ্রস্ত সৎকাজের পূতিগন্ধের মতো দুর্গন্ধ আর হয় না। সে যে নরদেহ তথা দেবদেহের মিলিত শবের দুর্গন্ধ। অমুক আমার কাছে আসছে, তার দৃঢ় সংকল্প আমার কল্যাণ সাধন করবেই, এমন সুনিশ্চিত সংবাদ পেলে আমাকে জীবন-আশংকায় পালাতে হবে। লোকে যেমন আফ্রিকার মরুভূমি অঞ্চলের তপ্ত ঝলসে-দেওয়া মরুবায়ু সিমুম থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পালায়। মুখ-চোখে, নাককানে ধুলোর চাপে দম আটকে মরতে হয় তা থেকে। অমুককে তাই আমার এত ভয়, পাছে সে আমার কিছু উপকার করে ফেলে, পাছে তার বিষ আমার রক্তে সংক্রান্ত হয়। না, বরং স্বাভাবিক ভাবের দুর্গহের সম্মুখীন হওয়া ভাল। অনাহারে মারা পড়তে বসেছি যখন, তখন যেলোক আহার দেয়, শীতে যখন জমে গেছি, তাপ দেয়, কিংবা পাঁকে পড়লে তা থেকে টেনে তোলে, সে আমার কল্যাণকৃৎ নয়। এমন নিউ ফাউন্ডল্যান্ড কুকুরের সন্ধান দিতে পারি, ওকাজটা সেও করতে পারে। ব্যাপক অর্থে মানবপ্রেম মানবের প্রতি শুধু প্রেম নয়। হাওয়ার্ড স্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সহৃদয় ও সুযোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই এবং তার পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু

প্রয়োজনের অনুপাতে একশ হাওয়ার্ডই বা আমাদের কি করতে পারেন? তাঁর মানবপ্রেম আমাদের কোন কাজেই যদি না লাগল আমাদের শ্রেষ্ঠক্ষণে, যে অবস্থায় সব চাইতে সাহায্যের প্রয়োজন আমাদের? কখনও এমন কোন বিশ্বপ্রেম-প্রচার-সভার সংবাদ আমি পাই নি, যেখানে আমার কিংবা মাদৃশ ব্যক্তির কল্যাণকল্পে অকপট কোন প্রস্তাব করা হয়েছে।

খুঁটিতে বেঁধে ইণ্ডিয়ানদের দগ্ধে মারার সময়, তারা পীড়নকর্তাদেরই পীড়নের নতুন উপায় বাতলে দেয় দেখে জেসুইটরা হতবাক হয়ে যান। শারীরিক কষ্টের উপরে উঠেছিল তারা। এমন ঘটনাও মধ্যে মধ্যে ঘটত যে মিশনারিরা কোন সান্ত্বনা দান করতে গিয়েও তাদের নাগাল পায় নি। যারা তোয়াক্কাই রাখে না, অপরে তাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করে, শত্রুদের যারা নতুন ঢঙে ভালবেসেছে, এবং যা কিছু করছে শত্রুরা, সবকিছুকে প্রায় সর্বান্তঃকরণে মার্জনা করার অবস্থায় পেঁছে গেছে যারা, তাদের কানে "অপরের নিকট যে আচরণ প্রত্যাশা কর, অনুরূপ আচরণ নিজে কর", এই নীতির আবেদন কম।

গরিবকে সাহায্য কর, কিন্তু দেখ যেন যে সাহায্যের তার সর্মাধক প্রয়োজন, সে তাই পায়। তোমার যে আচরণ, অনেক পশ্চাতে পড়ে তারা তাতে। যদি অর্থ দাও, নিজেকেও দিয়ো তার সঙ্গে। শুধু টাকাটা ছুঁড়ে দিয়ো না। কখনও কখনও আশ্চর্য ভুল করি আমরা। দরিদ্রেরা সব সময়েই কিছু ততটা শীতার্ত এবং অন্নাভাবগ্রস্ত নয়, যতটা নোংরা, ছেঁড়াময়লা কাপড় পরা আর ইতর। এর কিছুটা তার রুচির ফল, সবটা তার দুর্ভাগ্য নয়। তাকে অর্থ দাও, সে হয়তো তাই দিয়ে আরও ছেঁড়া কাপড়-চোপড় কিনে বসবে। আমারও কষ্ট হ'ত অপরূপ সব আইরিশ মজুরদের দেখে। বেচারিরা বিশ্রী ছেঁড়া-ময়লা ট্যানা পরে পুকুরের জমাট বরফ সাফ করত আর আমি আমার পরিচ্ছন্ন, তাদের তুলনায় কেতাদুরস্ত জামাকাপড় পরেও শীতে হিহি করতাম। তারপর এক মারাত্মক ঠাণ্ডার দিনে তাদের একজন পিছলে জলের মধ্যে পড়ে আমার ঘরে আগুন পোহাতে এল। দেখলাম, তিনজোড়া প্যাণ্ট আর দুজোড়া মোজা খুলে তবে তাকে খালি গা-হাত-পা হ'তে হ'ল। সবগুলোই অত্যন্ত জীর্ণ বটে, কিন্তু যে বহির্বাস দিতে গেলাম, অস্বীকার করল নিতে, তার এতগুলো অন্তর্বাস। তার দরকার ছিল ঠিক এই জলে চুবানি খাওয়াটা। তখন আমার নিজের সম্বন্ধেই কষ্ট হ'তে লাগল। বুঝতে পারলাম যে তাকে এক দোকান জামাকাপড় না দিয়ে নিজের গায়ে একটা ফ্লানেলের কামিজ চড়ানো বেশি দয়ার কাজ হবে। পাপের শাখাপ্রশাখায় হাজার ঘা দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার মূলোচ্ছেদ করতে লাগে এক ঘা। এমনও হতে পারে যে অভাবগ্রস্তকে একরাশ অর্থ দান আর সেজন্য প্রচুর সময় ক্ষেপণ করছেন

যিনি, ফলে যে দুর্দশা দূর করতে চাইছেন, তা সব চেয়ে বেশি সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর জীবনের কাজে, তাঁর চেষ্টাও নিরর্থক হচ্ছে। এ হচ্ছে সেই সাধু ক্রীতদাস ব্যাপারির মতো প্রতি দশজন ক্রীতদাসের একজনের উপায়ে অপর ক'জনের রবিবারের ছুটির ব্যবস্থা করা। অনেকে নিজেদের রান্নাঘরে দরিদ্রদের কাজকর্ম দিয়ে দয়া দেখান। তাঁরা নিজেরা সেখানে কাজ করতে গেলে বেশি দয়ার কাজ হ'ত না? আপনার আয়ের একদশমাংশ খয়রাত করে দম্ভ করেন আপনি, হয়তো আর নয় ভাগও ঐ ভাবেই ব্যয় করা আপনার উচিত, লেঠা চুকে যায় তাহ'লে। সেক্ষেত্রে সমাজ ফিরে পাচ্ছে সম্পত্তির শুধু এক-দশমাংশ। যাঁর ট্যাঁক থেকে বেরুল ওটা, সে কি তাঁর বদান্যতায়, না ট্যাক্স-দারোগাদের শৈথিল্যও আছে? লোকহিতৈষণাই একমাত্র সৎকাজ যার সম্বন্ধে মানুষের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। বরং শ্রদ্ধাটা যেন বেশিই করা হয়। আর আমাদের স্বার্থ-সর্বস্বতাই অতিরিক্ত শ্রদ্ধার মূলে। জোয়ানগোছের একজন গরিব লোক, এই কনকর্ডে পরিষ্কার একটা দিনে, তার জনৈক শহরবাসীর প্রশংসা করছিল, কেন না গরিবদের অর্থাৎ তাকে সে লোকটি দয়া করে। আসল আধ্যাত্মিক বাপ-মায়ের চাইতে মানুষ তার দয়ার্দ্র খুড়োখুড়ির তারিফ করে বেশি। একদা জনৈক শ্রদ্ধেয় বক্তার ইংলণ্ড বিষয়ক বক্তৃতা শুনেছিলাম। বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তিনি। শেক্‌সপিয়ার, বেকন, ক্রমওয়েল, মিল্টন, নিউটন প্রভৃতি ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের বর্ণনা শেষ করে, অতঃপর তিনি ইংলণ্ডের খ্রীষ্ট ধর্মবীরদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে, যেন তাঁর পেশার খাতিরে ওটা দরকার, এঁদের তিনি অন্য সকলের শীর্ষে স্থান দিলেন, মহদপি মহৎ হিসাবে। এঁরা হলেন পেন, হাওয়ার্ড এবং মিসেস ফ্রাই। সকলেই নিশ্চয় এর ভুয়ো বাক্যাড়ম্বর ধরতে পারবেন। শেষের কজন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নরনারী নন, শুধু হয়তো তাঁরা এর শ্রেষ্ঠ লোকহিতৈষী।

লোকহিতৈষণার বরাদ্দ প্রশংসার কিছুই আমি বাদ দিতে চাই নে, কিন্তু যাঁদের জীবন আর কৃতি সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ, তাঁদের সকলের জন্যও সুবিচার চাই। মানুষের সাধুতা আর বদান্যতাকে শ্রেষ্ঠমূল্য দিই নে আমি, এগুলো বলতে গেলে ডাল-পাতা। যে সব গাছের কাঁচা-পাতা শুকিয়ে আমরা অসুস্থদের জন্য ভেষজ চা বানাই, তাদের উপকারিতা যৎসামান্য, কেবল হাতুড়ে বৈদ্যরাই ব্যবহার করে সেগুলো। আমি চাই মানুষের ফুল আর ফল, যাতে করে তাঁদের কিছুটা সুগন্ধ আমার কাছে ভেসে আসে আর পরস্পরের সম্পর্কে পরিণতির সুস্বাদ আনে। যাঁর সততা মাত্র কোন খণ্ডিত ক্ষণস্থায়ী কাজ নয়, অফুরন্ত নির্ঝর, যে জন্য তাঁর কিছু কষ্ট পেতে হয় না, যে সম্বন্ধে তিনি সচেতনই নন। এমন দাক্ষিণ্য যাতে সহস্র দোষ ঢাকা পড়ে যায়। লোক-হিতৈষী প্রায়ই আবহমণ্ডলের মতো অতীত দুঃখ-কাহিনীর স্মৃতিতে মানুষকে

ঢেকে ফেলে এবং তাকেই সমবেদনা আখ্যা দেয়। নৈরাশ্য নয়, সাহস সঞ্চার করতে হবে; অস্বাস্থ্য নয়, স্বাস্থ্য ও স্ফুর্তি; খেয়াল রাখতে হবে যে নৈরাশ্য আর অস্বাস্থ্য সংক্রামিত হয়ে বিস্তার লাভ না করে। কোন সে দক্ষিণ জনপদ যেখান থেকে আর্তনাদ শোনা যায়? কোন ভূ-বৃত্তে অবিশ্বাসীর বাস, যেখানে আলোক প্রেরণ করতে হবে আমাদের? কে সে উচ্ছৃঙ্খল নৃশংস ব্যক্তি যার পাপমোচন করতে হবে আমাদের? যদি কিছুতে পীড়া দেয় কাউকে, তার শারীরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে অপারগ হয় সে, যদি তার অন্ত্রে বেদনা বোধ হয় সমবেদনার উৎস তো সেখানেই—অমনি সে সংস্কারে, বিশ্ব-সংস্কারে লেগে যায়। সেই তো বিশ্বজগৎ, তাই আবিষ্কার করে বসল পৃথিবীময় লোক কাঁচা আপেল উদরসাৎ করছে,—অকৃত্রিম আবিষ্কার এবং সে আবিষ্কারের কর্তা তো সেই হবে। তার চোখে সত্যই সমগ্র পৃথিবীটা প্রকাণ্ড একটা কাঁচা আপেল এবং ভাবতে পর্যন্ত ভীষণ লাগে তার যে, পরিপক্ক হবার আগেই মনুষ্যশিশুরা সেই আপেলে কামড় দিতে চাইবে। সুতরাং অচিরাৎ তার উৎকট লোক-হিতৈষণায় ধরা পড়ে এস্কিমোরা, ধরা পড়ে প্যাটাগোনিয়ার অধিবাসীরা এবং ভারতের ও চীনের জনবহুল গ্রামগুলোকেও পরিবেষ্টিত করে। ইতিমধ্যে অবশ্য শক্তিমানেরা তাকে নিজেদের কাজে লাগায়, কিন্তু কয়েক বৎসরের লোকহিতকর কর্মতৎপরতায় নিঃসন্দেহে সে উদরাময় থেকে নিরাময় হয়, পৃথিবীর এক কি উভয় গণ্ডই লালিমা ধারণ করে, বুঝি পাকতে সুরু করেছে এবং জীবন যেন অপরিপক্কতা পরিহার করে, বেঁচে থাকা পুনরায় মধুময় এবং মঙ্গলজনক মনে হয়। কিন্তু আমি আমার স্বকৃত দুষ্কর্মের চাইতে অধিকতর দুষ্কৃতির কল্পনা করতে পারি না। আমার চাইতে দুর্বৃত্ততর কোন ব্যক্তির সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ-লাভ ঘটে নি আমার, ঘটবেও না কখনও।

আমি মনে করি, সংস্কার-সাধককে যা বিমর্ষ করে, তা মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি সমবেদনা ততটা নয়, যতটা নিজের পীড়া, তা ভগবানের যত বড় সুসন্তানই তিনি হন। পীড়া থেকে তিনি মুক্তিলাভ করুন, বসন্ত সমাগম হ'ক, ঊষার উদয় হ'ক তাঁর জীবনে, বিনা ক্ষোভে তিনি তাঁর উদারহৃদয় সঙ্গীদের বর্জন করে আসবেন। তাম্রকূট সেবনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা না দেওয়ার আমার কৈফিয়ত এই যে আমি কখনও তাম্রকূট সেবন করি নি। অভ্যাসমুক্ত তাম্রকূট-সেবীদের সে আক্কেলসেলামি দিতেই হবে। আমি সেবন করেছি এমন অনেক বস্তুর বিরুদ্ধেই অবশ্য আমার বক্তৃতা দেওয়া চলে। কিন্তু আপনি যদি এই সব লোকহিতৈষণার কোনটার পাকে জড়িয়ে পড়েন, তবে যেন আপনার ডান হাতের কাজ বাম হাত না জানতে পারে, কারণ জানবার মতো কিছু নয় ওটা। ডুবন্ত লোককে উদ্ধার করুন, করে কেটে পড়ুন। যতদিন ভাল লাগে, করতে থাকুন, তারপর কোন স্বাধীন কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

সাধ্বপর্বষদের সংস্পর্শে আমাদের শিষ্টাচার নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের স্তোত্রমালা ভগবানের উদ্দেশে স্বললিত শাপ-শাপান্তের ঝংকার তুলছে। আর তাই দিয়েই তাঁকে অনন্তকাল সঞ্জীবিত রাখছে। মনে হয়, এমন কি পীর-পয়গম্বররাও মান্বষের আতঙ্কের নিরসন করে গেছেন, তার আশা-ভরসার পোষকতা করেন নি। জীবনকে উপহার লাভের ফলে অনাবিল উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রসাদ, ভগবানের কোন অবিস্মরণীয় স্তবগান কোথাও মেলে না। যত স্বদ্বরসংস্থিত তথা বিশিলষ্টই মনে হ'ক, স্বাস্থ্য ও সাফল্য মাত্রই আমার মঙ্গল-বিধায়ক, আর পরস্পর যত ব্যথার ব্যথী হই নে কেন, অস্বাস্থ্য ও অসাফল্য মাত্রেই আমি নিরানন্দ বোধ করি, আমার অনিষ্ট হয় তাতে। প্রকৃত ভারতীয়, উদ্ভিদন্বগ, চৌম্বকধর্মী, অথবা প্রকৃতিনিষ্ঠ পন্থায় আমরা যদি মন্বষ্যজাতির প্বনর্বাসন কামনা করি, তবে প্রথমেই আমাদের নিজেদের প্রকৃতির মতোই সরল এবং নীরোগ হ'তে হবে, যে মেঘে আমাদের দৃষ্টি আবৃত, তাকে অপসারিত করতে হবে, আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিঞ্চিৎ প্রাণধর্ম সঞ্চারিত করতে হবে। দরিদ্রদের তত্ত্বাবধায়ক হবার জন্য বেঁচে থাকা নয়, জগদ্বরেণ্যদের একজন হবার সাধনা কর।

শিরাজের শেখ সাদীর গ্বলিস্তাঁ, অর্থাৎ ফ্বলবাগিচা নামক গ্রন্থে পাঠ করেছি, "লোকে জনৈক জ্ঞানী প্বর্বষকে জিজ্ঞাসা করে ; খোদাতাল্লাহ্ বহ্বৎ নামী গাছকে উন্নত আর ছায়াময় করে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তার কোনটাকেই আজাদ অর্থাৎ ম্বক্ত অভিহিত করা হয় না, এক সাইপ্রেস ছাড়া। কিন্তু সে তো নিষ্ফলা। এর নিগূঢ় রহস্যটা কি ? তিনি উত্তর দেন, প্রত্যেক গাছেরই যথাবিহিত ফসল হয়, যথানির্দিষ্ট ঋতু আছে তার, যতদিন মেয়াদ থাকে তার ততদিন তাজা আর ফলন্ত থাকে। মেয়াদ ফুরলে শ্বকিয়ে যায়, রসও থাকে না। এই দ্বই অব-স্থার কোনটাই সাইপ্রেসের বেলায় খাটে না। সে হামেশাই বাড়ন্ত। যাঁরা আজাদ অর্থাৎ স্বধর্মনিষ্ঠ তাঁদেরও এই স্বভাব। যা দ্বদিনের, তোমার মন যেন তাতে না মজে। মনে রেখ, খলিফার বংশ ফৌত হয়ে যাবে, কিন্তু তখনও বোগদাদের উপর দিয়ে দিজ্লা বা তাইগ্রিস বয়ে চলবে। তোমার ধনদৌলত থাকে, খেজ্বর গাছের মতো শরীফ হও। কিন্তু দেবার মতো দৌলত যদি না থাকে, আজাদ বন্ যাও, অর্থাৎ ম্বক্ত হও সাইপ্রেস তর্বর মতো।"

পরিপূরক কবিতা

দারিদ্র্যের দর্প

নিতান্তই স্পর্ধা হয়, যদি ভিক্ষাশ্রয়ী দীন অধমের
সাধ জাগে নভস্তলে স্থান কামনার,
পর্ণ কুটিরেতে এক টুকরির বুকে
আগুলিয়া রাখি শুধু অকর্মণ্য পাণ্ডিত্যের ভার,
অতিক্ষীণ আতপ আড়ালে, অন্ধকার প্রবাহের কূলে
টব-শোভা লতা-পাতা মাঝে। দক্ষিণ করেতে যথা
মন হ'তে উপাড়িয়া চলে মানুষের শত কামনায়,
বৃন্তে যার ফুল্ল-স্ফুট প্রাণ দল মেলে,
প্রকৃতিরে ভ্রষ্ট করি, ইন্দ্রিয়ে নিগ্রহ
দানব গর্গন যেন পাথর বানায় কৃতী নরে।

প্রয়োজন নাই কোন নিরানন্দ সাহচর্য
ঐ শুধু বাধ্য হওয়া সংযতাচারের,
স্বাভাববিরোধী ঐ জড়বুদ্ধিতায়
জানে না কি সুখ, কি বা দুখ। কিংবা ঐ জোর করা
অসত্য উচ্ছ্বাসময় ক্লীব সহিষ্ণুতা
কর্ম পরিহরি। এই নীচ ঘৃণ্য নরকীট
নিরাপদ মধ্যবিত্ততায়,
সাজে শুধু যার দাস মন। মোরা যাই ছুটে
এমন কৃতিত্বে যার আতিশয্য অসহ্য না লাগে,
বীরোচিত বদান্য কৃতিতে, রাজোচিত ঐশ্বর্য সম্ভারে,
অন্তর্যামী বিচক্ষণতায়, উদারতা
সীমা নাই যার, আর সেই বীরের আচার
প্রাচীনেরা নাম দেয় নাই যার,
দিয়াছে আদর্শ শুধু। হারকিউলিস,
একিলিস, থেসিয়ুস যথা। ফিরে যাও ঘৃণ্য কক্ষকোণে,
যখন দেখিতে পাবে অভিনব প্রদীপ্ত মণ্ডল
শুধু মনে বুঝে দেখ, কারা ছিল বরেণ্য প্রবর।

টি· ক্যারু।

॥ ২ ॥ কুত্রাবসম্‌ কো বা সংকল্পঃ

জীবনে এক একটা সময় আসে যখন যে কোন জায়গাতেই ঘর বাঁধবার উপযোগী ভিটে খুঁজে পাবার একটা ঝোঁক আসে। যেখানে আমি থাকি তার চারপাশে মাইল বারো জুড়ে যত জায়গা সব এই ঝোঁকে পড়ে দেখে বেড়িয়েছি। যত জোত-জমি একের পর এক সব কিনে ফেলেছি—কল্পনাতে। সব গুলোই বিক্রি ছিল, দর-দামও জানতাম। গৃহস্থ চাষী মাত্রেরই বাড়ি হেঁটে পাড়ি দিয়েছি, বুনো আপেল চেখে দেখেছি, চাষ আবাদ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছি, যে দাম চেয়েছে যত চড়াই হ'ক তাতেই রাজি হয়েছি তার জোতজমি কিনে নিতে। তারই কাছে আবার বন্ধকও রেখেছি মনে মনে। এমন কি, সে যে দাম চেয়েছে, তার চাইতেও বেশি দাম কবুল করেছি। দলিল বাদে সবই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। বলেছি তার কথাই দলিল। কথাবার্তা কইতে বড় ভাল লাগে আমার। জমির সংস্কার সাধন করেছি, শুধু জমির নয়, মনে হয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে জমির মালিকেরও। খানিক বাদে চলে এসেছি বাদ বাকি কাজটা তার ঘাড়েই ফেলে রেখে। এই অভিজ্ঞতার দৌলতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে জমি বিক্রির দালাল বলে প্রসিদ্ধি লাভও ঘটেছে আমার। যেখানেই বসি, সেখানেই বসবাস করতে ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছা চারপাশের দৃশ্যকে আলোয় ভরে তোলে। বসবার ঠাঁই ছাড়া ঘর আর কি ?—গ্রামাঞ্চলে হলেই অবশ্য ভাল। অদূর ভবিষ্যতে বাসোপযোগী হবার কোন সম্ভাবনা নেই, এমন কত জায়গাতে ভিটে বাঁধবার ঠাঁই খুঁজে পেয়েছি। অনেকে সে সব জায়গাকে গ্রাম থেকে বহুদূরে বলে ভয় পাবেন। আমার মনে হয়েছে গ্রামই সে জায়গা থেকে বহু দূরে। বেশ থাকতে পারি সে সব জায়গায়। আর বাস করেওছি সেখানে, এক ঘন্টা হ'ক, একটা গ্রীষ্ম কি একটা শীতকাল, যাই হ'ক। দেখেছি বছরের পর বছর কেমন কাটিয়ে দেওয়া যায়, শীত কাটিয়ে বসন্তের সমাগম দেখেছি। এই সব অঞ্চলের ভবিষ্যৎ বাসিন্দারা যিনি যেখানেই ঘর তুলুন, সব জায়গাই তাঁর আগে কেউ দখল করেছিল, এ কথা তিনি ধরে নিতে পারেন। জায়গাটিতে ফলের বাগান, বনভূমি, গোচারণের মাঠ কোথায় কি হবে, কোথায় ফটকের সামনে মানাবে এমন সুন্দর সুন্দর ওক আর পাইন, আর ঠিক কোথায় প্রতিটি বৃক্ষকে বেশ মানানসই লাগে, এসব ব্যবস্থা করার পক্ষে

একটা বিকালই যথেষ্ট। জমিটা পড়ে থাক না কেন,—অনাবাদী হয়েই। যে-পরিমাণ সম্পদ মানুষ ব্যবহার না করে থাকতে পারে, সেই অনুপাতেই তো সে ধনবান।

কল্পনাকে এতদূর গড়িয়ে নিয়ে গেছি যে মনে হয়েছে গোটাকয়েক জোত পাওয়া যায় নি—না পেতেই তো চেয়েছিলাম সেগুলো। কিন্তু খাস দখল নিতে গিয়ে কখনও হাঙ্গামা বাধাই নি। হলওয়েলের জমিটার বেলাতেই খালি সত্যি সত্যি দখলের খুব কাছাকাছি এগিয়েছিলাম। কোনটা কি বীজ, গোছগাছ করে ফেলেছিলাম। এখান থেকে ওখানে মাল বোঝাই কি খালাস করে দিয়ে আসার জন্য এক চাকার ঠেলাগাড়ির দরকার বলে তার যন্ত্রপাতিরও যোগাড় করেছিলাম। কিন্তু মালিক দলিলপত্র দেবার আগেই তাঁর স্ত্রীর—পুরুষ-মাত্রেরই স্ত্রী এমনিতরো হয়ে থাকে—মতলব বদলে গেল, তিনি সম্পত্তিটা রাখতে চাইলেন। সুতরাং তাঁকে জমিটা ফিরিয়ে দিতে চাইলে তিনি আমাকে দশ ডলার মূল্য ধরে দিলেন। এখন, সত্যি কথা বলতে কি, আমার মোট ভব-সম্পত্তি বলতে ছিল দশটা সেণ্ট। তাই আমার অঙ্কের বিদ্যায় থই পাই না যে সেই দশ সেণ্টের, না জোতটার, না দশ ডলারের, না একত্রে সব কটার, কোনটার মালিক আমি। যাই হ'ক, তাঁকে তাঁর দশ ডলার আর সম্পত্তি, কিছু থেকে বঞ্চিত হতে হ'ল না—এমনিতেই বাড়াবাড়ি হতে চলেছিল বলে অথবা দয়াপরবশ হয়েই যে মূল্যে কিনেছিলাম সম্পত্তিটা, সেই মূল্যেই বেচে দিলাম তাঁকে। আর ধনী নয় বলে দশ ডলার উপহারও দিয়েছিলাম তাঁকে। এ সত্ত্বেও আমার দশ সেণ্ট, বীজ, সেই ঠেলাগাড়ির যন্ত্রপাতি সবই আমার রইল। সুতরাং বুঝতে পারলাম যে আমার বিত্তহীনতার কিছুমাত্র হানি না করেও আমি বিত্ত পেয়েছি। উপরন্তু, বনস্থলীটায় আমার স্বত্ব তো রইলই। তারপর থেকে ঠেলাগাড়ির দরকার হয় নি, প্রতি বৎসরই তার ফসল আমি সংগ্রহ করে এনেছি। বনস্থলীটার সম্বন্ধে বলা চলে ঃ—

> "যা দেখি চারিধার, আমিই রাজা তার,
> আমার অধিকার কে না করে স্বীকার।"

মধ্যে মধ্যে দেখতে পাই, কোন কোন কবি কোন কোন ভূমিখণ্ডের সব চাইতে ভাল অঞ্চলের ঐশ্বর্য আহরণ করে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। নীরস চাষী ভেবেছে, খালি গোটাকয়েক বুনো আপেলই বুঝি তিনি নিয়ে গিয়েছেন। আসল কারণটা বুঝতে অনেক বছর লেগেছে মালিকের। এর মধ্যে তার সেই ভূমিখণ্ডকে কবি চর্মচক্ষুর অগোচর উৎকৃষ্ট যে আবেষ্টনী, সেই ছন্দে আবন্ধ করেছেন, তাকে শৃঙ্খলিত করেছেন, দোহন করেছেন, নবনী সংগ্রহ করেছেন, চাষীর অংশে রয়ে গেছে সর-তোলা বাকি দুধটুকু।

আমার কাছে হলওয়েল-খামারের প্রকৃত আকর্ষণ ছিল ঃ এর পরিপূর্ণ

নির্জনতা, গ্রাম থেকে খামারটা প্রায় দুই মাইল দূরে, নিকটতম পড়শীও এখান থেকে আধ মাইল দূরে, বড় রাস্তা থেকে পৃথক করে রেখেছে প্রশস্ত একটা মাঠ; খামারটির সীমানায় নদী; নদীর কুয়াসা, মালিক বলতেন, জায়গাটিকে বসন্তকালে তুষারের কবল থেকে রক্ষা করত—আমার অবশ্য তাতে যায় আসে নি কিছু; এই খামার-বাড়ি আর গোলাঘরের ধ্বংস-প্রায় অবস্থা, তার ধূসর বর্ণ আর প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ—আমার আগে যিনি এখানে থেকে গেছেন, তাঁর আর আমার আসবার মধ্যে একটা ছেদ টেনে দিয়েছিল; ফাঁপা-ফাঁপা সেই শ্যাওলা-পড়া আপেল গাছ, খরগোস এসে দাঁত দিয়ে কেটেছে, দেখিয়ে দিয়েছে আমার পড়শীরা কেমন হবে; কিন্তু, সব ছাপিয়ে, মনে পড়ছে প্রথম যেদিন নদীপথে যেতে এর দর্শন পাই, তার স্মৃতি—মেপল-এর লাল কুঞ্জের আড়ালে বাড়িটা আত্মগোপন করে আছে, মাঝে মাঝে বাড়ির কুকুরটার ডাক কানে এসে পৌঁছচ্ছে। পাছে অধিকারী মশায় আপেল গাছ কয়টা কেটে-কুটে টিলা জমি সমতল করতে লেগে যান, মাঠে যে কয়টা কচি বার্চের চারাগাছ জন্মেছে তাদের উপড়ে ফেলেন, তাই সোজা কথায় বলতে গেলে, এবংবিধ নানা সংস্কার করবার আগেই কালবিলম্ব না করে আমি সেটা কিনে ফেলতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি। ঠিক ঐ সবের সুযোগ নেবার জন্যই আমি তাড়াতাড়ি এটা হাতে চেয়েছিলাম। দৈত্য অ্যাটলাস যেমন ভূমন্ডলটাকেই কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তেমনি ভাবে। তিনি এর কোন ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন বলে শুনি নি। যে কাজ করতে মন চেয়েছিল, তার পিছনে কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না, বিশেষ কোন তাৎপর্যও ছিল না। কিন্তু যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সমস্ত উপস্বত্বটা ভোগ করতে পারি, তাই মূল্য দিতে রাজী ছিলাম। মনে মনে আমি সর্বক্ষণ এঁচেছিলাম, শুধু যদি ফেলে রাখতে পারি, আমি যে জাতের ফসল চাই, ওখান থেকে তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। শেষ পর্যন্ত কি হ'ল আগে বলেছি।

ফলাও করে চাষ-আবাদের বিষয়ে আমার তখন বলবার মধ্যে শুধু এই টুকুই ছিল যে,—বরাবরই আমার বাগানের সখ আছে—আমার কাছে বীজটা মজুদ ছিল। অনেকে বলে থাকেন যে যত সময় যায় তত বীজের গুণ বাড়ে। আমারও সন্দেহ নেই যে সময় গেলে অন্তত ভাল-মন্দের তফাতটা বোঝা যায়। শেষ পর্যন্ত আবাদ করব যখন হতাশ হব না। সতীর্থদের কিন্তু এই কথা নিঃসংশয়ে নিবেদন করতে পারি ঃ যতদিন সম্ভব স্বাধীন আর নির্লিপ্ত থাকবার চেষ্টা করাটা ভাল। আবাদের জমি আর শহরের জেল—আটকে পড়লে দুয়ের মধ্যে কোন তফাত নেই।

বিচক্ষণ কেটোর ডি রি রাস্টিকা আমার চাষ প্রণালী—এর একমাত্র যে অনুবাদগ্রন্থ আমি দেখেছি, তার মধ্যে এই অংশটা একেবারেই অর্থহীনভাবে অনুবাদ করা হয়েছে—"আবাদের জন্য জমি নিতে ইচ্ছা থাকলে মনে তা গোপন

রাখতে হবে। লোভে পড়ে কিনে ফেললে চলবে না। একবার গিয়ে ঘুরে এলেই যথেষ্ট মনে করা চলবে না। যতবার পারা যায়, তাকে দেখা দরকার। যদি সত্যি সত্যি ভাল হয়, তবে যত দেখা যাবে, তত ভাল লাগবে।" সুতরাং, ঠিক করেছিলাম, লোভে পড়ে কিনব না। আমরণ শুধু ঘুরে ফিরে দেখে যাব। যদি প্রথম দিকে মন-প্রাণ দিয়ে দেখে নিতে পারি তবে শেষে আনন্দলাভ হবে বেশি।

এই ধরনের যে প্রয়াস করেছিলাম, এখন তার কথাই সবিস্তারে বলছি। ভাল করে বলবার উদ্দেশ্যে দুই বৎসরের অভিজ্ঞতা একত্র উপস্থিত করছি। আগেই বলেছি, আমার লক্ষ্য নিষ্ফল সাধনার গাথা রচনা নয়। রাত্রির আশ্রয় থেকে ভোরবেলায় মোরগ যে উৎসাহ নিয়ে ডেকে ওঠে, আমার ইচ্ছা তেমনি করে ডেকে ওঠার—যাতে পাড়া-পড়শীর ঘুম ভাঙে।

প্রথম যেদিন বনবাস সুরু করি অর্থাৎ দিন আর রাত্রি দুই-ই কাটাতে আরম্ভ করি সেখানে, ঘটনাচক্রে সেটা স্বাধীনতা দিবস, ১৮৪৫ সালের ৪ঠা জুলাই। তখনও আমার বাসগৃহকে শীতকালের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়ে ওঠে নি, তখন শুধু বর্ষায় মাথা গুঁজবার মতো ঠাঁই সেটা। পলেস্তারা নেই, চিমনি নেই, রোদে পোড়া বৃষ্টিতে ভেজা কাঠের এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল, স্থানে স্থানে বড় বড় ফোকর রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা রাখে ঘরটাকে। সোজা সাদা কাঠের খুঁটি সব, জানালা-দরজায় নতুন পাল্লা সদ্য সদ্য লাগানো হয়েছে। সব মিলিয়ে ঝকঝকে, খোলা-মেলা ভাব, বিশেষ করে সকালের দিকটায় যখন কাঠের তক্তা সব ফোঁটা ফোঁটা শিশিরে ভরে যায়, মনে হয় দুপুরের দিকটায় হয়তো কোন সুগন্ধি নির্যাস বেরবে তা থেকে। সারাদিন ধরে ভোরবেলার এই ভাবটা আমার কল্পনায় ওকে ঘিরে থাকত। বছর খানেক আগে বেড়াতে গিয়েছিলাম পাহাড়ে। সেখানকার একটা বাড়ির কথা মনে পড়ত থেকে থেকে। পলেস্তারা-বিহীন, খোলা-মেলা একটা প্রকোষ্ঠ মাত্র। স্বর্গের কোন দেবতা বিহারে এলে তাঁর অভ্যর্থনার উপযুক্ত স্থান, কোন দেবী তাঁর বসনাঞ্চল দিয়ে ভূমিস্পর্শ করতে পারেন সেখানে। আমার আস্তানার উপর দিয়ে হাওয়া বয়ে যেত। পাহাড়ের গায়ে হাওয়ায় টুকরো টুকরো সুরের মূর্ছনা ভেসে আসে, বুঝি মর্ত্য সঙ্গীতের অপার্থিবতার সংকেত নিয়ে। ভোরের হাওয়া সারাক্ষণই বয়ে চলেছে, বিশ্বসৃষ্টির ছন্দোরচনা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু লোক কোথায় যে শুনবে। মর্ত্যভূমির বাইরেটায় সর্বত্রই স্বর্গরাজ্য।

নৌকো বাদ দিলে এর আগে একটি মাত্র যে আশ্রয়স্থল ছিল আমার, সেটা একটা তাঁবু। গ্রীষ্মকালে অভিযানে বেরুলে সেটাকে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করতাম। এখনও সেটা আমার কুঠুরিতে ভাঁজ করা অবস্থায় রয়ে গেছে। কিন্তু নৌকোটি হাত বদলাতে বদলাতে কালপ্রবাহে কোথায় ভেসে গেছে। তুলনায়

এখন এই ভদ্র ভদ্রাসনটি পেয়ে সংসার গোছাবার দিক দিয়ে উন্নতির পথে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। এই আবেষ্টনীটা এর যৎসামান্য আচ্ছাদন সত্ত্বেও আমার চারপাশে আবরণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াল—নির্মাতার উপর প্রতিক্রিয়াও হ'ল। যেন কোন ছবিতে চারপাশে রেখার বেড় দেওয়া হয়েছে এমনি একটা ইঙ্গিত ছিল এর মধ্যে। হাওয়া খেতে আর বাইরে যাবার দরকার হ'ত না, ভিতরের আবহাওয়ার প্রফুল্ল ভাবটি তখনও পুরোপুরি বজায় ছিল। এমন কি খুব জোরাল বর্ষাতেও যেখানটা আড্ডা গাড়তাম সেটা ঠিক ঘরের মধ্যে বন্দী হওয়া নয়, একটা দরজার আড়ালমাত্র। হরিবংশ-এ উল্লেখ আছে, "যে-আবাস পক্ষিহীন, সে আবাস মশলাবিহীন মাংসের তুল্য।" আমার আবাস সম্বন্ধে সে কথা বলা চলবে না, নিজেকে একেবারে পাখিদের পড়শী মনে হ'ত সারাক্ষণ। কোন পাখিকেই আমায় খাঁচায় পুরতে হয় নি। নিজেই বরং তাদের মধ্যে গিয়ে খাঁচায় বন্দী হয়ে ছিলাম। ফুল কি ফলের বাগানে যে-সব পাখিরা সচরাচর উড়ে বেড়ায় শুধু তাদের মধ্যেই নয়, অরণ্য অঞ্চলে যে সব বুনো মন-ভোলান পাখি গান গেয়ে ফেরে, পল্লীবাসীরা পর্যন্ত যে আনন্দ কদাচিৎ সম্ভোগ করতে পায়, তাদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম—উড-থ্রাশ, ভিয়েরি, স্কারলেট ট্যানেজার, ফিল্ড স্প্যারো, হুইপ পুয়োর উইল, আরও কত।

কনকর্ড গ্রাম থেকে দক্ষিণে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটা ছোট পুষ্করিণীর কূলে আমার এই ভদ্রাসন পেতেছিলাম। কনকর্ডের চাইতে খানিকটা উঁচুতে, এই শহর আর লিংকনের মধ্যে যে প্রকাণ্ড বন, তার ঠিক মধ্যস্থলে। একমাত্র যে মাঠটার একটু খ্যাতি শোনা যায় আমাদের, সেই কনকর্ড ব্যাটল গ্রাউণ্ডের দক্ষিণে দুই মাইল মতো দূরে। কিন্তু বনের এমন অন্তরালে গিয়ে পড়লাম যে বিপরীত দিকটাতে আধ মাইল দূরেই—চারদিকের মতো সেটাও জঙ্গলে ঢাকা—সুদূর দিগন্তকে যেন দেখতে পেতাম। প্রথম সাতদিন যত বার পুষ্করিণীটার দিকে চেয়ে দেখেছি, মনে হয়েছে, পাহাড়ের ধারে অনেকটা উঁচুতে যেন পার্বত্য হ্রদ, অন্য সব হ্রদের উপর দিকটারও বেশ খানিকটা উপরে যেন তার তলাটা। সূর্যোদয় হলে দেখতাম সে তার কুয়াসার রাত্রিবাস খুলে ফেলেছে। এখানে-ওখানে ক্রমে ক্রমে তার অতিক্ষীণ বীচিমালা কিংবা সুমসৃণ উপরিভাগটা চিক চিক করে উঠত। ততক্ষণে কুয়াসা নিশাচরের মতো আস্তে আস্তে বনের চারদিকে চুপি চুপি সরে গেছে। যেন রাত্রির অন্ধকারে কোন গুপ্ত সভা বসেছিল, তার অধিবেশন সাঙ্গ হ'ল। পরে যখন যথারীতি বেলা বাড়ত, তখনও যেন মনে হ'ত শিশিরকণা গাছে গাছে লেগে রয়েছে, যেমন পাহাড়ের গায়ে তারা লেগে থাকে।

যখন বাতাস আর জল দুই-ই সম্পূর্ণ নিশ্চল, কিন্তু আকাশ মেঘে

ঢাকা, ঠিক দুপুর বেলাতেও সন্ধ্যার প্রশান্তি, চারপাশে উড্‌-থ্রাশের কাকলি শোনা যায়, একূলে-ওকূলে তার প্রতিধ্বনি, তখন আগষ্ট মাসে মধ্যে মধ্যে ছোটখাট রকমের ঝড়বৃষ্টি হ'ত। তার ফাঁকে ছোট হ্রদটি একমাত্র প্রতিবেশী হিসাবে মনকে নাড়া দিত। এই সময়টিতে এই সব হ্রদের জল যত নিস্তরঙ্গ থাকে, ততটা আর কোন সময়ে থাকে না। এর উপরকার পরিষ্কার আকাশটুকু তখন মেঘে মসীমাখা হয়ে উঠেছে, জলে শুধু আলো আর প্রতিবিম্বের খেলা দেখা যায়, তখন স্থানটিকে সত্যই মর্ত্যভূমে স্বর্গরাজ্য বলে মনে হ'ত, মহিমময় হয়ে উঠত সবটা। কাছাকাছি একটা পাহাড়ের উপর দিকটাতে বন-জঙ্গল সদ্য পরিস্কার করা হয়েছিল। সেখান থেকে দৃশ্যটা মনোরম। পুষ্করিণীটার আড়াআড়ি দক্ষিণে পাহাড়ের গায়ে বেশ খানিকটা জায়গা। ওদিকটার তীর সেটা। ঢালু হয়ে নেমেছে সেখানে বিপরীত দুই প্রান্ত। মনে হ'ত কাননময় উপত্যকা থেকে কোন নির্ঝরিণী বুঝি সেই দিকটাতে বয়ে চলেছে। কোন ঝরণা অবশ্য ছিল না সেখানে। চেয়ে থাকতাম সেই দিকে। কখনও মাঝামাঝি জায়গায়, কখনও তা ছাড়িয়ে। সামান্য দূরের পাহাড় সব সবুজ রঙের, কিন্তু চক্রবালের দিকে উঁচু পাহাড়গুলো নীলাভ। পায়ে ভর দিয়ে আরও উঁচু হয়ে দাঁড়ালে আভাস পেতাম উত্তর-পশ্চিমে আরও দূরের পর্বতশ্রেণীর, তাদের চূড়োগুলো আরও নীল, স্বর্গের নিজস্ব টাকশালে তৈরি খাঁটি নীল মুদ্রার মতো। নজরে পড়ত গ্রামের খানিকটাও। কিন্তু অন্য কোন দিকে এ-ভাবে দাঁড়ালেও আমার চারপাশের ঘন জঙ্গল ভেদ করে কি তার উপর দিয়ে নজর যেত না। কাছাকাছি কোন জলাশয় থাকা ভাল। মাটিকে প্রাণবন্ত রাখে, ভাসমান রাখে। অতি ক্ষুদ্র কূপেরও তাই মূল্য আছে। তার ভিতরে উঁকি মারলে বোঝা যায় পৃথিবীটা খালি মহাদেশ নয়, এর চারদিকে জল। গুরুত্ব আছে এর, মাখন ঠাণ্ডা রাখা হয় এই নীতিতে। এই চূড়াটার উপর চড়ে পুকুর পেরিয়ে সুড্‌বেরি প্রান্তরের দিকে চেয়ে থাকতাম। বন্যার সময় সেটা একটু উঁচুতে উঠে পড়ে বলে দেখা যেত যেন। বোধ হয় তপ্ত উপত্যকার বুকে কোন মরীচিকার খেলা। স্বল্পগভীর পাত্রে মুদ্রাখণ্ডের মতো। মধ্যের এই স্বল্প-পরিসর জলাশয়টির জন্য, পুষ্করিণীটার ওপারের সমস্ত ভূমিখণ্ডটাকে মনে হ'ত যেন এক টুক্‌রো মাটির চারপাশে জল, আর সেটা জলে ভাসছে। তখন মনে পড়ত যে যেখানটায় আছি, সেখানটা ডাঙা জমি।

আমার দরজার সামনে থেকে দৃশ্যটা আরও সংকীর্ণ লাগলেও এতটুকুও স্থানাভাব বা চাপা-চাপা লাগত না। কল্পনার যথেষ্ট খোরাক মিলত। ওপার গিয়ে পড়েছে বনবাদাড়ের মতো ওকগাছ আকীর্ণ মালভূমিতে, পশ্চিমে প্রেরি আর তাতারের স্টেপ পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষের মধ্যে যত যাযাবর আছে, সকলের বসবাস করার পক্ষে পর্যাপ্ত। ধেনু চরাবার জন্য নতুন, আরও বড়

মাঠের দরকার মনে হতেই দামোদর বলেছিলেন, "যারা অবাধে দিগন্ত পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে, পৃথিবীতে তাদের চাইতে সুখী আর কেউ নয়।"

স্থান আর কাল, দুয়েরই পরিবর্তন হয়েছিল। পৃথিবীর যে সব অঞ্চল আর ইতিহাসের যে সব যুগ সব-চাইতে আকৃষ্ট করে, নিজেকে তাদের নিকটতর বোধ করেছিলাম। যে সব অঞ্চল কেবল রাত্রে জ্যোতির্বিদদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, যেখানে বাসা বেঁধেছিলাম, সে প্রায় সেই সব অঞ্চলের কাছাকাছি। আমরা মনে করে থাকি, কোলাহল কি বাধাবিঘ্নের ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে, কোন নক্ষত্রলোকে, কাশ্যপী নক্ষত্র-মণ্ডলীও ছেড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোন সুদূর দেবলোকে বুঝি আমাদের বাঞ্ছিত কল্পরাজ্য। আবিষ্কার করেছিলাম যে, আমার আস্তানা যেখানটায় সে-স্থানটি বিশ্ব-পৃথিবীর লোক-সম্পর্ক-বর্জিত, কিন্তু চিরনবীন আর নিষ্কলুষ। কৃত্তিকা অথবা রোহিণী, শ্রবণা অথবা মৃগশিরা নক্ষত্রের কাছাকাছি অঞ্চলে ঘর বাঁধা বাঞ্ছনীয় মনে হ'লে, বাস্তবিক পক্ষে সেখানেই তো গিয়েছিলাম। অন্তত যে লোকালয় পশ্চাতে ফেলে যাই, সেখান থেকে দূরত্ব দুয়েরই সমান। আমার নিকটতম প্রতিবেশীর চোখেও সেখানকার আলোক ক্ষীণ, অতিসূক্ষ্ম কিরণে সমান মিটমিট করত। শুধু যে রাত্রে আকাশে চাঁদ থাকত না, তখনই সে কেবল আমার আলয় দেখতে পেত। বিশ্বসৃষ্টির এমন একটি জায়গায় গিয়ে সমাসীন হয়েছিলাম ঃ

"একদা জনৈক ছিল রাখাল
চরাত পাহাড়ে মেষের পাল,
পাহাড়-বিহারী-ভাবনা লইয়া মনে—
খোরাক যোগাত উভয়েই ক্ষণে ক্ষণে।"

যদি এই রাখালের ধেনু সর্বদা তার নিজের ভাবরাজ্যকে অতিক্রম করে কোন উঁচু মাঠে চরতে যেত, তবে রাখালের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে কি ধারণা হ'ত ?

প্রত্যেক দিন সকালে উঠে আমন্ত্রণ আসত প্রকৃতির সঙ্গে জীবনযাপন সরল করে গড়ে তুলবার,—কাপট্যহীনও বলতে পারি। ঊষাদেবীর পূজারী হিসাবে আমার নিষ্ঠা গ্রীকদের তুল্য ছিল। সকাল-সকাল উঠতাম, তারপর পুষ্করিণীতে স্নান করে নিতাম। পূজাহ্নিকের মতো নিত্যকৃত্য ছিল এটা, আমার আর সব কাজের মধ্যে সেরা কাজ একটা। নৃপতি চিং-থাংয়ের স্নান-পাত্রে এই মর্মে লিপি খোদাই ছিল বলে শোনা যায়, নিজেকে নিত্য প্রক্ষালন কর, বারংবার, আজীবন কর। আমি মর্মানুধাবন করতে পারি এ কথার। সকাল বেলাটা পৌরাণিক যুগের কথা মনে আনিয়ে দেয়। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ঘরের দরজা-জানালা উন্মুক্ত করে বসতাম, নিরুদ্দেশ যাত্রার মশক অস্পষ্ট গুঞ্জন তুলে মনকে অসামান্য রূপে নাড়া দিত: যশোগাথা-উদ্গাতা ভেরি-নিনাদ

শুনলে যেমনটা হয়, তেমনি। স্বয়ং হোমার যেন স্তোত্র পাঠ করছেন, ইলিয়াড আর অডিসির রোষ-নির্ঘোষ আর অভিযানের সুর শুনতে পেতাম কানে। চিরন্তন কিছু থেকে থাকবে এর মধ্যে, বিশ্ব-পৃথিবীর অনন্ত যৌবন আর সৃষ্টি-শক্তির চিরপ্রকাশ, আজও অজ্ঞেয়। দিনের মধ্যে সব চাইতে স্মরণযোগ্য হ'ল প্রভাতকাল—জাগরণের ক্ষণ। আমাদের মধ্যে তন্দ্রালুতা তখন নেই বললেই চলে। অন্তত একটি ঘন্টার জন্যও আমাদের কিছু অংশ জাগরূক থাকে, দিন-রাত্রির অবশিষ্ট সময় যা সুপ্ত। যে ভাব-লোকে নিদ্রামগ্ন হয়েছিলাম, ইষ্টদেবতার আহ্বানে তার চাইতে উঁচু কোন ভাব-রাজ্যে জেগে না উঠে, কারখানার ঘন্টার বদলে স্বর্গ-সঙ্গীতের তালে তালে, সুগন্ধি হাওয়ায় আমাদের স্বতোৎসারিত নব-লব্ধ শক্তি আর উদ্দীপনায় না জেগে, কোন আজ্ঞাবাহীর যন্ত্রচালিতবৎ ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙে যেদিন—দিন যদি বা তাকে বলতে হয়—সেদিনটা ব্যর্থ। এই ভাবেই তো অন্ধকারেও ফল ফলে, কল্যাণময় হয় সে, আলোর চাইতে সে কম নয়। যে-ব্যক্তি বিশ্বাস করতে পারে না যে, তার ধারণার ঊর্ধ্বে প্রত্যেকটা দিনের মধ্যে অনাদি পুণ্যময় একটি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত বিরাজ করে, তার জীবন হতাশাময়, জীবনের পথ তার নিম্নগামী, অন্ধকারে পূর্ণ। ইন্দ্রিয়প্রবণ জীবন-যাপনে আংশিক বিরতি আসে তখন, মানুষের আত্মা—আত্মার যন্ত্র বলাই ভাল—নব বলে বলীয়ান হয় প্রতিটি দিবস। তখন তার পরমপুরুষের পরীক্ষা সুরু হয় নতুন করে তার জীবনে নব-মহিমার সন্ধানে। আমার বক্তব্য এই যে, সব স্মরণযোগ্য ঘটনাই প্রভাতে আর প্রভাতী পরিবেশেই ঘটে থাকে। ঊষা-কালেই ধীশক্তির জাগরণ, বেদে একথা উল্লিখিত হয়েছে। কাব্য, কলা, মানুষের সুন্দরতম, স্মরণীয় ক্রিয়াকলাপের আরম্ভের কাল এই। গ্রীক-বীর মেম্‌ননের মতোই সব কবি তথা বীর অরোরার, ঊষাদেবীর সন্তান, অরুণোদয়ে গান গেয়ে ওঠে। যে ব্যক্তির নমনীয় কিন্তু দৃঢ় ভাব-কল্পনা সূর্যের সঙ্গে তাল রেখে চলে, তাঁর কাছে সমগ্র দিন অফুরন্ত প্রভাতকাল। ঘড়ির কাঁটা আর অপর ব্যক্তির চিন্তা কি কাজকর্মের ধার তিনি ধারেন না। আমি যখন জেগে আছি, তখন আমার প্রভাত। ঊষা আমার মধ্যে নিত্য বিরাজমানা। নিদ্রা থেকে নিষ্কৃতির প্রয়াসই নৈতিক শক্তি। যদি ঘুমিয়েই না থাকে, তবে মানুষ সারাদিনের কাজে এত ব্যর্থ হয় কেন? কোন হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে তো তার এত ব্যর্থতা দেখা যায় না। তন্দ্রাচ্ছন্ন না থাকলে মানুষের কাজ ফলপ্রসূ হ'ত। কোটি কোটি মানুষ শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে সতত সজাগ, দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনই মাত্র কার্যকর বুদ্ধিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সজাগ। এক কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র একজনই কেবল রসময় আর ঈশ্বরনির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে সজাগ। জাগ্রত থাকাই প্রাণের লক্ষণ। এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ এখনও পাই নি যিনি সম্পূর্ণ সজাগ। তাই যদি হ'ত, কি করে সম্মুখীন হতাম তাঁর?

পুনর্জাগরণের আর সম্পূর্ণ সজাগ থাকার সাধনা করতে হবে আমাদের। যন্ত্রপুত্তলীর মতো নয়, প্রত্যূষের প্রত্যাশায় যেন ছেদ না ঘটে। নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রার মধ্যেও প্রত্যূষ যেন আমাদের পরিহার না করে। জাগ্রত সাধনার সাহায্যে জীবনকে ঊর্ধ্বগামী করার মধ্যে মানুষের যে সন্দেহাতীত শক্তির পরিচয় লাভ করি, তার চাইতে অধিকতর উৎসাহবর্ধক তত্ত্ব আমার জানা নেই। চিত্রাঙ্কন, মূর্তিগঠন,—সুন্দর শিল্পসাধনার নিদর্শনের মধ্যে সামর্থ্যের পরিচয় আছে; কিন্তু যা কেবল নৈতিক নিষ্ঠাসাধ্য, আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবেশের যা শিল্পায়ন এবং গঠন, তার গৌরব সমধিক। শিল্পের চরমোৎকর্ষ দৈনন্দিন জীবনযাপনের ধারাকে গুণান্বিত করা। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য নিজের জীবনকে সর্বদিক দিয়ে সর্বোত্তম এবং চরমতম ধ্যানকল্পনার যোগ্য করে তোলা। এ দিকে যে সব সামান্য সংকেত আমরা লাভ করি তাদের যদি গ্রহণ না করতে পারি কিংবা তার অপব্যবহার করে থাকি, সে ক্ষেত্রে মনীষীদের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে কি ভাবে সাধনা করতে হবে।

সংকল্পনিষ্ঠ জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম বলে বনবাসে গিয়েছিলাম। জীবনের মূল সত্যের সম্মুখীন হয়ে দেখতে চেয়েছিলাম, সে যে পাঠ দিতে পারে, তা শিক্ষা করতে পারি কি না। মৃত্যুকালে যেন দুঃখ না পাই যে, জীবন-ব্রত সাধনা করা হয় নি। জীবন মহার্ঘ; যা জীবন নয়, তেমন জীবন যাপন করতে চাই নি। অনিবার্য না হলে বৈরাগ্য সাধনও করতে চাই নি। গভীর ভাবে জীবনেরই সাধনা করতে চেয়েছিলাম। জীবনের সারাংশের নিঃশেষ স্বাদ পেতে চেয়েছিলাম। যা জীবন নয় তার সব কিছু বর্জন করে প্রাচীন স্পার্টার অধিবাসীদের আদর্শে সুকঠোর সাধনা করতে চেয়েছিলাম। অনেকখানি ফসল নিঃশেষে সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। জীবনকে একেবারে কোণঠাসা করে দেখতে চেয়েছিলাম, তার শেষ কথাটা কি। যদি তাকে ইতর মনে হয়, তবে তার পুরোপুরি খাঁটি ইতরতার সন্ধান জেনে সর্ব-সাধারণের দরবারে সেই ইতরতা প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। যদি মহান হয়, তবে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলাম, পরে আর এক বার অভিযানে গিয়ে যেন তার সত্য বিবরণ দিতে পারি। কেন না, চারপাশেই দেখতে পাই, জীবন শয়তান না ভগবানের লীলা, বেশির ভাগ লোকেরই সে সম্বন্ধে জ্ঞান আশ্চর্য রকমে অনিশ্চিত। যে জন্যই হ'ক তারা সাত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে, পৃথিবীতে মানুষের প্রধান কৃত্য হচ্ছে, "ভগবানের মহিমা কীর্তন আর সেই রস উপভোগ।"

তবুও পিপীলিকার মতোই সংকীর্ণ জীবন যাপন করছি আমরা এখনও পর্যন্ত, যদিও গল্প শোনা যায় যে বহুকাল হ'তে আমরা মানুষে ক্রমবিকাশ লাভ করেছি। বালখিল্যদের মতো আমরা সারস পক্ষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত রয়ে

গেছি; ভুলের উপর ভুল স্তূপীকৃত হয়েছে, জোড়াতালির উপর জোড়াতালি দিয়ে চলেছি। আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের চরম প্রকাশ বহিরাবরণে আর নিবারণসাধ্য ক্ষেত্রে বিপত্তি সৃষ্টির মধ্যে। খুটিনাটি ঠিক করতেই আমাদের জীবন কেটে যায়। সাধু যে, হাতের দশ আঙুলের বেশি গণনা করা তার দরকার হয় না, তেমন বিশেষ ক্ষেত্রে পায়ের দশ আঙুলও যোগ করা যেতে পারে—বাদ বাকি সব কিছুকে একসঙ্গে ধরা যেতে পারে। সহজ সরল হও—আমি এ কথাই বলব। একশ নয়, হাজার নয়—বিষয়ব্যাপার তোমাদের দুই আর তিনে সীমাবদ্ধ থাক। এক কোটির জায়গায় আধডজনই যথেষ্ট। আঙুলের ডগার মধ্যেই হিসাব নিকাশ যেন সারা হয়। সভ্য জীবনের বীচি-বিক্ষুব্ধ জীবন-সমুদ্রে এত মেঘ, এত ঝড়, এত চোরাবালি আর এত হাজার হাজার দফায় বিলিবন্দোবস্ত যে, কোন মানুষকে বাঁচতে হলে, যদি সে অতলে ডুবে যাবার ইচ্ছা না করে থাকে আর বন্দরে পেঁাছাবার লক্ষ্য না ভুলতে চায়, তার চুল পরিমাণ পর্যন্ত হিসাব থাকার দরকার। সাফল্য অর্জন করতে হলে মারাত্মক রকমে হিসাবী হতে হবে। সরল হ'ক সব কিছু, সরল হ'ক। দিনের মধ্যে তিন তিনবার না খেয়ে, দরকার মতো একবার খেলেই চলে। একশটা ডিশের বদলে পাঁচটা, সেই অনুপাতে আর সব আড়ম্বরও কমানো যেতে পারে। আমাদের জীবনযাত্রা জার্মান রাষ্ট্রসংঘের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। টুকরো টুকরো রাষ্ট্রে ভরা, তাদের সীমানা আবার ক্রমাগত বদলাচ্ছে। এমন যে, জার্মানরা নিজেরাও বলতে পারে না, কোন সময়ে কোথায় তাদের দেশের সীমানা। দেশের আভ্যন্তর ব্যবস্থায় তথাকথিত উন্নতির ভিড় বাহ্যাড়ম্বর আর চটকদারীর খেলা সব। শাসন-পরিচালনার্থ গড়ে তোলা হয়েছে প্রকাণ্ড পল্লবিত শাসন-ব্যবস্থা। আসবাব-পত্রেই ঘর ভরে গেছে, তার ফাঁদে পা জড়ালেই কুপোকাৎ। বিলাসে জর্জরিত—অনর্থক অপব্যয় সব, কোন হিসাব নেই, তেমন কোন লক্ষ্যও নেই। জাতকে জাত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, যেমন চলেছে দেশের অগণিত লোকের সংসারযাত্রা। দেশের আর দেশবাসীর এই ব্যাধি প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে অতি কঠোর মিতব্যয়িতা। নির্মমভাবে, প্রাচীন স্পার্টার অধিবাসীদের চাইতেও অধিক পরিমাণে জীবন-যাপন সংক্ষেপ করা, জীবনের লক্ষ্যের উন্নতি সাধন করা। বিলাস-ব্যসন অতি-মাত্রায় বেড়ে চলেছে। দেশবাসী ভাবতে শিখেছে রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য অপরিহার্য—বরফ চালান দাও, তারযোগে বার্তা বিনিময় কর, ঘন্টায় ত্রিশ মাইল ছোট, এ সবের যেন ত্রুটিহীন বন্দোবস্ত থাকে—দেশবাসীর নিজেদের অদৃষ্টে কিছু জুটুক আর নাই জুটুক; কিন্তু এখনও ঠিক হয় নি, আমরা মানুষের না বনমানুষের মতো জীবন যাপন করব। কাঠের স্লীপার দরকার, রেল লাইন তৈরি করার দরকার, দিনরাত তাই নিয়ে থাকতে হবে। এ সব কাজ না করে নিজেদের জীবনাদর্শ নিয়ে যদি মত্ত হই, কি করে শুধু তাকে উন্নততর

করে তোলা যায় সে কথা ভাবি, তবে রেলরাস্তা তৈরি করবার লোক জুটবে কোথায়? আর রেলরাস্তা যদি তৈরি না হয়, তবে যথাসময়ে স্বর্গে যাব কি করে? কিন্তু নিজের নিজের ঘরে বসে নিজের নিজের কাজ করলে রেলরাস্তার প্রয়োজনটা কোথায়? আমরা তো রেলে চাপি নে, রেলই আমাদের ঘাড়ে চাপে। কোনদিন কি কেউ ভেবে দেখে, এই যে রেলরাস্তাবরাবর স্লীপার পাতা হয়েছে, বাস্তবিক পক্ষে এগুলো কি? এক একটা স্লীপার গোটা এক একটা মানুষ— সে আইরিশই হক, কি ইয়াংকিই হক্। এদেরই উপর দিয়ে, এদেরকে বালি দিয়ে ঢেকে রেল পাতা হয়েছে। গাড়ি চলেছে অবাধে তাদের উপর দিয়ে। নিঃসন্দিগ্ধ হও যে এ সব স্লীপারদের ঘুম কখনই ভাঙবে না। বছর কয়েক পর পরই এদের নতুন দলকে পাতা হচ্ছে, তারপর রেল চলছে। ফলে জন কয়েকের সৌভাগ্য হয় রেলে চড়বার, কিন্তু অন্যদের দুর্ভাগ্য, তাদের উপরই চড়ছে সবাই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলে যে-ব্যক্তি, সে ফালতু, নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত। তাকে রেলে চাপা দিয়ে জাগিয়ে তুলে, রেলগাড়ি থামিয়ে হৈ-চৈ করা হচ্ছে যেন এমন ঘটনা ঘটে নি। ভাল লাগে শুনে যে, পাঁচ পাঁচ মাইল অন্তর এক দল লোক মোতায়েন রাখতে হয় স্লীপার ঠিক রাখার জন্য, সেগুলো যাতে চিতপাত বিছানায় শুয়ে থাকে। ভবিষ্যতে এরা একদিন জেগে উঠতে পারে, এ তারই লক্ষণ।

এত ঝামেলা করে বেঁচে থেকে লাভটা কি? খিদে লাগার আগেই না খেয়ে মরবার সংকল্প করেছি আমরা। বলা হয়ে থাকে যে সময় মতো একটা সেলাইয়ের ফোঁড় দিলে নটা ফোঁড় দেবার কাজ বাঁচে। তাই বোধ হয় ভবিষ্যতে নয়টা জায়গায় সেলাই দেওয়া থেকে বাঁচতে, এরা আজ হাজারটা জায়গায় সেলাই দিতে বসে গেছে। আর কাজের কথা যদি বল, এমন মূল্যবান কাজই বা কি করছি আমরা। শির কম্পন-রোগে ভুগছি, এক জায়গায় মাথাটাকে স্থির রাখতে পারি নে। আগুন লাগলে যেমন টানা হয়, গির্জার ঘণ্টার দড়ি ধরে এক্ষণি কেউ টান দাও, ঘণ্টাটা যেন উলটে না যায়। কনকর্ডের চারদিকের ক্ষেত-খামারে এমন একটা কেউ নেই, হাজার কাজের চাপ থাকলেও— আজ সকালেই বারবার যারা সব কাজের অজুহাত শুনিয়ে গেছে—ছোট ছেলেরা, এমন কি মেয়েরাও, যারা ছুটে না আসবে সব ছেড়ে-ছুড়ে আওয়াজটা কি তাই জানতে। আগুন লাগা থেকে ঘর-বাড়ি বাঁচাতে নয়, সত্যি কথা এই যে, আগুন লাগার মজাটা দেখবার জন্য। কেন না আগুন তো লেগেইছে, সব তো ছারখার হবেই; আর আমরা তো আগুন লাগাই নি; এটাও লোকের জানা দরকার। আগুনটা কেমন করে নিভোন হয়, তাও দেখতে হবে তো। আর ওরই মধ্যে গায়ে আঁচ না লাগিয়ে নিভোতে সাহায্যই না হয় একটু করা গেল। এমন কি, গাঁয়ের গির্জাতে আগুন লাগলেও অবস্থা এই হবে। খাওয়া-

দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক হয় তো ঘুমিয়েছে কি না ঘুমিয়েছে, অমনি কান খাড়া হয়ে উঠল, কি, না, খবর কি? যেন আর সব মানুষের কাজ কেবল তাদের হুকুম তামিল করা। আধ ঘণ্টা পর পর আবার ঘুম ভাঙাবার হুকুম থাকে কারও কারও—নিশ্চয় ঐ একই কারণ। ঘুম ভাঙলেই, বকশিশ দেওয়ার ভাব দেখিয়ে বলা চাই কি স্বপ্ন দেখেছে। একটা রাত ঘুমিয়ে কেটেছে, সকালে প্রাতরাশের সঙ্গে খবর চাইই-চাই। দোহাই, দুনিয়ার কোন প্রান্তে কোন ব্যক্তির নূতন কিছু হয়ে থাকলে, যেন জানতে পাই—কফি আর খাবার সামনে রেখে পড়তে হবে খবরটা। কোথায় ওয়াশিটো নদীতে কার চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, খবরটা চাই। অথচ স্বপ্নেও ভাবতে চায় না কেউ, এই দুনিয়ার বিরাট অতলস্পর্শ গুহার অন্ধকারে সে যে পড়ে রয়েছে, তার নিজেরই চোখ আছে কি নেই।

ডাকঘর ছাড়াও বেশ চলে—আমার নিজের কথা এই। আমার মতে এর মারফত যে-সব খবর চলাচল হয়, তেমন দরকারী খবর তার মধ্যে খুব কমই। চুল-চেরা দৃষ্টিতে দেখলে বলতে হয় যে, জীবনে আমি একটা কি দুটোর বেশি এমন চিঠি পাই নি, যাতে ডাকটিকিটের দাম ওঠে। রচনাটা কয়েক বছর আগের। ঠাট্টা করে বলা হয়ে থাকে, যা ভাবছ বলতে পারলে পয়সা দেবে বল। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে এই যে ডাকের ব্যবসা—তাতে এই ঠাট্টাকেই রূপ দেওয়া হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আর এ-ও নির্ঘাত বলতে পারি যে, খবরের কাগজে যে-সব খবর বেরোয় তার কোনটাই মনে রাখবার মত নয়। খবর তো সেই ডাকাতি হয়েছে, মানুষ খুন হয়েছে, দুর্ঘটনায় মরেছে কেউ, বাড়ি পুড়েছে কোথাও, জাহাজ ডুবেছে, ষ্টীম-বোট ফেঁসে গেছে, ওয়েস্টার্ন রেল রোডে একটা গরু চাপা পড়েছে, একটা পাগলা কুকুরকে মারা হয়েছে, নয় তো গত শীতে এক ঝাঁক ঝিঝিপোকা —বারবার করে পড়ব কেন এ-সব খবর, একবার পড়লেই যথেষ্ট। মূল সূত্রটা তো জানা কথা—তার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আর প্রয়োগ জেনে লাভটা কি? যাকে খবর বলা হয়, দার্শনিকের কাছে তা বাজে গল্প। তার আবার সম্পাদনা আর তা পড়া। শুধু চা খেতে খেতে বুড়ীদেরই তা মানায়। তবু দেখি এই সব বাজে গল্পের লালসা কম লোকের নয়। শুনতে পেলাম, সেদিন কোন অফিসে, বিদেশ-বার্তার শেষ সংবাদটা কি জানতে এত লোকের ভিড় হয়েছিল যে, চাপের চোটে অফিস ঘরের কয়টা চৌকো পাটাতনই ফেটে চৌচির। খবরটা হয়ত এমন যে কোন চালাক লোক বারো মাস কি বারো বছর আগেই যথেষ্ট খুঁটিনাটি বর্ণনা করে সেটা লিখে রাখতে পারতেন—আমি অন্তত তাই মনে করি। দৃষ্টান্ত হিসাবে স্পেনের খবর ধরা যাক, যদি বার কতক জায়গা-মাফিক ডন কার্লোস, আর ইনফাণ্টা, তথা ডন পেড্রো কি সেভিল, কি গ্রানাডা

বসিয়ে দেওয়া যায়—হয়ত নামগুলোর কিছুটা অদলবদল হয়ে থাকবে এর মধ্যে, আমি অনেকদিন খবরের কাগজ পড়ি নি—আর তার সঙ্গে যদি অন্য মজার খবরের অভাবে ষাঁড়ের লড়াই জুড়ে দেওয়া যায়, তবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য খবর পাওয়া যাবে। স্পেনের অবস্থার সঠিক পরিস্থিতি আর ভীষণতার সম্বন্ধে যে ধারণা পাওয়া যাবে তা থেকে, তা ঐ শিরোনামায় খবরের কাগজের পরিষ্কার আর বিশদ বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে। ইংলণ্ডের খবর ধরলে দেখা যাবে, ১৬৪৯ সালে সেখানে যে বিপ্লব ঘটে তাই ঐ অঞ্চলের ইদানীংকার শেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর। আর ইংলণ্ডের ফসল সম্বন্ধে কোন একটা বৎসরের মোটামুটি খবরটা জানা থাকলে সে বিষয়ে আর কোন তথ্য জানবার দরকার মনে হবে না, যদি না টাকাকড়ির ব্যাপারে বিশেষ করে মাথা ঘামাবার ব্যাপার থাকে কারও। খবরের কাগজের পোকা নয়, এমন লোকের মন নিয়ে বিচার করলে বোঝা যায় বিদেশ থেকে যে খবর আসে তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। এমন কি, সেদিক থেকে দেখলে ফরাসী বিপ্লবও বাদ যাবে না।

কি না খবর! যে খবর কোনকালে বাসি হয় না, তা জানার প্রয়োজন কি এর চাইতে বেশি নয়। কিয়েউ-হি-য়ু (ইউ রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় পদস্থ ব্যক্তি) খুং-সুর কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন, তাঁর খবরাখবর জানতে। খুং-সু দূতটিকে কাছে বসিয়ে এই মর্মে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন : "আপনার প্রভু কি করছেন?" দূত সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন : "আমার প্রভুর মনোগত বাসনা তাঁর ত্রুটির সংখ্যা হ্রাস করেন, কিন্তু শেষ করে উঠতে পারছেন কই।" দূত প্রস্থান করলে দার্শনিক প্রবর অভিমত জ্ঞাপন করলেন : "সুযোগ্য দূত।" সমগ্র সপ্তাহটাই বাজে কাজে কাটার পর আসে রবিবার—যোগ্য উপসংহার হিসাবে। নূতন সপ্তাহের অমলিন, অকুণ্ঠ সূচনা বলে গণ্য করা হয় না রবিবারকে। দিনটা চাষীদের সাপ্তাহান্তিক বিশ্রামের দিন। তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে তাদের শ্রবণশক্তি। পাদ্রী সাহেব একটা-না-একটা উপদেশ কাহিনী দিয়ে সেদিনও তাদের বিরক্ত করবেন। তা না করে বজ্র-কণ্ঠে তাঁর ঘোষণা করা উচিত, শান্ত হও, সংযত হও। এত ত্বরা যদি, তবে এই মন্থরতা কেন?

পরম সত্যের নামে মিথ্যা আর মরীচিকাকে পূজা করা হচ্ছে। বাস্তবকে অলীক মনে করা হচ্ছে। মানুষ যদি নিষ্ঠার সঙ্গে বাস্তবকে অনুসরণ করত, মোহগ্রস্ত না হ'ত, তবে আজ চারপাশে যা ঘটছে, তার তুলনায় মানুষের জীবন রূপকথা, আরব্য উপন্যাসের কাহিনী হয়ে উঠতে পারত। যা অবশ্যম্ভাবী, অবশ্যম্ভাবিত্বে যার অধিকার, কেবল তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারলেই সঙ্গীত আর কাব্যে রাস্তাঘাট মুখরিত হয়ে উঠত। আমরা যদি ব্যস্তসমস্ত না হয়ে বিচক্ষণ হই, তবে বুঝতে পারব যে, মহত্ত্ব আর যোগ্যতাই চিরস্থায়ী,

তথা পরম সত্য। ক্ষুদ্র আশঙ্কা আর ক্ষুদ্র আরাম বাস্তবের ছায়া মাত্র। এ অনুভূতি সঞ্জীবিত করে, সুমহান করে। চোখ বুজে ঘুমিয়ে থেকে মানুষ সর্বত্র তার গতানুগতিক দৈনন্দিন জীবনকে মেনে চলছে বলেই তা চালু আছে। অথচ সম্পূর্ণ মিথ্যার ভিত্তির উপর এর গঠন। শিশুদের খেলায় জীবন ধরা দেয়, এর বিধান আর সম্বন্ধ তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে। কিন্তু বয়স্কেরা তা পারে না। যথাযথ জীবন যাপনে তারা অক্ষম। কিন্তু তাদের ধারণা অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অসাফল্য তাদের বিচক্ষণ করে তোলে। হিন্দুদের কোন গ্রন্থে পড়েছি : "কোন রাজপুত্র শৈশবে স্বীয় রাজত্ব থেকে নির্বাসিত হন, তারপর অরণ্যচারীর কাছে লালিত পালিত হন। এই অবস্থায় তিনি ক্রমশঃ বড় হলে তাঁর ধারণা হয়, যে অসভ্য জাতির মধ্যে তিনি আছেন তিনিও তাদেরই একজন। তাঁর পিতার জনৈক আমাত্য তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর পূর্ববৃত্তান্ত তাঁকে জ্ঞাপন করে। তখন তাঁর নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়। জানতে পারেন, তিনি রাজপুত্র।" হিন্দু দার্শনিক অতঃপর বলছেন, "এইভাবে আত্মা যে অবস্থা পরিগ্রহ করেন, তদনুযায়ী স্বীয় বৈশিষ্ট্য বিষয়ে ভ্রান্তি পোষণ করেন। যখন কোন সদ্‌গুরু তাঁকে সত্যের সন্ধান দান করেন, তখনই কেবল তিনি নিজেকে ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।" চোখের উপর দেখছি, আমরা নিউ ইংলণ্ডের অধিবাসীরা যে হীন জীবন যাপন করি, তার কারণ আমাদের দৃষ্টি বস্তুর বাহির ভেদ করে অন্তর দেখতে অসমর্থ। আপাত রূপকেই আমরা প্রকৃত রূপ মনে করি। এই সহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত কেউ যদি প্রকৃত বস্তুর সন্ধানে ফেরেন, তবে মিলের ঐ বাঁধ স্থান পাবে কোথায়? এখানকার যে প্রকৃত রূপ তাঁর দৃষ্টিতে পড়বে, যদি তিনি আমাদের কাছে তার বর্ণনা করেন, তাঁর সেই বিবরণীতে আমরা আমাদের পরিচিত স্থানটিকে চিনতেও পারব না। এই সভামণ্ডপ, আদালত, জেল, দোকানপাট, বসতবাটি সব কিছু দেখার পর সত্যদৃষ্টির সম্মুখে এদের আসল রূপটা কি দাঁড়াচ্ছে বিবেচনা কর, নিজের কাছে ওদের অস্তিত্ব মিলবে না। সত্যকে সুদূর মনে করে মানুষ—সৌর-মণ্ডলের বাইরে, দূরতম তারকারও পিছনে, মান্ধাতার আগে কি পৃথিবীর আদিম মানুষটিরও আগে। সত্য যা, যা বিরাট, অনন্তের মধ্যেই তার ইঙ্গিত অভ্রান্ত। কিন্তু তার যে স্থান, কাল, পাত্র, তা তো ঠিক এই মুহূর্তেই আমাদের সামনে রয়েছে। ঈশ্বর নিজে এই মুহূর্তে তাঁর যে রূপে প্রকাশ, যুগ-যুগান্তের পরও তিনি এর চাইতে ঈশ্বর-তর হবেন না। আমরা সর্বক্ষণ যদি আমাদের পারিপার্শ্বিককে ক্রমান্বয়ে বিন্দু বিন্দু করে অথবা পূর্ণরূপে দেখতে পারি, তবেই সেই বিরাটত্বের সন্ধান পেতে পারি। বিপুল বিশ্ব প্রতিনিয়ত অনুগতের মতো আমাদের ভাবনার উত্তর দান করছে। অগ্রসরণ

আমাদের দ্রুত কি ধীর যাই হ'ক, পথ প্রস্তুত রয়েছে আমাদের জন্য। ভাবনার সাধনায় নিজেকে যেন ব্যাপৃত রাখি। আজ পর্যন্ত কবি কি শিল্পী এমন সুন্দর আর মহৎ কোন কিছু কল্পনা করতে পারেন নি, ভবিষ্যতে কেউ না কেউ যাকে অন্তত বাস্তবে রূপায়িত না করতে পারবেন।

প্রকৃতি যেভাবে স্থির সংকল্প নিয়ে চলে, অন্তত একটা দিনও তদনুযায়ী জীবন যাপন করতে যেন পারি। পথে একটা বাদামের খোসা পড়ে থাকলে বা মশার ডাক কানে শুনলে যেন সংকল্প থেকে বিচ্যুত না হই। সকাল-সকাল যেন জাগতে পারি, উপোষ করি বা সামান্য প্রাতরাশ যাই খাই, যেন ধীরে সুস্থে শান্তিতে করি; যে আসার আসুক, যে যাবার যাক্; ঘণ্টাধ্বনি হ'ক্, শিশুরা চিৎকার করুক—আমাদের সংকল্প যেন না ভুলি যে একটা দিনের মতো দিন যাপন করতে হবে। পরাজয় স্বীকার করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেব কেন? ভোজন বলতে দ্বিপ্রহরে কূপের অন্তর্গত যে ভীষণ ঘূর্ণি আর আবর্ত বুঝি, তার দ্বারা বিচলিত অথবা আত্মহারা হওয়া চলবে না। সেই বিপদটা উত্তীর্ণ হতে পারলেই নিশ্চিন্ত। বাকি পথটা ঢালু। স্নায়ু শিথিল করা চলবে না, প্রভাতের উৎসাহ বজায় রাখতে হবে। ইউলিসিসের মতো মাস্তুলে নিজেকে বেঁধে রেখে দূরনিবন্ধ দৃষ্টিতে পাল তুলে যেন চলতে পারি। ইঞ্জিন হুইস্‌ল দেয় দিক, নিজের চিৎকারে তার নিজেরই গলা ভাঙবে। ঘণ্টা বাজে বাজুক, পালাবার দরকার কি? কোন্ সুরের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলে এরা, তা বিচার করতে পারি আমরা। আত্মস্থ হয়ে সাধনা করতে হবে। পৃথিবীর আপাদমস্তক পাঁকে ঢেকে গেছে। মতামত, কুসংস্কার, ঐতিহ্য, মায়া, মোহ এই সব কাদাবালির মধ্যে পা মেপে মেপে চলতে হবে। প্যারিস, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, বস্টন আর কনকর্ড পার হয়ে, ধর্মসম্প্রদায় আর রাষ্ট্রব্যবস্থা পেরিয়ে, কাব্য, দর্শন, এমন কি ধর্মবিশ্বাসকে পর্যন্ত অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে একেবারে প্রস্তর-কঠিন তলদেশে। যাকে স্বরূপ বলতে পারি, সেখানেই তার নাগাল পাব। তখন বলতে পারব, অস্তি, ভ্রান্তি নয়। সেই ভিত্তি-মূলে দাঁড়িয়ে বন্যা, তুষার আর আগুনের মধ্যে স্থল সন্ধান করতে হবে। প্রাকার অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে সেখানে। কিংবা নিরাপদ আলোকস্তম্ভ একটা, হয়ত বা মানদন্ড—শূন্যবাদী নয়, স্বরূপবাদী—ভবিষ্যৎ যুগ তবেই বুঝতে পারবে কতদিন ধরে মিথ্যা আর মোহের কি গভীর পঙ্কই না জমে ছিল এতদিন। একেবারে ঘটনার মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলে তার উপর থেকে নীচে পর্যন্ত সূর্যের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মনে হবে যেন বাঁকা তরোয়াল। তার মোহন রূপ অস্থিমজ্জা ভেদ করবে। আলো বিকীর্ণ হবে অন্তঃস্থলে। তখন এই মর জীবনের সানন্দ সমাপ্তি। জীবন কি মৃত্যু—আমাদের সন্ধান সত্যের জন্যই। বাস্তবিকই যদি মৃত্যুর পথে যাই তবে যেন

কন্ঠনালীতে ঘরঘড়ানি শুনি, হাত পায় হিম-শীতলতা অনুভব করতে পাই; আর যদি জীবনের সাক্ষাৎ পাই তবে যেন কর্তব্য সাধন করতে পারি।

কালের স্রোতস্বিনীতে আমি মৎস্য-শিকারী। জলপান করি বটে, কিন্তু জলপান কালে তলদেশের বালিও আমার দৃষ্টিতে পড়ে। এর অগভীরতা তখন উপলব্ধি করি। ক্ষীণ স্রোত বয়ে যায়, কিন্তু অনন্ত যে কালপ্রবাহ তা রয়ে যায়। গভীরে মগ্ন হতে চাই। আকাশের তলদেশে যেখানে তারারা সব পাথরের নুড়ির মতো, আমার মাছ ধরা সেখানে। গণনা সাধ্যাতীত। বর্ণ-মালার প্রথম অক্ষরও আমার জানা নেই। যে-জ্ঞান নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম সর্বদা দুঃখ হয় সেই জ্ঞান হারিয়েছি বলে। বুদ্ধি বিদারণ করে চলে। হাতড়ে পথ খুঁজে ফেরে, বস্তু-রহস্য বুঝতে চায়। যেটুকু দরকার তার চাইতে বেশি সময় হাতের কাজে কাটাতে চাই নে। মাথাই আমার হাত ও পা। বুঝতে পারি, আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন, সব দানা বেঁধেছে সেখানে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝতে পেরেছি যে, মাটি খুঁড়ে এগিয়ে চলার অস্ত্র আমার মাথা। যেমন কোন কোন প্রাণী লম্বা নাক কি পায়ের থাবা দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলে। এই পাহাড় ভেদ করে এগুতে হবে, মাথা দিয়ে খনি খুঁড়তে হবে। এখানেই কাছাকাছি সব চাইতে মূল্যবান খনিজের স্তর আছে মনে হয়; খনি-সন্ধানী দণ্ড আর সামনে যে ক্ষীণ বাষ্প উঠছে এরা তাই বলে। খনি-খননের কাজ আরম্ভ করতে হবে এখানটাতেই।

॥ ৩ ॥ অধ্যয়ন

কাজকর্ম বেছে নেবার ব্যাপারে একটু সুবিবেচনা দেখাতে পারলে সব মানুষই হয়তো আসলে শিক্ষার্থী আর গবেষক হ'ত। কেন না, তাঁদের কাজের ধারা আর পরিণতি সকলের পক্ষেই নিশ্চয়ই হৃদয়গ্রাহী। আমরা যখন নিজে-দের কিংবা উত্তরাধিকারীদের জন্য বিষয়সম্পত্তি করি, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করি, এমন কি কীর্তি অর্জন করি, তখন মর-জগতের অধিবাসী আমরা; কিন্তু সত্যের সাধনায় আমরা অমর। পরিবর্তন কি আকস্মিক উৎপাতের কথাই ওঠে না। প্রাচীন মিশরীয় অথবা হিন্দু দার্শনিক পরমেশ্বর-মূর্তির এক প্রান্তের আবরণ উন্মোচন করেন; এখনও পর্যন্ত সেই তরঙ্গায়িত বস্ত্র উত্থিত রয়েছে। তিনি যা করে গেছেন, আমারও দৃষ্টি সেই একই ধরনের গৌরবের দিকে। আমিই তো তাঁর মধ্যে সেই সাহস সঞ্চার করেছিলাম, আর আমার মধ্যে তিনিই আজ সেই রূপকে পুনরবলোকন করতে চান। সে বস্ত্রে এতটুকু ধূলিকণাও লাগে নি। সেদিন যখন পরম-দেবতার প্রকাশ ঘটেছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কালের কোনও ব্যবধান ঘটে নি। যে ক্ষণটিতে আমরা ঊর্ধ্বে উঠি, কিংবা যে ক্ষণ ঊর্ধ্বারোহণের অনুকূল, তা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই নয়।

আমার বাসাটি শুধু চিন্তা করার দিক দিয়েই নয়, মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করার পক্ষে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও ভাল ছিল। প্রচলিত কোন ভ্রাম্য-মাণ পাঠাগারের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছিলাম সত্যি; কিন্তু যেসব গ্রন্থ ভূমণ্ডল পরিক্রমণ করে, যার বাক্য প্রথমটায় গাছের বাকলে লিপিবদ্ধ হয়, আর এখন শুধু অনুলিখিত হয়ে চলেছে কাপড়ের কাগজে মধ্যে মধ্যে, আগের চাইতে বেশি করে তার প্রভাবের মধ্যে গিয়ে উঠলাম। কবি মীর কামরুদ্দীন মস্ত বলে গেছেন, "উপবিষ্ট অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক জগতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে চাই, গ্রন্থে সেই সুযোগ লাভ ঘটে আমার; এক পেয়ালা সুরাতেই মাতোয়ারা হতে চাই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মদিরা পান করে আমি সে আনন্দের স্বাদ পাই।" সারা গ্রীষ্মকালটা আমার টেবিলে হোমারের ইলিয়াড রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু পড়েছি শুধু মধ্যে মধ্যে। কায়িক পরিশ্রম করতে

হয়েছিল প্রথমটায় ক্রমাগত, আস্তানাটা ঠিক-ঠাক করতে হ'ল, সঙ্গে বিন ক্ষেতে আগাছা সাফের কাজও ছিল। বেশি পড়া তাই সম্ভব হয় নি। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনদিন যে পড়ব, এই ভেবেই বেশ খুশি ছিলাম। কাজের ফাঁকে দুই একটা মামুলি ভ্রমণকাহিনী পড়েছিলাম, শেষে তাতে নিজের সম্বন্ধে লজ্জিত বোধ করলাম। প্রশ্ন এল মনে, আমার আমিটা এই সময়টাতে কোথায় ছিল।

মূল গ্রীক ভাষায় হোমার কি এস্কাইলাসের রচনা যখন কোন ছাত্র পাঠ করেন, তাতে বিলাস কিংবা চিত্তবিক্ষেপের ভয় থাকে না, কেন না বোঝা যায় কথঞ্চিৎ পরিমাণে তিনি এই সব নায়কের সমকক্ষ বোধ করেছেন, তাই সারা সকালটা পাঠেই নিবিষ্ট থাকেন। কিন্তু এই রকম মহাকাব্যের ভাষা, আমাদের মাতৃভাষার অক্ষরে মুদ্রিত হলেও, সে এমন ভাষা যা ভ্রষ্ট-যুগের পক্ষে অবোধ্য। প্রত্যেকটি পদ আর কলির অর্থসন্ধানে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে আমাদের, নিজেদের জ্ঞান, সামর্থ্য ও হৃদয়বত্তা পেরিয়ে প্রচলিত অর্থ অপেক্ষা গভীরতর ব্যঞ্জনা কল্পনা করতে হবে। বর্তমানে সুলভ মূল্যের প্রচুর বই আর নানা অনুবাদ এই সব প্রাচীনকালের মহাকবিদের নিকটতর হতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করে নি। তাঁরা তেমনই নিঃসঙ্গ রয়েছেন আর যে-অক্ষরে তাঁরা মুদ্রিত হচ্ছেন তা সমান বিরল তথা অদ্ভুত থাকছে। উদ্যোগ আর নিষ্ঠার সঙ্গে যৌবনে কিছুকাল পরিশ্রম করে যদি কোন প্রাচীন ভাষার কয়েকটা শব্দও শিক্ষা করা যায়, তাতে সার্থকতা আছে। পারিপার্শ্বিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠে নিয়ত ব্যঞ্জনা আর প্রেরণা মেলে তাতে। যে-কয়েকটি লাটিন কথা শোনা আছে, চাষীরা যে তা স্মরণে রাখে আর আবৃত্তি করে, তা নিরর্থক নয়। মধ্যে মধ্যে লোকে এমন কথা বলে, যেন অধুনাতন ব্যবহারিক বিদ্যার্জনের ফলে ক্লাসিক-গ্রন্থের অধ্যয়ন উঠে যাবে। কিন্তু জিজ্ঞাসু ছাত্র চিরকাল ক্লাসিক অধ্যয়ন করবেন। যে ভাষাতেই তা লেখা হ'ক না কেন, আর যত প্রাচীনই তা হ'ক। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার ভান্ডার ছাড়া ক্লাসিক-গ্রন্থ আর কি? দৈববাণী-কথক দেবতাদের মধ্যে এরাই শুধু আজও লোপ পায় নি। তাদের মধ্যেই আধুনিকতম প্রশ্নের উত্তর মেলে, গ্রীসের দৈববাণী-কথক ডেলফি আর ডোডোনা যে উত্তর কোনদিন দেন নি। প্রাচীন বলে তাহলে তো প্রকৃতি-অধ্যয়নও আমরা বাদ দিতে পারি। নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন, অর্থাৎ সাত্ত্বিক গ্রন্থ সাত্ত্বিক চিত্তে অধ্যয়ন মহৎ সাধনা। আজকালকার সমাজে যে সব সাধনার মূল্য আছে, তাদের যে কোনটার তুলনায় এ সাধনা পরিশ্রমসাধ্য। ব্যায়াম-বীররা যে ভাবে কসরত শিক্ষা করে, এতেও তাই করা দরকার। ঐ একটিমাত্র লক্ষ্যে প্রায় সমগ্র জীবনের অবিচলিত নিষ্ঠার প্রয়োজন। যে সংকল্প আর সংযম নিয়ে গ্রন্থ রচনা হয়, গ্রন্থপাঠেও তাই দরকার, যে জাতির রচিত গ্রন্থ, তাদের ভাষায় কথা কইতে পারলেই যথেষ্ট নয়। কথিত আর লিখিত ভাষায়, যে ভাষাটা কানে

শোনা যায় আর যে ভাষাটা পাঠ করি, দুয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। একটা সাধারণত ক্ষণস্থায়ী শব্দমাত্র, জিহ্বার উচ্চারণ শুধু, বেশি হলে একটি আঞ্চলিক ভাষা, প্রায় পশু-ধর্মী, আমরা পশুদের মতো যা মায়েদের কাছ থেকে নিজে-দের অজ্ঞাতসারে শিক্ষা করি। অপরটি তার পরিণতি এবং উপলব্ধি। একটা মাতৃভাষা হ'লে অপরটি পিতৃভাষা; সংযত, সুবিন্যস্ত ভাবপ্রকাশ। এর বাচ্যার্থ এত যে কেবল কানে শুনলেই চলে না, দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করতে হবে এর কথা বুঝতে হলে। মধ্যযুগের অগণিত লোক গ্রীক এবং লাটিন ভাষায় কেবল কথা কইতে পারতেন, কিন্তু শুধু জন্মের দৈব ঘটনার ফলেই, ঐ সব ভাষায় রচিত প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদের রচনা অধ্যয়নের অধিকারী হন নি তাঁরা। যে গ্রীক আর লাটিন ভাষা তাঁদের জানা ছিল, এগুলি সে-ভাষাতে লেখা নয়, সাহিত্যের সুসংস্কৃত ভাষায় লেখা। যাতে সে সব লেখা হ'ত সেগুলোকে পর্যন্ত তাঁরা বাজে কাগজ মনে করতেন। এদের বাদ দিয়ে তাঁরা সস্তা সাময়িক সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন—তাঁরা গ্রীস আর রোমের দেবভাষা শিক্ষা করেন নি। এর পর ইউরোপের কয়েকটা জাতি নিজস্ব ভাষা লাভ করল, অমার্জিত হলেও তাদের উঠতি সাহিত্যের কাজ তাতে বেশ চলে যেত। তখন বিদ্যাচর্চা পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় পণ্ডিতমণ্ডলী সুদূর প্রাচীনকালের সম্পদের মূল্য নির্ধারণে সমর্থ হলেন। রোম আর গ্রীসের জনতা যে ভাষা কানে শোনে নি, কয়েকযুগ পরে গুটি কয়েক পণ্ডিত তার পাঠোদ্ধার করলেন। এখনও দুই চার জন পণ্ডিত ব্যক্তিই সে ভাষা অধ্যয়নে লিপ্ত আছেন।

সুবক্তার সময়োচিত বক্তৃতার উচ্ছ্বাস আমাদের যত ভালই লাগুক, তারায় ভরা আকাশ মেঘের যতখানি পিছনে, লিখিত ভাষার অভিজাত সাহিত্য প্রায় সব সময়েই ক্ষণস্থায়ী কথিত ভাষার ততখানি পিছনে বা উপরে থেকে যায়। তারার মতোই এরা দূরে থাকে। যাদের ক্ষমতা আছে কেবল তাদেরই এ পাঠ্য। জ্যোতির্বিদেরাই কেবল তাদের পর্যবেক্ষণ ও ভাষ্য রচনা করেন। আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনার বাষ্পোদ্গম কিংবা নিঃশ্বাস-নিঃসরণের মতো নয় তারা। প্রকাশ্য বক্তৃতা-সভায় যাকে বাগ্মিতা বলা হয়, পাঠগৃহে তা অলংকার-শাস্ত্ররূপে দেখা দেয়। বক্তা ক্ষণিক প্রেরণার বশে তাঁর সম্মুখের জনসাধারণকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দেন, তারা তাঁর কথা কানে শুনতে পায়। কিন্তু লেখক প্রেরণা পান তাঁর সমাহিত জীবন থেকে। বক্তাকে জনতা আর ঘটনা যে প্রেরণা দান করে, তাঁর চিত্ত তাতে বিক্ষিপ্ত হয়। লেখক মানুষের বোধশক্তি আর হৃদয়কে উদ্দেশ করে কথা কন, সকল কালের সর্ব-সাধারণ তাঁর লক্ষ্য—অবশ্য যাঁরা তাঁর বাক্য বুঝতে পারবেন, তাঁদের জন্য।

আলেকজাণ্ডার অভিযানে বার হলে দুর্মূল্য পেটিকায় ইলিয়াড সঙ্গে নিয়ে যেতেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। লিখিত গ্রন্থই সর্বোৎকৃষ্ট

অভিজ্ঞান। অন্য সব কলার তুলনায় একাধারে আমাদের সব চাইতে অন্তরঙ্গ, আবার সর্বজনীনও। কলাক্ষেত্রে জীবনের নিকটতম। প্রত্যেক ভাষায় তাকে অনুবাদ করা যায়, শুধু পড়ার জন্য নয়, মানুষের মুখে মুখে আবৃত্তিও হতে পারে—শুধু কাপড়ের উপর কি মর্মর প্রস্তরে রূপসজ্জার নয়, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে চলে এর রূপায়ণ। প্রাচীন কালের এক ব্যক্তির চিন্তার ঠাট আধুনিক যুগের কোন ব্যক্তির মুখে কথা যোগায়। দুই হাজার বৎসর ধরে গ্রীসের সাহিত্য আর প্রস্তর-শিল্পের স্মৃতি-স্তম্ভে পাকা সোনা আর শরৎ কালের রঙ লেগেছে, তাদের নির্মল, দিব্য প্রভাব নানা দেশে প্রসার লাভ করে কালের ক্ষয় থেকে তাদের রক্ষা করেছে। গ্রন্থ পৃথিবীর পরম সম্পদ, বংশানুক্রমে আর জাতিপরম্পরায় উত্তরাধিকারের যোগ্য। প্রত্যেক কুটিরের গ্রন্থাধারে তাই প্রাচীন আর উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী স্বভাবতই সঙ্গত ভাবে রক্ষিত হয়েছে। তাদের নিজেদের কোন পক্ষ নেই যার পোষণ তারা চায়, পাঠক মাত্রেরই মনোরঞ্জন করতে চায় তারা, শক্তি দান করতে চায় তাকে—সহজ বুদ্ধিতে কেউ তা অগ্রাহ্য করতে পারে না। এ সব গ্রন্থের লেখকরা সমাজ মাত্রেই স্বাধিকারে আর অপ্রতিহত ভাবে অভিজাত, রাজা কি সম্রাটের চাইতেও অধিক। মনুষ্য-সমাজে সর্বত্র তাদের প্রাধান্য। নিরক্ষর এবং সম্ভবত শ্রদ্ধাহীন ব্যবসায়ী, উদ্যোগ আর পরিশ্রমে তাঁর লক্ষ্য অবসর আর স্বাধীনতা লাভ করলেন, ধনী আর ফ্যাশানদুরস্তদের সভায় স্থান পেলেন, শেষ পর্যন্ত কিন্তু অনিবার্য ভাবেই আরও উচ্চে—তখনও পর্যন্ত তাঁর অনধিগম্য—মনস্বী আর প্রতিভাবানদের সাহচর্যের বাসনা জাগবে তাঁর। তখন নিজের সংস্কৃতির ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেন, সচেতন হলেন তাঁর সমগ্র বিত্তের অসারত্ব আর অপূর্ণতা সম্পর্কে। আরও সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন যখন উদ্যোগী হয়ে সন্তানদের জন্য যে বিদগ্ধ সংস্কৃতি থেকে তিনি নিজে বঞ্চিত বোধ করেছেন তার ব্যবস্থা করলেন। এই ভাবে তিনি একটি পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন।

এই প্রাচীন ক্লাসিক-গ্রন্থগুলি যে ভাষায় লেখা, যাঁরা সে ভাষা শিক্ষা করে মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নি, মানুষের ইতিহাস বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান রীতিমত অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় আধুনিক কোন ভাষায় এ সব গ্রন্থের প্রতিলিপি নেই—অবশ্য যদি না আমাদের গোটা সভ্যতাকেই এর প্রতিলিখন বলে ধরা হয়। হোমারের গ্রন্থ ইংরেজীতে ছাপা হয় নি, এস্কাইলাসেরও না, এমন কি ভার্জিলেরও নয়—প্রভাতের মতো সুন্দর রচনা এ সব, যেমন সুমার্জিত, তেমনই সুনিপুণ। পরবর্তী লেখকরা কেউই, তাঁদের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে যাই বলুন না কেন, কখনও প্রাচীনদের সেই আজীবন আয়াসসাধ্য সাহিত্য-সাধনার, তার সূক্ষ্ম শৈলী আর নৈপুণ্যের সমকক্ষ হতে

পারেন নি। যাঁরা এই পরিচয় পান নি, তাঁরাই কেবল এদের বিস্মৃত হবার কথা তোলেন। এ সব গ্রন্থ অধ্যয়ন আর তার রস উপলব্ধি করবার বিদ্যা আর প্রতিভা অর্জনে সমর্থ হবার আগে এদের বিস্মৃত হবার কথা উঠতেই পারে না। যাদের ক্লাসিক বলা হয়, সেই সব প্রাচীন গ্রন্থ আর তার চাইতেও প্রাচীন আর মূল্যবান অথচ অখ্যাত বিভিন্ন জাতির শাস্ত্র-গ্রন্থের সংখ্যা যে-যুগে বৃদ্ধি পাবে, তাকে সমৃদ্ধ-যুগ বলতে হবে। তখন পোপের আবাস ভ্যাটিকানে বেদ, জেন্দাবেস্তা আর বাইবেল রক্ষিত হবে, তার সংগে থাকবে হোমার, দান্তে আর শেক্সপীয়ারের রচনাবলী। তখন বিশ্ব-পৃথিবীর সংসদে অনাগত কালের বিজয়-চিহ্ন ক্রমান্বয়ে সংরক্ষিত হতে থাকবে। সেই স্তূপের সাহায্যে শেষ-পর্বে আমরা স্বর্গারোহণের আশা করতে পারি।

মহাকবিদের কাব্য এখন পর্যন্ত মানুষের অনধীতই রয়ে গেছে, কেন না কেবল মহাকবিরাই সে-কাব্য অধ্যয়নের সামর্থ্য রাখেন। জন-সাধারণ যেমন তারকা নিরীক্ষণ করে, ঐ সব কাব্য তেমন ভাবেই তাদের অধীত হয়, তাও আবার ফলিত জ্যোতিষের দৃষ্টিতে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নয়। অধিকাংশ ব্যক্তিই পাঠাভ্যাস করেন সামান্য সুবিধার উদ্দেশ্যে, যেমন হিসাব রক্ষা করার জন্য, কি ব্যবসায়ে না ঠকে যান এই জন্যই তাঁরা পাটিগণিত শিক্ষা করেন। কিন্তু অধ্যয়ন যেখানে মহীয়ান্, ধীশক্তির সাধনা, সেখানে তাঁদের জ্ঞান সামান্যই, নেই বললেই চলে। বিশিষ্ট অর্থে অধ্যয়ন তো তাই। বিলাস হিসাবে আমাদের তন্দ্রালু করে আমাদের শ্রেষ্ঠ গুণকে নিদ্রামগ্ন রাখবার জন্য অধ্যয়ন নয়। পদাঙ্গুলে ভর করে অত্যন্ত সচেতন হয়ে অতি-সজাগ অবস্থায় যে পাঠ, তাকেই অধ্যয়ন বলা চলে।

আমার মতে বর্ণমালা শিক্ষা করেই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থ পাঠে মন দেওয়া উচিত—চিরকাল ধরে অ-আ-ক-খ কি চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণীর সরল পাঠ, পুনরাবৃত্তির দরকার নেই, যেন চিরকাল ধরেই নিম্নতম শ্রেণীতে শিক্ষকের সম্মুখে বসে পাঠাভ্যাস করতে হবে। একটি মাত্র সদ্‌গ্রন্থ বাইবেল পাঠ করেই বা তার পাঠ শুনে অথবা তার বিচারে নিজেকে অপরাধী করে খুশি থাকেন বেশির ভাগ লোক। বাকি জীবনটা আলসেমি করে কি নিজেদের ক্ষমতার অপচয় হিসাবে সহজপাঠ্য বই পড়ে কাটিয়ে দিলেই হ'ল। আমাদের ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারে লিট্‌ল রীডিং নামে কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি পুস্তক আছে। ভেবেছিলাম ওটা একটা জায়গার নাম—আমার যাওয়া হয় নি এমন কোন অঞ্চলের। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা পুরোপেট মাংস কি সব্‌জির খানার পর অতিভোজী করমোরান্ট কি উট-পাখির মতো, এসব খেয়েও হজম করতে পারেন—কিছুই পাতে ফেলে রাখার পক্ষপাতী নন তাঁরা। এই সব মাল যাঁরা তৈরি করেন, তাঁরা এক যন্ত্র, আবার

এসব যাঁরা পাঠ করেন তাঁরাও যন্ত্র বিশেষ। নয় হাজার বার তাঁরা একই গল্প পড়ে চলেছেন—জেবুলোন আর সোফ্রোনিয়া পরস্পর পরস্পরকে এমন ভালবাসেন, যেমন কেউ কাউকে কোনদিন বাসে নি, কিন্তু তাঁদের প্রেম যখন প্রকৃত প্রেম, তখন পথে বাধা-বিঘ্ন পড়বে না এমন হ'তে পারে না—অন্তত ছুটতে ছুটতে, হোঁচট খেতে হয়, উঠেই আবার ছুটতে হয়। এক বেচারিকে একবার গির্জার চূড়ায় উঠিয়ে দেওয়া হ'ল, তার কিন্তু ঘণ্টা-ঘর পর্যন্ত যাওয়াও উচিত ছিল না। কিন্তু বিনা দরকারে যখন চূড়া পর্যন্ত উঠতেই হয়েছে, তখন প্রসন্ন ঔপন্যাসিক ঘণ্টা বাজিয়ে বিশ্ববাসীকে একত্র করে শোনালেন, “হায় হায় কি করে বেচারি আবার মাটিতে নামল।” আমার মতে উপন্যাসজগতের যাবতীয় হবু লেখকদের যদি কোন রকমে মানুষ দিঙনির্ণয় যন্ত্রে রূপান্তরিত করে—যেমন এককালে গ্রহ-নক্ষত্রে বীরদের খাড়া করা হত—তাদেরকে ঘুরপাক খাওয়ানো যেত সেখানে, যাতে অকেজো হয়ে মরে সেখানে—তাহ'লে তারা এখানে নেমে এসে আর ভদ্রলোকদের আবোল-তাবোল শুনিয়ে কান ঝালাপালা করতে পারত না। এর পরের বার যখন ঔপন্যাসিকপ্রবর ঘণ্টা বাজাবেন, তখন আমি এক পাও নড়ব না,—আগুন লেগে পুড়ে সব ছারখার হয়ে গেলেও। “টিপ-টো-হপের স্কিপ, মধ্য যুগের রোমাঞ্চ, টিট্‌ল-টোল-টান-এর প্রখ্যাত লেখকের রচনা; মাসে মাসে এক এক খণ্ডে প্রকাশ্য; ভীষণ ভিড়; সকলে যেন এক সঙ্গে না আসেন”—চোখ গোল করে পড়েন সব, অধীর অশোভন আগ্রহের সংগে, পক্ষিসুলভ দ্বিতীয় পাকস্থলী তখনও ভরে নি, সেখানকার ধারে কখনও শান দেবার দরকার হয় না—যেন কোনও চার বছরের শিশুর হাতে তার দুই সেণ্ট মূল্যের সোনালী সংস্করণের সিণ্ডেরেলা;—যতদূর দেখা যায় উচ্চারণে কোথায় জোর দিতে হবে, কোথায় কতখানি গুরুত্ব, সেদিকে উন্নতির লক্ষণ নেই, নীতি-সংগ্রহে বা পূরণে কোন নৈপুণ্যেরও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে চোখে ছানি পড়ে, প্রাণরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক রক্ত-সঞ্চালনে বাধা ঘটে, সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তির সকল দিক দিয়ে শৈথিল্য আসে, পঙ্কিল হয়ে ওঠে সব। প্রত্যেকের চুলাতে এই বাজে বিস্কুট তৈরি হচ্ছে প্রত্যেক দিন, খাঁটি গম কি যব দিয়ে যা তৈরি তার চাইতে অনেক উৎসাহের সংগে। আর বাজারে তো পড়তেই পায় না মাল।

যাঁদের লোকে পড়ুয়া বলে জানে, তাঁরাও সেরা বই পড়েন না। আমাদের কনকর্ডে কৃষ্টির বহর কতটুকু? বাছা বাছা কয়েকটা ক্ষেত্র ছাড়া এই শহরে ইংরেজী সাহিত্যের খুব ভাল বই কি সর্বশ্রেষ্ঠ বই পড়ার রেওয়াজও নেই—এ ভাষা তো সবাই পড়তে পারে, বানানও জানে কথার। এমন কি, যাঁরা কলেজে পড়েছেন, কি যাঁরা এখান থেকে বা বাইরে থেকে তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁদেরও ইংরেজী ক্লাসিক গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় নেই, বা

থাকলেও খুব কমই আছে। আর প্রাচীন ক্লাসিক-গ্রন্থ কি বাইবেল, মনুষ্য-জাতির প্রজ্ঞার যা নথিস্বরূপ, পড়তে চাইলেই যা সবাই যোগাড় করতে পারে, কুত্রাপি তাদের পরিচয় লাভের সামান্য মাত্র আগ্রহও দেখা যায় না। মধ্য বয়সের জনৈক কাঠুরিয়াকে জানি আমি, সে ফরাসী ভাষার একখানি খবরের কাগজ নেয়,—খবরের জন্য নয়, সে বলে খবর জানার দরকার নেই তার, তবে "অভ্যাসটা রাখতে হবে তো"—কানাডার অধিবাসী বাপ-মার ছেলে সে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, দুনিয়ায় তার কাছে সব চাইতে ভাল কাজ কি। সে বললে, ঐ ভাষা ছাড়া ইংরেজী ভাষা-চর্চার অভ্যাসটা রাখতে চায়, শব্দজ্ঞানও বাড়াতে চায়। কলেজে পড়েছেন যাঁরা তাঁদেরও সচরাচর উচ্চাশা এই ধরনেরই, এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ইংরেজী কাগজ নেন একখানি করে। একজন হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ একখানি পড়া সাঙ্গ করে এসেছেন সবে, ক'জনকে পাবেন তিনি যাদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা কইতে পারেন? কিংবা, মনে করুন, তিনি মূল গ্রীক অথবা লাটিনে রচিত কোন ক্লাসিক-গ্রন্থ পাঠ করেছেন,—তথাকথিত নিরক্ষর লোকদের কাছেও বইটার সমাদর আছে—তিনি এমন কাউকে পাবেন না, যাঁর সঙ্গে তা নিয়ে কথাবার্তা কইতে পারেন, তাঁকে এ-বিষয়ে চুপ করে থাকতে হবে। বস্তুত, আমাদের কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে কেউ যদি বা গ্রীকভাষার কায়দা-কানুন আয়ত্ত করে থাকেন, কোন গ্রীক কবির কাব্য বা তার রচনাচাতুর্য বা তার কলা-কৌশল কি তিনি সমান আয়ত্তের মধ্যে এনেছেন যাতে দরদ দিয়ে উৎসাহী কষ্ট-সহিষ্ণু কোন পাঠককে সে-বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন? আর বিভিন্ন জাতির ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থ বাইবেল ইত্যাদির কথা যদি ধরা যায় তবেই বা এ শহরে এমন কে আছেন যিনি আমাকে তাদের নাম পর্যন্ত বলতে পারেন? বেশির ভাগ লোক এও জানেন না যে, হিব্রু ছাড়া আর কোন জাতের শাস্ত্র-গ্রন্থ আছে। একটা রৌপ্য-ডলার কুড়িয়ে নিতে হলে কোন মানুষ—যে কোন মানুষ—তাঁর পথ ছেড়ে বেশ খানিকটা এ ধারে ও ধারে চলে যান; কিন্তু এইসব স্বর্ণময় বাণী, প্রাচীন কালের জ্ঞানী-গুণীরা যা উচ্চারণ করে গেছেন, যার মহিমা কীর্তনে পরবর্তী কালের জ্ঞানীরা মুখর, তা ছেড়ে আমরা সরল পাঠ আর স্কুল-পাঠ্য প্রাথমিক বই পড়ে জ্ঞান লাভ করি। স্কুল ছেড়ে অবধি পড়ছি লিট্‌ল রীডিং আর গল্পের বই, বালকপাঠ্য হাতে খড়ির বই সব। ফলে আমাদের পড়াশোনা, আমাদের কথা-বার্তা, আমাদের চিন্তাধারা সব কিছু এমন নিম্নস্তরে থাকে যে তা কেবল বালখিল্য আর মানবকদের শোভা পায়।

কনকর্ডের মাটিতে যে সব জ্ঞানী জন্মেছেন, তাঁদের চাইতে যাঁরা জ্ঞানবান, যাঁদের নাম এখানকার সকলে শোনেনও নি, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় লাভের উচ্চাশা আছে আমার। প্লেটোর নাম কি চিরকাল ধরে শুনেই যাব, তাঁর

গ্রন্থ পড়ব না কখনও? প্লেটো আমার এই শহরেই বাস করেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ করলাম না—আমার পড়শী কিন্তু আমি তাঁকে কথা কইতে শুনলাম না, তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণীও মন দিয়ে শুনলাম না। বাস্তবিক কি হয়? তাঁর ডায়ালগ্স-গ্রন্থ, তাঁর অমর-বাণীর ভান্ডার এই শেলফেই রয়েছে, কিন্তু কখনও তা পড়ি নে। যথোপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা হয় নি আমাদের, কূপ-মণ্ডূকের জীবন যাপন করি, আমরা নিরক্ষর। স্বীকার করছি, শহর-বাসীদের মধ্যে যাঁরা লেখাপড়া একেবারেই শেখেন নি, আর লেখাপড়া শিখেও যাঁরা শিশুপাঠ্য আর কমবুদ্ধি লোকদের জন্য লেখা বই পড়ে জীবন কাটান, তাঁদের নিরক্ষরতার মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য আমি দেখি নে। প্রাচীন কালের মহাপুরুষদের যোগ্যতা লাভ করতে হলে, তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে খানিকটা জ্ঞানলাভ প্রথমটায় প্রয়োজন। আমরা বাল-খিল্যের জাতি, বুদ্ধির ক্ষেত্রে দৈনিক কাগজের খবরাখবরের বেশি ঊর্ধ্বে বিচরণ করি নে।

সব গ্রন্থই কিছু পাঠকের মতো নীরস নয়। হয়তো সে সবের মধ্যে এমন কথাও আছে যা আমাদেরই অবস্থাকে উপজীব্য করেছে, ঠিক ভাবে পড়লে আর বুঝতে পারলে যা আমাদের পক্ষে প্রাতঃকাল কিংবা বসন্তকালের মতো স্বাস্থ্যপ্রদ হতে পারত, হয়তো আমাদের কাছে বস্তুজগতের চেহারা নতুন করে তুলে ধরত। কত মানুষ একটা বই পড়েই তো জীবনে নতুন অধ্যায় সূচনা করেছেন। হয়তো আমাদের পক্ষে যা রহস্য তার সমাধান করে নতুন রাজ্যের সন্ধান দিতে পারে আমাদের, এমন বইও আছে। বর্ত-মানে যে প্রশ্ন অকথিত রয়েছে, কোথাও হয়তো তাদের উল্লেখ পাওয়া যাবে। যে সব প্রশ্ন আমাদের চঞ্চল করে, সমস্যাকুল করে, হতবুদ্ধি করে, সে সব প্রশ্ন জ্ঞানীদের মনেও উঠেছিল, একটিও বাদ পড়ে নি। তাঁদের প্রত্যেকে এর সমাধান করে গেছেন, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁদের বাণীতে, তাঁদের জীবনে। উপরন্তু জ্ঞান লাভের সঙ্গে পরমতসহিষ্ণুতাতেও শিক্ষা লাভ ঘটবে আমাদের। কনকর্ড থেকে একটু বাইরে গেলে একটা খামার আছে, সেখানে একটা লোক মজুরি খাটতে এসে তার পুনর্জীবন লাভ করলে, ধর্ম বিষয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। এখন সে মনে করে, তার এই ধর্ম তাকে নীরব গাম্ভীর্য দিয়েছে। সে কারও সঙ্গে মেলা-মেশা করতে চায় না, কিন্তু এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধও হয়ে উঠতে পারে নি সে। কিন্তু হাজার হাজার বৎসর আগে, জরথুস্ত্র একই পথের পথিক হয়ে একই অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি জ্ঞানী ছিলেন, তাই একে বিশ্বজনীন বলে বুঝেছিলেন, প্রতিবেশীদের সেই ভাবেই দেখতেন। এই ভাবেই তিনি নতুন ধর্মের সন্ধান পেয়েছিলেন, মনুষ্য সমাজে তার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে শোনা যায়। শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি

জরথ্রুস্ট্রের দ্বারস্থ হতে পারেন। অপরাপর মহাপুরুষদের এমন কি স্বয়ং যীশুখ্রীস্টের প্রভাবে চিত্তের প্রসার সাধন করতে পারেন। তাতে যদি 'আমাদের 'চার্চ'কে তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়, তাতেই বা কি?

আমরা গর্ব করে বলি ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্তান আমরা, অন্য জাতির তুলনায় আমাদের অগ্রগমন অতি দ্রুত। কিন্তু এই গ্রামে অনুশীলনকল্পে কি কাজ হয়েছে দেখা যাক। শহরের কোন ব্যক্তির তোষামোদ করতে আমি চাই নে, কিংবা কেউ আমার তোষামোদ করুক তেমন ইচ্ছাও নেই আমার। তাতে উভয়ের কারওই লাভ হবে না কিছু। ষাঁড়কে যেমন খুঁচিয়ে দ্রুত চালাবার চেষ্টা করা হয়, সেই রকম ভাবে চলার পথে খোঁচা খাবার দরকার আমাদের। সাধারণের জন্য আমাদের কতকগুলো বিদ্যালয় আছে, সে সব শিশুদের জন্য। তুলনামূলক বিচারে সেখানকার ব্যবস্থা মন্দ নয়। কিন্তু শীতকালে ঢিমে তালে চলা লিসিয়াম আর সম্প্রতি সরকারের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত সামান্য একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিলে, আমাদের উপযোগী কোন শিক্ষালয়ই নেই। আমাদের মনের খোরাকের তুলনায়, দৈহিক পুষ্টির আর ব্যাধির প্রয়োজনে যে কোন সামগ্রীর জন্য খরচা বেশি করে থাকি আমরা। সাধারণের অতিরিক্ত বিদ্যালয়ের প্রয়োজন এখন, নর-নারী হবার বয়ঃক্রমে পেঁছিলেই যাতে শিক্ষার অবসান না ঘটে। গ্রামগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলবার সময় এবার এসেছে। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা তার সদস্য হবেন। যদি অবস্থা সচ্ছল হয় তাঁদের, অবসর থাকে, তাহ'লে বাকি জীবনটা তাঁরা সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির চর্চায় রত থাকতে পারেন। চিরকাল ধরে পৃথিবী কি একটা প্যারিস বা একটা অক্সফোর্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে? কনকর্ডের উন্মুক্ত প্রান্তরে ছাত্রেরা খেয়ে থেকে উচ্চ শিক্ষা পাবে এমন ব্যবস্থা হ'তে পারে না? কোন অ্যাবেলার্ডকে সম্মানীমূল্যের বিনিময়ে এখানে এনে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করতে পারি নে কি আমরা? দুঃখের কথা এই যে, গরু-মোষের খাওয়ার ব্যবস্থা করে, কি দোকানপাটের খবরদারি করেই আমাদের সময় কাটে, বিদ্যালয়ে যাবার সময় কোথায়? তাই শিক্ষাও এগোয় না কিছুতে। ইউরোপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যা করেন, এদেশের গ্রামগুলি কয়েকটা বিষয়ে সে কাজ করতে পারে। কলা-শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হ'তে পারে। সে-রকম ধনৈশ্বর্য আছে এর। অভাব শুধু মার্জিত রুচি আর বদান্যতার। চাষীরা আর ব্যবসায়ীরা যে সবের মূল্য বোঝে, সে সব ব্যাপারে খরচা এখানে যথেষ্টই হয়। কিন্তু কেবল বুদ্ধিপ্রধান ব্যক্তিরা যাকে সবার উপরে স্থান দিয়ে থাকেন, তেমন কোন ব্যাপারে খরচা করাকে উদ্ভট কল্পনা বলে ধরা হয়। রাজনীতির কি ঘটনাচক্রের দৌলতে যে কারণেই হ'ক, এই শহরে সতর হাজার ডলার মূল্যে এক টাউন-হল খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু

কোন জীবিত বুদ্ধিজীবীর কল্যাণে—ঐ গৃহে প্রাণ সঞ্চার করতে হ'লে যা দরকার—আর একশ বছরের মধ্যে ঐ টাকা খরচা করবে কি না সন্দেহ আছে। শীতকালে লিসিয়াম-এর জন্য বাৎসরিক যে একশ পঁচিশ ডলার বরাদ্দ আছে, তাকে এই শহরে ঐ পরিমাণ টাকার আর সব যে-ব্যয় হয় তার চাইতে সদ্ব্যয় বলতে হবে। আমরা যখন ঊনবিংশ শতাব্দীতেই জীবন যাপন করছি, তখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে, সে সব ভোগ করব না কেন? আমাদের জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখি কেন? খবরের কাগজই যদি পড়ি, তবে বস্টনের খবরাখবর বাদ দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র যেটা, সেটা নেওয়া সুরু করি নে কেন এখনই? তাহ'লে "নিরপেক্ষ পারিবারিক" পত্রিকার রস পান করতে হয় না, নিউ ইংলণ্ডে বসে "অলিভ ব্র্যাণ্ড" চর্বণ করতে হয় না। সমস্ত বিদ্বজ্জন-সমাজের কার্য বিবরণী কেন না আনাই আমরা—দেখাই যাক না তাদের বিদ্যাবুদ্ধি কি পরিমাণ। আমরা কি পড়ব না পড়ব, তার ভার হার্পার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স কি রেডিং অ্যাণ্ড কম্পানির হাতে ছেড়ে দিই কেন? অনুশীলিত-রুচি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যেমন চারপাশে তাঁর অনুশীলন-সহায়তার জন্য বিবিধ সংগ্রহ রক্ষা করেন—প্রতিভা, পাণ্ডিত্য, বাক্‌চাতুর্য, পুস্তক, রেখা-চিত্র, প্রস্তরমূর্তি, সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এবং অনুরূপ কত কি—তেমনই আমাদের গ্রামেও ব্যবস্থা হতে পারে। গুরুমশায়, পাদ্রী, তাঁর অনুচর, একটা আঞ্চলিক পাঠাগার, আর সেই নির্বাচিত ত্রয়ী, কেন না আমাদের পিলগ্রিম পূর্বপুরুষরা কঠিন শীতের মধ্যে রুক্ষ পর্বতে এদের সাহায্যে রক্ষা পেয়েছিলেন,—শুধু এই সব নিয়ে নাই থাকলাম। আমাদের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মূল নীতি হচ্ছে সমবেত হয়ে কাজ করা। আমাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ, আমাদের অর্থানুকূল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চাইতে বেশি, তাই নিউ ইংলণ্ড পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানীদের অর্থ-মূল্যে এখানে এনে তাঁদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে সংকীর্ণতা বর্জনের দোষে বিন্দুমাত্র দোষী না হয়ে তাঁদের নিকট পাঠ গ্রহণ করবে এই আমার আশা। সাধারণের অতিরিক্ত এই রকম শিক্ষালয়ের প্রয়োজন আমাদের। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্থান অধিকার করুক গ্রামবাসীদের সম্ভ্রান্ত গ্রাম। প্রয়োজন হ'লে নদীতে একটা পুল না হয় গড়া নাই হ'ল, একটু ঘুর পথে গেলেই চলবে। পরিবর্তে, আমাদের চারপাশে অজ্ঞতার যে কৃষ্ণোপসাগর, তার উপরে অন্তত একটা খিলানও তোলা যেতে পারে।

॥ ৪ ॥ ধ্বনি

আমরা যতক্ষণ বই মুখে করে আছি, এ ভাষায় সে ভাষায় লেখা উৎকৃষ্ট এবং উচ্চাঙ্গের সব বই পড়ছি, ভাষাগুলো কিন্তু প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ভাষা মাত্র, ততক্ষণ একটা বিপদ ঘটেছে এই যে, যে-ভাষায় বিনা অলঙ্কারেও সকল সামগ্রী আর ঘটনা কথা বলে যায়, সে-ভাষা ভুলতে বসেছি। অফুরন্ত আর প্রামাণিক ভাষা বলতে তো ঐ একটাই। অনেক তার কথা, ছাপা হয় সামান্য। ঝিলমিলির ভিতর দিয়ে সূর্যকিরণ ঝরঝরিয়ে এসে পড়ছে, ঝিলমিলিটা একেবারে সরিয়ে দিলে মনেও পড়বে না তার কথা একবার। কোন রীতি কি নিয়মনিষ্ঠাই সতত সচেতন থাকার প্রয়োজনের স্থান অধিকার করতে পারে না। চোখ মেলে চেয়ে দেখবার শিক্ষার সঙ্গে তুলনায়, ইতিহাস, দর্শন, কাব্যের, যতই সুনির্বাচিত হ'ক, কোন পাঠ্যধারা, কি মনের মতো সংসর্গ, কি জীবনযাত্রার সুপরিপাটি শৃংখলা কোথায় দাঁড়ায়? অদৃষ্টকে জানতে হ'লে চোখ মেলে সামনে চেয়ে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গে আগে চলার পথে পা বাড়ান।

প্রথম বৎসর গ্রীষ্মকালটা আমি পড়াশোনা করি নি, বিন চাষ করতাম। শুধু তাই নয়, তার চাইতেও ভাল কাজে সময় কাটে আমার। এমন সময়ও গেছে যখন বর্তমান মুহূর্তটির মঞ্জরীকে হাত ফসকে যেতে দেবার কথা ভাবতে পারি নি, হাত কি মাথার সব কাজই ফেলে রেখেছি সেই জন্য। সুপ্রচুর অবকাশ ভাল লাগে আমার জীবনে। গ্রীষ্মকালে সকাল বেলায় কখনও কখনও যথারীতি স্নান সাঙ্গ করে এসে আমার রোদে ঝলমল দুয়ারটির পাশে বসে কাটিয়ে দিয়েছি। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়েছে, পাইন, হিকোরি আর স্যুমাকের মধ্যে স্বপ্নে ডুবে কেটেছে, সম্পূর্ণ নিভৃত, সম্পূর্ণ নির্জন, পাখিরা কূজন করছে চারপাশে কিংবা বাড়িটার মধ্যে নিঃশব্দে উড়ে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ দেখি আমার পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে, দূরের রাজপথ থেকে কোন যাত্রী গাড়ির চলার আওয়াজ কানে আসছে। তখন কেবল খেয়াল হয়েছে সময় কতটা কেটেছে। রাত্রিকালে ফসল যেমন বাড়ে, সে সময়ে তেমনি ফলন ঘটেছে আমার। হাতের কাজ করে যা হ'ত, তার চাইতে অনেক ভাল

হয়েছে সেটা। আমার জীবন থেকে সে সময়টার বিয়োগ ঘটে নি, আমার বরাদ্দ ভাতার উপরে উপরি-পাওনা হিসাবে যোগ হয়েছে। প্রাচ্য দেশীয়েরা ধ্যান আর কর্মত্যাগ বলতে কি বোঝেন, তখন উপলব্ধি করেছি। কি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, কোন পাত্তাই রাখি নি তার বেশির ভাগ সময়ে। বেলা যে বেড়ে চলেছে, সে যেন আমারই কোন কাজে আলোর যোগান দিতে। এই সকাল ছিল; আবার এই সন্ধ্যা হ'ল, মনে রাখবার মতো কোন কিছুই ঘটল না। আমার নিরবচ্ছিন্ন সৌভাগ্যে নীরবে হেসেছি, পাখিদের মতো গান না গেয়ে। আমার দোরের সামনে হিকোরি গাছের ডালে বসে চড়াই পাখিটা যত গুঞ্জন তুলেছে, আমি আমার নীড়ে বসে তত মুখ চেপে হেসেছি, চাপা কাকলি, পাখিটা শুনুক। আমার দিন হপ্তা গুণে কাটে নি, কোন পৌত্তলিক দেবতার ছাপমারা দিন নয়, কিংবা ঘণ্টার ছক-কাটা ঘড়ির টিক-টিক আওয়াজে হয়রান হওয়া দিন নয়। আমি দিন কাটাতাম পুরীতীর্থে ভারতবাসীরা যেমন দিন কাটান। তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "গতকাল, আজ, আগামী কাল সব বোঝাতেই তাদের কথা একটা মাত্র, শুধু অর্থের পার্থক্য বোঝাবার জন্য তারা গত কাল বলতে হ'লে পিছনে ইঙ্গিত করে দেখায়, আগামী কাল বলতে সামনে, আর যে দিনটা কাটছে সেটা বোঝাতে মাথার উপর ইঙ্গিত করে।" আমার শহরবাসীদের কাছে নিছক কুড়েমি এটা। কিন্তু পাখি আর ফুল তাদের নিরিখে পরখ করলে আমার দোষ পাবে না। মানুষের নিজের উপলক্ষ নিজের মধ্যে, কথাটা খাঁটি। অতি প্রশান্ত দিন প্রকৃতির, কারও আলসেমির জন্য গঞ্জনা দেয় না।

যারা আমোদের সন্ধানে বাইরে ছুটতে বাধ্য হয়, সমাজ চায়, থিয়েটারে যায়, তাদের তুলনায় আমার জীবনযাত্রার ধারাটার অন্তত একটা সুবিধা ছিল, আমার জীবনটাই আমোদ হয়ে ওঠে, কখনও বৈচিত্র্য হারায় নি। বহু দৃশ্যে ভরা নাটক একটা, তার অন্ত ছিল না। যদি সর্বদা জীবিকার যোগাড় থাকে আমাদের আর একেবারে শেষমেশ যে কায়দাটা রপ্ত হয়েছে, সেই মতো জীবনটা যদি কাটাতে পারি, তবে আনন্দের অভাবে কষ্ট পেতে হবে না কোনদিন। নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধির পায়ে পায়ে চল, দণ্ডে দণ্ডে নতুন দৃশ্য দেখানোয় হার মানবে না সে। গৃহস্থালির কাজকর্মেও আনন্দে সময় কেটেছে। মেজেতে ধুলো জমেছিল, সকাল সকাল উঠে আমার আসবাবপত্র বাইরে টেনে এনে ঘাসের উপর ফেললাম, এক খরচায় খাট আর বিছানা দুইই, মেজেতে জল ঢেলে দিলাম, পুকুরের ধার থেকে সাদা বালি এনে ছড়িয়ে দিলাম তার উপর, অতঃপর একটা ঝাড়ু নিয়ে ঘষে মেজে পরিষ্কার ধবধবে করে তুললাম মেজেটা। গ্রামবাসীরা প্রাতরাশ সাঙ্গ করবার আগেই প্রভাত সূর্য আমার ঘরটাকে এমন শুকনো খটখটে করে দিলে যে ঘরের মধ্যে ফিরে যেতে পারলাম। এ সময়টার

মধ্যে চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে নি বললেই চলে। আমার ঘর-সংসারের সমস্ত সামগ্রীকে ঘাসের উপর ছড়ানো দেখে বেশ মজা লাগছিল। বেদেদের মালপত্রের ছোটখাটো একটা স্তূপের মতো। আমার তেপায়াটার উপর থেকে বই কলম কাগজ কিছু নামাই নি। পাইন আর হিকোরির মধ্যে খাড়া করা ছিল সেটা। মনে হচ্ছিল, বাইরে যেতে পেরে সব বেশ খুশিই হয়েছিল, ভিতরে ঢুকতে অনিচ্ছুক ছিল যেন। মধ্যে একবার লোভ হয়েছিল, সামিয়ানা একটা খাটিয়ে দিই ওগুলোর উপরে, তারপর তার নিচে গ্যাঁট হয়ে বসে যাই। জিনিষগুলোর উপর রোদ পড়ে ঝলমল করছিল দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। আওয়াজ পাচ্ছিলাম সেগুলোর উপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। অনেক পরিচিত জিনিষপত্র বাড়ির বাইরে খোলা মাঠে দেখলে আরও ভাল লাগে সেগুলো। একটা পাখি পাশের ডালে বসে আছে, টেবিলটার নিচে থেকে লাইফ এভারলাস্টিং মাথা খাড়া করে উঠেছে, তার পায়াগুলো ঘিরে রয়েছে ব্ল্যাকবেরির লতাপাতা, পাইনের ফল, চেস্‌নাটের আঁটি, স্ট্রবেরিব পাতা চারদিকে ছড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিল, এই ভাবেই বুঝি আমাদের আসবাবপত্রে, চেয়ারে, টেবিলে আর খাট-পালঙ্কে এদের আকার অঙ্কিত হয়—একদিন তো ওগুলো এদের দলভুক্তই ছিল।

পাহাড়ের একটা ধারে আমার বাড়িটা, বড় জঙ্গলটার লাগাও, কচি কচি পিচপাইন আর হিকোরির বনবাদাড়ের মধ্যে, জলাশয় থেকে আধ ডজন রড মাত্র দূরে, পাহাড়ের গা বয়ে সরু একটা পায়ে-চলা পথ সেখানে গিয়ে পড়েছে। আমার সামনের উঠোনটায় স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি, লাইফ এভারলাস্টিং, জন সোওয়র্ট আর গোল্ডেনরড, শ্রাবওক আর স্যান্ডচেরি, ব্লুবেরি আর গ্রাউন্ডনাট গজিয়েছিল। মে মাসের শেষাশেষির দিকে স্যান্ডচেরি (সিরেসাস পিউমিলা) পথের দুধার সাজিয়ে দিলে সুন্দর ফুল দিয়ে, ছোটছোট ডাঁটার উপর গোল ছত্রাকারে সুবিন্যস্ত। ডাঁটাগুলো গত হেমন্তে বড় বড় সুন্দর সুন্দর চেরির ভারে ঝুঁকে পড়েছিল, চারধারে মালার মতো করে—যেন কিরণচ্ছটা। প্রকৃতির সম্ভাষণার্থে সেগুলো চেখে দেখেছিলাম, মোটেই সুস্বাদ লাগে নি যদিও। বাড়ির চারধার জুড়ে স্যুমাক (রাস গ্লাব্রা) ঝাঁকে ঝাঁকে গজিয়েছে। একটা বেড়া দিয়েছিলাম, সেটা ছাড়িয়ে পাঁচ কি ছয় ফুট লম্বা হয়ে ফুঁড়ে বেরিয়েছিল প্রথম বৎসর। চওড়া পাখা-মেলা পাতা, গরম দেশের গাছের মতো মনোরম, কিন্তু দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। একেবারে মরে গেছে মনে হয়েছিল কয়েকটা শুকনো ডাঁটা, সেগুলো থেকে হঠাৎ সব অঙ্কুর বসন্তের শেষে মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে বেড়ে উঠে সুন্দর সবুজ এক এক ইঞ্চি ব্যাসের কচি কচি ডাল হয়ে গেল—যেন ভোজবাজি। দুর্বল গাঁটগুলো খাটিয়ে এক রকম বেপরোয়া ভাব নিয়ে বাড়ল সেগুলো। জানালায় বসে আছি

কোন সময়ে, কোথাও বাতাস চলার কিছুমাত্র লক্ষণ নেই, একটা সদ্যোজাত কচি ডাল হাতপাখার মতো মাটিতে উড়ে পড়ল হুড়মুড়, করে, আওয়াজ পেলাম—নিজের ভার নিজেই সইতে পারে নি। আগষ্ট মাসে বড় বড় থোকা থোকা বেরি আস্তে আস্তে নিজেদের চকচকে গাঢ় মখমলী লাল রঙে রাঙিয়ে উঠল, তারপর নিজেদের ভারে ঝুঁকে পড়ল, আবার মাটিতে পড়ে কচি কচি গা-হাত-পাগুলো ভেঙেও ফেলল। যখন ফুল ছিল অনেক বন-মৌমাছিকে আকৃষ্ট করেছে এরা।

গ্রীষ্মকালের এই বিকাল বেলায় জানালার ধারে বসে আছি। নিজের হাতে বনজঙ্গল সাফ করা জায়গাটির উপরে বাজপাখিরা ঘুরে ঘুরে উড়ছে। চোখের ঠিক সামনা সামনি বনপায়রারা ঘন ঘন ঘুর ঘুর করছে, জোড়ায় জোড়ায় আবার তিনটে করেও, কিংবা আমার বাড়ির পিছন দিককার শ্বেত পাইন গাছের ডালে উড়ে গিয়ে বসে ফরফর করছে। বাতাস যেন বাঙময় হয়ে উঠেছে। মাছরাঙা পাখিটা একটা মাছ ধরে আনল, হ্রদের স্ফটিক-স্বচ্ছ উপরটায় টোল পড়ল। আমার দরজার সামনের জলা থেকে একটা বেজি সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এসে হ্রদের ধারে গিয়ে একটা ব্যাঙ পাকড়ে ধরল। জলপিপি পাখিরা এখানে ওখানে উড়ে বসছে, নলখাগড়ার বন তাদের ভারে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। এই আধঘণ্টা ধরে রেল গাড়ির ঝমঝম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। কখনও ক্ষীণ হয়ে এল, আবার ভেসে উঠল কবুতরের পাখা ঝাপটানোর মতো আওয়াজ করে। বস্টন থেকে এই অঞ্চলে যাত্রী নিয়ে আসছে গাড়িগুলো। এই শহরের পুবপাড়ায় একটা চাষীর কাছে এক ছোকরা কাজে লাগে বলে শুনেছিলাম। কিছুদিন যেতে না যেতেই পালিয়ে দেশে ফিরে যায়, অত্যন্ত দৈন্য দশাগ্রস্ত অবস্থায়, বাড়ির জন্য মন কেমন করে ওঠে বেচারির। পৃথিবীর সঙ্গে এত-খানি বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটাতে সুরু করি নি আমি। সে নাকি কখনও এমন নীরস আর পাণ্ডববর্জিত দেশ দেখে নি। সব লোকই কাজে বাইরে যায়। একটা ইঞ্জিনের হুইস্‌ল পর্যন্ত কানে আসে না! ম্যাসাচুসেটস অঞ্চলে আজ সেরকম জায়গা আছে কি না সন্দেহ আমার :—

> "খাঁটি কথা শোন, আমাদের গ্রাম হয়েছে বাঁটের মতো
> দ্রুত চলাচল রেলরাস্তার শিংয়ের গুঁতার ঘায়,
> শান্তির এই নিকেতন জুড়ি খালি খালি অবিরত
> কনকর্ড-নাম হাওয়ায় উড়িছে হায়।"

আমি যেখানে আছি, তার দক্ষিণে প্রায় একশ রড দূরে হ্রদটা ছুঁয়ে চলেছে ফিচবার্গ রেলরোড। সেই উঁচু পথ ধরে আমি সাধারণত গ্রামে যাই। যেন সেই সূত্রেই সমাজের সঙ্গে আমার আজও সম্পর্ক। এই রাস্তার সমস্তটাই পাড়ি দিয়ে চলে মালগাড়ি। তার লোকজন আমাকে পুরনো

পরিচিত ব্যক্তির মতো নমস্কার জানায়। আমার সঙ্গে এতবার তাদের দেখা হয় যে তারা স্পষ্টই ধরে নিয়েছে আমিও জনৈক কর্মচারী। প্রকৃত পক্ষেও আমি তাই। ভূমণ্ডলের যে কোন কক্ষে রাস্তা মেরামতের কাজে আমি খুশি হয়ে লাগতে রাজি আছি।

রেলগাড়ির হুইস্‌ল শীতে গ্রীষ্মে আমার চারপাশের বন জঙ্গল ভেদ করে আসছে, চাষীর আঙিনার উপর দিয়ে উড়ন্ত বাজপাখির মতো চিৎকার তার। এই শহরের বুকে বড় বড় শহরের ব্যস্ত-সমস্ত অনেক ব্যাপারি এসে পৌঁছুলেন বুঝতে পারি, কিংবা দেশান্তর থেকে এলেন তৎপর দেশী কারবারীরা। এক দিগন্তে এসে জমছেন সব, একদল অন্যদলকে হুঁশিয়ার হবার জন্য হাঁক পাড়ছেন। দুই শহরের বৃত্ত থেকে আওয়াজ শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। মুল্লুক জোড়া লোক চেয়ে দেখছে, এই আসছে তাদের মুদী-খানার মাল মশল্লা, এই এল তাদের খাবার-দাবার। এমন একজন কেউ নেই যে তার ক্ষেতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এদের রুখবে। এই নাও তোমাদের এজন্য যে পাওনা, এ মুল্লুকের হুইস্‌ল চিৎকার করে জানায়। শহরের দেওয়াল গুঁতিয়ে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল ছোটা লম্বা-লম্বা পিটিয়ে-ঠাণ্ডা-করা-ডাণ্ডার মতো কড়িকাঠ আর চেয়ারের রাশ, শ্রান্ত, বোঝার ভারে ক্লান্ত বাসিন্দাদের বসে চলার পক্ষে সংখ্যায় যথেষ্ট। এই বিরাট জবরজঙ্গ অনুষ্ঠানের সঙ্গে গ্রামদেশ শহরের হাতে একটা চেয়ার তুলে দিচ্ছে। ইণ্ডিয়ান হাকলবেরি ভর্তি পাহাড় ন্যাড়া হয়ে গেল, মাঠভর্তি ক্র্যানবেরি উজাড় হয়ে গেল শহরে। তুলো এল উজিয়ে তো বোনা কাপড় যায় ভাঁটিয়ে; রেশম হ'ল তেজী তো পশম গেল মন্দা; বইয়ের বইল জোয়ার, কিন্তু যে বুদ্ধিতে তা লেখা, তাতে পড়ল ভাঁটা।

যখন দেখি, সার সার গাড়ি নিয়ে ছুটে চলছে ইঞ্জিনটা, গ্রহের মতো গতিবেগ, বরং ধূমকেতুর মতো বলা ভাল, কেন না যে দেখছে সে বুঝতে পারে না এই পথেই আবার ফিরে আসবে ইঞ্জিনটা; কক্ষপথে কোন ফেরবার পথ নজরে পড়ে না তার, বাষ্পের ধোঁয়া পিছনে ফেলে ছেড়ে চলেছে,—অনেক উঁচুতে আকাশে পেঁজা তুলোর মতো যেমন মেঘের দল দেখি, বুক পেতে দিয়েছে আলোতে—যেন অর্ধ-দেব-মানব এই যাত্রী, এই মেঘশাসক এক্ষুণি সূর্যাস্তের আকাশকে তার আড্ডার উর্দি বানিয়ে তবে ছাড়বে; যখন দেখি এই লৌহাশ্ব তার নাসিকাধ্বনিতে বাজ পড়ার আওয়াজ করে পাহাড় কাঁপিয়ে ছুটছে, চরণভারে ধরিত্রী কম্পিত, তার নাসারন্ধ্র সধূম অগ্নি উদ্গিরণ করছে (নবযুগের পুরাণ কাহিনীতে কি পক্ষিরাজ ঘোড়া আর ভয়াল ড্রাগনের চেহারা নেবে এরা জানি নে), মনে হয় বসবাস করতে দেবার উপযুক্ত জাতি লাভ হয়েছে পৃথিবীর। যা মনে হয় তাই যদি হ'ত। মৌলগুলোকে মহৎ

আদর্শের কাজে লাগাত যদি মানুষ। মহৎ কীর্তির স্বেদ হ'ত যদি ইঞ্জিনের জমাট ধোঁয়া, কৃষকের ক্ষেতের উপর ভাসমান মেঘের মতো তা কল্যাণকর হ'ত, তবে মৌল আর প্রকৃতি নিজেরা সানন্দ চিত্তে মানুষের যাত্রাসহচর, সহগামী রক্ষী হ'তে পারত।

যে মনোভাব নিয়ে সূর্যোদয় দেখি, সেই ভাব নিয়েই সকালের গাড়ি চলে যাওয়াও দেখি, সেও কম নিত্য-নিয়মিত নয়। তার ধোঁয়ার রাশ অনেক পিছনে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে আকাশের দিকে চলেছে, আর গাড়িগুলো চলেছে বস্টনের পথে; সূর্যকে ক্ষণিকের জন্য ঢেকে আমার দূরের ক্ষেতে ছায়া ফেলেছে; স্বর্গের যাত্রীর পাশে তার ক্ষুদে ক্ষুদে গাড়ির সারি মাটি আঁকড়ে রয়েছে যেন বর্শার ফলা। লৌহাশ্বদের যেটা দৃঢ়তর, এই শীতের মধ্যে পাহাড়ের রাজ্যে সে সাত সকালে তার অশ্বদের দানাপানি দিয়েছে, তারার আলোয় তাদের জিন-লাগাম জুতেছে। অগ্নিদেবকেও তাই সকাল সকাল জাগতে হয়েছে, তার প্রাণশক্তির আগুন জুগিয়ে তাকে যাত্রার জন্য তৈরি করতে। যত সকাল সকাল আরম্ভ, তত যদি নির্দোষ হ'ত কাজটা। বরফ পুরু হয়ে জমলে বরফে চলার জুতো পরিয়ে দেওয়া হয় তাকে। বিরাট একটা ফলা পাহাড় থেকে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত হলরেখা কেটে যায়, গাড়িগুলো পিছনে জোতা বীজ ছড়ানো গাধা-গাড়ির মতো সেই রেখার মধ্যে বীজের বদলে ভিতরকার ব্যস্ত-সমস্ত সব লোককে আর বিক্ষিপ্ত পণ্যদ্রব্যগুলো ছড়াতে ছড়াতে ছোটে। সমস্তটা দিন অগ্নি-অশ্বটা দেশময় ছুটে বেড়ায়, থামে কেবল তার চালকের বিশ্রামের দরকার হলে। মধ্যরাত্রে তার চলার আওয়াজে, বেপরোয়া ঘোঁতঘোঁত শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমার। বনের ভিতর সুদূর কোন সংকীর্ণ উপত্যকায় বরফের তাল আর গুঁড়ো বরফের আড়ালে মৌলবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছে সে তখন। আড্ডায় গিয়ে পৌঁছুতে শুকতারা উঠবে, আবার ছুটতে হবে রোঁদ দিতে, বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই। কিংবা হয়তো শুনি সন্ধ্যাবেলায়, দিনান্তের প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি তার আড্ডায় গিয়ে হুসহুস করে ছাড়ছে। যাতে কয়েক ঘন্টার জন্য কঠিন লোহার ঘুম ঘুমিয়ে সে তার স্নায়ুগুলোকে স্থির আর যকৃত তথা মস্তিষ্ককে শীতল করতে পারে। কাজ তার সময়-সাপেক্ষ, অক্লান্ত, যদি সেই পরিমাণে মহৎ আর মহিমান্বিত হ'ত শুধু।

যেখানে এক সময় কেবল শিকারীরা দিনের আলোয় ঢুকেছে, শহরের শেষ প্রান্তে লোক-চলাচলবিহীন সেই বন জঙ্গলের অনেক ভিতর দিয়ে অধিবাসীদের কোন খবর না রেখে নিশুতি রাতের অন্ধকারে এই সব আলোকোজ্জ্বল আরাম-কামরাযুথ দ্রুত ছুটে চলেছে। এই মুহূর্তে কোন নগর কি বড় শহরের হাস্যোল্লাসময় বিরামবাড়িতে থামল, সদালাপী লোকদের

সেখানে জমাটি ভিড়, পর মুহূর্তে গিয়ে উঠল এক নিরানন্দ জলাভূমিতে, পেঁচা আর খেঁকশিয়ালরা ভয় পেল। গাড়িগুলোর আসা-যাওয়া গ্রামের জীবনে এখন যুগসূচনার মতো। এত নিয়মিত আর অভ্রান্ত ভাবে তারা আসে যায়, হুইস্‌লের আওয়াজ তাদের এত দূর থেকে শোনা যায় যে চাষীরা তাদের ঘড়ি মিলিয়ে নেয়, তাই শুনে। এই ভাবে সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশকে নিয়মানুগত রাখে। রেলরাস্তা পত্তনের সময় থেকে লোকজনের সময়ানুবর্তিতার উন্নতি হয় নি কিছুটা? ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থার আফিসগুলোর তুলনায় রেলগাড়ির স্টেশনগুলোয় বেশি কথা বলছে না তারা, বেশি তাড়াতাড়ি চিন্তা সারছে না? রেল স্টেশনের আব-হাওয়ায় কেমন যেন তড়িৎ সঞ্চারের ভাব। কি ভোজবাজী সাধন করেছে এ, আশ্চর্য হয়ে যাই দেখে। আমার প্রতিবেশীদের কারও কারও সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয় ছিলাম যে, তাঁরা কোনদিন এই দ্রুতগামী যানে চেপে বস্টন ছুটবেন না—এখন ঘণ্টা বাজতেই তাঁরা হাজির। কাজ করতে গেলেই এখন 'রেলগাড়ি ঝমাঝম' লোকের মুখে মুখে। রেলরাস্তা থেকে তফাত যাওয়ার জন্য এত বার করে আর এত মন দিয়ে হুঁশিয়ার হবার হুকুম মেনে চলায় লাভ আছে। এ ক্ষেত্রে, শান্তিভঙ্গের আইনটা পড়ে নেওয়ার অপেক্ষার কথা, কি বেআইনি জনতার মাথা বাঁচিয়ে গুলি ছোড়ার কথা ওঠে না। নতুন নিয়তির গঠন করেছি আমরা, যেন অ্যাট্রপস, ফিরে তাকায় না সে (তোমাদের ইঞ্জিনের নাম হ'ক এই)। লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া হয়, একটা নির্দিষ্ট ঘণ্টায় আর মিনিটে কম্পাসের বিশেষ বিশেষ দিক লক্ষ্য করে তীরগুলো ছোড়া হবে। কিন্তু কোন লোকের কাজের ব্যাঘাত করে না এরা, ছেলেরা পর্যন্ত আলাদা পথ দিয়ে ইস্কুলে যায়। টেল-এর পুত্রদের মতো শিক্ষা লাভ করছি আমরা। অদৃশ্য সব তীরে আকাশ ছেয়ে গেছে। নিজের পন্থা ছাড়া আর সব পন্থাই অদৃষ্ট পন্থা। সুতরাং নিজের পন্থায় স্থির থাক।

আমার কাছে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল্য তার উদ্যমে তার নির্ভীকতায়। হাত জোড় করে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায় না সে। রোজ দেখছি এই লোকদের, অল্পবিস্তর সাহস নিয়ে আর সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের কাজে কারবারে ছোটাছুটি করছে, এত কাজ করে তারা যা নিজেরাও ভেবে উঠতে পারে না এবং হয়তো নিজেরা ভেবে চিন্তে যে ফন্দিফিকির বার করত, তার চাইতে এ কাজ ভাল। এই সব লোকের সহাস্য শৌর্য যতটা নাড়া দেয় আমাকে, বুয়েনাভিস্টার লড়ায়ে যারা আধঘণ্টা কাল যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাগ্রে খাড়া ছিল, তাদের বীরত্ব আমার মনকে ততটা নাড়া দেয় না। বরফে ঢাকা রেলগাড়িকেই শীতকালের ঘরবাড়ি করে তার মধ্যে বসবাস করে চলেছে তারা। বোনাপার্ট

যাকে দুর্লভতম ভাবতেন, এদের সাহস রাত্রির সেই শেষ প্রহরকে অতিক্রম করেও সজাগ, এত তাড়াতাড়ি বিশ্রাম চায় না তা; ঝটিকার শান্তি হ'লে তবে এরা ঘুমোতে যায়, কিংবা যদি লৌহাশ্বটার হাত-পা ঠাণ্ডায় জমে যায় তখন। গ্রেট-স্নোর কথা সম্ভবত লোকজনের রক্তকে এখনও চঞ্চল করে, হিমার্ত করে তাদের। সেদিন ভোরবেলাতেও শুনলাম, ওদের ইঞ্জিনের ঘন্টার চাপা কন্ঠস্বর, তার জমে যাওয়া নিঃশ্বাসের কুয়াসাকুন্ঠ কিনার থেকে ঘোষণা হ'ল, নিউ ইংলণ্ডের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের তুষার-ঝটিকার প্রতিবাদ সত্বেও গাড়িরা আসছে, এল বলে। দেখলাম সব হলধরের বরফে শিশিরে ভেজা মূর্তি, মাথাগুলো লৌহবেষ্টনী ভেদ করে উঁকি মারছে, ডেজি ফুল আর মাঠইঁদুরদের গর্ত ছাড়া আর সব তছনছ করে চলেছে, বিশ্বপৃথিবীর বাইরে যার ঠাঁই, সিয়েরা নেভাডার সেই পর্বতপ্রমাণ চাঁইয়ের মতো।

ব্যবসা-বাণিজ্যে অসাধারণ আত্ম-বিশ্বাসী, সমাহিত, সজাগ, দুঃসাহসী আর অক্লান্ত হওয়া প্রয়োজন। তৎসত্বেও এর কার্যক্রমে একটা স্বাভাবিক ভাব থাকে। এর মধ্যে সে ভাব অনেক উদ্ভট উদ্যম আর ভাববিলাস মূলক পরীক্ষার চাইতে ঢের বেশি। বিশিষ্ট কৃতিত্ব এর সেখানেই। মালগাড়ি গড় গড় করে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়, আমি সঞ্জীবিত বোধ করি, প্রসারিত বোধ করি। লং হোয়ার্ফ থেকে লেক চ্যাম্পলেন পর্যন্ত সারাপথ সে মালপত্রের যে ঘ্রাণ বিলোতে বিলোতে চলে, সেই ঘ্রাণ পাই আমি। মনে পড়ে দেশ-বিদেশের কথা, প্রবাল দ্বীপ, ভারত মহাসাগর, গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুর কথা আর ভূমণ্ডলের বিশালত্বের কথা। আগামী গ্রীষ্মে নিউ ইংলণ্ডের কত লোকের সোনালী চুলে ভরা মাথা ঢাকবে যে তালপাতা তা দেখি, ম্যানিলার শণ, নারকেলের ছোবড়া, লঝঝর দড়িকাছি, গুণচটের থলে, লোহালক্কড়, মরচেপড়া পেরেক সব দেখি আর মনে হয় আমি ভূ-পৃথিবীর বাসিন্দা। এই গাড়ি বোঝাই ছেঁড়া পালের গাদা যখন কাগজে আর ছাপা বইয়ে রূপান্তরিত হবে, তখনকার চাইতে বেশি সুবোধ্য লাগে এখন, বেশি মজার লাগে। পালগুলোর ফুটোফাটা যেসব ঝড় রুখেছে, তার ইতিহাস আর কে স্পষ্টতর করে লিখতে পারবে? এরা এমন প্রুফ ছেপেছে, যার সংশোধনের কোন দরকার নেই। ম্যোনের বনজঙ্গল থেকে বোঝাই হয়ে চলেছে সব কাঠ, গত বর্ষায় এদের সমুদ্র পাড়িতে পাঠানো হয় নি, হাজার করা চার ডলার দাম বেড়েছে এখন, গতবার যা রপ্তানি আর ফাড়াই হয় তার ফলে; পাইন, স্প্রুস, সিডার—এক দুই তিন কি চার নম্বরের, এই সেদিন পর্যন্ত সব এক নম্বরের ছিল, ভালুক, মুজ আর ক্যারিবু হরিণের মাথার উপর দুলত সব। তার পরের গাড়িতে টমাসটন চুন, খাস পাঁজা থেকে আসছে, ঘুটিংএ গুঁড়ো হবার আগে অনেক পাহাড়-পর্বত ডিঙোতে হবে একে। এই যে গাঁট গাঁট, রং বেরং

হরেক রকম ছেঁড়া ন্যাকড়া, পোষাক-পরিচ্ছদের এই তো চরম পরিণাম, তুলো আর কাপড়ের শেষ অবস্থা যা দাঁড়ায়—ফ্যাশানদুরস্ত আর দৈন্যগ্রস্ত সব অঞ্চল থেকে যোগাড় হয়েছে এরা। সব রকম প্যাটার্ন আছে, এখন আর কদর নেই, এক মিলওয়াকিতে হয়তো থাকতে পারে, সে কদর এখন ইংলন্ড, ফ্রান্স, মার্কিনের ছাপা কাপড়, ডোরাকাটা রঙিন ছিট আর মসলিন ইত্যাদির সুন্দর সুন্দর মাল পাচ্ছে। সব একতাল কাগজ হয়ে দাঁড়াবে, একরঙা কি একাধিক রঙেরও হ'তে পারে, সত্য ঘটনা মূলক বাস্তব জীবনের কথা লেখা হবে এতে উঁচুনিচু সবায়ের। এই বন্ধ গাড়িটা থেকে নোনা মাছের গন্ধ আসছে, নিউ ইংলন্ড আর তার বাণিজ্যের জোর গন্ধ। গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক আর মাছ-ধরা সব আড্ডার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। এ নোনা মাছ কে না দেখেছে, এই অঞ্চলের সম্পূর্ণ যোগ্য করে বানানো, কিছুতে যাতে নষ্ট না হ'তে পারে, এমন অধ্যবসায়ের সঙ্গে যে সাধকেরা হার মেনে যায়। এগুলো দিয়ে রাস্তা পর্যন্ত ঝাড়ু দেওয়া যেতে পারে, খোয়া বাঁধানোর কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, কুচোকাঠ কুচিকুচি করা যায়, ঘোড়াগরু সমেত গাড়োয়ান, নিজে তো বটেই, বোঝাই মাল পর্যন্ত রোদ বাতাস বৃষ্টিতে আশ্রয় নিতে পারে। কারবারী—কনকর্ডের এক কারবারী যেমন করেছিল—কারবার খোলার সময়, তার দোকানে সাইনবোর্ডের মতো একে টাঙিয়ে দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত দোকানের সব চাইতে পুরনো খরিদ্দারও মনে করে উঠতে পারবে না, আসলে এটা জন্তু, না উদ্ভিদ, না খনিজ। তখনও বরফখণ্ডের মতো অবিকৃত থাকবে এ, কড়াইয়ে চাপিয়ে সাঁতলাও, শনিবারের ভোজপর্বে দিব্যি শুঁটকি মাছ হিসাবে চলে যাবে। তারপরের গাড়িটায় স্পেনের চালান কাঁচা চামড়া। ষাঁড়গুলো যখন স্পেনের প্রান্তরে পাম্পাস অরণ্যে চরে বেড়াত, লেজগুলো তখনকার মতোই বাঁকানো, যত উঁচুতে কোণাকুণি ছিল হুবহু সেটা পর্যন্ত—গোঁয়ার্তুমির খাস নমুনা একটা, বুঝিয়ে দেয় সব বংশদোষই কি পরিমাণ প্রায় সংশোধনের বাইরে, দুরারোগ্য। ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, লোকের আসল কাঠামটা কি, তা স্থির হয়ে গেলে আর পরিবর্তনের আশা থাকে না, স্বীকার করতেই হয় একথা। প্রাচ্যদেশীয়েরা যেমন বলেন, "নেড়ি কুত্তার লেজে তাপ লাগাও, চাপ দাও, দড়াদড়ি বেঁধে বারোটা বছর এক নাগাড়ে খাটুনি খাট, তার চেহারা যে কে সেই থাকবে।" এই লেজগুলো বদ্ধমূল যে সব বৃত্তির পরিচায়ক, তার একমাত্র সফল প্রতিকার হচ্ছে শিরিষ তৈরি করে ফেলা সেগুলো দিয়ে, সাধারণত তাই করাও হয়। তখন তারা ঠিক এঁটে সেঁটে থাকে। এই আসছে পিপেভর্তি হয়ে মাতগুড় কি ব্র্যান্ডি, জন স্মিথ, কাটিংসভিল, ভারমণ্ট বরাবর, গ্রিন মাউন্টেনের ব্যাপারি সে, ঐ অঞ্চলের কৃষকদের জন্য মাল আমদানি করে। জাহাজে করে যে মালপত্তর এল, এখন হয়ত নিজের মালের গাদার

মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই কথাই ভাবছে, কি ভাবে তার মালের দামের কম বেশি করবে এগুলো। আর ঠিক এই সময়টায় খরিদ্দারদের বলছে, আজ সকালের আগেও অবশ্য সেকথা বিশবার বলা হয়ে গেছে,—পরের গাড়িতেই কিছু খাঁটি মাল আশা করছে সে। কাটিংসভিল টাইম্‌স-এ বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছে তার।

এই সব মাল যেমন যাচ্ছে, অন্য সব মাল তেমনি আসছে। হুস করে আওয়াজ হ'ল, হুঁশিয়ার হলাম আমি। বই থেকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম ঢ্যাঙা একটা পাইন গাছ, দূরে উত্তরে পাহাড়ের গায়ে খোদা, গ্রিন মাউন্টেন আর কনেকটিকাট হয়ে উড়ে এসে পড়েছে ধনুক ছোঁড়া তীরের মতো, দশটা মিনিট লেগেছে মাত্র শহর পার হয়ে আসতে, আর কেউ দেখতেই পায় নি। আসছে

"মাস্তুল হতে চায়,
কোন নাম করা নৌ-সেনাপতির ছায়ায়।"

আর ঐ শোন, গরু মোষ বোঝাই গাড়িটা এল, হাজার পাহাড় খাটাল আস্তাবল, দূর গোয়াল থেকে বয়ে আনছে গরু মোষ, ভেড়ার পাল, পালের মধ্যে লাঠি হাতে তাড়ুয়া, রাখাল ছেলে, সব কিছু আছে, নেই কেবল পাহাড়ের গায়ের চরবার মাঠটা—পাহাড় থেকে আশ্বিনের ঝড়ে ওড়া পাতার মতো ঝুরঝুর করে এল সবকিছু। বাছুরের আর ভেড়ার ব্যাব্যাতে আকাশ ভরে গেছে, ষাঁড়গুলোর গুঁতোগুঁতি—যেন আস্ত গোষ্ঠ-জনপদ একটা চলেছে। সবার আগে বুড়ো খাসী ভেড়াটার গলার ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং আর পাহাড়গুলোই যেন লাফঝাঁপ খাচ্ছে, বাচ্চা পাহাড় যেন বাচ্চা ভেড়া। গাড়িতে ওদের মধ্যে তাড়ুয়ারাও আছে, এক হয়ে গেছে এখন তাদের খেদানো পালের সঙ্গে। কাজ চলে গেছে, কাজের নিশানাদিহি লাঠিগুলো আঁকড়ে আছে তবু। কিন্তু ওদের কুকুরগুলো, কোথায় গেল সব? ছত্রভঙ্গ হ'ল তারাই, একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সব, পথের হদিস শুঁকে পাচ্ছে না আর। মনে হচ্ছে কেঁউ কেঁউ করছে সেগুলো পিটারবরো হিলের পিছনটায়, নয় গ্রিন মাউন্টেনের পশ্চিমের গায়ের ঢালু বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছে। মরার সময়ও ফিরে আসবে না ওরা। ওদেরও কাজ খতম। প্রভুভক্তি আর সহজ-বুদ্ধিতে এখন ভাটা পড়েছে ওদের। হয়তো দুর্নাম কিনে ঘরে সুড় সুড় করে ফিরে আসবে, নয় নেকড়ে বাঘ আর খেঁকশিয়ালের দলে মিশে বুনো বনে যাবে। কিন্তু ঘন্টা বাজল, আমাকে পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হবে যাতে রেলগাড়ি যেতে পারে;—

আমার কি আসে যায় রেলরাস্তায়?
দেখিতে যাই না কোন দিন
কোথা হইয়াছে লীনা।

গর্ত ভরিয়াছে খাসা
চাতক পাড়ে বাঁধে বাসা,
বালুকা উড়ে থরে থরে
ব্ল্যাকবেরি থ'লো থ'লো ধরে।

গরুর গাড়ি চলা বনজঙ্গলের রাস্তার মতো করে পার হই একে। এর ধোঁয়া, বাষ্প আর হিসহিস আমার চোখ দুটো ধাঁধিয়ে দিক, কি আমার কানটা খারাপ করুক তা চাই নে।

গাড়িগুলো চলে গেল এখন, সঙ্গে নিয়ে গেল অস্থির জগৎ। পুকুরের মাছ আর গাড়িটার গুরুগুরু ধরতে পারছে না। আগের চাইতেও নিঃসঙ্গ লাগছে আমার। দীর্ঘ বিকাল বেলার বাকি সময়টায় আমার চিন্তার ব্যাঘাত ঘটাবে হয়তো কেবল কোন গাড়ির ঈষৎ গড়গড় আওয়াজ, কি দূরের রাস্তায় পথচারী পশু আর পশুপালক।

কোন কোন সময়ে রবিবারে অনুকূল বাতাস থাকলে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেতাম, লিংকন, অ্যাক্‌টন, বেডফোর্ড কি কনকর্ড থেকে আসছে, অতিক্ষীণ মিঠে সুর, প্রকৃতির সঙ্গীতালাপ। অরণ্যে আমদানির উপযুক্ত। বনের উপরে অনেক দূরে আওয়াজটা বিশেষ এক ধাঁচের শিহরণগুঞ্জন সৃষ্টি করে। মনে হয় যেন দিগন্তে পাইনের পাতা বীণার তার, আর তাতে ঝংকার তুলে তুলে চলেছে সে। সব ধ্বনিই যত দূর থেকে সম্ভব শুনলে সমান ভাব মনে আনে—যেন বিশ্ববীণার ঝংকার। যেমন মধ্যেকার আকাশ আমাদের দৃষ্টিতে দূর ধরণীর শৈলশিখরকে নিজস্ব নীলিমা দিয়ে মনোরম করে তোলে। আকাশ ছেঁকে এনেছে যে সুর, বনের প্রত্যেকটি লতাপাতার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এসে পৌঁছিয়েছে যে সুর, আমার কানে সেই সুর বাজিয়ে তুলত সে—মৌলগুলো তুলে নেয় যে সুর, একটু সুর চড়িয়ে দিকে দিকে প্রতিধ্বনি তোলে—সেই ধ্বনির রেশ এ। প্রতিধ্বনির কিছুটা মৌলিক ধ্বনি, তাইতো তার এই ভেল্কি আর বাহার। ঘণ্টাধ্বনির যেটুকু পুনরাবৃত্তির যোগ্য, এ তার পুনরালাপ শুধু নয়, কিছুটা বনবাণীও আছে, বনদেবীদের টুকিটাকি কথাবার্তা আর সুরের আলাপ আছে।

সন্ধ্যাবেলায় বনের ওপারে দূর দিগন্ত থেকে একটা গরুর হাম্বা রব মিঠে বোলের মতো কানে বাজল। জন কয়েক বাউল কবে গান গেয়ে আনন্দ দেয় আমাকে, প্রথমটায় তাদের কণ্ঠস্বর বলে ভুল হয়েছিল, বুঝি পাহাড় আর মাঠের ওধারে পথ হারিয়ে তারাই এসে পড়েছে। কিন্তু পরে ভুল ভাঙল, ভালই লাগল যখন খানিক ক্ষণ শুনে গরুর সাধারণ স্বাভাবিক

কণ্ঠসঙ্গীত চিনতে পারলাম। ব্যাঙের উদ্দেশ্যে নয়, যুবক কটির গান শুনে খুশি হয়েছিলাম বোঝাবার জন্যই বলছি, আমার স্পষ্ট মনে হ'ল, হাম্বাধ্বনির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে তার, দুইই শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির এক ভাবের প্রকাশ।

গ্রীষ্মকালের কিছু সময় সন্ধ্যার গাড়িটা চলে যাবার পর নিয়মিত সাড়ে সাতটায় হুইপ-পুয়োর-উইলগুলো আমার দোরের ঠিক পাশটিতে একটা খোঁটার উপর কি উঁচু টিলাটার উপর বসে তাদের সান্ধ্য স্তোত্র সাঙ্গ করত। তারা প্রায় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সূর্যাস্তের সঙ্গে তাল রেখে নির্দিষ্ট একটা ক্ষণের পাঁচ মিনিটের মধ্যে গান সুরু করত। ওদের চাল-চলনের সঙ্গে পরিচিত হবার বিশেষ সুযোগ হয় আমার। মধ্যে মধ্যে শুনতে পেতাম বনের আলাদা আলাদা জায়গা থেকে চার পাঁচটা এক সঙ্গে গাইছে, কদাচিৎ একটার সঙ্গে আর একটার একচুল এধার-ওধার হ'ত হয়তো। আমার এত কাছে যে প্রত্যেকটা মূর্ছনার কিংকিণী ধ্বনিটা পর্যন্ত ধরতে পারতাম। প্রায় মাকড়সার জালে ধরা পড়ে মাছিরা যেমন গুন গুন করতে থাকে সেই রকম, তার তুলনায় আওয়াজ একটু জোরাল শোনাত শুধু। কখনও কখনও কোন কোনটা আমার চারপাশে কয়েক ফুট দূরে থেকে গোল হয়ে ঘুরতে থাকত, যেন তাকে সুতো দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, হয়তো তার ডিমগুলোর কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম। সারারাত ধরেই ফাঁকে ফাঁকে গান গেয়ে যেত তারা, কিন্তু ঠিক ভোর হবার আগে, আর ভোরের কাছাকাছি সময়টাতে আবার আগের মতো রাগ-রাগিণীর ঝংকার তুলত।

অন্য সব পাখি যখন থেমে যায়, হুতুমপেঁচা তখন তান ধরে, মেয়েরা যেন তাদের সনাতন কান্নার সুরে শোক প্রকাশ করছে। তাদের শোকার্ত আর্তনাদের ধরনটা ঠিক যেন বেন জনসনের নকলে। মধ্যরাত্রের বিচক্ষণ ডাইনী সব। কবিরা যা শুনতে পান, সেই অকৃত্রিম সোজাসুজি টু-হুইট টু-হু নয় এ। হাসি রসিকতা নয়, এ হচ্ছে বেদনার্ত শ্মশান গীতি, আত্ম-ঘাতেচ্ছু প্রণয়ীদের পরস্পর সান্ত্বনা, নরককুণ্ডে বসে স্বর্গীয় প্রেমের আনন্দ-বেদনার স্মরণগাথা। তবু ভাল লাগে ওদের এই ক্রন্দন, বিষণ্ণ সুর, বনে শিহরণ আনে। মধ্যে মধ্যে ভুল হয় একে গান আর গায়ক পাখি বলে। যেন গানের অন্ধকার আর অশ্রুর দিকটা, দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস, গান গেয়ে জানাতে ইচ্ছা হয় যা। তারাও আত্মা, নিচু স্তরের আত্মা সব, সকরুণ ভাবী অমঙ্গল আশংকার মতো। একদিন যারা নরদেহে পৃথিবীতে নিশাচর ছিল, অন্ধকারে যেসব কাজ করা হয় সেইসব করে বেড়াত, এখন বিষণ্ণ স্তবগানে অথবা শোকগাথায় স্বকৃত পাপকর্মের মঞ্চেই সেই পাপের

প্রায়শ্চিত্ত করছে। পতিত আত্মা এরা। যে প্রকৃতি আমাদের সকলের লীলাক্ষেত্র, তার বৈচিত্র্যের আর শক্তির পরিচয় নতুন করে আমার মধ্যে জাগল। "ওহো-ও-ও, জনম যদি না হ'ত কোন দি-দি-দিন", হ্রদের এই কোণ থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠছে একটার, ব্যর্থ বিক্ষোভে ঘুরে গিয়ে বসছে বুড়ো ওকগাছটার নতুন একটা ডালে। তারপর "য-যদি না জ-জ-জন্মাতাম গো", একটু দূরে ওধার থেকে প্রতিধ্বনি তুলছে আর একটা, কম্পমান অকপট সুরে, লিংকনের সুদূর জঙ্গল থেকে ভেসে আসছে মৃদু অনুরণন, "জ-জ-জন্মাতাম গো"।

আমাকে একটা পেঁচাও তার ঘুৎকারে আপ্যায়িত করত। বুঝি প্রকৃতির চরম বিষণ্ণ ধ্বনি, খুব কাছ থেকে হ'লে সেই রকমই মনে হ'ত। যেন তিনি মুমূর্ষু মানবের হাহুতাশকে এই ভাবে ছাঁচে ফেলে নিজের গানের দলে পাকাপাকি করে নিতে চান। আশাকে চিরকালের মতো বর্জন করে এসেছে যে, সেই হতভাগ্যের সামান্য শেষ সম্বল, অন্ধকারের রাজ্যে এসে জন্তুর মতো গোঙাচ্ছে, তবু যেন তা মানুষেরই ফোঁপানি। আরও ভয়ংকর করে তোলে বিশেষ একটা ঘড়ঘড়ানি সুর, তার অনুকরণ করতে গেলেই দেখি 'গড়র' কথাটাই এসে যায়; যখন সকল সুস্থ আর সমর্থ ভাব চাপা পড়ে চটচটে হয়ে যায়, ছাতা পড়ে যায়, মনের সেই অবস্থা প্রকাশ পায়। আমার মনে জাগত অশরীরীদের,—জড়বুদ্ধিদের আর বদ্ধোন্মাদদের কাতরানি। দূরের জঙ্গল থেকে এই এক্ষুনি একজন জানান দিয়ে উঠল হু হু হু, হুরর হু করে, এমন সুরে যে দূর বলে সত্যিই সুরেলা লাগে। আর বাস্তবিক পক্ষে বেশির ভাগ সময়ে দিনে রাত্রে শীতে গ্রীষ্মে যখনই কানে আসে, আনন্দের স্মৃতিই মনে আনে।

পেঁচারা যে আছে এতে আমার আনন্দই হয়। মানুষের হয়ে তারা কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ত জিগির জাগিয়ে রাখুক। এ ধ্বনি বনজঙ্গলের আবছা আলোয় আর জলাভূমিতেই ভাল খোলে, দিনের আলোয় খোলতাই হয় না। মানুষের অজ্ঞাত রয়ে গেছে যে বিস্তৃত অপরিণত প্রকৃতি তার আভাস দেয় এ। সকলের মধ্যে যে অনস্বীকার্য তমোভূমি আর অনুপপত্তি আছে তার প্রতিভূ এ। ঐ যেখানে জংলী জলাভূমিটার বুকে একটা মাত্র শৈবালভূষিত স্প্রুস গাছ খাড়া হয় ঝুলে আছে, উপরে ক্ষুদে বাজপাখিগুলো বৃত্তাকারে ঘুরছে, চিরহরিৎ লতাপাতার ঝোপে ঝাড়ে চিকাডি পাখিগুলো আধ-আধ সুর তুলছে, নিচে পায়রা আর খরগোস ছোঁক ছোঁক করে ঘুরছে, সারাদিন ধরে সূর্য সেখানটা আলো করে রেখেছিল; আর এখন উদয় হ'ল স্থানের যোগ্য কালের, বিষাদ-বিধুর, একটা আলাদা জাতের জীবরা যেখানে প্রকৃতির মর্ম ব্যাখ্যা করতে জেগে উঠেছে।

সন্ধ্যা ঘোর হলে শুনতে পেতাম দূরে ব্রিজের উপর মালগাড়ির গুড়গুড়, রাত্রে আর প্রায় সব আওয়াজের চাইতে বেশি দূর পর্যন্ত শোনা যায় সে আওয়াজ, কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ, আর কখনও কখনও বা দূরের কোন গোলাবাড়ির উঠোন থেকে কোন দুরন্ত গরুর হাম্বারব। ইতিমধ্যে হ্রদের সমস্ত ধার জুড়ে কোলাব্যাঙদের গ্যাঙোর-গ্যাঁ গমগম করে উঠত—ঝানু মালদার আর পাঁড় মাতালদের সব জবরদস্ত আত্মা—এখনও অনুতাপ নেই, নিজস্ব নরককুন্ড থেকে মাতলামির মহড়া দিতে চায়—ওয়ালডেনের জল-দেবীরা তুলনাটা যেন গায়ে না মাখেন, ওয়ালডেনে জল-আগাছা না থাকতে পারে, কিন্তু ব্যাঙ তো আছে। গতজন্মের মাইফেল-পর্বের হৈ-হুল্লোড় জাগিয়ে রাখার সাধ তাদের, কিন্তু গলা ভেঙে গেছে, বেজায় দমভারি ভাব, স্ফূর্তির উপর অবজ্ঞা, সুরায় স্বাদ নেই, শুধু তাদের ভুঁড়োপেটগুলো আরও মোটা করে তুলবার তরল দ্রব্য তা এখন, নেশা মিঠে লাগে না আর, অতীতের জ্বালাযন্ত্রণা ডোবাতে পারে না, শুধু আকণ্ঠ জলাধিক্য, জবজবে হওয়া আর ফুলে ওঠা। সব চাইতে যিনি হোমরা-চোমরা, হার্টলিফের পাতার উপর থুতনি রেখেছেন, ঝুলে পড়া দুই চোয়াল ঢাকা কাপড়ের কাজ চালিয়ে দিচ্ছে সেটা, উত্তর ধার থেকে খুব খানিকটা জল গিললেন, আগে মুখে রুচত না, বাটিটা অন্যের হাতে তুলে দিলেন, মুখে তুড়ুক তুড়ুক রব; পদে এবং স্থূলত্বে যিনি দ্বিতীয়, কোন দূর খাড়ির অন্তর থেকে সোজা জলের উপর ভেসে উঠলেন, তাঁরও মুখে ঐ সঙ্কেতবাক্য, তিনিও সমান জল গিললেন। চার ধারে এই অনুষ্ঠানপর্ব যখন সমাধা হল, তখন কর্মকর্তা মশায় খুশি হয়ে হুংকার দিলেন, তুড়ুক তুড়ুক। এমনি সবাই একে একে একই অনুষ্ঠান সাঙ্গ করলেন, সব চাইতে ফোলাফুলো, কমজোর, ভুঁড়োপেট যার, সে পর্যন্ত—যেন ত্রুটি না থাকে। এবং অতঃপর পানপাত্রটি চারধার ঘোরাফেরা করতে থাকল, যতক্ষণ সূর্য উঠে কুয়াসা না ঘোচান। শুধু গোষ্ঠীপতি তখনও হ্রদতলে অন্তর্হিত হন নি, মধ্যে মধ্যে তুড়ুক করে সদম্ভে ফুৎকার দিচ্ছেন আর জবাবের প্রতীক্ষা করছেন।

আমার আস্তানা থেকে আমি কোন দিন কুক্কুট-ধ্বনি শুনতে পেতাম কি না ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু মনে হ'ত শুধু সঙ্গীতের জন্যই, গায়ক পক্ষী হিসাবে কুক্কুটশাবক পালন মন্দ নয়। এই একদাবন্য ইণ্ডিয়ান ফেঝান্টের স্বরগ্রাম অন্যসব পাখির তুলনায় জোরাল। এদের পোষাপাখি করে না তুলে দেশের জলহাওয়ায় অভ্যস্ত করে নেওয়া যদি সম্ভব হ'ত, তবে এর রব আমাদের বনাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ধ্বনি হয়ে উঠত, রাজহাঁসের ক্রেংকার কি পেঁচার ঘুৎকারকে হটিয়ে দিত। এবং তৎসঙ্গে কল্পনা করুন কুক্কুটগিন্নীর কর্তব। কর্তার তীব্র নিখাদ যখন ক্ষান্ত হচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে সুর সেধে চলেছেন তিনি।

মানুষ যে একে তার পোষ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—এর ডিম আর পিছনকার ঠ্যাংয়ের হাঁটুটার কথা নাই বা তুললাম। শীতকালের সকালে বনের ভিতর দিয়ে বেড়াতে চলেছেন, যেখানটায় এই পাখিদের ঝাঁক সেখানটায়, তাদের স্বক্ষেত্র সেটা, গাছের উপর থেকে বন্য কুক্কুটশাবকের ডাক শুনতে পেলেন, স্পষ্ট, তীব্র, মাইল কয়েক জায়গা জুড়ে ধ্বনিতরঙ্গ তুলে চলেছে, অন্যান্য পাখির ক্ষীণস্বর ডুবে যাচ্ছে—অবস্থাটা কল্পনা করুন। বিশ্ব-পৃথিবীর লোকদের সজাগ করে তুলবে এ। কার না ঘুম ভাঙবে, কে না জাগবে ভোরে? জীবনের দিন থেকে দিনে, আরও ভোরে, আরও আরও ভোরে, যতদিন না সে সপ্রচুর স্বাস্থ্য, সম্পদ আর জ্ঞান লাভ করছে; সব দেশের কবিরাই দেশের অন্যসব পাখির সঙ্গে এই বিদেশী পাখির স্বরের যশোগাথা রচনা করেছেন। পৃথিবীর সব দেশের জলহাওয়াতেই দুর্ধর্ষ শ্রীকুক্কুট ধাতস্থ। সব দেশেই সে দেশীয়, এমন কি দেশীয়ের চাইতেও দেশীয়। সতত অটুট স্বাস্থ্য তার, নির্দোষ বায়ুকোষ, আনন্দ ক্ষয়হীন। আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরে নাবিকরা পর্যন্ত তার কণ্ঠস্বরে শয্যাত্যাগ করে। কিন্তু আমার ঘুম ভাঙাতে পারে নি কখনও কোনদিন এর তীক্ষ্ম স্বর। কুকুর বিড়াল গরু শুয়োরছানা কি মুরগী, আমি কিছুই পুষি নি। এমন অবস্থা যে আপনার মনে হবে, আমার ঘর সংসারে ধ্বনির ত্রুটি ঘটেছে। মাখন তোলার যন্ত্র, চরখা, কেতলিতে জল ফোটার সুর, কড়াইয়ের ছ্যাঁক ছ্যাঁক, কাচ্চাবাচ্চার কান্না, আনন্দঘটার কোন কিছুই ছিল না। চিরাচরিত রীতিবদ্ধ লোক উন্মাদ হয়ে যেতেন, কিংবা তার আগেই আনন্দের অভাবে জীবনহানি ঘটত তাঁর। দেয়ালে ইঁদুরের বালাই ছিল না, অনাহার আশংকায় তারা বাড়িছাড়া হয়েছিল, কিংবা বাড়ির ভিতরে লোভনীয় কিছুই পায় নি তাই,—শুধু ছাদটার উপর কি মেজেটার নিচে কাঠবিড়াল, টিলার খুঁটিটার উপর একটা হুইপ-পুয়োর-উইল, জানলার নিচে চিৎকারশীল একটা ব্লু-জে, বাড়ির তলায় একটা খরগোস কি উডচাক, একটা হুতুম কি বিড়াল পেঁচা, পিছন-টাতে, পুকুরের উপর এক ঝাঁক বুনো হাঁস কি হাস্যময়ী লুন পাখি আর রাত্রিতে ডাকার জন্য খেঁকশিয়াল একটা। বাগ-বাগিচার নিরীহ জাতের পাখিরা কেউ আমার আস্তানার কাছ ঘেঁষত না—না একটা লার্ক, না একটা অরিয়োল। আমার উঠোনে না কিচমিচ করত কুঁকড়োছানা, না করত কোঁকর কোঁ কোন মুরগী। উঠোনই ছিল না। শুধু ঝনকাঠ পর্যন্ত উঠে গেছে উন্মুক্ত প্রকৃতি। জানালার নিচেই গজিয়েছে কচি কচি আগাছার ঝোপ, সেলারে নাক ঢুকিয়ে দিয়েছে বুনো সুমাক আর ব্ল্যাকবেরির লতাপাতা, জায়গা না পেয়ে ছাদের পাতলা তক্তায় মাথা ঘষছে কি খসখস আওয়াজ করছে কাঠখোট্টা পিচ পাইন গুলো, তাদের শিকড় ধাওয়া করেছে বাড়িটার নিচে পর্যন্ত। ঝড়ে এক পাটি

পাটাতন কি খড়খড়ি উড়িয়ে নেওয়ার বদলে বাড়ির পিছনকার একটা পাইন গাছের ডালপালা ভেঙে পড়েছে, কি আস্ত গাছটাই শিকড়শুদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—জ্বালানিকাঠ হয়েছে তাতে। সেই গ্রেট-স্নোর সময়ে সদর উঠোনে ফটক পর্যন্ত পথ ঢাকবে কি—ফটকই নেই—উঠোন পর্যন্ত নেই—সভ্য জগতের কোন প্রবেশপথই নেই।

॥ ৫ ॥ নির্জনতা

আজ সন্ধ্যাবেলাটি সুন্দর। সমস্ত দেহ একটিমাত্র ইন্দ্রিয় হয়ে প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে আনন্দ গ্রহণ করছে। অবাধ আনন্দে প্রকৃতির বুকে আনাগোনা করছি, যেন আমি তারই অংশ। পুষ্করিণীর পাথর বাঁধান ঘাটে শুধু শার্ট গায়ে চাপিয়ে ঘুরছি; যদিও হাওয়া ঠাণ্ডা। একটু মেঘলাও, আর জোরে বাতাস বইছে। মন টেনে নেবার মতো বিশেষ কিছু নজরে পড়ছে না, কিন্তু সব কিছু মিলে মনের মতো লাগছে, যা সচরাচর লাগে না। কোলাব্যাঙ ডাকছে, রাত আসছে ঘোষণা করতে হুইপ-পুয়োর-উইল পাখিটার স্বর জলের উপর দিয়ে শিরশিরে হাওয়ায় ভেসে আসছে। অলডার আর পপলার গাছে পাতা নড়ছে, তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেছি, দম আটকে আসছে যেন। তবু আমার প্রশান্তিতে সামান্য ঢেউ লাগলেও হ্রদের মতোই কোন চাঞ্চল্য নেই। সন্ধ্যার হাওয়ায় এই যে ছোট ছোট ঢেউ ওঠে, এতে ঝড়ের আশংকা একেবারে নেই, জল একেবারে নিথর থাকলে যেমন হয়। অন্ধকার হয়ে এল, হাওয়া এখন জোরে বইছে, বনের মধ্যে গোঁ গোঁ করছে, ঢেউগুলো এখন আছাড় খাচ্ছে। কয়েকটা পাখির ডাকের কাছে অন্যগুলো হার মেনেছে। সম্পূর্ণ বিরাম কখনই হতে পারে না। বন্য জানোয়ারদের এখন বিশ্রাম নয়, তারা শিকার খুঁজতে বেরিয়েছে। খেঁকশিয়াল, খট্টাস, খরগোস সব এখন মাঠে বনে নির্ভয়ে ঘুরছে। প্রকৃতির প্রহরী সব—প্রাণচঞ্চল জীবনের দিন থেকে দিনের যোগ রক্ষা করে।

বাসায় ফিরে দেখলাম, অতিথিরা বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁদের কার্ড রেখে গেছেন, কেউ এক গোছা ফুল, কেউ চিরহরিতের একটা মালা, কেউ বা আখরোটের তুলোট রঙের পাতার উপর পেন্সিলে নিজের নাম, আবার কেউ বা রেখে গেছেন যা তা একটা টুকরো। যাঁরা কালেভদ্রে বনের দিকে আসেন, হাতে এক চিলতে বন নিয়ে ফেরেন ফাঁকে ফাঁকে খেলার জন্য। ইচ্ছা করেই হ'ক কি ঘটনা চক্রেই হ'ক সেগুলো আবার ফেলে রেখে যান। উইলোর একট কচি ডাঁটা ভেঙে একজন একটা আংটি গোছের বানিয়ে সেটাকে আমার টেবিলের উপর ফেলে গেছেন। যখন না থাকতাম, সে সময়ে কেউ

বেড়াতে এলে বুঝতে পারতাম, ঘাস কি দোমড়ানো কাঁচ ডাল কি জুতোর দাগ দেখে। কোন সামান্য চিহ্ন দেখে মোটামুটি বুঝতে পারতাম তাঁরা মেয়ে না পুরুষ, কত তাঁদের বয়স, গুণাগুণ কি। ফুল একটা পড়ে রয়েছে হয়তো, এক চাপড়া ঘাস উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে গেছেন দূরে কেউ, আধ মাইল দূরে রেলরাস্তা পর্যন্ত, কিংবা সিগার আর পাইপের গন্ধ বাতাসে রয়ে গেছে। এমন কি, ষাট রড দূরে সদর রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে তার পাইপের গন্ধ থেকে প্রায় সময়েই আঁচ পেতাম।

যথেষ্ট জায়গা থাকে সব সময়েই আমাদের আশে পাশে। দিগন্ত ঠিক আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে কখনও হয় না। একেবারে দরজা থেকেই ঘন জঙ্গল সুরু হয় নি, পুষ্করিণীটাও নয়। কি করে করে ক্রমশ সাফ হয়ে যায়, আমাদের চলা-ফেরায় চেনাও হয়ে যায়। কোন সময়ে বাজেয়াপ্ত করে বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়ে প্রকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে ফেলি সেটাকে। কি কারণে লোকালয়ের বাইরে এই বনের মধ্যে এতখানি লম্বা চওড়া বেশ কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে আছি আর লোকজন বেশ ছেড়েও দিয়েছে তা আমার নির্জন বাসের জন্য? আমার সব চাইতে নিকট প্রতিবেশীও এক মাইল দূরে। আমার আস্তানার আধ মাইলের মধ্যে যে পাহাড়, তার মাথা ছাড়া কোন জায়গা থেকে লোকালয় নজরে পড়ে না। চারদিকের বনই আমার চক্রবাল। একদিকে পুষ্করিণীকে ছুঁয়ে রেলরাস্তা চলে গেছে, দেখা যায় দূরে। অন্য দিকে বনভূমিকে ঘিরে যে রাস্তা, তার প্রান্তের আবেষ্টনীটা নজরে পড়ে। কিন্তু যেখানে আছি, তার বেশির ভাগ জায়গাই প্রেয়ারি অঞ্চলের মতো নির্জন। একে নিউ ইংলণ্ডও ধরতে পার, আবার এশিয়া কি আফ্রিকাও ধরতে পার। যেন একটা ছোট পৃথিবী আমার, সূর্য, চন্দ্র, তারা সব নিয়ে—সমস্তটাই আমার রাজত্ব। রাত্রে কেউ আমার আস্তানার কাছ ঘেঁষে না, দোরের কড়াও কেউ নাড়ে না—যেন মানুষ আমিই একা, প্রথম এবং শেষ, তার চাইতেও বেশি। বসন্তকালে অবশ্য খুব লম্বা ব্যবধানে গ্রাম থেকে কেউ কেউ আসতেন পাউট মাছ ধরতে—বোঝা যেত যে তাঁদের নিজস্ব ওয়ালডেন পণ্ডে আরও অনেক সময়ে তাঁরা মাছ ধরেন, অন্ধকারকেই বঁড়শির টোপ হিসাবে কাজে লাগানোর অভ্যাস আছে। ফিরে যেতে দেরি হ'ত না তাঁদের। প্রায়ই হাল্কা চুপড়ি নিয়ে ফিরতেন। আমার পৃথিবীকে রেখে যেতেন পেছনে—অন্ধকার আর আমার কাছে। তারপর রাত্রির সেই অন্ধকার মর্মস্থল আর কোন মানুষের সান্নিধ্যে কলুষিত হ'ত না। মনে হয়, অন্ধকার বলতে মানুষের এখনও একটু ভয়ের ভাব আছে, যদিও ডাইনীদের ফাঁসিকাঠে লটকানো হয়েছে। আর খ্রীস্টানধর্ম আর মোমবাতি দেখা দিয়েছে।

তবু মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে, সব চাইতে আমাদের যে সঙ্গ ভাল লাগে,

যা স্নিগ্ধ নির্দোষ আর প্রাণস্পর্শী, সেটা প্রকৃতির যে কোন বস্তুতে পাওয়া যাবে—এমন কি, মানবদ্বেষ্টা হতভাগ্য কি মনমরা ব্যক্তির পক্ষেও। ইন্দ্রিয় বিক্ষেপ না করে প্রকৃতির অন্তঃস্থলে বাস করতে পারলে দুঃখের কাল ছায়া তার কাছ ঘেঁষতে বেশি পারে না। শ্রবণশক্তি যার অটুট আর দোষহীন, যে-কোন ঝঞ্ঝার মধ্যেই সে অশরীরী সঙ্গীতধ্বনি শুনতে পায়। যে ব্যক্তির সারল্য আর সাহস আছে, কোন কিছুই তার জীবনকে কুৎসিত দুঃখে তেমন বিপর্যস্ত করতে পারে না। যতদিন বিভিন্ন ঋতুর সাহচর্যে আনন্দ লাভ করব, জানি যে, কোন অবস্থাতেই জীবনকে বোঝা বলে মনে হতে পারে না আমার। আজ টিপ টিপ বৃষ্টিতে ঘর থেকে বেরোতে পারি নি, কিন্তু আমার বিন-ক্ষেত জল-সিঞ্চন পেল—নিরানন্দ কি বিষণ্ণ লাগছে না, বরং ভালই হ'ল আমার। আগাছা সাফ করতে পারলাম না, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি দরকারী কাজ হ'ল। বৃষ্টি যদি পড়তে থাকে কয়দিন ধরে, তাহলে মাটিতে বীজে পচ ধরে আর নিচের দিকে জমিতে যে আলু দিয়েছি তাও নষ্ট হয়; তবু উপরের জমির ঘাসের উপকার হবে। ঘাসের পক্ষে ভাল হলে আমার পক্ষেও ভাল। আমার সঙ্গে অপর লোকদের মাঝে মাঝে যখন তুলনা করি, মনে হয় তাদের চাইতে আমার উপর দেবতাদের অনুগ্রহ বেশি। আমার যে যোগ্যতা আছে বলে জানি তার চাইতেও অনেক বেশি। যেন আমার হয়ে খত কি বন্ধকী তমসুক লিখে দিয়েছেন তাঁরা, অন্যদের হয়ে দেন নি, তাই বিশেষ করে আমার দেখাশোনা করে চালিয়ে নিয়ে বেড়ান আমাকে। আমার তোষামোদ আমি নিজে করি নে, কিন্তু সম্ভব হ'লে তাঁরাই আমার তোষামোদ করেন। নিজেকে একলা মনে হয় নি কোন দিন, নির্জন বোধ করে কিছু কষ্টও পাই নি। শুধু একবার ছাড়া। বনে এসে বসবাস করবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেটা ঘটে। ঘন্টা খানেকের জন্য সেদিন মনে হয়েছিল, হয়তো প্রশান্ত আর সুস্থ জীবন যাপনের পক্ষে মানুষের নিকট-সঙ্গ অপরিহার্য। একেবারে একা-একা থাকা নিরানন্দময়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতর যে এটা একটা পাগলামির ভাব, সেটা যে শীগগিরই কেটে যাবে এও আঁচ করতে পারি। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, তারই মধ্যে চিন্তাটা আসে মনে। অকস্মাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন স্নিগ্ধ আর মঙ্গলময় সাহচর্য বোধ করলাম, তার ঐ টিপ টিপ বৃষ্টিপাতের শব্দের মধ্যে, আমার আস্তানার চারপাশের প্রত্যে-কটি আওয়াজ আর দৃশ্যের মধ্যেও, যেন সীমাহীন কারণহীন কোন মৈত্রী ভাব আমাকে ঘিরে পরিমণ্ডল গড়ে আমাকে রক্ষা করে চলেছে। আমার কাছে মনুষ্যসমাজের নৈকট্যের কাল্পনিক সুযোগ-সুবিধা তুচ্ছ বোধ হ'ল। তারপর সে রকম আর কোনদিন মনে হয় নি। পাইনের প্রত্যেকটি ছোট ছোট পাতা সব দরদে ভরে ফুলে উঠল, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল তাদের। সর্বত্র,

এমন কি যে সব জায়গাকে আমরা বন-বাদাড় কি খটখটে শুকনো বলে জানি, সে সব জায়গাতেও আপনার জনের উপস্থিতির বোধ আমার মনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ-বোধও হ'ল, আমার নিকটতম আত্মীয়, আমার সঙ্গে মমত্ব-সূত্রে বাঁধা যিনি, তিনি গ্রামবাসীদের একজন নন, মানুষও নন। তখন বুঝতে পারলাম, কোন জায়গাই আর আমার বিদেশ-বিভুঁই নয়—

"অকালেতে শোক করে ক্ষয়, মুহ্যমান যে বা রয়
জীবনের দিন তার হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
হে সুন্দরী টসকার-দুহিতা!"

বসন্ত কি হেমন্ত কালে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কোন কোন সময় বড় মানোরম লেগেছে আমার। বাড়ির মধ্যে সকাল বিকাল বন্ধ হয়ে বাইরের ফোঁস-ফোঁসানি আর ফট ফট শব্দে মন খুশি হয়ে উঠত তখন। আগে আগে গোধূলি হ'ত, তারপর একটানা সন্ধ্যাকাল। অনেক ভাব মনের মধ্যে মূল বিস্তারের সময় পেত, তারা উদ্গত হ'ত। উত্তর-পূব দিক থেকে বৃষ্টির জোর ছাঁট এসে গাঁয়ের মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে বিপদ ঘটাত। মেয়েরা সব ঝাঁটা-বালতি নিয়ে খাড়া থাকত বাইরের দরজায়, যাতে জলের ঝাপটা ভিতরে না ঢুকতে পারে। আমার ছোট বাসাটির চারদিকেই ফাঁক। একটা দরজার আড়ালে বসে আত্ম-রক্ষা করে মজা লাগত দিব্যি। একবার ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাজ পড়ল পুকুরের ওপারে একটা বড় পিচ পাইন গাছের মাথায়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমান সমান ফাঁক রেখে বেশ চোখে পড়ার মতো ঢেউ খেলান চাকা চাকা দাগ এঁকে গিয়েছিল তার গায়ে, এক ইঞ্চি কি তারও বেশি গভীর, চার কি পাঁচ ইঞ্চি চওড়ায়—যেমন হাতের লাঠি কেটে করে কেউ কেউ। সেদিন আবার তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। উপরে সেই দাগটার দিকে চেয়ে মন ভয়ে ভক্তিতে ভরে গেল। দাগটা এখন আরও স্পষ্ট। আট বছর আগে এইখানটা নির্মেঘ আকাশ থেকে নির্দয় নির্মম বাজ পড়েছিল। লোকজন প্রায়ই আমাকে বলে, "এখানে তোমার একা একা লাগছে মনে হয়, মানুষের কাছাকাছি যেতে ইচ্ছে হয় নিশ্চয়ই—বৃষ্টিতে, বরফ পড়লে—বিশেষ করে রাত্রে।" উত্তর দিতে ইচ্ছা হয়—শূন্যের মধ্যে আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী একটা বিন্দু মাত্র। ঐ যে তারা, যার আয়তন কতখানি চওড়া আমাদের যন্ত্রে এখনও ধরা পড়ে নি—এর দূরতম দুই অধিবাসীর মধ্যে ব্যবধান কতখানি মনে হয়? একা লাগবে কেন আমার? আমাদের গ্রহটা কি ছায়াপথের মধ্যে নয়? তোমরা যে প্রশ্ন করছ, আমার কাছে তার তেমন গুরুত্ব নেই। কোন মানুষ আর তার সঙ্গীদের মধ্যে কোন্ জাতের ব্যবধান থাকলে তার একলা মনে হ'তে পারে? আমি দেখছি যে পায়ে হেঁটে কাছে গেলেই কিছু দুজনের মনের ব্যবধান ঘুচে

যায় না। আমরা কিসের সব-কাছে থাকতে চাই? বহু লোকের নয় নিশ্চয়ই—স্টেশন, পোস্টাফিস, পানশালা, সভাগৃহ, স্কুল-বাড়ি, মুদিখানা, বেকন-হিল, ফাইভ-পয়েণ্টস্—যে সব জায়গায় লোকেরা ভিড় করে—সেখানেও নয়। আমরা নৈকট্য চাই আমাদের জীবনের চিরন্তন উৎসের। জীবন যেখানে সুরু হয় বলে আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে, তার নৈকট্য চাই। যেমন উইলো-গাছটা খাড়া আছে জলের ধারে, তার শিকড়ও ঐ দিকেই। বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের ইচ্ছা বিভিন্ন রকমের হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঐ রকম জায়গাতেই সেলার গাড়বেন তাঁর।..একদিন সন্ধ্যায় পথে দেখা হয়েছিল শহরবাসীদের একজনের সঙ্গে। যাকে বলা হয় "বেশ কিছু গুছিয়ে নিয়েছেন" তিনি সেই দলের—এ সম্পর্কে আমার ধারণা অবশ্য খুব ভাল নয়। ওয়ালডেনের রাস্তায় একজোড়া বলদ হাঁকিয়ে বাজার যাচ্ছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে আমার মনের মধ্যে জীবনের কত সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেবার চিন্তাটা এল। উত্তর দিয়েছিলাম, "বেশ ভাল আছি বলেই তো আমার ধারণা।" ঠাট্টা করে বলি নি। তারপর বাসায় ফিরে শুয়ে পড়লাম। আর তিনি চলে গেলেন তাঁর পথে, অন্ধকার আর কাদা ঠেলে ব্রাইটনের দিকে—অর্থাৎ ব্রাইট-টাউন। সকালের দিকে কোন সময়ে পেঁছাবেন সেখানে।

মৃত যে, জেগে কি বেঁচে ওঠার কোন সুযোগ পেলে সে স্থান কালের বাছ বিচার করতে যায় না। যে জায়গাতেই ঘটুক সে ঘটনা তারতম্য থাকে না তাতে। আমাদের মনপ্রাণের পক্ষে তা অবর্ণনীয় আনন্দের আধার। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা কেবল বাইরে থেকে ক্ষণিক উত্তেজনায় আনন্দ বোধ করি। বাস্তবিক পক্ষে তাতে আমাদের চিত্তবিক্ষেপই ঘটে। যে শক্তির প্রভাবে বস্তু সত্তা খুঁজে পায়, সকল বস্তুর নিকটতম তো তাই। আমাদের পাশেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান বিরামহীন ভাবে কাজ করে চলেছে। আমাদের ঠিক পাশেই, যে মিস্ত্রি আজ মজুর খাটছে, যার সঙ্গে কথা কইতে বেশ ভালই লাগে, সে নয়—যে মিস্ত্রি আমাদের স্রষ্টা, তিনি।

"স্বর্গ-মর্ত্যের সূক্ষ্ম শক্তির প্রভাব কি বিরাট, কি গভীর।"

"নিরীক্ষণ করতে চাই তাদের, কিন্তু দৃষ্টিতে পড়ে না তারা; তাদের বাণী শ্রবণ করতে চাই, কিন্তু কানে শুনতে পাই না কিছু; বস্তুর সারাংশের সংগে এক হয়ে গেছে তারা, তা থেকে পৃথক করা যায় না তাদের।"

"সমগ্র বিশ্বে মানুষ যে মনে-প্রাণে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে নব-বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে অর্ঘ্য আর তর্পণ দান করছে, সে তারাই করাচ্ছে। অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি-রূপ অণুর মহাসাগর সে। তারা সর্বত্র বিচরণ করে,

আমাদের উপরে, বামে, দক্ষিণে। চারিদিকে আবেষ্টন সৃষ্টি করে আছে তারা।"

আমরা এমন গবেষণার বস্তু—আমার কাছে কম মজার ব্যাপার নয় তা। এই অবস্থায় বাজে গল্পের আড্ডা থেকে একটু দূরে নিজেদের আত্ম-চিন্তায় খুশি থাকলে ক্ষতি কি? কনফুশিয়াস ঠিকই বলে গেছেন, "ধর্ম কখনই পরিত্যক্ত অনাথের মতো একা নয়; প্রতিবেশী জুটবেই—স্বভাবের নিয়মেই জুটবে।" ,

চিন্তার সাহায্যে আমরা নিজেরা নিজেদের হারাতে পারি, কথাটার সদর্থে। মনে দৃঢ় সংকল্প নিতে পারলে আমরা সব কাজ আর তার পরিণাম থেকে দূরে সরে যেতে পারি; ভাল মন্দ সব কিছু আমাদের পাশ দিয়ে স্রোতের মতো বয়ে যাক্। প্রকৃতির মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণ সমাচ্ছন্ন নই। আমি স্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখন্ডও হতে পারি, আবার স্বর্গে ইন্দ্রদেব হয়ে তাকে সেখান থেকে লক্ষ্য করতেও পারি। রঙ্গাভিনয় দেখে আমি বিচলিত হতে পারি। আবার আমার সঙ্গে অনেক প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কোন বাস্তব ঘটনায় আমি অবিচলিতও থাকতে পারি। আমি নিজেকে কেবল মনুষ্য-রূপেই জানি, আমার চিন্তা ভাবনা, দয়া মায়ার এই দৃশ্যরূপে। কিন্তু আমার একটি দ্বিতীয় সত্তা আছে, এও বুঝি। অন্যের কাছ থেকে যেমন, নিজের থেকেও তেমনি দূরে সরে যেতে পারি তার দৌলতে। বোধ যত সুতীব্রই হ'ক, আমার মধ্যেই এমন আর একটি অপর কারও অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, যে ক্রমাগত আমার সমালোচনা করে চলেছে। সে ব্যক্তি যেন আমার অন্তর্গত নয়, আমার দর্শক মাত্র। আমার কোন অভিজ্ঞতার ভাগী-দার নয়, কিন্তু সব লক্ষ্য করে চলেছে সে। এমন ভাবে যে সে আমিও হ'তে পারি, তুমিও হ'তে পার। জবননাট্যের অভিনয়—হয়তো বিয়োগান্তকই—শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দর্শক চলে গেল নিজের কাজে। তার দিক থেকে দেখলে, এ যেন একটা উপন্যাস, কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। এই উভয় ব্যক্তিত্বের জন্য প্রতিবেশী কি বন্ধু হিসাবে পরস্পরের সম্পর্ক মধ্যে মধ্যে খারাপ হয়ে পড়ে।

বেশির ভাগ সময়েই একা থাকলে উপকার হয় বলে আমি মনে করি। লোকের সঙ্গ, তাঁরা অতি সজ্জন হলেও, অল্পেই ক্লান্ত করে। মনে হয়, সময় বাজে কাটছে। একা থাকতে আমার ভাল লাগে। সঙ্গী হিসাবে, নির্জনতার চাইতে ভাল সঙ্গ আমি দেখি নি। নিজের ঘরে কাটাই যখন তার তুলনায় বাইরে লোকজনের মধ্যে গেলে অনেক সময়ে নিজেদের বেশি একা মনে হয়। যে জায়গাতেই হ'ক, চিন্তা কি কাজ করার সময় মানুষ সর্বদাই একা, যেখানে খুশি থাক্। কোন ব্যক্তি আর তার সতীর্থদের

মধ্যে স্থানগত ব্যবধানের হিসাবে নির্জনতার পরিমাপ হয় না। কেম্ব্রিজ কলেজের কোন জনাকীর্ণ চক্রের মধ্যেও প্রকৃত অধ্যয়ন-রত ছাত্র মরুপ্রদেশের দরবেশের তুল্য নিঃসঙ্গ। চাষী একা একা সারাদিন মাঠে কি বনে কোদাল চালানো কি কাঠ কাটার কাজ করে, কিন্তু কাজের মধ্যে থাকে বলে নিজেকে তার নিঃসঙ্গ লাগে না, কিন্তু রাত্রে যখন বাড়ি ফেরে তখন একা ঘরে বসে থাকতে পারে না, চিন্তা ভাবনার যন্ত্রণায়। যেখানে লোকজনের সাক্ষাৎ মেলে সেখানে গিয়ে সারাদিনের নিঃসঙ্গতার মূল্যহিসাবে নিজের ধারণা অনুযায়ী অবসর-বিনোদনের জন্য ছটফট করে।* তাই তার অবাক লাগে বিদ্যার্থী যখন সারারাত্রি আর দিনের বেশি সময়টা বাড়িতে একা কাটায়—অথচ অবসন্ন বোধ করে না, চেঁচামেচি করে না। বিদ্যার্থী যে বাড়িতে বসেই চাষীর মতো নিজের হিসাবে নিজের মাঠে চাষ করে চলেছে আর বনে কাঠ কাটছে, আর সময় সময় তারই মতো, ছোটখাটো করে হ'লেও, অবসর-বিনোদন আর সঙ্গের জন্য ব্যাকুল হচ্ছে—এ তার মাথায় আসে না। অবশ্য সে সঙ্গ-ব্যবস্থা সংক্ষিপ্ত হতে পারে।

সঙ্গ-সাহচর্য সব সময়েই অতিমাত্রায় খেলো ব্যাপার। মেলামেশা ঘন ঘন হচ্ছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে নতুন করে আত্মীয়তা গড়ে তোলার সময় নেই আমাদের। দিনের মধ্যে তিনবার খাওয়ার সময় পরস্পরের সাক্ষাৎ পাচ্ছি—আর বাসি-পুরনো চিজ-এর (তাই তো হয়ে পড়েছি আমরা) মতো লাগছে নিজেদের। রোজ পরস্পরকে নতুন করে দেখছি। ভব্যতা-ভদ্রতা বলতে গোটাকয়েক বাঁধা-ধরা নিয়ম মেনে চলি, তাই এত ঘন ঘন মেলামেশা সত্ত্বেও অতিষ্ঠ হয়ে প্রকাশ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করি নে। পোস্টাফিসে, সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা হচ্ছে পরস্পরের, বাড়িতে আগুনের পাশে রাত্রের মজলিশে তো ঘেঁষাঘেঁষি করেই থাকি, তাই এ ওর পথ জুড়ে আছি, পরস্পর ঠোকা-ঠুকি খাচ্ছি। এর ফলে পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুটা শ্রদ্ধা হারাতে হচ্ছে, আমার এই ধারণা। জরুরী কিংবা হৃদ্যতাসূচক ভাষা বিনিময়ের পক্ষে আরও দেরিতে দেরিতে দেখা হলেও চলত। কারখানায় কাজ করে যে মেয়েরা—তাদের কথা ভাব—কখনও একা থাকতে পারে না, স্বপ্ন দেখার সময় কই। আমি যেমন আছি, তেমনি প্রতি বর্গ-মাইলে এক একটা বাসিন্দা হলে ভাল হ'ত। মানুষের মূল্য তার চামড়ায় নয় যে তাকে ছুঁয়ে থাকতে হবে আমাদের।

শুনেছি, এক ব্যক্তি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে না খেয়ে ক্লান্তিতে গাছের তলায় মরতে বসেছিল। শারীরিক দৌর্বল্যে, অসুস্থ কল্পনায় দেখতে পেল বিকট দৃশ্য সব চারদিকে। সত্যি মনে করে নিলে তা। নিজেকে কম নিঃসঙ্গ লাগল। শরীর আমাদের সুস্থ, মনও সবল। আমাদের বেলাতে

সুস্থ সবল লোকজন ক্রমাগত আমাদের বাহবা দিতে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারি একা নই আমরা। ঠিক ঐ লোকটারই মতো।

আমার আস্তানায় অনেক সঙ্গী, বিশেষ করে সকালের দিকটায় যখন বাইরের কারও আসার সময় নয়। কয়েকটা উপমা দিই, তাতে আমার অবস্থা সম্বন্ধে যে ধারণা হবে, অন্যকে জানাতে পারে কেউ। এই পুষ্করিণীতে যে লুন-পাখি বিকট চিৎকার দিয়ে হাসে, কিংবা খোদ ওয়ালডেন পন্ড যতখানি নিঃসঙ্গ, আমিও ততখানিই নিঃসঙ্গ, তার বেশি নয়। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি এই নিঃসঙ্গ জলাশয়ের সঙ্গী কে? তবু এর জলের নীল রঙে নীল পরীদেরই ঘুরতে দেখি, নীল দানোদের নয়। সূর্য একা। কখনও কখনও, আর হাওয়া তেমন বইলে দুটো দেখায় বটে, কিন্তু তার একটা নকল। ঈশ্বর একা। কিন্তু শয়তান কখনই একা নয়, বহু সাঙ্গোপাঙ্গ দরকার তার; নিজেই সে অসংখ্য। গোটা মাঠের মধ্যে একটা মালিন কি ড্যান্ডিলিয়ন যেমন, বিন-এর পাতা কি সোরেল-এর ঝাড়, কি একটা ঘোড়া-মাছি কি মৌমাছি, তেমনি একা আমি। মিলের ঐ নদী কি ঐ দিঙ্‌নির্ণয়ের ত্রিশূলটা, ধ্রুবতারা, দক্ষিণা বাতাস, এপ্রিলের বৃষ্টি, জানুয়ারি মাসের বরফ গলা, কিংবা নতুন বাড়ির সর্বপ্রথম মাকড়সা, কারও চাইতেই বেশি একা নই আমি।

শীতকালের দীর্ঘায়ত সন্ধ্যায় যখন জোরে বরফ পড়ে, বনের মধ্যে হাওয়া গর্জে ওঠে, তখন কোন কোন সময়ে বেড়াতে আসেন এখানকার খোদ মালিক। অনেককাল আছেন এখানে। তিনিই না কি ওয়ালডেন পন্ড খুঁড়েছিলেন, পাথরের বাঁধ দিয়েছিলেন, চারদিকে পাইন গাছও পুঁতেছিলেন। প্রাচীন কাল আর চির-নবীন নিয়ে অনেক গল্প বলেন আমাকে তিনি। দুজনে মিলে সন্ধ্যাটা আলাপ-আলোচনায়, গল্প-গুজবে, হাসি-খুশি ভাবে আনন্দেই কাটিয়ে দেওয়া যায়। আপেল লাগে না, সাইডার লাগে না। সহৃদয়, জ্ঞানী, রসিক ব্যক্তি। খুব ভালবাসি তাঁকে। গফ ও হোয়ালের চেয়েও নিজেকে আড়ালে রাখতে জানেন তিনি। সবাই জানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু কোথায় যে তাঁর গোর দেওয়া হ'ল তা পর্যন্ত কেউ জানে না। বর্ষীয়সী জনৈক মহিলাও আমার কাছাকাছি থাকেন। অনেকেই তাঁকে চোখেও দেখেন নি কোনদিন। তাঁর সুগন্ধি ওষধি-কাননে মধ্যে মধ্যে বেড়াতে ভাল লাগে আমার। এটা ওটা সংগ্রহ করি আর তাঁর গল্প শুনি। গল্প বানিয়ে বলায় তাঁর প্রতিভার জুড়ি মিলবে না। তাঁর স্মৃতিশক্তি পৌরাণিক যুগের সময়কেও ছাড়িয়ে যায়। প্রচলিত কাহিনীর প্রত্যেকটার আদি ঘটনা বলতে পারেন তিনি, বলতে পারেন কোনটা কোন ঘটনার উপর গড়ে উঠেছে। সব ঘটনাই তো তাঁর ছেলে-বেলাতে ঘটেছে। বৃদ্ধা হলেও রাঙা টুকটুকে, উপচে পড়ছেন যেন সর্বদা। সব রকম

অবস্থাতেই খুশি, নিজের সন্তানদের মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই তিনি বহাল তবিয়তে থাকবেন।

প্রকৃতির,—তার রৌদ্র, হাওয়া, বর্ষা, গ্রীষ্ম, শীতের যে অবর্ণনীয় সারল্য আর কারুণ্য, যে প্রাণ-প্রাচুর্য, যে আনন্দ—তা চিরন্তন, এবং তার যে মমত্ব আছে মানুষের সম্বন্ধে, কোন মানুষ কোন দিন যথার্থ কারণে দুঃখ বোধ করলে সমগ্র প্রকৃতি তাতে বিচলিত হয়ে উঠবে, সূর্যের প্রভা ম্লান হবে, বাতাস মানুষের মতো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করবে, মেঘ থেকে অশ্রু ঝরবে আর অরণ্য পত্রপল্লবহীন হয়ে মধ্য-গ্রীষ্মে বিষাদ-মূর্তি পরিগ্রহ করবে। মৃত্তিকার সঙ্গে কি আমার সমপ্রাণতা নেই? আমি কি অংশত নিজে পত্র এবং উদ্ভিদের ছাঁচে ঢালাই নই?

কোন বটিকা আমাদের নীরোগ, শান্ত, প্রসন্ন রাখবে? আমার কি তোমার প্রপিতামহের কোন বটিকা নয়। আমাদের অতিবৃদ্ধা প্রপিতামহী প্রকৃতি ঠাকুরাণীর কাছে তরুগুল্মের গাছ-গাছড়ার লতা-পাতার ভেষজ রক্ষিত আছে। অক্ষয় যৌবনসম্পন্না হয়েছেন তিনি তারই গুণে। তাঁর সমবয়স্ক কত বৃদ্ধের আয়ু শেষ হয়েছে। তাদের স্থবিরত্বে তাঁর স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি হয়েছে। আমার সর্বরোগহর মহৌষধ, অ্যাকেরণ আর কৃষ্ণসাগরে ডুবিয়ে আনা লোক ভোলান মিকশ্চারের মধ্যে নেই। আমরা তৈরি হতে দেখি যা; ঐ যে সব বোতল বোঝাই করে আনার জন্য লম্বা খাটো জাহাজের মতো দেখতে মালগাড়ি—তাই থেকে বেরোয়। নির্মল প্রভাতের হাওয়া খুব খানিকটা খেলেই হবে আমার। দিবসের উৎসমুখে গিয়ে লোকজন সকালের হাওয়া খেতে না চায় যদি, বোতলে ভরে এনে দোকানে রাখতে হবে আমাদের বিক্রির জন্য। পৃথিবীর সকালে ওঠবার টিকিট যারা হারিয়ে ফেলেছে, তাদের উপকার হবে। মনে রাখতে হবে কিন্তু যত ঠাণ্ডা ঘরেই রাখা হ'ক দুপুর পর্যন্ত চুপ করে থাকার পাত্র নয়, ছিপি খুলে বেরিয়ে পড়বে তার আগে আর ঊষা দেবীর পায়ে পায়ে পশ্চিমে চলবে। গ্রীক পুরাণের বৃদ্ধ বৈদ্য এস্কুলাপিয়াসের কন্যা স্বাস্থ্য-দেবী হাইজিয়া-র উপাসক নই আমি। ফলকে তাঁর যে মূর্তি আঁকা হয়েছে—তার এক হাতে সাপ আর অন্য হাতে একটা পেয়ালা, সাপটা থেকে থেকে চুমুক দিচ্ছে তাতে। আমি হচ্ছি দেবরাজ জুপিটারের সাকী চিরযৌবনা হিবি-র উপাসক। জুনো আর বন-লেটুসের কন্যা তিনি। দেবতা আর নর, উভয়কে হৃত শক্তি পুনরায় দান করার সামর্থ্য রাখেন তিনি। সম্ভবত মর্ত্যচারিণীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সম্পূর্ণ নীরোগ স্বাস্থ্যসম্পন্না বলিষ্ঠা কামিনী। যেখানে তাঁর পা পড়েছে সেখানেই বসন্তের সমাগম হয়েছে।

॥ ৬ ॥ অতিথি-অভ্যাগত

আমি জানি অধিকাংশ লোকের মতোই মনুষ্য-সঙ্গ আমি ভালবাসি। সে রকম প্রাণোচ্ছল লোকের দেখা পেলে খানিকটা সময় তার গায়ে ছিনে-জোঁকের মতো লেগে থাকতেও আমি রাজী আছি। স্বভাব-সন্ন্যাসী নই আমি। কোন কাজ পড়লে পানশালায় গিয়ে সেখানে যাদের নিয়মিত গতিবিধি আছে তাদের মধ্যে বলিষ্ঠতম ব্যক্তিকে সম্ভবত হঠিয়ে দিতেও পারি।

আমার আস্তানায় তিনটে চেয়ার ছিল, প্রথমটা নিঃসঙ্গতার, দ্বিতীয়টা বন্ধুত্বের, তৃতীয়টি সামাজিকতার। অপ্রত্যাশিত ভাবে যখন অভ্যাগতদের অনেকে এসে পড়তেন, তখন সকলের জন্যই তৃতীয় চেয়ারটাই শুধু থাকত। সাধারণত তাঁরা দাঁড়িয়েই কাটাতেন, তাই জায়গার অভাব ঘটত না। একটা ছোট ঘরে মেয়ে-পুরুষে কতজন বয়স্ক লোক ধরতে পারে ভাবলে অবাক লাগে। পঁচিশ ত্রিশ জন সশরীরে এসে জমায়ত হয়েছেন আমার ছাদের নীচে। তবু যখন বিদায় নিয়েছি পরস্পরে, তখন প্রায়ই খেয়াল হয় নি যে আমরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলাম। সরকারি কি বেসরকারি, আমাদের অনেক বাড়িতেই, প্রায় অগুণতি ঘর, বড় বড় হল, মদ রাখার সেলার, শান্তির কত উপকরণ সব—তাদের গুটিকয় প্রাণীর পক্ষে অতিরিক্ত রকমের বাড়াবাড়ি লাগে আমার কাছে। এত সুবিশাল আর এমন আড়ম্বরবহুল যে লোক-গুলোকে সেখানে ইঁদুরের মতো উপদ্রবস্বরূপ মনে হয়। কোন ট্রেমণ্ট, কি অ্যাষ্টর, কি মিডলসেক্স হাউস-এ যখন দেখা যায় নকিব এসে কুলজীনামা ঘোষণা করলেন, তখন মজা লাগে দেখে, বাইরের বারান্দা থেকে সুড় সুড় করে সমবেত ব্যক্তির সম্মুখে এসে উপনীত হলেন জনৈক হাস্যকর মূষিক-পুঙ্গব এবং এসেই গা-ঢাকা দিলেন মেঝের কোন গর্তে।

আমার আস্তানাটা এত ছোট হওয়ায় একটা অসুবিধা বোধ করতাম মাঝে মাঝে—বড় বড় কথায় যখন বড় বড় ভাব বলা সুরু হত তখন অতিথির কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যেত না। চিন্তার পালে হাওয়া লাগিয়ে তাকে ঠিক মত বন্দরে পৌঁছে দেবার আগে দু-চার বার পাড়ি জমাতে হ'লে জায়গা লাগে খানিকটা। চিন্তা বন্দুকের গুলির মতো,

কানে গিয়ে ধাক্কা লাগাবার আগে তাকে তেরছা, ওঠা নামা, নানা গতির ঝামেলা সামলে শেষ পর্যন্ত সোজাসুজি সামনে শ্রোতার কানের দিকে ছুটতে হয়, নইলে মাথার পাশে লেগে আবার ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ফাঁক পেলেই ছড়িয়ে পড়া আর সার বেঁধে সেজে দাঁড়াবার জন্য আমাদের কথাগুলোরও জায়গা দরকার। যেমন জাতিতে জাতিতে তেমনি ব্যক্তির মধ্যেও উপযুক্ত পরিমাণ প্রশস্ত আর স্বাভাবিক ব্যবধানভূমি থাকার দরকার, এমন কি পরস্পরের মধ্যে বেশ খানিকটা নিরপেক্ষ অঞ্চলও থাকা দরকার। পুষ্করিণীর বিপরীত পাড়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে এপার থেকে তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে আমি বেশ খানিকটা বিলাস বোধ করি। আমার আস্তানায় এত ঘেঁষাঘেঁষি হত আমাদের যে কথা শোনার সুবিধা হত না, শোনার জন্য যতটুকু স্বর নামিয়ে কথা বলার দরকার তা সম্ভব হ'ত না, যেমন শান্ত জলে খুব কাছাকাছি দুটো ঢিল ছুড়লে পরস্পরের ঢেউ পরস্পরকে নষ্ট করে। আমরা শুধু শুধু যদি বাচালতার জন্যই চেঁচামেচি করি, খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে এ ওর নিঃশ্বাসের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে। কিন্তু সাবধানে চিন্তা করে কথা বলতে হ'লে একটু দূরে দূরে থাকতে হয়, যাতে গরম ভাবটা আর ভাপটা কেটে যাবার সুযোগ পায়। কথা না কয়ে যা পেতে হয়, কি কথাবার্তায় যার নাগাল মেলে না, পরস্পরের মধ্যে সেই নিবিড় অন্তরঙ্গতার আনন্দ লাভ করতে হ'লে আমাদের শুধু নীরব থাকলেই চলবে না, পরস্পর থেকে পরস্পরের শারীরিক দূরত্বও এতখানি হওয়া দরকার যে, কোন অবস্থাতেই যেন কেউ কারও কথা শুনতে না পাই। এই দিক থেকে দেখলে যারা কানে ভাল শুনতে পায় না, কথায় শুধু তাদেরই সুবিধা। কিন্তু এমন অনেক সূক্ষ্ম ভাব আছে, চেঁচাতে হলে যা প্রকাশ করা যায় না। কথাবার্তা যত উচ্চ থেকে উচ্চস্তরের বিষয়ে উঠত, উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর হ'ত, আমাদের চেয়ার তত ক্রমশ দূরে সরতে সরতে দুই বিপরীত দেওয়ালে গিয়ে ঠেকত। তখনই সচরাচর জায়গা কম প'ড়ত।

আমার আস্তানার পিছনে পাইন বনই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ কক্ষ, আমার বিশ্রামাগার। সেখানে কখনও কারও যেতে মানা ছিল না। তার কার্পেটে রোদ লাগত না বললেই হয়। গ্রীষ্মকালে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা এলে সেখানে নিয়ে বসাতাম তাঁদের। সেখানে বিনা বেতনের ভৃত্য মেঝে ঝাড়ু দিত, আসবাব-পত্রের ধুলো ঝেড়ে রাখত, জিনিস সব গোছগাছ করে রাখত।

কোন অতিথি এলে কোন কোন সময়ে ভাগাভাগি করে আমার সামান্য আহার্য খেয়ে নিতাম। কথাবার্তায় বাধা হ'ত না। ওরই ফাঁকে তাড়াতাড়ি খানিকটা পুডিং বানিয়ে নিতাম আর আগুনের তাত পেলে এক টুকরো

রুটি কেমন ফুলে লাল হয়ে ওঠে তাও লক্ষ্য করতাম। কিন্তু বাড়িতে দুজনের রুটি আছে আর জন কুড়ি আড্ডা দিতে এসেছেন তখন খাওয়ার নামও উচ্চারণ করা হ'ত না, যেন খাওয়ার অভ্যাস বর্জন করেছি আমরা। বাধ্য হয়েই উপবাস দিতে হ'ত সকলকে। তাতে আতিথেয়তার ত্রুটি হ'ল বলে কেউ মনে করতেন না, বরং যথোচিত বিবেচনা-সঙ্গত ব্যবস্থা হয়েছে বলেই মনে করতেন সবাই। অদম্য প্রাণশক্তির কল্যাণে প্রাণিজীবনের অপচয় আর ক্ষয়, যা ক্রমাগত পূরণ হওয়া প্রয়োজন, আশ্চর্য রকমে স্থগিত থাকত এ ক্ষেত্রে। সুতরাং লোকসংখ্যা কুড়িই হ'ক কি হাজারই হ'ক, আপ্যায়িত করতে পারতাম সকলকেই। আমি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে যদি ব্যর্থ-মনোরথ কি ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরে যেতে হয়ে থাকে আমার আস্তানা থেকে, তাহ'লে আমাকেও তাঁরা অন্তত তাঁদের সমগোত্রীয় বলে ধরে নিতে পারেন। অনেক গৃহস্থের হয়তো সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু চিরাচরিত ব্যবস্থার বদলে কোন নতুন আর অধিকতর উপযোগী রীতি-নীতি চালানো রীতিমত সহজ। খাইয়ে দাইয়ে সুনাম অর্জন করতে হ'লে, তা না করাই ভাল। আমার কথা বলি। এক ভদ্রলোক আমাকে খাওয়ানো নিয়ে এমন হৈ চৈ বাধান একবার যে আমি ধরে নিলাম একটু ঘুরিয়ে ভদ্রভাবে বলতে চান, আবার যেন তাঁকে বিরক্ত না করি কখনও। বাড়িতে লোক আসা বন্ধ করার এমন সার্থক উপায় আর নেই। কোন পাহারাদার কুকুর এমনটি পারবে না। সেই ভদ্রলোকের বাড়ি আমি আর কোনদিন যাব মনে হয় না। আমার জনৈক অতিথি একবার তুলোট রঙের একটা আখরোটপাতায় স্পেনসরের কয়টা লাইন লিখে এনে-ছিলেন কার্ডের বদলে। লাইন কয়টি আমার আস্তানার মূল মন্ত্র করতে পারলে গর্ব বোধ করতাম ঃ—

> "কুঁজনায় গিয়ে ক্ষুদ্র কক্ষ ভরে—
> পানাহার নাই, নাই কোন আয়োজন,
> অবসরই ভোজ যা চায় তা করে
> মহৎ চিত্তে তাই তো শ্রেষ্ঠ ধন।"

একবার উইন্সলো, ইনি পরে প্লিমাথ কলেজের গবর্ণর হন, বনের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে এক সঙ্গীকে নিয়ে মাসাসয়েটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান, সেখানে গিয়ে যখন ওঠেন তখন বড় ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। রাজা তাঁদের সস-ম্মানে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার কোন কথাই উত্থাপন কর-লেন না সেদিন। যখন রাত্রি হ'ল, তখন তাঁদের বর্ণনা থেকেই উদ্ধৃত করছি— "রাজা তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর পাশে শয়নের ব্যবস্থা করলেন আমাদের। তাঁরা একদিকে, আমরা অন্যদিকে। শুধু তক্তার পাটাতন মাটির থেকে এক ফুট

ওপরে আর তার উপর পাতলা মাদুর বিছানো। জায়গার অভাবে তাঁর দলের দুজন মুরুব্বি ব্যক্তি আমাদের কাছে, একেবারে ঘাড়ের উপর। সুতরাং রাস্তার ক্লান্তির চাইতে আশ্রয়ের এই ব্যবস্থায় আমরা আরও বেশি ক্লান্তি বোধ করছিলাম।" পরদিন একটার সময় মাসাসয়েট তাঁর "মারা দুটো মাছ নিয়ে হাজির," ব্রিম মাছের তিনগুণ বড় হবে। এগুলো সিদ্ধ হ'লে অন্তত চল্লিশ জন ভাগীদার জুটল, ভুরিভোজন তাদের। দুটো রাত আর একটা দিনের মধ্যে আমাদের এই হল আহার। আমাদের একজন ভাগ্যে একটা তিতির কিনে এনেছিলেন, নইলে সে যাত্রা আমাদের উপবাস করেই কাটত।" ভয় হ'ল পাছে না খেয়ে না ঘুমিয়ে মাথা ঘোরা সুরু হয়—তার উপর আবার "অসভ্যদের বর্বর সংগীত (তারা গান গেয়ে ঘুম পাড়ায় নিজেদের)।" তাই হেঁটে যাবার মতো জোর থাকতে বাড়ি ফিরে আসার জন্য তাঁরা রওনা দিলেন। আশ্রয়ের দিক থেকে অবশ্য এই ব্যবস্থাকে অত্যন্ত হতাদরসূচক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁরা অসুবিধা বোধ করলেও তাঁদেরকে ওঁরা সম্মানই করতে চেয়েছিলেন। আর খাওয়ার দিক থেকে রেড ইণ্ডিয়ানরা এর চাইতে কি বেশি ভাল ব্যবস্থা করতে পারত, জানি নে। তাদের নিজেদেরই আহার জুটত না। আর অতিথিকে আহার্যের বদলে কেবল বিনয় ভাষণ দিয়ে তার পূরণ করার অবিবেচনা না দেখিয়ে, তারা নিজেদের সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছে। সুতরাং তারা নিজেদের কোমরেও কষে বেল্ট বেঁধেছে, ঐ নিয়ে উচ্চবাচ্যও করে নি। আর একবার পরে যখন উইন্সলো এদের ওখানে বেড়াতে যান তখন তাদের ভাল সময়, সেদিক দিয়ে কোন ত্রুটি হয় নি সেবার।

মানুষের কথা যদি বল, কুত্রাপি তারা কোথাও না গিয়ে থাকে না। আমার জীবনের আর সব পর্বের চাইতে যখন বনবাসে ছিলাম, তখনই সব চাইতে বেশি লোকজন আমার কাছে এসেছিলেন; অর্থাৎ তবু কয়েকজন। অনেককে সেখানেই অনুকূল পরিবেশে দেখতে পেয়েছি। অন্য যায়গায় তা সম্ভব হ'ত না। কিন্তু ছুতো-নাতা ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার লোক সেখানে কমই ছিল। এই দিক দিয়ে শহর থেকে খালি দূরে ছিলাম বলেই আমার অনেক সঙ্গীও তুষের মতো কুলোর বাতাসে দূরে গিয়েছিলেন। লোক-সমাজের নদীর স্রোতের যেখানে সমাপ্তি, নিঃসঙ্গতার সেই মহাসাগরের গভীর তলদেশে আত্মগোপন করেছিলাম আমি। আর সেখানে আমার নিজের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, শুধু অতি সূক্ষ্ম পলিমাটিই জমতে পারত বেশির ভাগ সময়ে। উপরন্তু অন্যপক্ষে অনাবিষ্কৃত আর অপরিচিত মহাদেশের সাক্ষ্য সেখানে হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল।

আজ সকালে আমার আস্তানায় একটি লোক এসে উপস্থিত, তাকে হোমারের কি সুপ্রাচীন পাফলাগোনিয়ার যুগের লোক বললেই হয়। নামটিও উপযুক্ত, কাব্যগন্ধী—দুঃখের বিষয় সেটা ছাপতে পারছি নে। লোকটি কানাডীয়, কাঠুরে কাঠের খুঁটি লাগায়। দিনে পঞ্চাশটা খুঁটি লাগাতে পারে। তার কুকুর একটা উডচাক ধরেছিল, গত রাত্রে তাই খেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। সেও হোমারের নাম জানে। "বৃষ্টির দিন বই না থাকলে কি করে কাটত জানি নে।" যদিও অনেক বর্ষাই হয়তো কেটে গেছে, কিন্তু একটা গোটা বই পড়ে উঠতে পারে নি এর মধ্যে। তার সুদূর গ্রাম-দেশের নিজেদের এলাকার পাদ্রী গ্রীক ভাষা পড়তে জানতেন, তাকে বাইবেলের শ্লোক পড়তে শিখিয়ে ছিলেন। এখন অবিশ্যি আমাকেই তাকে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে হবে পড়ে—সে বই হাতে ধরে থাকবে। একিলিস পেট্রোক্লাসকে তার বিষণ্ণ মুখ দেখে তিরস্কার করছেন—"চোখে জল কেন তোমার, পেট্রোক্লাস, ছোট্ট মেয়ের মতো এ কি?"—

"কিংবা পেলে দুঃসংবাদ কিছু থিয়ার নিকট?
সবে জানে, মেনেটুস আছে বাঁচি, অ্যাক্‌টর নন্দন,
ইয়েকুস-পুত্র পেলেয়ুস, সেও বাঁচে মীরমিডন দলে,
উভয়ের কারও মৃত্যু হ'লে দুঃখের কারণ ছিল।"

শুনে বললে, "বাঃ বেশ।" আজ রবিবার সকালে সংগ্রহ করেছে অসুস্থ কোন লোকের জন্য সাদা ওক গাছের বাকলা, তার একটা আঁটি রয়েছে বগলে। প্রশ্ন করলে, "আজ এর খোঁজে এসেছি বলে দোষ হয় নি তো?" হোমারকে বড় লেখক বলে সে জানে, কিন্তু কি বিষয় নিয়ে লিখেছেন, তা জানে না। এমন একটা সাদাসিধে স্বভাব-সুন্দর ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পাপ কি আধি-ব্যাধি, পৃথিবীর সর্বত্র যায় মসীকৃষ্ণ নীতিবাগীশ ছায়া, এ দুয়ের কোন অস্তিত্বই নেই তার কাছে। বছর আঠাশেক বয়স, বারো বছর হ'ল কানাডা আর বাপের আশ্রয় ছেড়ে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করে টাকা রোজগারের ধান্ধায়। হয়তো দেশে ফিরে শেষ পর্যন্ত ক্ষেত-খামার কিনতে পারে। যতদূর সম্ভব রুক্ষ কর্কশ চেহারা, বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট কিন্তু ঢিলেঢালা দেহ, তবু হাঁটলে সুন্দর দেখায়, রোদে পোড়া পুরু গলা, কাল গোছা-গোছা চুল আর নিষ্প্রভ তন্দ্রালু নীল চোখ, মধ্যে মধ্যে মনের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরিধান সাদামাঠা ধোঁয়া রঙের কাপড়ের টুপি, ময়লা পশম রঙের গ্রেটকোট আর গরুর চামড়ার বুটজুতো। অত্যন্ত মাংসাশী, সাধারণত একটা টিনের বালতিতে খাবার বয়ে নিয়ে যায় কাজ করে যেখানে, আমার আস্তানা ছাড়িয়ে প্রায় দু'-মাইল—সারা গ্রীষ্ম কাঠ ফাড়ে। ঠাণ্ডা মাংস, প্রায়ই উডচাকের। পাথরের বোতলে কফি বেল্টের দড়িতে বাঁধা, সেটা ঝুলছে। মাঝে মাঝে আমাকে দুই

এক কাপ কফি দিত। খুব সকালেই দেখা যেত সে আমার বিন-ক্ষেত পেরিয়ে চলেছে। কাজে যাবার তাড়া কি ব্যস্ততা নেই, যেমন ইয়াঙ্কিদের অভ্যাস। নিজেকে তো জখম করতে পারে না। শুধু পেটের ভাত রোজগার করলেই হ'ল। তার বেশি রোজগার না হলেও দুঃখ নেই। প্রায়ই ঝোপঝাড়ের মধ্যে খাবার রেখে চলে যেত—পথে তার কুকুর হয়তো একটা উডচাক পাকড়েছে। দেড় মাইল গিয়ে ডানাপালক ছাড়িয়ে যেখানে থাকত সেই বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে রেখে আসতে যেত। আধ ঘণ্টা ধরে তার আগে চিন্তা করেছে, পুকুরের মধ্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটাকে ডুবিয়ে রাখা চলে কি না। এই সব নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসে সে। সকালে যাবার সময় বলে যেত, "খাসা পায়রা সব, রোজ কাজ করা যদি না আমার কারবার হত, যা মাংস দরকার সব যোগাড় করতাম শিকার করে—পায়রা, উডচাক, খরগোস, তিতির,—বাপ্। হপ্তার খোরাক এক দিনে যোগাড় হয়ে যেত।"

কাঠ ফাড়ার কাজে সে ওস্তাদ। কাজ করতে গিয়ে বেশ এক হাত খেলা আর ওস্তাদি দেখাতে ভালবাসত। গোড়া ঘেঁষে একেবারে মাটির সমান করে সে গাছ কাটত, যাতে করে পরে যখন অঙ্কুর জন্মাবে সেখানে, সেগুলো আরও জোরাল হতে পারে, আর স্লেডগাড়ি যেন কাটাগোড়ার উপর দিয়ে গড় গড় করে চলে যেতে পারে। একটা গোটা গাছকে কাটা কাঠের মাপকাঠি না রেখে সে কেটে-ছেঁটে সেটাকে একটা কাণ্ড কি খোঁটা বানিয়ে তাই দিয়ে কাজ চালাত। সেটা হাত দিয়েই উপড়ে ফেলা যেত।

নিরীহ নিঃসঙ্গ, কিন্তু তবু খুশি, তাই তাকে ভাল লাগত। খোস মেজাজ আর তৃপ্তির ঝরনা চোখে মুখে উপচে পড়ত। আনন্দে কোন খাদ ছিল না তার। এক এক সময়ে দেখতাম বনের মধ্যে সে কাজে ব্যস্ত, গাছ কাটছে। আমাকে দেখে অনির্বচনীয় আনন্দের হাসি হেসে অভ্যর্থনা জানাত, তার সঙ্গে কানাডীয় ফরাসী ভাষায় নমস্কার,—যদিও ইংরেজী সে ভালই কইতে পারত। আমি কাছাকাছি গেলে কাজ থামিয়ে একটা পাইন গাছের কাণ্ডের উপর শুয়ে পড়ত, মুখে হাসি। ভিতরকার কাঁচ বাকলা ছিঁড়ে একটা কাটা ছোট বলের মতো তৈরি করে সেটাকে চিবোতে চিবোতে হাসত আর গল্প করত। প্রাণশক্তির এমন প্রাচুর্য ছিল তার, যে কোন কিছু মনকে সুড়সুড়ি দিলে কি তাতে মজা পেলে হেসে মাটিতে গড়িয়ে লুটোপুটি খেত। গাছগুলোর দিকে চেয়ে বলে উঠত,—"সত্যি বলছি কি আনন্দই না লাগে আমার কাঠ কাটতে। এর চাইতে মজার খেলার দরকার নেই আমার।" কখনও কখনও অবসর পেলে সারাদিন ধরে বনের মধ্যে একটা ছোট পিস্তল নিয়ে খেলা করে ঘুরত—বেড়াচ্ছে আর একটা নির্দিষ্ট সময়ান্তে পিস্তল ছুড়ছে যেন নিজেরই সম্মানে। শীতকালে দুপুরের দিকে আগুন জ্বালিয়ে কেতলিতে কফি গরম

করত। তারপর কাঠের একটা গঁুড়ির উপর বসে যখন খাবার খেত, মধ্যে মধ্যে চিকাডিগ্রলো এসে তার হাতের উপর নেমে আঙ্রলের ফাঁক দিয়ে আল্র ঠোকরাত। দেখে বলত, "ছোকরাগ্রলোকে চারদিকে ঘ্রতে দেখলে ভালই লাগে" তার।

তার মধ্যে জান্তব মান্রষটারই বেশি বিকাশ। শারীরিক সহ্যশক্তি আর তৃপ্তিবোধের দিক থেকে সে ছিল পাইন আর পাহাড়ের সগোত্র। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সারাদিন খাটবার পর কোন কোন সময়ে রাত্রে তার ক্লান্তি আসে কি না। অকপট আন্তরিকতা ফ্রটে উঠল তার ম্রখে, বললে, "ক্লান্তি? জীবনে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি নি।" কিন্তু শিশ্রর মধ্যে যেমন তার মধ্যেও তেমনি ব্রদ্ধি-প্রধান আর যাকে বলা হয় আধ্যাত্মিক সত্তা তা স্রপ্ত ছিল। ক্যাথলিক পাদ্রীরা আদিম জাতিদের যেমন শিক্ষা দেন, ছাত্রের শিক্ষা যাতে সচেতন স্তরে না উঠে বিশ্বাস আর ভক্তির স্তরেই থেকে যায়, শিশ্র মান্রষ হয়ে ওঠে না, শিশ্রই থেকে যায়, তার শিক্ষা-দীক্ষাও তেমনি নির্দোষ আর নিষ্ফল স্তরেরেই ছিল। নির্মাণকালে প্রকৃতি তাকে বলিষ্ঠ দেহ আর আত্ম-প্রসন্নতার উপাদানে তৈরি করেছিলেন, উপরন্তু সব দিকে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস দিয়ে স্ররক্ষিত করেছিলেন তাকে, যাতে তিনকুড়ি দশবছর ধরে সে শিশ্রই থেকে যেতে পারে। এত বিশ্রদ্ধ আর খাঁটি যে কোন পরিচয়েই তার পরিচয় দেওয়া যায় না, যেমন একটা উডচাককে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া যায় না—এর বেলাতেও তাই। নিজের সন্ধান পেতে হবে তাকে আর সবাইএর মতো। কোন ভূমিকা অভিনয়ের মধ্যে নেই সে। লোকে তাকে খাটিয়ে পয়সা দেয়, এতেই তার খাওয়া-পরা চলে। কিন্তু তাদের কারও সঙ্গে কখনও সে মতামত বিনিময় করে নি। স্বভাবতই সরল আর বিনয়ী, —যার কোন বাসনাই নেই, তার সম্বন্ধে বিনয়ের কথা যদি ওঠে—কিন্তু এই বিনয় তার আলাদা কোন গ্রণ নয়. সে নিজেও তা মনে করতে পারত না। জ্ঞানী লোকদের প্রায় দেবতা ভাবত সে। এদের কেউ আসছেন খবর পেলে সে ধরে নিত যে, এত বড় যিনি, তাকে দিয়ে তাঁর কোন দরকার নেই, যা কিছ্র করবার তিনি নিজেই করে নেবেন, ওকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না। প্রশংসা সে জীবনে শোনে নি। লেখক আর ধর্মযাজকদের বিশেষ করে সে শ্রদ্ধা করত। এঁদের কাজ অলৌকিক মনে হ'ত তার। আমিও অনেক কিছ্র লিখে থাকি শ্রনে সে খানিকক্ষণ চিন্তা করলে, তারপর ধরে নিলে হাতের লেখার কথাই হচ্ছে, হাতের লেখা তারও খ্রব ভাল। মধ্যে মধ্যে দেখতাম, তার স্বদেশের প্যারিশের (ধর্ম-এলাকার) নাম রাস্তার ধারে বরফে স্রন্দর ভাবে লেখা রয়েছে, মায় ফরাশি উচ্চারণ-ভঙ্গীর ঠিক চিহ্নটি পর্যন্ত—ব্রঝতাম এই পথ দিয়েই সে গেছে। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে মনে যা ভাবে তা লিখতে ইচ্ছে করে

কি না তার। যারা লেখা-পড়া জানে না, তাদের চিঠিপত্র পড়ে আর লিখে দিতে হয়েছে তাকে, স্বীকার করলে—কিন্তু মনে মনে যা সে ভাবে, তা লেখার চেষ্টা করে নি কোনদিন—লিখতে পারবেও না; প্রথম কি লিখতে হবে, তাই ভাবতেই তো মারা যাবার দাখিল, তার উপর সেই সঙ্গে আবার বানানের দিকে নজর রাখতে হবে।

শুনেছি একজন খ্যাতনামা তত্ত্বজ্ঞ সংস্কারক তাকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দুনিয়ার হাল-চালের বদল হ'ক, এ সে চায় কি না। এ প্রশ্ন কোনদিন কারও মনে উদয় হয়েছে, ভাবতেও পারে নি সে। তাই হক চকিয়ে হেসে উঠে তার সেই কানাডীয় ভংগীর উচ্চারণে জানিয়েছিল, "না, আমার এই বেশ ভাল লাগে।" কোন দার্শনিক তার হাবভাবের মধ্যে অনেক খোরাক পাবেন বলে আমার ধারণা। নতুন পরিচয়ে মনে হবে সাধারণ জ্ঞানেরও অভাব আছে তার। আমি কিন্তু তার ভিতর মাঝে মাঝে অদৃষ্টপূর্ব ব্যক্তির সন্ধান পেতাম, বুঝতে পারতাম না যে, সে শেক্সপীয়ারের মতো জ্ঞানী কিংবা শিশুর মতো অজ্ঞান, দুর্লভ কাব্য-বুদ্ধি না নির্বুদ্ধিতার আধার বলে ধরে নেব তাকে। শহরের একজন আমাকে বলেছেন, গাঁয়ের মধ্যে তার ঐ ছোট্ট আঁট-সাঁট টুপি পরে যখন সে মুখে শিস্ দিতে দিতে চলে, মনে হয় ছদ্মবেশী কোন রাজপুত্র চলেছেন।

বই বলতে তার একটা পঞ্জিকা আর একটা পাটিগণিত। এর মধ্যে পাটিগণিতে তার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। পঞ্জিকাটি তার কাছে বিশ্বকোষ বিশেষ, মনে করত মানুষের যাবতীয় জ্ঞানের সংক্ষিপ্তসার সেটা। কথাটা অনেকটা সত্যও বটে। সমসাময়িক বিবিধ সংস্কার সম্বন্ধে তার মতামত জানতে চাইতাম। কোন ব্যাপারেই তার সহজ আর কাজ-চলা গোছের দৃষ্টি-ভংগীর অভাব দেখি নি কোনদিন। সে সব বিষয়ে আগে কোনদিন কোন কথাও শোনে নি সে। কারখানা ছাড়া চলে কি? তার পরিধানে বাড়িতে তৈরি ছাই-ছাই রঙের জামা-কাপড়—তাই ভাল লাগে তার। চা-কফি ছাড়া তার চলবে? দেশের মধ্যে জল বাদ দিলে আর পানীয় আছে না কি? হেমলকের পাতা জলে ভিজিয়ে সে খেয়ে দেখেছে, গরমকালে জলের চাইতে সুস্বাদু মনে হয়েছে তার। যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল টাকা-পয়সা ছাড়া চলবে কি না, তখন টাকাকড়ির সুবিধা এমন ভাবে বুঝিয়ে দিলে যে টাকাকড়ির আদি ইতিহাসের দর্শন-সম্মত বিচার-বিবেচনা, এমন কি অর্থ কথাটির ধাতু প্রত্যয়গত সংজ্ঞার বিষয়ে জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় তা থেকে, কোন কোন বিষয়ে মিলেও যায় হুবহু। তার সম্পত্তি একটা ষাঁড়। দোকান থেকে সুচ-সুতো কেনার দরকার তার। হিসাব মতো বারে বারে ঐ একটা জীবের কোন একটা অংগ বন্ধক রাখার সুবিধা হবে না, কিছুকালের মধ্যে তা অসম্ভব হয়ে

পড়বে সে বুঝত। অনেক ব্যবস্থারই স্বপক্ষ সমর্থন দার্শনিকের চাইতে ভাল ভাবে করতে পারত সে। ঐ ব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে সে সংশ্লিষ্ট, তার বর্ণনায় ব্যবস্থাটি কেন প্রচলিত হয়েছে, তার প্রকৃত কারণ বিবৃত করত সে। অপর কোন ব্যাখ্যা মাথা ঘামিয়ে বার করতে পারত না। প্লেটো মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন পক্ষহীন দ্বিপদ; একথা শুনল সে একদিন। একজন তাই একটা মোরগের পাখনা ছাড়িয়ে প্লেটোর মানুষ দেখায়, একথাও তাকে বলা হয়। ভেবে চিন্তে একটা বড় তফাত বার করলে সে. হাঁটু দুটো দোমড়ানোটা ঠিক দিকে নয়। কখনও কখনও স্পষ্টই ঘোষণা করত, "কথা কইতে কি যে ভাল লাগে আমার। দিন ভোর কথা কয়ে যেতে পারি আমি, সত্যি বলছি।" কয়েক মাস তার সঙ্গে দেখা হয় নি। দেখা হলে জিজ্ঞাসা করলাম. এই গরমে তার মাথায় কোন ভাবোদয় হয়েছে কি না। "হায় ভগবান," সে উত্তরে বললে, "আমার মতো খাটতে হয় যাকে, তার মাথায় যে সব ভাব থাকে. তা না ভুললেই যথেষ্ট। যে লোকটা আপনার যোগানদারি করে, তার আবার বাতিক আছে, তাই বুঝি আপনারও ছিট লেগেছে। আগাছার কথা ভাবতে হবে না?" কিছুদিন দেখা না হলে প্রায়ই প্রথম প্রশ্ন করত সে. সুবিধা কিছু হয়েছে কি না। শীতকালে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাকে, সব সময় সে সন্তুষ্ট থাকে কি না। ইচ্ছা ছিল বাইরে তো পুরোহিত আছেই. মনের ভিতরে সেই জায়গায় আর কোন প্রতিভূ জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করুক। সে বললে, "সন্তুষ্ট! কেউ এক জিনিস নিয়ে, অন্য কেউ আর কোন জিনিস নিয়ে তুষ্ট হয়। এমন লোক হয়তো আছে, জীবিকার্জনের তাগিদ না থাকলে আগুনের দিকে পিঠ আর জঠরের কাছে টেবিল নিয়ে সারাদিন বসে থেকে যে সন্তুষ্ট হ'ত।" হাজার রকমের চেষ্টা করেও আমি কোন দিন কোন বিষয়ের আধ্যাত্মিক দিকটা তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারি নি। সব চাইতে উঁচুতে কোন বিষয়ে ধারণা তার যা যেত, তা হচ্ছে মোটামুটি কি সুবিধা হবে কাজের দিক দিয়ে তাতে। যেমন ধরুন জীব-জন্তুর ধারণা। বাস্তবিক পক্ষে, অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটাই সত্যি। তার জীবনযাত্রার প্রণালীর উন্নতিসাধনের জন্য কিছুর উল্লেখ করলে কোন দুঃখ প্রকাশ না করে, শুধু উত্তর দিত, আর সময় নেই। কিন্তু সততা বা ঐ রকম সব গুণে তার বিশ্বাস অটুট ছিল।

সামান্য হলেও তার মধ্যে সুনিশ্চিত প্রকৃত মৌলিকত্বের সন্ধান পেয়েছি। মধ্যে মধ্যে লক্ষ্যে পড়েছে, নিজে চিন্তা করে নিজের মতামত প্রকাশ করছে। ঘটনাটি এমন অসাধারণ যে এর কোন পরিচয় পেতে আমি যে কোন দিন দশ মাইল হেঁটে যেতে রাজী আছি। ফলে, সমাজের অনেক কিছুর আদিবৃত্ত সম্বন্ধে আমার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। ইতস্ততঃ করত এবং হয়তো

স্পষ্ট ভাবে নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে পারত না, কিন্তু সব সময়েই তার মনে প্রকাশযোগ্য চিন্তা একটা থাকতই। তবে তার চিন্তাধারা এমন অমার্জিত এবং স্বীয় জান্তব জীবনকেন্দ্রিক ছিল যে, বিম্বান ব্যক্তির চিন্তা অপেক্ষা তার মধ্যে সম্ভাবনা বেশি থাকা সত্ত্বেও, কদাচিৎ তা গ্রহণযোগ্য কোন রূপে পরিণতি লাভ করত। তাকে দেখে বোঝা যায়, জীবনের নিম্নতম স্তরেও প্রতিভাবান মানুষ থাকতে পারে, চিরক্ষুদ্র আর নিরক্ষর হ'লেও তাদের নিজেদের একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, অন্যথায় কোন কিছু দেখবার ভান করে না তারা। ওয়ালডেন পন্ডকে একদা যেমন বিবেচনা করা হ'ত, এরা সেইরকম অতলস্পর্শী, অন্ধকার কিংবা কর্দমময় হ'তে পারে।

পথ থেকে অনেক দূরে হলেও, অনেক পথচারী আমার আস্তানার অন্দরমহল তথা আমাকে দেখতে আসতেন। কেন এসেছেন কৈফিয়ত দিতে এক গ্লাস জল চাইতেন। পুকুরের জল পান করি বলে পুকুরটা দেখিয়ে দিতাম, একটা ঘটিও দিতে চাইতাম। অনেকটা দূরে থাকলেও বাৎসরিক পরিদর্শনপর্ব থেকে মুক্তি ছিল না আমার। বোধ হয় পয়লা এপ্রিলের কাছাকাছি ব্যাপারটির ঘটনাকাল। সকলেই তখন এখান থেকে ওখানে যায়। সুতরাং আমারও ভাগ্যানুযায়ী ভাগ মিলত। কিন্তু অতিথিদের মধ্যে অদ্ভুত কয়েকটি জীব জুটে যেত। আতুরাশ্রম কি ঐ রকম সব স্থান থেকে অর্ধোন্মাদ জনকয়েক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমার চেষ্টা ছিল, এদের যেটুকু বুদ্ধি তাই আস্তে আস্তে কাজে লাগিয়ে তাদের সম্বন্ধে সত্য ঘটনা জানার। কথায় বার্তায় আলোচনাকে বুদ্ধির দিকে টেনে নিয়ে যেতাম, চেষ্টা সার্থকও হ'ত। এমন কি দেখেছিলাম যে, গরিবদের তথাকথিত ওভারসিয়ার কি শহরের বাছা বাছা লোকদের চাইতে তাদের বুদ্ধি বেশি। মনে হ'ত যে পরস্পরের অবস্থা পাল্টাবার সময় হয়েছে। বুদ্ধির দিক দিয়ে একটা জ্ঞানলাভ হয়েছিল এই যে, বুঝেছিলাম অর্ধ-বুদ্ধি আর পূর্ণ-বুদ্ধি লোকের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই। একটা বিশেষ ঘটনা মনে আছে। দেখতাম নিরীহ, মোটা-বুদ্ধি নিতান্ত দরিদ্র এক ব্যক্তি অপর অনেকের সঙ্গে বেড়া রক্ষার কাজে নিযুক্ত, কিংবা মাঠের মধ্যে ধান মাপার পালির উপর দাঁড়িয়ে কি বসে গরু মোষ যাতে না ঢুকতে পারে, তার আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও রক্ষণাবেক্ষণ করছে। আমার কাছে একদিন এসে ইচ্ছা জানালে আমার মতো জীবন যাপন করতে চায়। যতদূর সম্ভব সরল আর আন্তরিক অর্থাৎ যাকে বিনয় বলা হয় তার চাইতে একটু উপরের ধাপের, না, বরং নীচের ধাপের মনোভাবের সঙ্গে আমাকে বললে যে, তার "বুদ্ধিটা একটু কম।" কথাগুলো ঠিক এই। ভগবান তাকে এমনি করেছেন, কিন্তু তবু তার মনে হয় তিনি অন্যের যতখানি, তারও ততখানি ভাল চান। বললে, "ছোটবেলা থেকেই আমি এই

রকম: বিশেষ বুদ্ধির বালাই আমার ছিল না; অন্য ছেলেদের মতো ছিলাম না; মাথাটা একটু কম দরের। ভগবানের তাই ইচ্ছা, বোধ হয়।” তার কথা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তার প্রমাণ হিসাবেই যেন সে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে আমার কাছে আধিবিদ্যক প্রহেলিকা স্বরূপ। আর কোন মানুষকে এই উন্নত মার্গের কাছাকাছি দেখেছি কি না সন্দেহ।—যে সব কথা বলেছে সে, একেবারে সহজ -সরল সত্য। আমার সত্যি মনে হ'ত যে সে নিজেকে যত ছোট করছে, যেন সেই অনুপাতে উঁচুতে উঠছে। প্রথমটায় বুঝতে পারি নি যে পিছনে মহৎ প্রেরণা কাজ করছে। মনে হ'ত যে, ঐ দুর্বলমস্তিষ্ক হত-দরিদ্র ব্যক্তির সত্যবোধ ও স্পষ্ট ভাষণের ভিত্তিতে আমাদের পরস্পরের ভাব-বিনিময় উন্নতি লাভ করতে পারে, মুনি-ঋষির ভাব বিনিময়ের চাইতে উৎকৃষ্টতর হ'তে পারে।

আরও জনকয়েক অতিথি এসেছিল আমার কাছে। সাধারণ ভাবে শহরের দরিদ্র ব্যক্তি বলে গণ্য যারা হয় না (কিন্তু হওয়া উচিত), তাদের মধ্য থেকে এসেছিল এরা। দুনিয়ার দরিদ্রদের মধ্যে এরাও পড়ে। অতিথিপরায়ণ আপনার নয়, আপনার আতুরপরায়ণ দৃষ্টিই এরা আকর্ষণ করবে। সাহায্য-লাভের ইচ্ছা এদের ঐকান্তিক। আবেদনের ভূমিকায় সংবাদ দিয়ে রাখে যে, প্রথম কথাটা হচ্ছে, এরা নিজেদের সাহায্য নিজেরা না করতে দৃঢ়মনস্থ। অতিথি অনশন করুন, এ কেউ চায় না। ভোজন-সামর্থ্য তাঁর সমধিক হতে পারে। কেউ সন্ধান চায় না কি ভাবে সেটা লাভ হয়েছে। অতিথি দয়াদাক্ষিণ্যের পাত্র নয়। যে প্রয়োজনে এসেছিলেন সাঙ্গ হয়েছে, তবে যেতে চান না। আমি আমার নিজের কাজে মন দিয়েছি আবার, আর তার কথার উত্তরে নির্লিপ্ততার ভাব ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তবুও। এই দেশান্তর হবার সময়টাতে আমার কাছে বিভিন্ন, প্রায় সকল স্তরের লোকজন এসেছে। কারও কারও বুদ্ধি এত বেশি যে, তা দিয়ে কি করবেন জানেন না। ক্রীতদাস পালিয়ে এসেছে, হাবে ভাবে তা ফুটে ওঠে। থাকে থাকে আর কান পেতে শোনে, যেমন পিছু-ধাওয়া কুকুরের দলের চিৎকার শুনলে গল্পের খেঁক-শিয়াল করে। আর আমার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চায়, যেন বলতে চায় :—

“হে খ্রীস্টান-ধুরন্ধর, আমাকে কি ফিরাইয়া দিবে?”

অনেকের মধ্যে একজন ছিল খাঁটি পলাতক ক্রীতদাস। তাকে উত্তর গোলার্ধে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করে প্রস্থানে সাহায্য করেছিলাম। একটি মাত্র ছানা (তাও আবার হাঁসের, নিজের নয়) থাকলে মুরগি যেমন করে, তেমনি একটি মাত্র চিন্তায় ব্যাপৃত ব্যক্তি ছিল কেউ কেউ। হাজারটা চিন্তা নিয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তি অবিন্যস্ত-কেশ কেউ কেউ—যে সব মুরগিকে একশটা ছানা পালতে

দেওয়া হয় তাদের মতো। সবাই একটা পোকার পিছু ধাওয়া করেছে, গোটা কুড়ি সকালের হিমে হারিয়ে যাচ্ছে, উস্‌কোখুস্‌কো আর যতদূর সম্ভব নোংরা হচ্ছে। চিন্তাশক্তি আছে অথচ চলচ্ছক্তি বিহীন ব্যক্তি কেউ, বুদ্ধি-ধুরন্ধর কিন্তু কেন্নোর মতো, দেখলে সারা গা শিরশির করে। এক ব্যক্তি বুদ্ধি দিলেন একটা খাতা রাখতে, যারা আসবে নাম লিখে যাবে, যেমন হোয়াইট মাউণ্টেনে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমার যে স্মৃতিশক্তি ভাল, তার প্রয়োজন মনে করি নি।

আমার অতিথিদের বিশেষত্ব লক্ষ্য না করে পারতাম না। বালক বালিকা, যুবতী মেয়েদের যেন ভাল লাগত বনের মধ্যে। তারা পুষ্করিণীর আর ফুলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত, ভালই কাটাত সময়। ব্যবসায়ী লোক, এমন কি চাষীরাও, শুধু নিঃসঙ্গতা আর কাজের কথা তুলত, লোকালয় কি সব কিছু থেকে কত বেশী দূরে এসে বাস করছি সে কথাও পাড়ত। মুখে বলতে শুনতাম বটে তাদের যে, বনে এসে মধ্যে মধ্যে বেড়ানো তারা পছন্দ করে, কিন্তু বেশ বোঝা যেত যে তা করে না তারা। অস্থির ভূত-গ্রস্ত লোক সব, জীবিকার্জনে কি জীবিকার্জন ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ত ব্যস্ত তারা; ধর্ম-যাজক সব, ভগবানের কথা বলছেন—যেন সে বিষয়ে তাঁদেরই একচেটিয়া এক্তিয়ার, আর কারও মতামত সইতে পারেন না; ডাক্তার, উকিল, অল্পে-উতলা গিন্নীরা সব, যাঁরা আমার অনুপস্থিতিতে আলমারি বিছানা উল্টে-পাল্টে দেখতেন—শ্রীমতী জানেন কি করে যে আমার বিছানার চাদর তাঁর চাইতে পরিষ্কার নয়; যারা তরুণ বয়সের হলেও আর তরুণ নেই, যারা স্থির জেনেছে যে চিরাচরিত পেশার পথ ধরে চলাই সব চাইতে নিরাপদ—এরা সব সময়েই বলেছে, আমার মতো অবস্থায় থেকে বিশেষ কোন উপকার করা সম্ভব নয়। ব্যাধি তো ঐ জায়গাটিতেই। বৃদ্ধ, অক্ষম, কাপুরুষ সব, সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষ সকলেই সব সময়ে ভাবছে অসুখ-বিসুখ, আকস্মিক দুর্ঘটনা আর মৃত্যুর কথা। তাদের কাছে জীবন সংকটময়—যদি সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা যায়, তবে সংকট কোথায়? কিন্তু তাদের মতে সুবিবেচক ব্যক্তি খুব হুঁশিয়ার হয়ে একটা সব চাইতে নিরাপদ স্থান বেছে নেবে, যেখানে ডাক্তার বি-কে এক সেকেণ্ডের মধ্যে হাতের কাছেই পাওয়া যাবে। তাদের কাছে গ্রাম মানেই অক্ষরে অক্ষরে গা-আরাম, পরস্পর-রক্ষী দল। ধরে নিতে পার যে, ওষুধ ভর্তি বাক্স না নিয়ে তারা হৈ-হল্লার মধ্যে যাবে না। আসল কথাটা এই যে, যতদিন মানুষের জীবন, ততদিনই তার মৃত্যুর আশংকা আছে। কিন্তু সেই আশংকার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করছে গোড়া থেকে কে কতটা জ্যান্ত কি মরে আছে তার উপর। দৌড়তে গিয়েও মানুষের যত বিপদ, বসতে গেলেও তাই! সর্বশেষে আছেন সেই

আপনি-মোড়ল সংস্কারকের দল সব চাইতে যাঁরা বিরক্তিজনক। তাঁরা মনে করেন যে, অনুক্ষণ আমি গাইছি—

আমারই হাতে গড়া এই বাসাখানি,
আমিই বিরাজি হেথা, আমিই বাখানি,

কিন্তু তাঁদের জানা নেই যে এর পরের লাইনেই আছে—

এঁরাই অনুক্ষণ করেন জ্বালাতন
আমারই গড়া ঘরে আমারে অকারণ।

আমার মুরগি-মারদের ভয় ছিল না, কারণ মুরগি আমি পুষি নে। কিন্তু মানুষ-মারদের খানিকটা ভয় করতে হয় বই কি।

গতবার যে অতিথিরা এসেছিলেন, তাঁদের চাইতে ভাল লাগল এবারে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের। ছেলেরা বেরি কুড়োতে, রেলরাস্তার লোকেরা পরিষ্কার কামিজ পরে রবিবারের সকাল কাটাতে; জেলে, শিকারী, কবি, দার্শনিক; সংক্ষেপে পুণ্য তীর্থযাত্রী সবাই, যাঁরা গ্রামকে সত্যই পিছনে রেখে এসেছিলেন বনের মধ্যে, স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে। এঁদের সংবর্ধনার জন্য প্রস্তুতও ছিলাম আমি—"সুস্বাগতম হে ইংরেজ, সুস্বাগতম."—ইংরেজ জাতের সঙ্গে পত্র বিনিময় হয়েছিল আমার।

॥ ৭ ॥ বিন-ক্ষেত

ইতিমধ্যে আমার বিনগুলো যেন ছটফট করে উঠেছে, আগাছা সাফ করতে হবে তাদের। একত্র যোগ করলে লম্বায় সারগুলো সাতমাইলটাক গিয়ে দাঁড়াবে। সব প্রথম যেগুলো পোঁতা হয় শেষের গুলো পোঁতার আগেই তারা বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। এমন যে সহজে ঠেকিয়ে রাখা যায় না আর তাদের। একনিষ্ঠ ভাবে এই আত্মসম্মান রক্ষার সামান্য কিন্তু হারকিউলিসোচিত কাজের অর্থ কি, আমার জানা নেই। যা চেয়েছিলাম, তার চাইতে ঢের বেশি হলেও বিনগুলোকে আর তাদের সারগুলোকে আমি ভালবাসতে সুরু করেছিলাম। আমাকে মাটির মায়ায় বাঁধে তারা, এন্টিয়ুসের মতো বল দিত। তাদের খাড়া করতে গেলাম কেন ? কেবল ভগবান জানেন তা। সারা গ্রীষ্মকালটা ধরে অদ্ভুত খাটুনি খাটতে হয় আমাকে এজন্য। আগে যেখানে শুধু কিংক-ফয়েল, ব্ল্যাকবেরি, জনসোয়ার্ট আর ঐ জাতের সব গাছ, পরে মিষ্টি বুনোফল আর বাহারে ফুল গজাত, তার বদলে সেই মৃত্তিকাবক্ষে দানার জন্ম দিতে গিয়ে এই খাটুনি আমাকে খাটতে হয়। বিন থেকে আমার কিংবা আমার থেকে বিনের কি শিক্ষালাভ হবে? আমি তাদের লালন করছি, আগাছা সাফ করছি, সকাল সন্ধ্যা তাদের খবরদারি করছি। সারাদিন আমার শুধু এই কাজ। বেশ চওড়া পাতাগুলো, দেখতে ভাল লাগে। আমার যোগানদার হ'ল শিশির আর বৃষ্টি, এই শুকনো মাটিকে তারা সরস রাখে আর মাটির নিজস্ব যে উর্বরতা তাকেও, বেশিটাই তার ঊষর আর বন্ধ্যা। আমার দুষমন হ'ল পোকামাকড়, ঠাণ্ডার দিন আর সর্বোপরি উডচাক গুলো। শেষোক্তটি দাঁতে কুটে আমার প্রায় সিকিটাক একর ক্ষেত সাবড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমারই বা কি অধিকার ছিল জনসোয়ার্ট আর বাকি সব গাছকে উদ্বাস্তু করার, তাদের সনাতন সবজিবাগের উচ্ছেদ সাধন করার ? যাই হ'ক, বাকি বিনগুলো অচিরাৎ ওদের পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে, নতুন শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে তাদের তখন।

আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন চার বছরের মাত্র, বস্টন থেকে তখন আমার এই স্বগ্রামে আনা হয় আমাকে, ঠিক এই সব বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে

এই জলাশয়ে। আর সেই জলাশয়েই আমার বাঁশী আজ প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলছে। আজও এই যে পাইন গাছগুলো খাড়া হয়ে আছে, আমার চাইতে বড় এরা। আর, কোন কোনটা যদি পড়ে গিয়ে থাকে, তাদের গোড়াগুলো দিয়ে আমি আমার রাত্রির খাবার পাক করেছি। নতুন সব গাছ চারদিকে গজিয়ে উঠছে, নতুন সব শিশুর জন্য অন্য রকম দৃশ্য রচনা চলেছে। সেই এক অক্ষয় মূল থেকে প্রায় একই জনসোয়র্ট অংকুরিত হয়ে আসছে এই চারণভূমিতে। আমিও শেষ পর্যন্ত আমার শৈশবস্বপ্নের রূপকথার এই দৃশ্যচিত্রসজ্জায় সাহায্য করেছি। এই বিনগুলোর পাতায়, শস্যের শীষ আর আলুর লতাপাতায় আমার অস্তিত্ব আর ক্ষমতার একটা পরিচয় চোখে পড়ছে।

প্রায় আড়াই একর পরিমাণ উঁচুজমিতে আমি বিন লাগিয়েছিলাম। এ হবে জমিটার জংগল যখন প্রথম সাফ হয়, তার মোটে পনের বছর পরের কথা। আমি নিজেই প্রায় দু'তিন গোছা গাছের গোড়া পাই, তাই জমিটায় কোন সার দিই নি। সেই গ্রীষ্মকালেই কোদাল দিয়ে মাটি উলটোতে গিয়ে যে সব তীরের ফলার টুকরো টাকরা পাই, তা থেকে প্রমাণ হয় শ্বেতকায় জাতিরা এখানে এসে জংগল পরিষ্কার করার আগেই লুপ্ত কোন জাতি প্রাচীন কালে সেখানে বসবাস করত, বিন আর অন্য শস্যও চাষ করত তারা। সুতরাং সেই পরিমাণে জমিটার এই ফসল ফলাবার ক্ষমতাও কমায় তারা।

উডচাক কি কাঠবিড়ালরা পথে বার হবার আগে, অর্থাৎ সূর্য কচি কচি ওকের ঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে ওঠবার আগেই শিশির না মিলিয়ে যাবারও আগে, আমার বিনক্ষেতের আগাছার খাড়া মাথা ন্যাড়া করে একাকার করতে আর সেই মাথায় ধুলো ঢালতে সুরু করে দিতাম। আমি পরামর্শ দিই আপনাদের শিশির না মিলিয়ে যাবার আগেই সব কাজ করে ফেলতে, চাষীরা যদিও আমাকে সতর্ক করে দেয় তা না করতে। মৃৎশিল্পী যেমন শিশিরভেজা গুঁড়োবালি দিয়ে হাত পাকায়, খুব সকাল থাকতেই খালি পায়ে আমি কাজে নেমে পড়তাম। কিন্তু বেলা বাড়লে রোদ লেগে পায়ে ফোস্কা পড়ত। হলদেটে কাঁকরময় উঁচুজমি, তার সামনে থেকে পিছনে আস্তে আস্তে এগিয়ে সূর্য আমাকে বিনের আগাছা সাফ করবার আলো যুগিয়েছে সেখানে, প্রায় আধ মাইল লম্বা শ্যামল সারির মধ্যে, একটা দিক কচি ওকঝাড়ের জংগলে শেষ হয়েছে, জুড়োবার ছায়া পেতাম সেখানে; অন্য দিকটা ব্ল্যাকবেরির মাঠে, আমার দ্বিতীয় পাড়ি সাঙ্গ করে সেখানে গিয়ে উঠবার আগেই কাঁচা বেরিগুলোর রঙে পাক ধরতে সুরু করত। আমার দৈনন্দিন কাজ ছিল—অন্য সব আগাছা উপড়ে ফেলে, আমি যে আগাছাটা পুঁতেছিলাম সেই বিনের গোড়ায় নতুন মাটি ঢেলে তাকে ভরসা দেওয়া, হলদেটে মাটিটা যাতে ওয়র্মউড,

পাইপার আর মিলেট তৃণ ছেড়ে বিনের পাতা আর কুঁড়ির মধ্যে নিজের নিদাঘস্বপ্নকে রূপায়িত করে তার সাহায্য করা আর মাটিকে তৃণের বদলে বিনের ভাবে ভাবিত করা। ঘোড়াগরু, ছোকরা কি উন্নত যন্ত্রপাতি, কিছুর সাহায্য নিই নি আমি। আমার কাজে সময় লাগত, সেই জন্যই সাধারণত যা দেখা যায় তার চাইতে বিনদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তাও অনেক বেশী হয়। একেবারে গোলামের মতো করে গেলেও কায়িক পরিশ্রমের কাজ কখনই হয়তো নিকৃষ্ট কুড়েমির পর্যায়ে পড়ে না—একটা শাশ্বত শিক্ষার দিক আছে এর, বিদ্যার্থীর কাছে তার ফল চিরায়ত। লিংকন আর ওয়েল্যান্ড হয়ে পশ্চিমমুখো যে-সব যাত্রী কে জানে কোথায় ছুটছে তাদের কাছে আমি নিতান্তই চাষাভুষো; হাঁটুর উপর কনুই ঠেকিয়ে আরামে বসে আছে এক্কাগাড়িতে, আর ফুলের মালার মতো আলগোছে ঝুলে আছে লাগাম, আমি গেঁয়ো লোক, মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি। তাদের চোখের আর মনের আড়াল হতে দেরি লাগত না আমার আস্তানার। ফাঁকা চষাজমি বলতে রাস্তার দুইধারে অনেকটা জায়গার মধ্যে শুধু আমার ক্ষেত-টাই, তাই এটাকে নিয়ে তারা বেশ মাথা ঘামাত। মধ্যে মধ্যে মাঠের লোক পথের লোকদের কথাবার্তা শুনতে পেত, যেসব কথা তার শুনবার নয় সে-সব কথাও, "এত দেরিতে বিন! এ সময়ে মটরশুঁটি!" কিন্তু কেতাদুরস্ত কৃষিজীবীর জানবার কথা নয় যে অন্য লোক যখন চারা আগলাচ্ছে, তখন পর্যন্ত আমার বীজরোপণ চলেছে। গরু-ঘোড়ার দানা হবে হে, গরুঘোড়া খাবে।" ছাইরঙা কোট আর কালটুপিপরা ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওখানে বুঝি থাকে লোকটা?" জবরদস্ত গোছের গেরস্থ চাষী একজন তাঁর বেতোঘোড়ার রাশ টেনে সেটাকে থামিয়ে—ঘোড়াটা খুশি হ'ল—জানতে চাইলেন, জমিতে সারের চিহ্নও নজরে পড়ছে না তাঁর, এখানে আবার কেমন কাজ হচ্ছে। খানিকটা করাতগুঁড়ো, কি আবর্জনা, কি ছাইপাশ, কি পলেস্তারা হলেও চলে—ব্যবহার করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু চাষ হচ্ছে আড়াই একর জমি, হাতগাড়ি বলতে এই কোদাল আর গাড়ি টানার জন্য এই একজোড়া হাত,—অন্য গাড়িঘোড়া ব্যবহার করতে মন চাইত না—করাতগুঁড়ো সেই কত দূরে। দলবল মিলে খটর খটর করে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে এ জমির সঙ্গে অন্য যেসব জমি পথে আসতে পড়েছে, সেগুলোর তুলনা করত চেঁচিয়ে, সুতরাং আমার জানতে বাকি থাকত না, কৃষিজগতে আমার কোথায় ঠাঁই। এমন একটা জমি আমার যে শ্রীযুক্ত কোলম্যানের রিপোর্টেও তার ঠাঁই হয় নি। তবে একথাও বলি যে মানুষে উন্নতি সাধন করে নি এমন জংলা জমি তো কতই রয়েছে, প্রকৃতি সেখানে যে ফসল ফলায়, তার মূল্যের হিসাব করে কে? ইংলন্ডমার্কা।বচ।।লশস৷

সযত্নে ওজন হ'ল, তার আর্দ্রতার হিসাব হ'ল, তার সিলিকেটের, তার পটাশের। কিন্তু মাঠে মাঠে, খাল বিলের খোঁদড়ে, বনে জঙ্গলে, জলায় যে অপর্যাপ্ত আর রকমারি ফসল গজায়, তা মানুষে পোঁতে না। প্রকৃতির সেই খাসমহল আর মানুষের তৈরি জমির মধ্যে আমার এই জমিটা যেন মিলনসূত্র। যেমন কতকগুলো রাষ্ট্র সভ্য হয়, কতকগুলো অর্ধসভ্য হয়, আরও কতকগুলো অসভ্য অর্থাৎ অমার্জিত থাকে, সেই রকম আমার জমিটাও অর্ধসভ্য। খারাপ অর্থে নয় কিন্তু। আমার লাগানো বিনগুলো যেন খুশি হয়েই ফিরে যাচ্ছে তাদের আদিম বন্য অবস্থায় আর আমার কোদালে তাদের হয়ে সুর তুলছে, "চাষ করি আনন্দে"।

অতি কাছেই, বার্চ গাছের মগডালে একটা ব্রাউন থ্র্যাশার গান করে চলেছে—কেউ কেউ রেড ম্যাভিস নামটা পছন্দ করেন। সারা সকাল ধরে লোক কাছে পেয়ে খুশি সে। এখানে এ জমিটা না থাকলে আর কোন চাষীর জমি খুঁজে বার করত। যখন বীজ ছড়ানো হচ্ছে, তখন সুর ধরবে, "ফেল তো ফেল, ঢাক তো ঢাক, ওপড়াবে তো ওপড়াও।" কিন্তু তার খাবার নয় বলেই তার মতো দুষমনের কাছে এর বাঁচোয়া। জানতে সাধ হয়, যা আলাপ করছে ও, ঐ শখের পাগানিনি তার এক কি বিশটা তারে সুর খেলিয়ে, কি সম্পর্ক তার এই বীজ পোঁতার সঙ্গে। কিন্তু তবু ভাল লাগে তা ছাইগাদা আর পলেস্তারার পরামর্শের তুলনায়। কম খরচে মাটি তৈরির এই বহিরঙ্গ পদ্ধতির উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

অজ্ঞাত-ইতিহাস যেসব জাতি অতি পুরাকালে এই আকাশখণ্ডের নিচে বসবাস করে গেছে, কোদাল দিয়ে আমার বিনের সারের চারপাশে আরও নতুন মাটি খুঁড়তে গিয়ে তাদের ধ্বংসাবশেষে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম, লড়াই আর শিকার করার জন্য তারা যে ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত, বর্তমান কালের দিবালোকে তাদের টেনে বার করলাম। প্রাকৃতিক সব প্রস্তরের সঙ্গে মিলে মিশে ছিল সেগুলো, কতকগুলোয় ইন্ডিয়ানদের আগুনে, আর কতকগুলোয় রোদে পোড়ার চিহ্ন পাওয়া গেল; কাঁচ আর মাটির বাসনের টুকরোও ছিল, এই মাটিতে সম্প্রতি যারা চাষবাস করে গেছে তারা আনে সেগুলো এখানে। আমার কোদালের ঘায়ে পাথরগুলো ঠং ঠং করে বাজতে থাকত, তার সুর বনে বনে আকাশে প্রতিধ্বনি তুলত, যেন আমার কাজের সঙ্গে সঙ্গত করছে, ফলে হাতে হাতে প্রচুর ফসল পেতাম। বিনগুলো আর আমার চাষকরা বিন থাকত না তখন, না থাকতাম আমি সেই যে সেগুলো চাষ করেছে। যদি কিছু মনে থাকত তো সে আমার চেনা-পরিচিত যারা বক্তৃতা শুনতে শহরে গেছে তাদের কথা, মনে পড়ে যত দুঃখ তত গর্ব বোধ করতাম। বাজপাখিগুলো রৌদ্র মাখানো বিকালটিতে আমার মাথার ঠিক উপরটিতে ঘুরে ঘুরে

উড়ছে—এক একদিন ছুটি করে নিতাম আমি—চোখের বালির মতো লাগছে তাদের, বুঝি বা আকাশের চোখের; মধ্যে মধ্যে ছোঁ দিয়ে নামছে ডানা ঝটপট করতে করতে, আকাশটা যেন ফুটো হয়ে গেছে, একেবারে ছেঁড়া ন্যাকড়া হয়ে গেল শেষটায়, শুধু বাকি রয়ে গেল আস্তসমস্ত আলখাল্লাটা। পাজির পাঝাড়া সব, উড়ে বেড়াবার বেলায় আকাশ, ডিম পাড়বার বেলায় মাটি, খালি বালুচরে কি পাহাড়ের চূড়োয় পাথরের আড়ালে, কেউ সেখানে খুঁজে পায় না সেগুলো। জলাশয়ের বুকে জাগানো তরঙ্গভঙ্গের মতো লাবণ্যময় ক্ষীণতনু হাওয়া যেমন উড়িয়ে আকাশে ভাসিয়ে দেয় পাতাগুলো। এমনি আত্মীয়তা-বোধ প্রকৃতির। বাজপাখি ঢেউয়ের আসমানী ভাই, তাই খবরদারি করতে পাখা মেলে ভেসে বেড়ায় তার উপর। ঐ যে নিটোল হাওয়া ভরা ডানা তার, ও তো সমুদ্রেরই না-মেলা মৌল-ডানার জুড়ি। এক এক সময়ে হয়তো একজোড়া মাদীবাজকে আকাশে অনেক উঁচুতে ঘুরে ঘুরে উড়তে দেখলাম, একটা উঠছে তো অন্যটা নামছে, পরস্পর কাছে আসছে, দূরে যাচ্ছে, যেন আমারই ভাবনার দেহরূপ ওরা। কখনও বা বন-পায়রাদের এ বন থেকে ও বনে উড়ে যাওয়া চোখে পড়ত, খানিকটা শিহরণ, হাওয়ার আওয়াজ আর খবর-বরদারের ঝটপট ভাব। অথবা কোন পচাগাছের গোড়া থেকে আমার কোদালের মুখে বার হ'ল একটা অথর্ব, বিরাট বিজাতীয় চিত্রবিচিত্র গিরগিটি, এক টুকরো মিশর আর নীল নদী, কিন্তু আমাদের সমকালীন। কাজ থামিয়ে কোদাল ঠেস দিয়ে একটু দাঁড়িয়েছি কি মাঠের যেখান সেখান থেকে এই সব শব্দ কানে এসেছে আর রূপ চোখে পড়েছে—দেশের বুকে যে অফুরন্ত আমোদ ব্যবস্থা রয়েছে এ তো তার একটুখানি মাত্র।

উৎসবের দিনে শহর থেকে কামানের আওয়াজ করা হয়। বনের মধ্যে পিস্তল ছোড়ার মতো প্রতিধ্বনি তোলে সে আওয়াজ। মধ্যে মধ্যে হয়তো সমরসঙ্গীতের কয়েকটা ছাড়াছাড়া সুর এত দূর পর্যন্তও আসে। শহরের এক প্রান্তে সেই বিন-ক্ষেতে আমার কাছে কামানের যে আওয়াজ আসত, মনে হ'ত যেন হাওয়াভরা বেলুন ফাটছে। আমি খবর পাই নি এমন কোন সাম-রিক অনুষ্ঠান হ'ত যখন, আমার কেমন সারাদিন ধরে আবছা আবছা মনে জাগত দিগন্ত জুড়ে চুলকানি কি ঐ ধরনের কোন অসুখের কথা, এখুনি যেন ফুসকুড়ি বেরোবে সেখানে, হয় মসূরিকা নয় আমবাত। তারপর দমকা অনু-কূল হাওয়া ছুটতে ছুটতে ভেসে আসত মাঠ পেরিয়ে ওয়েল্যাণ্ডের রাস্তা বরাবর, খবর দিত সব 'শিক্ষাগুরুর'। দূর থেকে গুন গুন শব্দে মনে হ'ত যেন কারও মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে আর পড়শীরা ভার্জিলের পরামর্শ মতো তাদের ঘরকরনার বাসনকোসনে যেটায় শব্দাড়ম্বর বেশি, তার উপর ঠুন-ঠুন আওয়াজ করে তাদের মৌচাকে ফিরে ডাকবার চেষ্টা করছে। সে আওয়াজ

একেবারে মিলিয়ে যেত, গুনগুনের ক্ষান্তি হ'ত এবং অতি-অনুকূল হাওয়াতেও কোন খবর মিলত না যখন, তখন বুঝে নিতাম, মিডলসেক্সের মৌচাকে ওদের শেষ অকর্মণ্য লোকটাও ধরা পড়ল, এখন তার পাখায় যে মধু জড়িয়ে ছিল তাই নিয়ে পড়েছে ওরা।

মাসাচুসেট্স তথা আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতা এতখানি নিরাপদ হেফাজতে রয়েছে জেনে গর্ব হ'ত, আবার যখন কোদাল চালানোতে মন দিতাম, তখন অনির্বচনীয় ভরসায় মন আমার ভরপুর, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুদ্বেগ নির্ভরতা নিয়ে হৃষ্টচিত্তে নিজের কাজ করে চলেছি।

যখন কয়েক দল ব্যান্ড থাকত, তখন আওয়াজ হ'ত যেন সারা গাঁটাই বিপুল একটা হাপর আর বাড়িঘরগুলো মহাশব্দে একবার ফুলে উঠছে, আবার চুপসে যাচ্ছে। কিন্তু বনে মধ্যে মধ্যে যে সুর এসে পৌঁছত, তা সত্যই উদাত্ত আর উদ্দীপক—সে তূর্যধ্বনি যশোগাথা উদ্গাতা; মনে হ'ত তখন মেক্সিকোবাসীর উদ্দেশে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করতে পারলে সত্যই খুশি হব। —কেন, সব সময়ে সামান্য ব্যাপারে এত বাধ-বাধ ঠেকা কেন?—চারদিকে চেয়ে দেখে নিতাম উডচাক কি খট্টাস একটা পাওয়া যায় কি না, তাহ'লে তার উপর বীরত্বের মহড়াটা দেওয়া যায়। মনে হ'ত সমরসংগীতের এই সুর যেন সেই সুদূর প্যালেস্টাইন থেকে আসছে আর গ্রামের চারপাশ ঘেরা এলমগাছগুলোর মাথায় সামান্য আরোহ আর কম্পনে মনে হ'ত যেন দিগন্তে ক্রুসেডবাহিনী কুচকাওয়াজ করে চলেছে। অবিনশ্বর দিনগুলোর একটা দিন! কিন্তু সূর্যকে রোজ আমার আঙিনা থেকে যেমন শাশ্বত লাগে, তেমনই লেগেছিল সেদিন, কোন তফাত বুঝি নি।

বিন চাষ করতে করতে তাদের সংগে যে বিলম্বিত পরিচয় ঘটে আমার, অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা সে। এই পুঁতছি, এই আগাছা সাফ করছি, এই কাটছি, ঝাড়ছি, তুলছি, বেচছি—শেষের কাজটাই ছিল সব চেয়ে কঠিন—আর এর সংগে জুড়তে হয় আবার খাচ্ছিও, কেন না চেখে তো দেখেই ছিলাম। বিন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে দৃঢ়সংকল্প হই। তাদের বাড়ের সময়টায় ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর পর্যন্ত আগাছা সাফ করেছি তাদের, দিনের বাকি সময়টা অবশ্য অন্য কাজ করতে হয়েছে। কত রকম আগাছার সংগে কি অন্তরংগ আর অদ্ভুত রকমের জানাশোনাই না ঘটেছে বুঝুন; বারবার পরিশ্রমের তো কমতি ছিল না তাই বারবার করে ব্যাপারটা বলা সাজে। অতিনির্জীব বিন্যাস তাদের অতিনির্মম ভাবে বিধ্বস্ত করতে হয়েছে আর কোদাল সহযোগে কি সে বিদ্বেষজনক শ্রেণিবৈষম্য সাধন, এক শ্রেণীকে আদ্যোপান্ত মুড়ে দিতে হচ্ছে, অন্যকে সযত্নে লালন করা হচ্ছে। এটা রোমান ওয়র্মউড, সেটা পিগউইড, এটা সরেল, সেটা পাইপার গ্রাস,—এটাকে ওপড়াও, সেটাকে কাট-ছাঁট

কর, এটার শিকড়টা সূর্যের দিকে মেলে ধর, একটা আঁশও ছায়ায় ঢাকা পড়ে না যেন, তাহলেই অন্য দিকে লিকের মতো লিকলিক করে বেড়ে উঠবে। লম্বা লড়ায়ের ব্যাপার, সারসদের সঙ্গে নয়, আগাছাদের সঙ্গে। ট্রোজানদের মতোই এদেরও রোদ, বৃষ্টি, শিশির সবই স্বপক্ষে। প্রতিদিন বিনগুলো দেখেছে কোদাল হাতে তাদের উদ্ধারে আসছি আমি, তাদের শত্রুসংখ্যা হ্রাস করছি, খাদ ভরে তুলেছি মৃত আগাছা দিয়ে। ঝাঁক ঝাঁক সঙ্গীর মাথা ছাড়িয়ে পুরো এক ফুট উঁচুতে উঠলেও কত বীর্যবান শিরস্ত্রাণসঞ্চালক হেক্টরই না আমার অস্ত্রাঘাতে ভূপাতিত হয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়েছে।

সেই গ্রীষ্মকালটা, আমার সমসাময়িক কেউ কেউ যখন বস্টনে কি রোমে শিল্পকলায় মনোনিবেশ ক'রে, কেউ কেউ ভারতে ধ্যানধারণা ক'রে, আর অন্যেরা লণ্ডনে আর নিউ ইয়র্কে ব্যবসা ক'রে কাটিয়েছেন, আমি তখন নিউ ইংলণ্ডের অন্য সব চাষীর সঙ্গে এই ভাবে কৃষিচর্যা ক'রে কাটিয়েছি। এ নয় যে বিন ভক্ষণের সাধ মিটাতে বিন পুঁতেছিলাম, স্বভাবধর্মে আমি পিথাগোরাসের দলভুক্ত, অন্তত বিনের বিষয়ে—পরমান্ন আর ভোট যে রূপেই হ'ক। আমি বিনের বদলে চাল যোগাড় করতাম। কিন্তু হয়তো বা কাউকে মাঠে মাঠে কাজ করতেই হবে, আর কিছু না হ'ক, ভাষার অলংকার আর শ্রীবৃদ্ধির জন্য, ভবিষ্যতে কোন কথাশিল্পীর কাজে লাগতে পারে। মোটের উপর দুর্লভ আনন্দ লাভ করেছিলাম এ কাজে। একটু বেশি সময় চালিয়েছিলাম এই যা, নেশা দাঁড়িয়ে যেতে পারত। সার দিই নি আমি, কি একই সঙ্গে সবটা চাষও করি নি। তবু আমার দৌড় হিসাবে আমার আবাদ আশাতিরিক্ত ভাল উতরে যায়। শেষ পর্যন্ত তার মূল্যও পেয়েছি। এভলিন যা বলে গেছেন, "কোন সার কি প্রক্রিয়া যাই হ'ক, ক্রমাগত নাড়ানাড়ি, বদলাবদলি, আর কোদাল দিয়ে মাটি উলটানোর কাছে কিছু নয়।" অন্যত্র আবার লিখছেন, "মাটির, বিশেষ করে নতুন অবস্থায়, নিজস্ব একটা আকর্ষণী শক্তি থাকে, তাতেই আমাদের জীবনরক্ষার জন্য লবণ, শক্তি কি গুণ (যাই বলা যাক) সংগ্রহ করে, এর প্রাণ সঞ্চার তাই থেকে হয়। আমরা যে এর পিছনে এত পরিশ্রম করি, একে নাড়াচাড়া করি, সব কিছুর যৌক্তিকতা তো সেইখানেই। গোবর দেওয়া আর অন্যান্য সব নোংরা কাজ, সেই প্রাণ সংগ্রহের পরের কথা।" উপরন্তু এ জমিটা তো সেই "জরাগ্রস্ত মৃতপ্রায় পতিত অবসরপ্রাপ্ত" জমির একটা। হয়তো কোন দিন শূন্যমার্গ থেকে 'কর্মী আত্মা'দের আকৃষ্ট করে থাকবে—স্যর কেনেল্ম ডিগবি যা সম্ভব মনে করেন। বারো বুশেল বিন পেয়েছিলাম আমি।

অভিযোগ আছে, শ্রীযুক্ত কোলম্যান তাঁর রিপোর্টে প্রধানত ভদ্রলোক

কৃষকদের ব্যয়সাধ্য পরীক্ষারই উল্লেখ করেছেন। আমার খুঁটিনাটির হিসাব দিচ্ছি। আমার খরচ হয়,

কোদাল	...	০·৫৪	ডলার
লাঙল, মই চালানো, সারিসজ্জা	...	৭.৫০	”
বীজ	...	৩.১২½	”
আলু	...	১.৩৩	”
মটরশুঁটি	...	০.৪০	”
শালগমের বীজ	...	০.০৬	”
বেড়ায় সাদা পোঁচ	...	০.০২	”
ঘোড়াওয়ালা চাষী আর ছোকরা (তিন ঘণ্টার জন্য)	...	১.০০	”
ফসল টানার জন্য ঘোড়াগাড়ি	...	০.৭৫	”
মোট	...	১৪.৭২½	”

আমার আয় (ক্রেতা হবে গৃহস্থ, বিক্রেতা নয়) দাঁড়ায়,

নয় বুশেল বারো কোয়ার্ট বিন বিক্রয়	...	১৬.৯৪	ডলার
পাঁচ বুশেল বড় আলু	... ...	২.৫০	”
নয় বুশেল ছোট আলু	... ...	২.২৫	”
ঘাস	... ...	১.০০	”
ডাঁটা	... ...	০.৭৫	”
মোট	...	২৩.৪৪	ডলার

আর্থিক লাভ হয়, অন্যত্র যা উল্লেখ করেছি ৮·৭১½ ডলার।

বিনের চাষে আমার অভিজ্ঞতার ফল এই : পয়লা জুন নাগাদ বীজ পুঁততে হবে—ছোট সাদা বিন যা সর্বত্র মেলে। এক সারি আর অপর সারির মধ্যে দূরত্ব থাকবে তিনফুট, গাছগুলো আঠার ইঞ্চি অন্তর। বীজ বাছবার সময়, সেগুলো যেন টাটকা আর গোল হয়, কোন মেশাল না থাকে, এ বিষয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে। প্রথম থেকেই খেয়াল রাখতে হবে পোকামাকড় না থাকে। জায়গা খালি থাকলে নতুন করে বীজ লাগাতে হবে সেখানে। তারপর জমিটা যদি খালি জায়গা হয়, উডচাক সম্বন্ধে হুঁশিয়ার, তারা প্রথম যেই কচিপাতা দেখা দেবে, যাবে আসবে আর সে গুলো দাঁতে কুটে সাফ করে দেবে। আবার যখন কচি শুঁড় বার হবে লতায়, তখন ঠিক খবর রাখবে, আর এসে কাঠবিড়ালের মতো বসে কুঁড়ি-শুঁটি সমেত সাবড়ে দেবে। কিন্তু সর্বোপরি,

হিম থেকে বাঁচতে হ'লে আর বিক্রির উপযুক্ত ভাল ফসল পেতে হ'লে যত শীঘ্র সম্ভব তুলে ফেলতে হবে সব। এই রকম করলে অনেক লোকসানের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

আরও এক অভিজ্ঞতা লাভ হয় আমার : মনস্থ করলাম, আগামী গ্রীষ্মে আর এত মেহনত করে বিন কি শস্য চাষ করব না। শুধু দেখব নষ্ট যদি না হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আর কয়েকটা বীজ যেমন অকপটতা, সত্যনিষ্ঠা, সারল্য, শ্রদ্ধা, অপাপবিদ্ধতা আর এই ধরনের বীজ এই জমিতেই কম মেহনতে আর অল্প সারে গজায় কি না, আমাকে রক্ষা করতে পারে কি না তারা। এই ফসলের সঙ্গেই নিশ্চয় ফুরিয়ে যায় নি সব। এই রকম মনস্থ করেছিলাম বটে, কিন্তু তারপর হায় রে, একটা গ্রীষ্ম তো কেটেছেই, আরও একটা, এবং আরও একটা কাটল. আজ আপনাকে বলতে হচ্ছে, পাঠক, ঐ যে সব বীজ পুঁতেছিলাম, সেগুলো বাস্তবিক ঐ সব গুণের বীজ থেকে থাকে যদি, সব পোকায় খাওয়া ছিল, অথবা হারিয়েছিল জীবনী শক্তি, সুতরাং মাটি ফুঁড়ে বেরোতে পারে নি। পূর্বপুরুষ নির্ভয় কি ভীরু যা হয়, সাধারণ মানুষও সেই অনুযায়ী নির্ভয় কি ভীরু হয়। কয়েক শতাব্দী আগে ইন্ডিয়ানরা যে পদ্ধতিতে চাষ করত আর যে পদ্ধতিতে প্রথম ঔপনিবেশিকদের তারা হাতেখড়ি দিয়েছিল, আজকেও মানুষ ঠিক সেই ভাবে প্রতি বৎসর শস্য আর বিন চাষ আবাদ করে চলবে নিশ্চয়—এই যেন নিয়তি। সেদিন, আশ্চর্য হলাম দেখে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি সেই গর্ত খুঁড়ে চলেছেন কোদাল দিয়ে—অন্তত সত্তর বারের বার হবে এবার, নিজের কবর খোঁড়ার উদ্দেশ্যে নয় নিশ্চয়ই। নতুন কোন দুঃসাধ্য সাধনে উদ্যোগী হয় না কেন নিউ ইংলন্ডের লোকরা? তার এই শস্য, এই আলু, তার ঘাস আর তার ফলের বাগান নিয়ে এত মাথা না ঘামিয়ে, এসব ফসল বাদ দিয়ে অন্য ফসল চাষ করবে না কেন তারা? বিনের ঝাড় নিয়ে আমাদের এত চিন্তা, মানুষের নতুন ঝাড় নিয়ে এতটুকু চিন্তা নেই কেন আমাদের? যে সব গুণের উল্লেখ করলাম, অন্য সব উৎপন্ন মালের চাইতে, তাদের মূল্য আমাদের কাছে ঢের বেশি, কিন্তু এখানে ওখানে ছড়িয়ে শূন্যে ভাসছে তারা। এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান যদি পাই যাঁর মধ্যে এর কয়েকটা গুণও শিকড় গেড়েছে, অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে তাদের, তবে পানভোজন আর আনন্দোৎসব করা উচিত। এই তো পথ দিয়ে আসছে সত্য আর ন্যায়-নিষ্ঠার মতো বিরল আর অনির্বচনীয় গুণ, যদিও পরিমাণ সামান্য আর রকম অভিনব। এই বীজ যাতে দেশে আমদানি হয়, আমাদের দূতদের এমন নির্দেশ দেওয়া উচিত, আর কংগ্রেসের উচিত দেশময় তার বিস্তার ব্যবস্থার সাহায্য করা। অন্তরে যোগ্যতা আর সৌহার্দ্য দেখা গেলে অনুদারতার ফলে পরস্পরকে প্রতারণা, অপমান আর

পরিহার করা উচিত নয় কখনও। এই জন্যই পরস্পরের পরিচয় দ্রুত না হওয়াই উচিত। অধিকাংশের সঙ্গেই আমার একেবারে পরিচয় নেই। মনে হয় তাদের সময়াভাব। সকলেই নিজের নিজের বিন নিয়ে ব্যস্ত। মানুষের সঙ্গে পরিচয় এই রকম হে'ট হয়ে খাটতে খাটতে, কাজের ফাঁকে লাঠি হিসাবে নিড়ানি কি কোদাল ঠেস দিয়ে করাও চলে না—ভুঁইফোঁড় অবস্থায় নয়—ভু'ই ছেড়ে উঠতে হবে খানিকটা, ঋজু থেকে ঋজুতর হ'তে হবে, চাতক পাখি যেমন মাটিতে নামে, নেমে ঘুরে বেড়ায় মাটিতে :

"কথা বলিবার কালে শুধু ডানা মেলে ধরে
উড়ে যেতে চায়, পুনঃ ডানারে বন্ধ করে—"

যাতে আমাদের মনে থাকে যে হয়তো বা দেবদূতের সঙ্গেই কথা হচ্ছে আমাদের। খাদ্য সব সময়েই আমাদের পুষ্টি সাধন না করতে পারে; কিন্তু সব সময়েই আমাদের কল্যাণ সাধন করে থাকে, আমরা যখন বুঝে উঠতে পারি নে আমাদের অস্বস্তি লাগছে কেন, আমাদের গ্রন্থির কাঠিন্য দূর ক'রে, সজীব ক'রে মানুষ কি প্রকৃতির সব দাক্ষিণ্যকে চিনিয়ে দেয়, যাতে নির্মল পুরুষোচিত আনন্দের ভাগী হ'তে পারি আমরা।

প্রাচীন কাব্য আর পুরাণে অন্তত সাক্ষ্য মেলে যে কৃষিচর্যা একদিন পুণ্য সাধনা ছিল। কিন্তু আমরা অশ্রদ্ধার হেলাফেলা আর অনবধানতায় এর চর্যা করি: আমাদের উদ্দেশ্য থাকে কেবল বড় বড় খামার আর বেশি ফসল লাভ। কৃষক তার পুণ্য ব্রতের তাৎপর্য প্রকাশ করতে পারে, অথবা পুণ্য ইতিবৃত্ত স্মরণ করতে পারে, এমন কোন অনুষ্ঠান, কোন শোভাযাত্রা, কোন উৎসব নেই আমাদের—আমাদের গবাদি পশু প্রদর্শনী আর তথাকথিত ধন্যবাদজ্ঞাপন পর্বকেও বাদ দিচ্ছি না। ভোজ আর লভ্যাংশেই তার লোভ। তার অর্ঘ্য কৃষিলক্ষ্মী সিরিস দেবী কি দেবাদিদেব জোভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং নরকাধিপ প্লুটাসের উদ্দেশ্যে। মাটিকে সম্পত্তি কি প্রধানত সম্পত্তি-লাভের উপায় হিসাবে দেখার মধ্যে যে লোলুপতা, স্বার্থবুদ্ধি তথা হীনতা স্বীকারের প্রবৃত্তি দেখা যায়, যা থেকে আমরা কেউ মুক্ত নই—তার ফলেই আমাদের স্থলদৃশ্য বিকৃত, কৃষিচর্যা জাতিভ্রষ্ট আর কৃষকের এই অধমাধম জীবন যাপন। প্রকৃতিকে সে জানে কেবল লুণ্ঠনকারী হিসাবে। কেটো বলে গেছেন, কৃষিকার্যের লাভ বিশিষ্ট পুণ্যকাজ, তথা ন্যায়সঙ্গত (ম্যাক্সিমেক পিয়াস কোয়েস্টাস) আর ভেরোর মতে প্রাচীন রোমকেরা "মাটিকেই জননী আর সিরিস আখ্যাত করতেন এবং মনে করতেন যারা এর চর্যা করে, তাদের জীবন পুণ্যময় তথা ইষ্টজনক এবং স্যাটার্ন নৃপতির বংশে একমাত্র তারাই অবশিষ্ট।"

আমাদের চাষের জমি, আর প্রেয়রি, আর বন জঙ্গল, নির্বিশেষে সকলের

খবরদারি করেন সূর্য, একথাটা ভুলে থাকা আমাদের রপ্ত হয়ে গেছে। এরা সকলেই সমানে তাঁর কিরণ শোষণ করে, প্রতিফলিত করে। সূর্যকে তাঁর দৈনিক টহলদারিতে যে বিরাট দৃশ্য দেখতে হয়, এগুলো তার সামান্য একটা অংশ। তাঁর চোখে ভূমণ্ডলের সর্বত্র কুঞ্জকাননের মতো সমান সাজানো। সুতরাং সমান বিশ্বাস আর দিলখোলা ভাবে তাঁর আলো আর তাপের কল্যাণ যেন নিতে পারি। এই বিনের বীজের দাম আছে আমার কাছে, বৎসরান্তে হেমন্তে তার ফসল ঘরে তুলেছি, ততঃ কিম্? এতদিন ধরে আমি এই প্রকাণ্ড মাঠটার মুখ চেয়ে কাটালাম, কিন্তু খোদ চাষী বলে আমার মুখ চেয়ে নেই এ, আমাকে ছাড়িয়েও যে কল্যাণ প্রভাব, যিনি একে জল দেন, শ্যামল রাখেন, তাঁর মুখ চেয়ে থাকে এ। এই বিনগুলোর এমন ফসলও আছে, যা আমার ঘরে ওঠে না। উডচাকের জন্যও কি খানিকটা ফলে না এরা? গমের শীষই (লাটিন ভাষায় স্পাইকা, অপ্রচলিত স্পেকা, স্পি থেকে —আশা) চাষীর একমাত্র আশা হওয়া উচিত নয়। এর সার অর্থাৎ দানাই (গ্রানাম, জেরেন্ডো জন্মদান থেকে) এর একমাত্র ফসল নয়। তাহ'লে কেমন করে বলি আমাদের ফসল নিষ্ফল? এই যে প্রচুর আগাছা, পাখিদের গোলাঘর তো এদেরই বীজ,—এতেই বা খুশি না হবার কি আছে? হিসেব করে দেখতে গেলে মাঠের ফসল চাষীর গোলায় মজুদ হ'ল কি না কিছুই আসে যায় না তাতে। খাঁটি চাষী দুশ্চিন্তা মুক্ত, যেমন এ বছর বনে বাদাম হবে কি না তা নিয়ে কাঠবিড়ালকে দুশ্চিন্তা করতে দেখা যায় না। রোজ-কার কর্মেই তার অধিকার, মাঠের ফসলের সব অধিকার ত্যাগ করতে হবে তাকে। শুধু প্রথম ফসলই নয়, শেষ ফসলও মনে মনে সে দেবে উৎসর্গ করে।

॥ ৮ ॥ গ্রাম

কোদাল চালাবার, কি হয়তো লেখাপড়া করার পর, বেলা বাড়লে আমি সাধারণত আবার পুষ্করিণীতে স্নান করতাম। বরাদ্দ মতো একটা খাড়ি বরাবর এক পাল্লা সাঁতার কেটে পরিশ্রমের গ্লানি গা থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতাম, কপাল কুঁচকে পড়া-শোনা করার শেষ চিহ্নটি যেত মিলিয়ে। বিকালের দিকটা সম্পূর্ণ ছুটি। রোজই কিংবা একদিন বাদ একদিন বেড়াতে বেরোতাম গাঁয়ের মধ্যে, সেখানে মুখে মুখে কি খবরের কাগজের মারফত যে গল্প-গুজব চলে ক্রমাগত, তাই শুনতে। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মতো সামান্য মাত্রায় খেয়ে গেলে এতে নিজেকে বেশ একরকম তাজা মনে হয়, যেমন পাতার খস খস ধ্বনি শুনলে হয়, কি ব্যাঙ উকিঝুঁকি মারছে দেখলে হয়। বনের মধ্যে যেমন পাখি আর কাঠবিড়ালদের দেখতে ঘুরে বেড়াতাম, তেমনি গাঁয়ের মধ্যে ঘুরতাম লোকজন আর ছেলে-ছোকরাদের দেখতে। পাইন বনের বাতাসের শব্দের বদলে শুনতে পেতাম গাড়ি ঘোড়ার খটর-খটর। আমার আস্তানাটার একদিকে এক পাল মাস্করাটের উপনিবেশ ছিল নদীর ধারের মাঠটায়। বিপরীত দিগন্তে এল্‌ম আর বাটনউড গাছের ছায়ায় একটা গ্রাম, বাসিন্দারা ব্যস্ত-সমস্ত। ভারি মজা লাগত আমার, প্রেরি-ডগের মতো তারা যেন এক একজন নিজের বিবরের মুখ আগলাচ্ছে আর ছুটে গিয়ে কোন পড়শীর সঙ্গে খানিক গল্প করে আসছে। তাদের চাল-চলন লক্ষ্য করতে প্রায়ই যেতাম সেখানে। গ্রামটাকে মনে হত বড় রকমের একটা খবরের ঘাঁটি; খরচ তোলার জন্য একদিকে যেমন এক সময়ে স্টেট স্ট্রীটের উপর রেডিং কোম্পানির ছিল—বাদাম, কিস মিস, অথবা লবণ কি খাবার আর মুদীখানার মালমশলা রাখা। কারও কারও প্রথম সামগ্রীটা অর্থাৎ খবর উদরস্থ করার ক্ষমতা এমন প্রচণ্ড আর তাদের পরিপাক-যন্ত্র এমন নির্দোষ যে সব সময়েই তারা সদর রাস্তায় অবিচলিত বসে আছে—গ্রীষ্মে সমুদ্রের হাওয়ার মতো খবর লাগুক সারা গায়ে, আস্তে আস্তে সোঁ সোঁ করে, ফিসফিস করে,—কিংবা যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিচ্ছে গ্যাস, নিঃসাড় করে দেয়, বেদনাবোধ লোপ পায়, কিন্তু অচৈতন্য করে না— নইলে শুনতে শুনতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হ'ত

তারা। গ্রামের মধ্যে ঘুরতে গিয়ে এমন কদাচিৎ ঘটেছে যে, এমন একদল নমস্য ব্যক্তিদের দেখতে পাই নি। সিঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে হয় রোদ পোয়াচ্ছেন, দেহটা নিয়ে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে লোলুপ চোখে ঠায় চেয়ে রয়েছেন, মাঝে মাঝে এদিক থেকে ওদিক ঘোরাচ্ছেন তাদের, নয়তো ঠেকনোর মতো ধান-চালের কোন গুদাম ঘরে ঠেস দিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যেন পাথর-প্রতিমা। বাইরে বাইরেই কাটে প্রায় সময়টা তাঁদের, তাই সব খবরই হাওয়ায় ভেসে আসে কানে। এঁরা হচ্ছেন জাঁতা-কলের মোটা দিকটা, সব গুজব একটা চলনসই গোছের পাক খেয়ে অথবা চড়াৎ করে ফেটে এখান থেকে খালি হচ্ছে গিয়ে আড়ালের চোঙা-যন্ত্রে, সেখানে চলবে আরও মিহিরকমের, আরও পরিপাটি কাজ। দেখতাম, মুদীখানা, পানশালা, ডাকঘর আর ব্যাঙ্ক, এরাই গ্রামের প্রাণ। কারখানার অঙ্গ হিসাবে থাকত একটা ঘন্টা, একটা কামান, একটা দমকল সুবিধা মতো জায়গায়। বাড়িগুলো গলির উপর সামনা সামনি এমনি গুছিয়ে তৈরি যে, কোন মানুষের তাদের এড়িয়ে চলার উপায় ছিল না। সুতরাং আগন্তুক মাত্রেরই এদের বাক্যবাণ সইতে হত, মেয়ে মরদ ছেলে সবাই একটু খুঁচিয়ে দেখত তাকে। অবশ্য, গঞ্জের আরম্ভের কাছাকাছি জায়গায় যাদের আড্ডা, যেখানে থেকে সব কিছু দেখা যায় আর সবায়ের দৃষ্টি যেখানে পড়ে, তারাই প্রত্যেককে প্রথম কিল-চড়টা লাগাতে পারত বলে তাদের ভদ্রাসনের মূল্যও দিতে হ'ত বেশি। সদর ছাড়িয়ে এখানে ওখানে যে গুটিকয়েক পরিবার ছড়িয়ে ছিল—ঘেঁষা-ঘেঁষি কমে গিয়ে ফাঁকা জায়গার সুরু যেখানে, আগন্তুক পাঁচিল টপকে কি মেঠো পথে নেমে গা ঢাকা দিতে পারত যেখানে, জায়গার জন্য সামান্য ভাড়া দিতে হ'ত তাদের। তাকে আকৃষ্ট করবার জন্য সাইনবোর্ড ঝুলছে চারদিকে। কোথাও, যেমন সরাইখানা কি খাবারের দোকান, তাকে পেটের খিদের প্যাঁচে জড়াতে চায়: কেউ কেউ চটক দেখিয়ে, যেমন মনিহারী কি স্যাকরার দোকান; কেউ কেউ আবার চুল, পা, মায় জামা-কাপড় দেখিয়ে, যেমন নাপিত, মুচী আর দর্জি। এসব ছাড়া আরও ভাবনার ব্যাপার ছিল, প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকবার সাদর নিমন্ত্রণ, এই সময়টাতে গিয়ে যদি তাদের ওখানে কাটায় কেউ এই অপেক্ষায় থাকত তারা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব বিপদ থেকে আশ্চর্য রকমে অব্যাহতি পেতাম আমি—দু'সার লোকের মধ্যে মার খেতে খেতে পথ চলতে হবে যাদের, তাদের যেমন নির্দেশ থাকে, তেমনি অকুতোভয়ে নির্ভাবনায় গন্তব্যের দিকে পা বাড়িয়ে দিতাম, নয় অরফিউসের মতো উচ্চ-মার্গের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকতাম, যিনি "বীণা-সহযোগে উচ্চস্বরে দেবতাদের স্তব-গানের মধ্যে সাইরেন কন্যাদের কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছিলেন।" কখনও কখনও হঠাৎ পিঠটান দিতাম, কোথায় ছুটেছি কেউ

বুঝতে পারত না, কেন না, লোকলজ্জাকে বিশেষ আমল দিতাম না, আর কোন রকমে কোন বেড়ায় ফাঁক পেলে আর বাছবিচার করতাম না। হয়তো বা কোন বাড়ির মধ্যেই কখনও হঠাৎ আক্রমণ করতাম গিয়ে, তাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'ত না। লড়াই আর শান্তি, কিসের সম্ভাবনা বেশি আর কম, দুনিয়ার আর বেশিদিন আয়ু আছে কিনা, সেখানে এই সব বিষয়ে অতি সারবান আর চূড়ান্ত সংবাদ সংগ্রহ করে খিড়কির রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। আবার বনের মধ্যে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম।

শহরে গিয়ে দেরি হলে, রাত্রির বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে বড় ভাল লাগত। বিশেষ করে যদি অন্ধকার আর দুর্যোগ হ'ত। পিছনে ফেলে এসেছি গ্রামের সেই আলোকোজ্জ্বল মজলিশ কি বক্তৃতা-সভা, পাল তুলে যাত্রা করেছি কাঁধে এক বস্তা জোয়ার কি ভুট্টা চাপিয়ে, বনের মধ্যে আমার নিরালা বন্দরের উদ্দেশে। বাইরের সব ফাঁক বন্ধ, ঝাঁপও বন্ধ, ভিতরে আমার কল্পনা, যেন একদল ফুর্তিবাজ নাবিক। আমার বাইরের আমিটা হাল ধরে বসে আছে, ঝড়-ঝাপটা না থাকলে হালটা একেবারে তোলা। "তরণী ভেসে চলেছে," চুল্লীতে আগুন, আমার মনে সুখ-কল্পনা। কোন বিপর্যয়ের মধ্যেই একেবারে বিপন্ন হই নি বা ভেসে যাই নি কোনদিন, অথচ কতবার কত দুর্যোগেই না পড়েছি। অনেকেই এঁচে উঠতে পারবেন না, সাধারণ রাত্রেও বনের ভেতরটা কি পরিমাণ অন্ধকার থাকে। পথ ঠাহর করতে গিয়ে বারবার উপর দিকে তাকিয়ে দুই গাছের মধ্যেকার ফাঁক দেখে এগুতে হয়েছে আমাকে। যেখানে গাড়ির চাকার দাগ নেই পা ঘষে ঘষে খুঁজতে হয়েছে নিজের পায়ে চলা পথের ঈষৎ রেখাটি কিংবা দুহাত বাড়িয়ে টের পেতে হয়েছে জায়গা বিশেষে চেনা গাছের পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি, তারপর এগুতে পেরেছি। হয়তো বনের একেবারে মাঝখানে, আঠার ইঞ্চির বেশি ফাঁকও নেই এমন দুটো পাইন গাছের মাঝ দিয়ে পথ খুঁজে খুঁজে চলতে হয়েছে সব সময়েই, গভীর রাতের অন্ধকারে। কখনও কখনও চোখে বিন্দুমাত্র না দেখে পা দিয়ে এঁচে এঁচে এগিয়ে চলেছি। কালি-ঢালা দম-আটকানো অন্ধকারের বুক চিরে আস্তানায় ফিরেছি অনেক রাত্রে। সারা পথটা স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে অন্যমনস্ক হয়ে। আচমকা জেগে দেখেছি, হাত তুলে আগল খুলছি। পায়ে পায়ে অনেকটা পথ এসেছি, কিন্তু মনে করে উঠতে পারি নি কেমন করে। মনে হয়েছে, মালিক ত্যাগ করলেও হয়তো দেহটাই নিজের আস্তানা খুঁজে বার করতে পারে, হাত যেমন কোন সাহায্য না পেলেও নিজেই মুখে ওঠে। অনেক সময় হয়তো কোন অতিথির রাত হয়ে গেছে আমার ওখানে; অন্ধকার রাত্রি, আমার আস্তানার পিছন দিককার গাড়ি চলবার রাস্তায় অগত্যা তাঁকে পেঁছে দিয়েছি। যেদিকে যেতে হবে সেই দিকটা বাতলে

দিয়েছি, বলে দিয়েছি যে চোখে না দেখতে পেলেও যেদিকে পা যায় সেদিকেই যান যেন তিনি। পুষ্করিণীতে মাছ ধরতে এসেছিল দুটি ছেলে একবার, ভীষণ অন্ধকার রাত্রিতে এমনি ভাবেই তাদের পথের নিশানা দিয়েছিলাম। জঙ্গলের রাস্তায় মাইলটাক দূরে তাদের আস্তানা, এ রাস্তায় তাদের বেশ যাতায়াতও আছে। দুই একদিন পরে তাদের একজনের কাছে শুনতে হ'ল, নিজেদের বাড়ির কাছ বরাবর গিয়েও সে রাত্রে অনেকটা সময় তাদের ঘোরাঘুরি করে কেটেছে, বাড়ি ফিরতে প্রায় ভোর হয়েছিল। মধ্যে বেশ জোর বৃষ্টি নামে কয়েকবার, গাছের পাতা থেকে জল ঝরতে থাকে, ফলে তাদেরও আপাদমস্তক ভিজে যায়। অন্ধকার যখন এমন গাঢ় হয়,—যাকে বলা হয় সূচিভেদ্য—তখন গাঁয়ের রাস্তাতেও অনেকে পথ হারিয়েছে বলে শুনেছি। অনেকে হয়তো শহরতলিতে থাকেন, মাল কিনতে মালের গাড়ি চড়ে এসেছেন শহরে, রাত্রে আর ফিরতে পারেন নি তাঁরা। সস্ত্রীক অনেক ভদ্রলোক বেড়াতে বেরিয়ে যেখানে যাবার কথা সেখান থেকে আধ মাইল দূরে গিয়ে পড়েছেন। শুধু পা দিয়ে রাস্তার ধার আন্দাজ করে চলতে হয়েছে তাঁদের, বুঝতেও পারেন নি কখন পথ ভুল করে বসেছেন। যেকোন সময়েই বনে জঙ্গলে পথ হারানো চমৎকার আর মনে রাখবার মতো ব্যাপার। আর অভিজ্ঞতা যা হয় তারও মূল্য আছে। তুষার-ঝঞ্ঝায় প্রায়ই, এমন কি দিনের বেলাতেও, অত্যন্ত পরিচিত পথে চলতে গিয়েও কোন দিকে গ্রামে যেতে হবে লোকে বুঝে উঠতে পারে না কিছুতে। জানছে যে হাজারবার এপথ দিয়ে যাতায়াত করেছে, কিন্তু তার একটা চিহ্নও চিনে উঠতে পারছে না, যেন সাইবেরিয়া মুলুকে কোন রাস্তায় গিয়ে পড়েছে এমন অদ্ভুত লাগছে পথটা। এর উপর যদি রাত হয়, তখন আরও হতবুদ্ধি হতেই হয়। পরিচিত আলোক সংকেত কি অন্তরীপ ইত্যাদি দেখে যেমন জাহাজ চালিয়ে যায় নৌ-চালক, যখনই, যত সামান্য পথই চলি, জ্ঞাতসারে না হলেও, আমরাও তাই করে চলেছি দিনের পর দিন। যে রাস্তা দিয়ে রোজ যাই, তার বাইরে যেতে হলেও মনে রাখি যে কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় অন্তরীপের মতো দেখতে জায়গাটা আছে। পৃথিবীতে পথ হারাবার পক্ষে চোখ দুটো বুজে একটিবারের জন্য মোড় ঘোরাই যথেষ্ট। কিন্তু যতক্ষণ না একেবারেই পথ হারিয়ে ফেলি, কিংবা মোড় ঘুরি, ততক্ষণ বুঝতে পারি নে কি বিরাট এই প্রকৃতি আর কি আশ্চর্য। ঘুম থেকেই হ'ক কি আকাশ বিহারের পরই হ'ক যতবারই জাগে, মানুষকে ততবার নতুন করে দিক নির্ণয় করে নিতে হয়। পথ যতক্ষণ না হারাই, ভাষান্তরে জগৎকে যতক্ষণ হারিয়ে না ফেলি ততদিন আমাদের নিজেদের খুঁজে পাই নে, বুঝতে পারি নে আমরা কোথায় রয়েছি আর আমাদের যোগাযোগ কি অনন্ত-বিস্তার।

গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকটার শেষাশেষি, একদিন বিকালে গেছি গ্রামের মুচীর কাছে, এক পাটি জুতোর সন্ধানে। আমাকে পাকড়াও করে কয়েদ-খানায় পোরা হ'ল। অন্যত্র বলেছি, যে-রাষ্ট্রের মন্ত্রণামণ্ডলের সম্মুখে গরু মোষের মতো মেয়ে পুরুষ আর শিশুদের কেনা বেচা করা হয়, আমি স্বীকার করি নে তার আধিপত্য, কোন কর দিতে চাই নে তাকে। বনবাসে গিয়ে-ছিলাম অন্য সংকল্প নিয়ে। কিন্তু যেখানেই মানুষ যাক, আর সবাই তার পিছু ধাওয়া করবে, তাদের যত নোংরা আইন কানুনের থাবা দিয়ে ধরতে চাইবে, আর যদি পারে তাদের বেপরোয়া বারো ভূতের সমাজে নাম লেখাতে বাধ্য করবে তাকে। হয়তো সত্যি যে, হাঁকডাক করে সমাজের বিপক্ষে পাগলের মতো লাফালাফি করলে অল্পবিস্তর ফল পাওয়া যেত: কিন্তু আমি চেয়েছিলাম সমাজই যখন বেপরোয়া তখন সেই আমার বিপক্ষে পাগলের মতো লাফালাফি করুকে। যা হ'ক, পরের দিনই ছেড়ে দেওয়া হ'ল আমাকে। মেরামত করা জুতোর পাটিটা নিয়ে ঠিক সময় মতো বনে ফিরে আসি, আর ফেয়ার-হ্যাভন-হিলে হাকলবেরি সহযোগে ভোজনপর্ব সমাধা করি। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছাড়া আর কোন লোকের হাতে কোনদিন আমাকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি। যে ডেস্কে কাগজপত্র ছিল, এক সেখানে ছাড়া তালা কি ছিট-কিনি আমার ছিল না, একটা পেরেক পর্যন্ত ছিল না খিল কি জানালা আটকাবার। দিনে কি রাত্রে কখনও আমাকে দরজা বন্ধ করতে হয় নি, যদিও পরপর বেশ কয়দিন আমি অনুপস্থিত থেকেছি। এমন কি পরের বছর হেমন্তকালে এক পক্ষেরও বেশি আমি ম্যেনের জঙ্গলে কাটিয়ে আসি। তৎসত্ত্বেও আমার আস্তানায় আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি। চারপাশে সৈনিকের দল পাহারা দিলেও এমনটি হ'ত না। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যে কেউ বিশ্রাম করে গেছে সেখানে, আগুনে হাত পা সেঁকে গেছে, সাহিত্যামোদীরা আমার টেবিলে যে কয়টা সামান্য বই ছিল তাই পড়ে সময় কাটিয়েছে: কিংবা যারা তেমন উৎসাহী, তারা বড়জোর পাশের ঘরের দরজা খুলে দেখতে চেয়েছে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের কিছু অবশিষ্ট বা রাত্রের খাবারের আমার কোন ব্যবস্থা আছে কি না। তবু, যদিও নানা শ্রেণীর নানা লোকই পুষ্করিণী দেখতে এসেছে এ পথে, তাদের জন্য আমাকে তেমন কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। একখণ্ড হোমারের গ্রন্থাবলী ছাড়া আমার কখনও কিছু খোয়াও যায় নি, একটু অন্যায় রকমের সোনালী রঙে বাঁধানো ছিল সেটা, হয়তো সেই জন্যই। বইটা এতদিনে আমাদের ছাউনির কোন সেপায়ের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে বলে আমার ধারণা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তখন যে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছি, সব মানুষ যদি তাই করে, চুরি ডাকাতি থাকবে না। যে সমাজে জনকয়েক লোক তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পায় আর বাকি

সবায়ের প্রয়োজনও মেটে না, চুরি ডাকাতি সেই সমাজেই চলে। পোপের হোমার-গ্রন্থাবলীর সম্যক্ বিতরণে কোন দেরি হবে না।

"যুদ্ধে লিপ্ত নাহি হ'ত মানুষ তখন,
শুধু কাষ্ঠপাত্র ওষ্ঠ মাগিত যখন।"

"তোমরা, যারা রাষ্ট্র শাসন কর, শাস্তি প্রয়োগের প্রয়োজন তোমাদের কি জন্য? ধর্মে অনুরাগী হও, প্রজাসাধারণও ধর্মানুরাগী হবে। উপরিতন ব্যক্তির ধর্মাচরণ পবনের মতো, সাধারণ ব্যক্তির ধর্মাচরণ তৃণের মতো। পবন যখন উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তৃণ তখন নত হয়।"

॥ ৯ ॥ পুষ্করিণী

কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে আর খোস গল্পে আতিশয্যজনিত অরুচি আসত, গ্রামের সব বন্ধুকেই ক্রমাগত সাহচর্যের ফলে নীরস লাগত। তখন যেখানে সাধারণত থাকি, তাকে ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে ঘুরতে ঘুরতে চলে যেতাম শহরের যেসব অঞ্চলে লোকজনের চলাফেরা কম ছিল, সেই "নব অরণ্যে, নবীন চারণ-ভূমে।" কিংবা সূর্য অস্ত গেলে ফেয়ার-হ্যাভেন-হিলের হাকলবেরি আর ব্লুবেরি সংযোগে রাত্রের আহার সাঙ্গ করতাম আর বেশ কয়েক-দিনের খাবারও মজুদ করে নিতাম। ফল যে কিনে খায় কিংবা বাজারে বিক্রির জন্য ফল যে চাষ করে, ফলের সত্যিকার আস্বাদ তাদের ভাগ্যে জোটে না। সে স্বাদ পাবার পন্থা মাত্র একটি, কিন্তু কেউই তা গ্রহণ করে না। হাকলবেরির স্বাদ যদি জানতে চাও, রাখাল কি তিতির পাখিকে জিজ্ঞাসা কর। গাছ থেকে পেড়ে না খেলে, হাকলবেরির স্বাদ পেয়েছি ভাবা ইতরজনোচিত ভ্রান্তি। বস্টনে গিয়ে যা পৌঁছায়, তা হাকলবেরি নয়। কাছাকাছি তিনটে পাহাড়ে হাকলবেরি হবার দিন থেকে এ পর্যন্ত বস্টনে এ জিনিস অপরিচিত। ফলটার অমৃতস্বাদী সারভাগ বাজারের গাড়ির ঘর্ষণে, ওর রঙের মতোই নষ্ট হয়ে যায়; যা থাকে তা নিতান্তই বাজারের খাবার। যতদিন ন্যায়বিচার অব্যা-হত থাকবে, একটি মাত্র নির্দোষ হাকলবেরিকেও গ্রামাঞ্চলের পাহাড় থেকে সেখানে বয়ে নেওয়া যাবে না।

মধ্যে মধ্যে, সেদিনকার মতো কোদাল চালানো কাজ শেষ হ'লে আমার সেই ধৈর্যহীন বন্ধুর কাছে গিয়ে বসতাম। সকাল থেকে তিনি হয়তো পুকুরে মাছ ধরছেন, নীরব নিশ্চল, যেন হাঁস কি ভাসা পাতা। আমি গিয়ে পৌঁছা-নোর আগে নানা দার্শনিক তত্ত্ব চর্চা করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপ-নীত হয়েছেন যে তিনি সুপ্রাচীন সেনোবাইট সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। একজন প্রৌঢ় ছিলেন, মাছ ধরতে আর কাঠের সব রকম কাজে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অনুগ্রহ করে তিনি ভাবতেন যে আমার আস্তানাটা মেছুড়েদের সুবিধার জন্য তৈরি বিশ্রামাগার বিশেষ। আমার দরজার সামনে বসে তাঁর ছিপ বঁড়শি যখন তিনি সাজাতেন, আমিও সমান অনুগৃহীত বোধ করতাম।

কালেভদ্রে আমরা পুকুরের ওপরে গিয়ে বসতাম একসঙ্গে, একটা নৌকোর এক ধারে তিনি, অন্য ধারে আমি। কথাবার্তা কিন্তু বেশি হ'ত না, কারণ শেষদিকে কানে একেবারেই শুনতেন না তিনি, মধ্যে মধ্যে শুধু সুর করে স্তোত্রপাঠ করতেন, আমার জীবন-দর্শনের সঙ্গে তার ভাবটা সুন্দর মিলত। আমাদের ভাব বিনিময়ে তাই অবিমিশ্র ছেদহীন সুরসঙ্গতি বজায় থাকত। ভাবতেও আজ আনন্দ হয়। কথার মারফত হলে এতটা হ'ত না। যখন, এমন অবস্থা প্রায়ই ঘটত, কথা কইবার মতো কাউকে পেতাম না, দাঁড় দিয়ে নৌকো-টার একটা ধারে ঘা কতক লাগিয়ে প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতাম, তার আওয়াজ চারপাশের বনে ঘুরপাক খেতে খেতে দূরে ছড়িয়ে যেত। আমি যেন কোন পশুশালার জানোয়ারদের রক্ষণাবেক্ষণ করি, তাদের খুঁচিয়ে চলেছি যতক্ষণ না সব বন-জঙ্গল, পাহাড় থেকে তারা রেগে গরগর করতে থাকে।

সন্ধ্যার দিকে গরম লাগলে প্রায়ই নৌকোটায় চড়ে বসে বাঁশী বাজাতাম, দেখতাম একটা পার্চ মাছ—সেটাকে নিশ্চয়ই যাদু করে থাকব—আমার চারদিকে ঘুরঘুর করছে। আর দেখতাম পুকুরটার তলাটা ঢেউ খেলানো, সেখানে বন-বাদাড়ের বিনাশাবশেষ ছড়ানো। ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে চাঁদ। আগে কোন কোন সময় পুকুরটাতে আসতাম যেন একটা দুঃসাহসিক কাজ করছি এই ভাব নিয়ে। গরমের অন্ধকার রাত, সঙ্গী আছে একজন। জলের ধারটাতে আগুন জ্বালানো হয়েছে। ধারণা ছিল, মাছকে তা আকর্ষণ করে। সুতোতে ঝোলানো একরাশ পোকা মাকড়, তাই দিয়ে পাউট মাছ ধরতাম। অনেক রাত্রে যখন শেষ হ'ত, জ্বলন্ত কাঠক'টা ছুড়ে দিতাম আকাশের দিকে অনেকখানি উঁচুতে হাউইবাজির মতো, পুকুরে পড়ে হুস শব্দ করে সেগুলো নিভে যেত। হঠাৎ চারদিক একবারে অন্ধকার হয়ে যেত আর আমাদের হাতড়ে পথ খুঁজতে হ'ত। ওরই মধ্যে শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পুনরায় লোকালয়ে ফেরবার পথ পাড়ি দিতে হ'ত। এখন এর তীরে আমি নীড় বেঁধেছি।

কখনও কখনও গ্রামের কোন বৈঠকখানায় আড্ডা মেরেছি বাড়ির সবাই ঘুমোতে না যাওয়া পর্যন্ত। বনে আবার ফিরে এসেছি। কতকটা পরদিনের খাবারের ব্যবস্থা করতেই। অতঃপর দুপুর রাতের সবটাই জ্যোৎস্নায় নৌকো চড়ে মাছ ধরে কাটিয়েছি। পেঁচা আর খেঁকশিয়ালরা নৈশ সঙ্গীত শুনিয়েছে, মধ্যে মধ্যে খুব কাছ থেকে একটা নাম-না-জানা পাখি কিচির মিচির করেছে। এইসব অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে আছে, আমার কাছে এদের মূল্যও অনেক। তীর থেকে বিশ ত্রিশ রড দূরে চল্লিশ ফুট গভীর জলের উপর নৌকো। চারদিকে ছোট ছোট পার্চ আর শাইনার মাছ কিলবিল করছে, কখনও হাজারে হাজারে। জ্যোৎস্নায় জলের উপরটা তাদের লেজের ঘায়ে টোল

খাচ্ছে, আর আমি লম্বা মোটা ছিপ নিয়ে চল্লিশ ফুট জলের নিচের বাসিন্দা রহস্যময় নিশাচর মাছের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছি। কখনও মৃদু নৈশ হাওয়ায় নৌকো ভাসিয়ে বেড়িয়েছি পুকুরের সর্বত্র, ষাট ফুট লম্বা ছিপসুতো হাতে নিয়ে। মধ্যে মধ্যে চারদিকে ঈষৎ একটা স্পন্দন অনুভব করেছি। মনে হয়েছে আদিম কোন জন্তু হয়তো ওত পেতে রয়েছে পাড়ে। মন্থর অনিশ্চিত দ্বিধাসংকুল লক্ষ্য তার, মন স্থির করতেও বিলম্ব হচ্ছে। অবশেষে কোনক্রমে দুই হাত বাগিয়ে টেনে তুললাম শিংওলা একটা পাউট মাছ, ওপরে তোলার প্রতিবাদে পাক খাচ্ছে আর চিৎকার করছে। ভয়ানক আশ্চর্য লাগে, বিশেষ করে চিন্তা যখন রাত্রের অন্ধকারে পক্ষ বিস্তার ক'রে সুবিশাল সৃষ্টিতত্ত্বের সন্ধানে অন্যান্তরে উড়ে গেছে, তখন সামান্য একটু টানে যদি স্বপ্ন ভেঙে দেয় আর প্রকৃতির বন্ধন মনে পড়ে যায়। ভাবতে থাকি এর পরে ছিপ ফেললে হয়তা ওপরে আকাশে ফেলতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নিচেও এই মৌলের মধ্যে—ঘনত্ব সেখানে খুব বেশি মনে হয় না। যেন দু'দুটো মাছ গেঁথেছে আমার এক বঁড়শি।

ওয়ালডেন-এর দৃশ্যপট সামান্য রকমেরই। অতি সুন্দর কিন্তু আড়ম্বরের কাছ ঘেঁষেও যায় না। উপরন্তু অনেকদিন ধরে এখানে যে ঘোরাঘুরি না করে বেড়িয়েছে কি এর তীরে বাসা বেঁধে না থেকেছে, তার ওপর এর প্রভাবও খুব বেশি হবে না। কিন্তু তবু এর গভীরতা আর বিশুদ্ধির বৈশিষ্ট্য এমন যে সেদিক থেকে এর বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন আছে। স্বচ্ছ গভীর, শ্যামল জল। আধ মাইল লম্বা, পরিধি পৌনে দুই মাইল। আয়তন সাড়ে একষট্টি একর হবে। চার পাশে পাইন আর ওক বন। সম্বৎসর জল থাকে। মেঘ আর সাধারণ ভাবে বাষ্প হওয়া ছাড়া জলের পুকুরে ঢোকবার বা বার হবার কোন পথ চোখে পড়ে না। চারদিকে জলের ঠিক ওপরেই পাহাড়, চল্লিশ থেকে আশি ফুট পর্যন্ত উঁচু। কিন্তু দক্ষিণ-পূবে আর দক্ষিণে যথাক্রমে একশ আর দেড়শ ফুট উঁচু, সিকি আর তিন ভাগের এক ভাগ মাইলের মধ্যেই। বনে ফাঁক নেই। আমাদের কনকর্ড-এ সর্বত্র জলের রঙ অন্তত দুই রকমের। প্রথমটা একটু দূরে থেকে দেখলে যেমন লাগে; অন্যটা—আসল রঙের এইটাতেই বেশি পরিচয়—কাছ থেকে দেখতে যেমন লাগে। প্রথমটা আলোর ওপর অনেকটা নির্ভর করে, আকাশের রঙ নকল করে। গরমকালে আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে, বিশেষ যখন ঢেউ ওঠে, একটু দূরে থেকে নীল দেখায়। অনেক দূরে থেকে দেখলে সব সমান দেখায়। কখনও ঝড়ের সময় স্লেটের মতো কালচে রঙের হয়। শোনা যায় যে, আবহাওয়ায় তেমন কোন পরিবর্তন টের পাওয়া না গেলেও সমুদ্র একদিন নীল আর পরের দিন সবুজ দেখায়। চারদিকের স্থলভাগ যখন বরফে ঢেকে গেছে,

আমাদের নদীতে তখনও দেখেছি বরফ আর জল দুইই প্রায় শষ্প-শ্যামল। অনেকে মনে করেন নীলই "নির্মল জলের রঙ তা তরলই হ'ক কি জমাটই হ'ক।" কিন্তু নৌকা থেকে যদি ঠিক একেবারে আমাদের এই জলের তলায় তাকানো যায় অনেক রঙ দেখা যাবে সেখানে। ওয়ালডেন কখনও নীল কখনও সবুজ, এমন কি একই দৃষ্টিকোণ থেকেও। স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান বলে উভয়ের রঙই সে ভাগ করে নিয়েছে। পাহাড়ের ওপর থেকে চেয়ে দেখলে আকাশের রঙ প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যাবে এর বুকে; কিন্তু একেবারে কাছে দেখা যাবে একটু হলদে ছোপ—তীরের ঠিক কাছে যেখানে বালি নজরে পড়ে। তারপর ফিকে সবুজ, ক্রমশ গাঢ় হয়ে পুকুরের ঠিক মাঝখানে একেবারে একটানা গাঢ় সবুজ। কোন কোন আলোতে পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলেও, একেবারে তীরের কাছেও এর রঙ একেবারে খাঁটি সবুজ দেখাবে। কেউ কেউ মনে করেন, সবুজে গাছপালার ছায়া পড়েই এমনটা দেখায়। কিন্তু রেলরাস্তার বালুর বাঁধের কাছেও এর রঙ সমান সবুজ, বসন্তকালে গাছের পাতা বড় হবার আগেও তাই। বোধ হয় চারদিকের নীল রঙের সংগে বালির হলুদ রঙ মেশার ফল সেটা। এই হচ্ছে এর কনীনিকার রঙ। এই জায়গাগুলোতেই বসন্তকালে জলের তলা থেকে রোদের তাপ প্রতিফলিত হয়ে পড়ে, মাটি থেকেও বিকীর্ণ হয়। সুতরাং বরফ গরম হয়ে গলতে সুরু করে। এর ফলে তখনও মাঝখানে যেখানে বরফ জমাট থাকে, তার চারপাশে একটা সংকীর্ণ খাল তৈরি হয়ে যায়। আমাদের অন্য সব জলও, ঢেউ উঠলে আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঢেউয়ের বুকে আকাশ সমকোণে প্রতিবিম্বিত হয় বলে, কি তার সংগে বেশ খানিকটা আলো মিশে থাকে ব'লে, কিছুটা দূরে আকাশের চাইতে বেশি নীল দেখায়। এই সব সময়ে জলের ওপর থেকে প্রতিবিম্ব দেখতে গিয়ে চোখের দৃষ্টি কেমন ভাগ হয়ে যেত। সে দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত অতুলনীয়, অবর্ণনীয় এক অদ্ভুত ফিকে নীল—যেমন জলে ডোবালে এক রকম রেশম থেকে আর তরোয়ালের ফলা থেকে আভাস পাওয়া যায়—আসমানের চাইতেও বেশি আসমানী সে রঙ। আর সেই রঙ বদলে পরক্ষণেই যখন দেখেছি জলের ওপারে মৌলিক গাঢ় সবুজ—কি কর্দমাক্তই না মনে হয়েছে তা। আমার মনে তার যে স্মৃতি আছে সে হচ্ছে কাচের সবজে নীল রঙের, সূর্যাস্তের আগে পশ্চিমদিকে মেঘের ফাঁকে দেখা শীত-কালের আকাশের টুকরোর মতো। কিন্তু এর একপাত্র জল আলোর দিকে তুলে ধরলে দেখা যাবে সমান পরিমাণ বায়ুর মতোই তা বর্ণহীন। সকলেই জানেন যে বড় কাচের খণ্ড থেকে সবুজ আভা বেরোয়—নির্মাতারা বলে এর 'দেহে'র দরুণ। ঐ একই কাচের ছোট কোন খণ্ড কিন্তু বর্ণহীন হবে।

সবুজ আভা বিচ্ছুরিত করতে হ'লে ওয়ালডেনের দেহে কি পরিমাণ জলের দরকার কখনই আমার তা পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। আমাদের নদীর জল কাল, কিংবা তেমন একমনে কেউ যদি চেয়ে দেখে, খুব গাঢ় বাদামী দেখাবে। বেশির ভাগ জলাশয়ের মতো তাতে নাইলেও গায়ে একটা বাদামী ছোপ লাগে। কিন্তু এ জল স্ফটিকস্বচ্ছ, কেউ নাইলে তার গায়ে স্ফটিকের মতো সাদাটে ছোপ লাগে। বড় অস্বাভাবিক। আবার অংগ-প্রত্যংগ সব বড় আর বিকৃত দেখায়। সুতরাং একটা বিকটত্বের সৃষ্টি হয়—মাইকেল এঞ্জেলোর মতো কারও অনুশীলনের যোগ্য বিষয়।

জল এমন স্বচ্ছ যে পঁচিশ ত্রিশ ফুট নিচে পর্যন্ত তলদেশ অতি স্পষ্ট দেখা যায়। নৌকো বেয়ে গেলে দেখা যাবে উপর থেকে অনেক ফুট নিচে দলে দলে পার্চ আর শাইনার মাছ সব, হয়তো শুধু এক ইঞ্চি লম্বা। গায়ে আড়াআড়ি ডোরা দাগ দেখলে পার্চ মাছকে বেশ চেনা যায়। দেখে মনে হবে মাছ জাতের মধ্যে এরা ঘোরতর তপস্বী, সেখানে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আছে। একদা শীতকালে অনেক বৎসর আগে পিক্এরেল মাছ ধরবার জন্য বরফের ভেতর গর্ত খুঁড়েছিলাম। তীরে পৌঁছিয়ে কুড়ুলটা ছুড়ে বরফের দিকে ফেলি। কিন্তু, বোধহয় কুড়ুলটির স্কন্ধে কোন অপদেবতা ভর করে থাকবে, সেটা চার পাঁচ রড গড়িয়ে গিয়ে সোজা গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ল। জল সেখানে পঁচিশ ফুট গভীর হবে। কৌতূহল হ'ল, বরফের ওপর শুয়ে গর্তটার মধ্যে উঁকি মারলাম। কুড়ুলটা দেখলাম একদিকে হেলে মাথাটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, বাঁটটা সোজা, ঈষৎ এদিক ওদিক দুলছে পুকুরের বক্ষ-স্পন্দনের তালে তাল রেখে। ঐ ভাবেই সোজা দাঁড়িয়ে থাকত সেটা হেলে দুলে, তারপর কালক্রমে বাঁটটা পচে যেত। কিন্তু বাধা উপস্থিত করলাম আমি। বরফ কাটবার একটা বাটালি ছিল আমার, তাই দিয়ে ঠিক ওপরটাতে আর একটা গর্ত খুঁড়লাম। চারদিক হাতড়ে সব চাইতে লম্বা একটা বার্চ গাছ খুঁজে বার করে ছুরি দিয়ে কেটে আনলাম সেটা। একটা ফাঁস-গেরো বানিয়ে সেটার এক প্রান্তে সেঁটে দিলাম গেরোটাকে। তারপর সেটাকে সন্তর্পণে নামিয়ে কুড়ুলটার বাঁটের গাঁটে আটকে দিলাম। অতঃপর ছিপ দিয়ে বার্চের বরাবর কুড়ুলটাকে ওপরে টেনে তুললাম আবার।

সুমসৃণ, সুডৌল, সাদা-সাদা নুড়ি-পাথর সুবিন্যস্ত ভাবে সাজিয়ে তৈরি পুকুরটার পাড়। দু'একটা জায়গায় শুধু বালি—খুব কম জায়গা নিয়ে। অনেক জায়গায় এমন খাড়া যে এক লাফ দিলেই ডুব জল একেবারে। জল খুব স্বচ্ছ তাই, নইলে একেবারে ওপারে গিয়ে না ওঠা পর্যন্ত তলের আর সন্ধান মিলত না। অনেকে মনে করেন পুকুরটা অতল। কোথাও কাদা নেই. খুঁজে পেতে না দেখলে গাছ-গাছালিও নেই মনে হবে। সম্প্রতি

জলে ভেসে গেছে যে ছোট মাঠটা তার কথা বাদ দিলে—সেটা তো পুকুরের অন্তর্গত নয়—লক্ষ্য করবার মতো গাছ-পালার মধ্যে, খুঁটিয়ে দেখলেও, ফ্ল্যাগ কি বুলরাশ এমন কি লিলি—সাদা হলদে কোন জাতেরই—চোখে পড়ে না। শুধু দেখা যায় গোটাকয়েক ছোট হার্টলিফ, পোটামোজেটন, হয়তো বা দু'একটা ওয়াটার টার্গেট। এ সবও হয়তো যে চান করছে তার চোখে পড়ে না। যে মৌলের মধ্যে তাদের জন্ম সবগুলো গাছ-লতা তারই মতো স্বচ্ছ আর প্রফুল্ল। পাথরগুলো দু'এক বাঁও জলের ভেতর নেমে গেছে, তারপরই তলাকার খাঁটি বালি। একমাত্র জল যেখানে সব চাইতে গভীর, সেখানে সচরাচর কিঞ্চিৎ তলানি। যে সব শুকনো পাতা কয়েক বছর ধরে ঝরেছে, হাওয়ায় উড়ে এসে জমেছে ওখানে—হয়তো তা থেকেই। এমন কি খুব শীতের মধ্যেও দেখা যায় একটা ঝকঝকে সবুজ আগাছা নৌকোর নোঙরের সংগে ওপরে উঠে এল।

মাইল আড়াই পশ্চিমে নাইন-একার-কর্ণারে ঠিক এই রকম আর একটা পুকুর আছে—আমাদের হোয়াইট পণ্ড। এইটিকে কেন্দ্র করে মাইল বারোর মধ্যে যত পুকুর আছে প্রায় সবগুলোর সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে, কিন্তু এই রকম নির্মল আর কুয়োর মতো কোন তৃতীয় পুষ্করিণীর কথা আমার জানা নেই। কালের খাতায় কত জাতই হয়তো এর জল খেয়েছে, তারিফ করেছে, এর জল মেপে তারপর অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু তবু এর জল সমান সবুজ আর স্বচ্ছ রয়ে গেছে। দমকা কোন নির্ঝর নয় এ। হয়তো যেদিন বসন্তকালের সকালবেলায় আদম আর ঈভ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেদিনও ওয়ালডেন পণ্ডের অস্তিত্ব ছিল। সেদিনও হয়তো এর বুকে কুয়াসা আর দখিনা বাতাসের সঙ্গে বসন্তকালের ক্ষীণ বৃষ্টিপাত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ রাজহাঁস আর পাতিহাঁস চরেছে সেখানে। পতনের খবর তারা রাখে নি। এর নির্মল জলে কাজ চলে গেছে তাদের। এর জোয়ার-ভাটার সুরু আর জল পরিষ্কার হয়ে এখন পরিধানে এর যে রঙ দেখা যায় তার জলুসের আরম্ভ তখন থেকেই। তখনই যোগাড় হয়েছে স্বর্গের পেটেন্ট যে ধরাতলে একমাত্র এই ওয়ালডেন পণ্ড-এই স্বর্গ-হিমানীর চোলাই হয়। কে জানে কত বিস্মৃত জাতের সাহিত্যে কাসটালীয় ফাউন্টেন ছিল এ; অথবা কত জলদেবী স্বর্ণ-যুগে এর কূলে বিহার করে গেছেন? কনকর্ড-এর শিরোপায়, এ একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন।

হয়তো প্রথম যে এই সরোবরে আসে সে তার পদচিহ্নের কোন লক্ষণ রেখে গেছে। বিস্মিত হয়েছি দেখে পুষ্করিণীটার চারপাশ ঘিরে যেখানে এর ধারে জঙ্গল কেটে সবে সাফ করা হয়েছে, সরু খাঁজ-কাটা পথ খাড়া পাহাড়ে উঠে গেছে, কখনও চড়াই, কখনও উতরাই, জলের ধার পর্যন্ত

এগিয়ে এসে আবার দূরে সরে গেছে। হয়তো সে পথ এখানে মনুষ্যজাতি যতদিনের ততদিনের। আদিম অসভ্য জাতির শিকারীদের পায়ে পায়ে তৈরি পথ, এখনও হয়তো কখনও কখনও এ অঞ্চলের বর্তমান বাসিন্দারা না জেনে এ পথে চলাফেরা করে। শীতকালে পুকুরের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেউ যদি দেখে, এ পথ তার স্পষ্ট নজরে পড়বে। মৃদু তুষার-পাতের ঠিক পর পর দেখা যাবে পরিষ্কার সাদা একটা রেখা, আগাছা কি গাছের ডালপালায় ঢাকা পড়ে নি। গরমকালে খুব কাছ থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় না, কিন্তু এখন তিন পোয়া মাইল দূরের অনেক জায়গা থেকেই পরিষ্কার নজরে পড়ে। বরফে যেন পুনর্মুদ্রিত হয়ে আছে—স্পষ্ট সাদা উঁচুনিচু হরফে। এখানে যে সব ভিলা গড়ে উঠবে ভবিষ্যতে, তার কেয়ারি করা বাগানের নিচে তখনও রয়ে যাবে কিছু নিদর্শন।

পুকুরটার জল কমা বাড়া করে, কিন্তু ঠিক নিয়ম বেঁধে কি না কিংবা কোন সময়ের মধ্যে তা কেউ জানে না। যদিও, যেমন দেখা যায়, অনেকে জানার ভান করে। সচরাচর শীতকালে জল বাড়ে, গরমকালে কমে, কিন্তু স্বাভাবিক আর্দ্রতা কি শুষ্কতার অনুপাতে নয়। যখন থাকতাম সেখানে, তার চাইতে একফুট দুফুট বাড়া আর অন্তত পাঁচফুট পর্যন্ত কমার কথা মনে আছে আমার। একটা ছোটখাট বালির চড়া আছে এক জায়গায়, তার একধারে জল বেশ গভীর, তার উপর কেতলি চাপিয়ে মাছ মাংসের ব্যঞ্জন কোন কিছু সিদ্ধ করে নিয়েছি, জায়গাটা আসল পাড় থেকে ছয় রডটাক দূরে। এটা ১৮২৪ সালের কাছাকাছি হবে, পঁচিশ বছরের মধ্যে আর করা সম্ভব হয় নি তা। আমার বন্ধুদের যখন বলতাম তারা বিশ্বাস করতে চাইত না যে এর কয় বছর পরে বনের একটি নির্জন খাড়ির মধ্যে, এখন তারা যেটাকে আসল পাড় বলে জানে, তার থেকে পনের গজ দূরে নৌকো বেঁধে আমি মাছ ধরেছি। সে জায়গা কবে মাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুবৎসর ধরে ক্রমাগত পুকুরে জল বাড়ছে। এখন এই বাহান্ন সালের গরম-কালে, আমি যখন ওখানে ছিলাম, তার চাইতে জল ঠিক পাঁচ ফুট বেড়েছে। অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর আগে যেমন বেড়েছিল ততখানি। মাঠে আবার মাছ ধরা সুরু হয়েছে। এতে বাইরের দিকটায় জলসমের পার্থক্য দাঁড়িয়েছে ছয় কি সাত ফুট। অথচ চারদিকের পাহাড়ে যে পরিবাহক্ষেত্র দেখা যায় তা আয়তনে নগণ্য। সুতরাং এই অতিরিক্ত প্রবাহের কারণ নিশ্চয়ই নির্ঝরের অন্তর্দ্বারের ব্যাপার। এই গ্রীষ্মেই পুকুরের জল আবার নামতে সুরু হয়েছে। লক্ষ্যের বিষয় এই যে কমাবাড়া নিয়মিত হ'ক আর নাই হ'ক, ঘটতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগে। আমি বৃদ্ধি দেখেছি একবার, আর দুবার হ্রাস দেখেছি কিছুটা। আমার মনে হয় যে এখন থেকে বারো কি পনের বছরের পর এ

পর্যন্ত আমি জল যতটা কমতে দেখেছি, আবার ততটাই কমবে। এক মাইল পূর্বে যে ফ্লিট পণ্ড, তার জল ঢোকবার কি বার হবার পথের কথা ধরলেও, আর ছোট ছোট যে ক'টা পুকুর আছে মধ্যে, সব ওয়ালডেন-এর সঙ্গেই কমাবাড়া করে। সম্প্রতি দেখা গেছে, ঐ সব পুকুরের জল ঠিক একই সময়ে এর জলের সঙ্গে সর্বাধিক বেড়েছে। আমার যতদূর জানা আছে হোয়াইট পণ্ড সম্বন্ধেও ঐ কথাই সত্য হবে।

ওয়ালডেন-এর জলের এই অনেক পর পর বাড়াকমায় অন্তত একটা উপকার হয়। বৎসরকাল কি তার বেশি সময় জল বেশ খানিক উঁচুতে থাকে, তখন এর চার দিকে বেড়িয়ে বেড়ানো একটু কষ্টসাধ্য হয় বটে, কিন্তু যখন শেষ উঠেছিল তখন থেকে এর মধ্যে ধারে পিঠে যত গাছ-গাছালি হয়েছিল—পিচ-পাইন, বার্চ, অলডার, অ্যাস্পেন, আরও কত—সব কাবার হয়ে যায়। যখন সে জল নেমে যায় তখন আবার নির্বিঘ্ন তীরভূমি। জল যখন নিচে থাকে সব চাইতে, এর তীর সব চাইতে পরিষ্কার থাকে তখন—যেখানে জলে প্রতিদিন জোয়ার হয় সেই সব পুকুরের মতো নয়। পুষ্করিণীর এ পাড়ে আমার আস্তানার ঠিক পাশে পনের ফুট উঁচু একসার পিচ-পাইন গাছ মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেছে, যেন কোন ডাণ্ডা দিয়ে তাদের ঘা মারা হয়েছে। ফলে তাদের অনধিকার প্রবেশের সমাপ্তি ঘটেছে। এদের উচ্চতা থেকে আভাস পাওয়া যায় গতবার জল যখন বেড়েছিল তখন থেকে এইবার-কার বাড়ের কাল পর্যন্ত কত বৎসর কেটে গেছে। এই ওঠা নামা করে পুষ্করিণীটা তার তীরাধিকারের দাবি জানাচ্ছে। প্রতিবার তীরের তরুরা তিরোধান করছে, তারা তাদের কোন অধিকারে সেখানে পাত্তা পাচ্ছে না। সরোবরের ওষ্ঠদেশে গুম্ফবৃদ্ধির সুযোগ নেই, মধ্যে মধ্যেই লেহন ঘটছে বেচারিদের ভাগ্যে। জল যখন উঁচু থাকে, তখন অলডার, উইলো, আর মেপল গাছ, তাদের, কাণ্ডের সর্বদিক থেকে জলের নিচে গোছা গোছা কয়েক ফুট লম্বা শিরাল রাঙা মূল সব পাঠিয়ে দেয় মাটি থেকে তিন-চার ফুট ওপর পর্যন্ত। চেষ্টা যদি কোনক্রমে বেঁচে থাকতে পারে। আমার দেখা আছে, তীরে উঁচুউঁচু ব্লুবেরির ঝোপ এই ক্ষেত্রে প্রচুর ফল দিয়েছে, সাধারণত তারা ফল দেয় না।

কী করে সমগ্র তীরটা এমন সমান সমান ভাবে পাথর বাঁধানো হ'ল, এ কথার উত্তর দিতে কেউ কেউ ফাঁপরে পড়েছেন। আমার শহরবাসীরা সকলেই পুরনো ইতিহাসটা জানেন— বুড়ো লোকরা বলেন তাঁরা ছেলেবেলায় শুনেছেন গল্পটা। বহু প্রাচীন কালে ইণ্ডিয়ানরা এখানকার এক পাহাড়ের উপর এক 'পাউ-আউ' (পঞ্চায়েত) ডাকে। পুকুরটা যে পরিমাণ মাটির অভ্যন্তরে বলে এখন দেখা যায় পাহাড়টা আকাশের দিকে ঊর্ধ্বে সেই পরিমাণ উঁচু ছিল। কাহিনীটা এই

যে ইণ্ডিয়ানরা সেই সভায় ধর্মবিরুদ্ধ আলোচনা করে—যদিও এ অপরাধে ইণ্ডিয়ানরা কখনও অপরাধী হতে পারে না। তারা যখন আলোচনা করছে, তখন পাহাড়টা কেঁপে উঠে হঠাৎ মাটির তলে সেঁধিয়ে যায়। কেবল একটি মাত্র স্ত্রীলোক বেঁচে যায়। তার নাম ওয়ালডেন; সেই থেকেই পুষ্করিণীটার নাম। অনুমান করা হয় যে পাহাড়টা যখন কাঁপছিল, তখন পাহাড়টার গা বেয়ে এই সব পাথর গড়িয়ে পড়ে এই তীরভূমি গড়েছে। যাই হ'ক, একটা কথা অত্যন্ত ঠিক যে এখানে আগে কোন পুষ্করিণীর অস্তিত্ব ছিল না, এখন হয়েছে। ইণ্ডিয়ানদের এই কাহিনীর সঙ্গে এর আগে আমি যাঁর কথা বলেছি, সেই প্রাচীন অধিবাসীর বর্ণনার কোনই অনৈক্য নেই। তাঁর বেশ মনে আছে যে, প্রথম যেদিন এখানে তিনি খনি-সন্ধানী দণ্ড হাতে আসেন, ঘাসের চাপড়ার মধ্য থেকে ক্ষীণ বাষ্পরেখা উঠতে দেখেছিলেন, আর ক্রমাগতই হ্যাজেল গাছটা নিচে নির্দেশ করছিল। তাই তিনি এখানে জলাশয় খননের সিদ্ধান্ত করেন। এই পাথরগুলোর সম্বন্ধে এখনও অনেকেই মনে করেন যে পাহাড়ের গায়ে ক্রমাগত ঢেউ লেগে ঐ রকম হয়েছে—একথা ঠিক হতে পারে না। আমি লক্ষ্য করেছি যে চারপাশের পাহাড় আশ্চর্য রকমে ঐ একই রকম পাথরে ভর্তি। এমন যে এখন পুষ্করিণীটার খুব কাছ দিয়ে যেখানে রেল পাতা হয়েছে, তার দুই দিকেই ঐ পাথর গাদা করে তাদের দেওয়াল বানাতে হয়েছে। উপরন্তু, তীরটা যেখানে সব চাইতে খাড়া, পাথরের সংখ্যাও সেখানে সর্বাধিক। সুতরাং আমার কাছে এ আর রহস্য নেই। এর মিস্ত্রি আমার কাছে ধরা পড়ে গেছে। যদি এর নামটা ইংলণ্ডের কোন স্থানের নাম থেকে না নেওয়া হয়ে থাকে—যেমন স্যাফরন ওয়ালডেন,—তা'হলে মনে করা যেতে পারে যে এর আদি নাম ছিল 'ওয়ালড-ইন পণ্ড', (প্রাচীরবেষ্টিত পুষ্করিণী।)

পুষ্করিণীটা আমার জলের জন্যই যেন খোঁড়া হয়েছিল। বৎসরের সব সময়েই জল এর নির্মল, চার মাস আবার বেশ শীতলও। আমার মনে হয়, সেই সময়টায় এর জল শহরের আর সব জলের মতোই সুপেয়; বোধ হয় তাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। শীতকালে যেখানে হাওয়া লাগে, তার জল, যেখানে হাওয়া লাগে না—যেমন ঝরনা কি কুয়োর জলের চাইতে ঠাণ্ডা। যে ঘরটাতে বসতাম সেখানে পুষ্করিণীর যে জল তোলা ছিল, তার তাপ বিকাল পাঁচটা থেকে পরদিন—১৮৪৬ সালের ৬ই মার্চ দুপুর পর্যন্ত ছিল ৪২ ডিগ্রি। এই সময়টার মধ্যে থার্মোমিটারে কখনও কখনও তাপ ৬৫—৭০ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে, খানিকটা অবশ্য ছাদে রোদের তাপ লাগার জন্য। অর্থাৎ গ্রামের সব চাইতে ঠাণ্ডা জল যে সব কুয়োয় পাওয়া যায়, তাদের একটির সদ্যতোলা জলের চাইতেও পুকুরের জলের তাপ এক ডিগ্রি কম। ঐ দিনই বয়েলিং স্প্রিংয়ের জলের তাপ ছিল ৪৫ ডিগ্রি, অর্থাৎ যে ক'টা জল পরীক্ষা করা হয় তাদের মধ্যে

সব চাইতে গরম। কিন্তু গরমকালে আমার জানা সব জায়গার জলের চাইতে এইটের জলই সব চাইতে ঠাণ্ডা। বিশেষ এই সময়টাতে এর জলে বাইরের আর কোন বদ্ধ বা বাজে জল মিশতে পারে না। উপরন্তু, গরমকালে ওয়ালডেন-এর জল তার গভীরতার জন্য আর সব রোদ লাগা জলের মতো গরম হয় না। খুব গরমের মধ্যেও সচরাচর এক কলসী জল তুলে ভাঁড়ার ঘরে রেখে দিতাম, রাত্রে সে জল ঠাণ্ডা হয়ে থাকত, সারাদিন ধরে ঠাণ্ডাই থাকত। মধ্যে মধ্যে অবিশ্যি কাছাকাছি একটা ঝরনারও শরণ নিতাম। প্রথম যেদিন তোলা হয় সেদিন যেমন ভাল লাগত জলটা, এক সপ্তাহ বাসি হলেও তেমনি লাগত। তাছাড়া পাম্পের কটু স্বাদ থাকত না। গরমকালে কোন পুকুরের ধারে কেউ যদি তাঁবু ফেলেন, তিনি যেন তার ছায়ায় কয়েক ফুট মাটির নিচে এক কলসী জল পুঁতে রাখেন, বরফের বিলাসিতা থেকে অব্যাহতি পাবেন।

ওয়ালডেন-এ পিক্‌এরেল মাছ ধরা পড়েছে, একটা তো সাত পাউণ্ড ওজনের—আর একটির কথা বাদ দিচ্ছি, সেটি মহাবিক্রমে ছিপসুতো ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, জেলেটি বলে সেটার ওজন কমপক্ষে আট পাউণ্ড ছিল, কিন্তু দেখতে পায় নি সে—পার্চ, পাউট, কোন কোনটার ওজন দু-পাউণ্ডেরও ওপর, শাইনার, শিভিন অথবা রোচ, (লিউসিস্কাস পালকেলাস) গোটা কয়েক ব্রিম আর এক জোড়া ঈল, তাদের মধ্যে একটার ওজন চার পাউণ্ড—খুঁটিনাটি দিচ্ছি এই জন্য যে, মাছের ওজনই তার সুনামের একমাত্র পরিচয়। তবে ঈল মাছের কথা এ অঞ্চলে এ ছাড়া শুনি নি। আর আবছা মনে পড়ছে পাঁচ ইঞ্চি-টাক লম্বা একটা ছোট মাছ, গা রুপোর মতো ঝকঝকে, পিঠটা সবুজ-ঘেঁষা, অনেকটা ডেস মাছের জাত। এর কথা বিশেষ করে বলা এই জন্য যে, আমার সত্যের মধ্যে একটু রূপকথাও জড়িয়ে থাকুক। তবুও, এ পুষ্করিণীতে মাছ খুব বেশি মেলে না। যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়া গেলেও পিক্‌এরেল মাছই এর প্রধান গর্ব। আমি অন্তত তিন জাতের পিক্‌এরেল দেখেছি বরফে পড়ে আছে এক সঙ্গে; ঢ্যাঙা, পাতলা, ইস্পাতের মতো রঙ, নদীতে সচরাচর যেমন ধরা পড়ে মোটামুটি তারই মতো; ঝকঝকে সোনালী রঙের সবুজের আভা দেয় আর অত্যন্ত গাঢ়, এইটাই এখানে সব চাইতে বেশি; আরও একটার একেবারে সোনার রঙ, আগেরটার মতোই গড়ন কিন্তু সারা গায়ে মরিচ ছড়ানো ছোট ছোট গাঢ় বাদামী আর কাল চাকা-চাকা; সঙ্গে গোটা কয়েক ফিকে রক্তের লাল চাকা মেশানো প্রায় অনেকটা ট্রাউট মাছের মতো। এদের চলতি নাম রেটিকু-লেটাস এক্ষেত্রে খাটবে না, বরং নাম দেওয়া উচিত হবে গুট্টাটাস। শক্ত বাঁধুনীর মাছ এরা, আকার দেখলে যা মনে হয় ওজনে তার চাইতে বেশি। শাইনার, পাউট, পার্চ, যত মাছ এই পুকুরটায় আছে সকলেরই নদী আর অন্য সব পুকুরের মাছের চাইতে পরিষ্কার সুন্দর আর মজবুত গড়ন, কেন না এর

জল তাদের চাইতে নির্মল—অন্যদের মধ্যে এদের অনায়াসেই চেনা যায়। মৎস্যতত্ত্ববিদরা এদের কোন কোনটাকে নতুন জাতের মাছ ব'লে ধরবেন। পরিষ্কার জাতের ব্যাঙ, কচ্ছপ, কয়েক রকম খাদ্য-ঝিনুকও পুষ্করিণীটায় থাকে। মাস্করয়াট আর মিংক এর চারপাশে যে ঘুরে বেড়ায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কখনও কখনও কোন পরিব্রাজক কদর্মচর কূর্মও ঘুরে যায় এখানে। এক এক সময়ে সকালে নৌকোটা ঠেলতে গিয়ে বৃহৎ এক একটা কর্দম-কূর্মের বিশ্রামে ব্যাঘাত উপস্থিত করেছি, রাত্রের অন্ধকারে নৌকোর তলায় সে লুকিয়ে ছিল। বসন্তে হেমন্তে হাঁস আর রাজহাঁস এখানে খুব ঘোরে, শ্বেত-বক্ষ সোয়ালো (হিরুন্ডো বাইকলর) ভেসে বেড়ায় আর সারা গরমকালটা পিটউইট পাখির দল (টোটেনাস ম্যাকিউলেরিয়াস) কিচমিচ করে এর পাথর বাঁধানো ঘাটে। কোন কোন দিন জলের ধারে সাদা পাইন গাছের ওপর বাজ পাখিকে মাছের জন্য ওত পেতে থাকতে দেখেছি, আমাকে দেখেই পালিয়েছে। কিন্তু গাল পাখির ডানার ছায়ায় জায়গাটা কখনও অপবিত্র হয়েছে কি না সন্দেহ। বড় জোর বৎসরে একটা লুন পাখিকে সহ্য করতে হয় এর। এখানে এখন যেসব প্রাণী ঘোরা ফেরা করে তাদের মধ্যে এরাই উল্লেখযোগ্য।

ঝড় ঝাপটা না থাকলে পূর্বদিকের বালি ভরা ঘাটের কাছে, জল সেখানে আট কি দশ ফুট গভীর, এবং পুষ্করিণীটার আরও কয়েকটা জায়গায় এখানে ওখানে নৌকো থেকে দেখা যায় গোল গোল তাল তাল সব ঢিবি, বারো ফুট ব্যাস আর এক ফুট উঁচু, মুরগির ডিমের চাইতেও ছোট ছোট পাথরের সমষ্টি। চারদিকে কিন্তু খালি বালি আর বালি। প্রথমে মনে হবে কি জানি হয়তো কোন কাজের জন্য ইন্ডিয়ানরাই বরফের ওপর এগুলো বানিয়ে থাকবে, তারপর বরফ গলে যাবার পর এগুলো পুকুরের তলায় ডুবে যায়। কিন্তু আকারে তারা এমন সমান আর ওরই মধ্যে গোটাকয়েক বেশ বোঝা যায় একেবারে সদ্য সদ্য তৈরি, সুতরাং তা হতে পারে না। নদীতে যেমন দেখা যায় এও ঠিক তেমনি। কিন্তু এর জলে সাকার কি ল্যাম্প্রে মাছ তো নেই, তাই কোন মাছ থেকে জন্ম এদের ঠাহর হয় না। হয়তো শিভিন মাছের বাসা সব। জলের তলাকে রহস্যে মনোরম করে তোলে এরা।

তীরে অনেক বৈচিত্র্য আছে, তাই তত একঘেয়ে লাগবে না। চোখের উপর ভাসছে পশ্চিমের তীরটা, ভেতরের দিকে অনেক জায়গায় জল ঢুকে আঁকাবাঁকা করেছে, উত্তরের তীরটার তেজ বেশি আর সুন্দর ধনুকের মতো বাঁকা দক্ষিণের তীরটা, সেদিকটায় অন্তরীপের মতো পরপর ডাঙা, এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে—মনে হয় খাড়ি আছে সব ফাঁকের মধ্যে, যারা এখনও অনাবিষ্কৃত। জলের ধার থেকে পাহাড় উঠেছে, কেন্দ্রের ছোট হ্রদটার ঠিক

মাঝখানে দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় পেছনের দৃশ্য বোধ হয় এত মানানসই, আর বন বিশেষ করে এমন সুন্দর কোথাও নয়। কেন না জলের মধ্যে এর ছায়া প'ড়ে এই পটভূমির সর্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যমুখ তো তৈরি হয়ই, উপরন্তু এর আঁকাবাঁকা তীরও অতি স্বাভাবিক আর মনোহর সীমারেখা রচনা করে। কোদাল দিয়ে সাফ করা জমি কি চষা মাঠ হুমড়ি খেয়ে পড়লে যা হ'ত, এর কিনারায় তেমন কাঁচা কাজ কি ত্রুটি দেখা যাবে না। জলের ধারে ডালপালা মেলে দেবার মতো প্রচুর জায়গা পায় গাছগুলো আর প্রত্যেকটি গাছ তার সব চাইতে বলিষ্ঠ ডালটিকে সেদিকেই ঠেলে দেয়। স্বাভাবিক পাড় বুনেছে প্রকৃতি সেখানটাতে। তীরের ছোট ছোট ঝোপঝাড় থেকে স্তরে স্তরে চোখের দৃষ্টি ওপরে বড় বড় গাছে গিয়ে ওঠে। মানুষের হাতের কাজ একটাও দৃষ্টিতে পড়ে না। হাজার বছর আগের মতোই আজও জল তীর ধুয়ে বয়ে চলেছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের সব চাইতে সুন্দর আর মুখর প্রকাশ হ্রদে। এ হ'ল ধরিত্রীর চোখ। এর দিকে চাইলে দর্শক নিজের চরিত্রের গভীরতার পরিমাপ পায়। তীরের কাছটাতেই যে সব জলজ গাছ এর চারপাশে ঘিরে জন্মায়, তারা এর আঁখিপক্ষ্ম, আর চারদিকের কাননঘেরা পাহাড় আর খাড়া পাড় এর প্রশস্ত ভ্রূযুগ।

সেপ্টেম্বর মাসের সুন্দর আবহাওয়ায় বিকালের দিকে একটা ঝাপসা ভাব যখন বিপরীত দিকের তীর রেখাকে অস্পষ্ট করে তোলে, তখন পুষ্করিণীটার একেবারে পূব দিকটার মসৃণ বালুময় তীরে দাঁড়িয়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি "স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হ্রদের বুক" কথাটির উদ্ভব কোথায়। বিপরীত দিকে ঘাড় ফেরালে দেখতে পাওয়া যাবে বিস্তীর্ণ ভূমি জুড়ে অতিসূক্ষ্ম মাকড়সার জাল যেন দূরে পাইন বনের গায়ে চিকচিক করে উঠছে, বায়ুমণ্ডলের এক স্তরকে অন্য স্তর থেকে পৃথক করছে। মনে হবে যে গায়ে জল না লাগিয়ে একেবারে ঐ দিকের পাহাড় পর্যন্ত ওর নিচে দিয়ে হেঁটে যেতে পারা যায়। আর যে সব সোয়ালো পাখি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে তারা হয়তো এসে ওখানটায় বসে পড়বে। আর সত্যিই ওরা যেন ভুল করেই এমন ছোঁ মারে যে পড়ে পড়ে, তখন ভুল ভাঙে। পুকুর ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে চাইলে দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকতে হয়, আসল আর নকল দুই সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচাতে, দুই-ই সমান তীব্র। কিন্তু দুয়ের ফাঁক দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পুকুরের ওপরটা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেটা যাকে বলে স্ফটিকস্বচ্ছ। শুধু যেখানটায় স্কেটার পোকাগুলো—এর সর্বত্রই তারা সমান দূরে দূরে ছড়িয়ে আছে—রোদে চলাফেরা ক'রে অতিক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করছে, কিংবা হয়তো একটা হাঁস পাখা ঝাপটাচ্ছে, অথবা যে

কথা বললাম, কোন একটা সোয়ালো পাখি হয়তো এত নিচে ছোঁ মেরেছে যে একেবারে জলে ছোঁয়া লেগে গেছে, সেইটুকু জায়গা ছাড়া। হয়তো বা দূরে একটা মাছ শূন্যে লাফ দিয়ে একটা তিন-চার ফুট চাপ আঁকল, যেখান থেকে উঠল সেখানে এক ঝলক আলো দেখা গেল, আর যেখানে পড়ল সেইখানেও আর একটা ঝলক; কখনও বা সমগ্র চাপটাই রূপোর মত ঝকঝক করে উঠল; হয়তো বা একটা কাঁটাগাছ জলে ভাসছিল, কোন মাছ সেটাকে ঠুকরে সেখানটা একটু টোল খাওয়ালে। এ যেন কাঁচ গলে ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু এখনও জমে যায় নি। কয়টা দাগ যেন কাঁচের ভেতরকার খুঁতের মতো খাঁটি আর সুন্দর। দেখা যাবে সব জল থেকে আলাদা হয়ে খানিকটা বেশি চকচকে আর কাল জল, যেন অদৃশ্য মাকড়সার জাল দিয়ে ঘেরা আর জলপরীদের জলসা চলছে সেখানে। পাহাড়ের ওপর থেকে চাইলে দেখা যাবে প্রায় সব জায়গাতেই একটা না একটা মাছ লাফাচ্ছে। কেন না একটা পিক্‌এরেল কি শাইনার স্থির জলে কোন একটা পোকা ধরল কি অমনি সমগ্র হ্রদটার প্রশান্তিতে এমন আলোড়ন হ'ল যে চোখে পড়বেই। আশ্চর্য লাগে যে কি আড়ম্বরের সঙ্গেই না এই সামান্য ব্যাপারটির প্রচার করা হয়—কীটহত্যার এই কাহিনীটা—আমার সেই দূরের নীড় থেকেও নজরে পড়ত কি করে জলে ঢেউ উঠল, গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল একেবারে ছয় রড পরিমাণ ব্যাস সৃষ্টি ক'রে। লক্ষ্য করলে এও দেখা যাবে যে সিকি মাইল দূরে ওয়াটার-বাগ (জাইরিনাস) একটা এগিয়ে চলেছে ক্রমাগত স্থির জলের ওপর দিয়ে, কেন না চলবার সময় জলে আঁচড় কাটে ওরা, স্পষ্ট একটা তরঙ্গ-বিক্ষোভ হয়, দুদিকে দুটো বিভিন্নমুখী রেখার বেড়। কিন্তু স্কেটার তেমন কোন তরঙ্গ না তুলেই সড়-সড় করে চলে যায়। যখন জল তেমন বিক্ষুব্ধ থাকে স্কেটার কি ওয়াটার বাগ কিছুই দেখা যায় না তার ওপর। কিন্তু বোঝা যায়, জল স্থির থাকলে এরা ওদের আশ্রয় ছেড়ে তীর থেকে দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়ে, আর একটু একটু করে এগিয়ে সম্পূর্ণটা পাড়ি দেয়। হেমন্তকালে সূর্য উঠলে সূর্যের তাপ বেশ আমেজ করে গায়ে লাগাতে লাগাতে একটা ছোট কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে পুকুরের দিকে চেয়ে তার চাকা চাকা টোল খাওয়া রূপটা দেখতে বেশ লাগে। অন্য সময়ে এর জলে তো আকাশ আর গাছের ছায়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু এ সময়ে ছেদহীন এই আলপনা আঁকা চলে। এই বিস্তীর্ণ জলরাশির আর কোথাও কোন বাধা নেই। সুতরাং ঐ বিক্ষোভ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে ক্রমশ একেবারে মিলিয়ে যায়, যেমন কোন জলপাত্র নাড়লে তাতে যে কম্পমান বৃত্তের সৃষ্টি হয় সেগুলো কিনারায় গিয়ে উঠতে চায়, খানিক পরে আবার স্থির হয়ে যায়। একটা মাছ লাফ দিলে কি একটা পোকা পুকুরে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে

খবর প্রকাশ হ'ল ঐ বৃত্তাকার টোল খাওয়ার সৌন্দর্যের রেখাতে, যেন তার প্রস্রবণের নিত্য প্রবাহ সেটা, তার প্রাণের মৃদু স্পন্দন, তার বক্ষের ওঠানামা। আনন্দের আর বেদনার শিহরণের পরিচয় পৃথক নয়। হ্রদের নিসর্গরূপ কি প্রশান্ত! আবার মানুষের কাজও এখানে বসন্তকালে যেমন, তেমনি শোভা নেয়। প্রতিটি পত্র আর পল্লব আর পাথর আর মাকড়সার জাল ঝকঝক করছে এখন এই মধ্য-বৈকালে, যেন বসন্তকালের সকালবেলার শিশিরে ধোয়া। একটা দাঁড় কি একটা পোকা নড়লেই আলোর ঝলকানি লাগে, আর দাঁড় একটা যদি পড়ে কি মধুর তার প্রতিধ্বনি!

সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসের এমনি দিনে বনের নিখুঁত একটা আয়না হয়ে ওঠে ওয়ালডেন। চারপাশে পাথরের কাজ করা, আমার কাছে সব অমূল্য, যেন কত অসামান্য, কত দুষ্প্রাপ্য। সম্ভবত মর্ত্যভূমিতে আর কিছুই হ্রদের মতো এত সুন্দর, এত নির্মল এবং সঙ্গে সঙ্গে এত বিশাল নয়। আসমানী জল। প্রাচীরের প্রয়োজন নেই। জাতির পর জাতি আসে যায় কেউ অপবিত্র করে না। এমন আয়না যে কখনও পাথরে ভাঙে না, পারা ঝরে যায় না, মোড়া সোনার কাজ প্রকৃতি নিয়ত মেরামত করছে। কোন ঝড় বা আঁধি এর চির নতুন মুখশ্রীকে ম্লান করতে পারে না। এমন যে কোন অপবিত্র জিনিষ এর মধ্যে ফেললে আবছা রোদের সম্মার্জনীয় ঝাড়-পোঁছে ডুবে যায়—যেন আলোর একটা ঝাড়ন সেটা। এর গায়ে নিঃশ্বাস ফেললে কোন দাগ ধরে না, নিজের নিঃশ্বাস অনেক ওপরে মেঘ হয়ে ভেসে বেড়াবার জন্য পাঠায় আর সেই সঙ্গে নিজের নিঃশ্বাস নিজের বুকেও ছায়া ফেলে।

আকাশের যে ভাব জলের বুকে তা ধরা পড়ে। ক্রমাগতই নতুন প্রাণ আর গতি পাচ্ছে এ ওপর থেকে। আকাশ আর মৃত্তিকার মাঝামাঝি প্রকৃতি এর। মাটির বুকে হাওয়ায় গাছ লতা পাতা দোলে, কিন্তু হাওয়ায় জল নিজেই ঢেউয়ে কাঁপে। হাওয়া এর কোথায় ধাক্কা মারলে তা বুঝতে পারি আলোর চমক আর ফুলকিতে। এর বুকের ভেতর আমরা যে চেয়ে দেখতে পারি, লক্ষ্য করবারই মতো ব্যাপারটা। এমনি করে হয়তো শেষে একদিন শূন্যের বুকের ভেতরেও চেয়ে দেখতে পারব আমরা, বুঝতে পারব আরও বায়বীয় কোন আত্মার বিচরণ সে বুকে।

অক্টোবর মাসের শেষাশেষি যখন শীতের শিশির ঘন হয়ে ওঠে, স্কেটার আর ওয়াটার-বাগরা সে বৎসরের মতো অদৃশ্য হয়। তখন আর নভেম্বর মাসের পরিষ্কার দিনে, বলতে গেলে কিছুই থাকে না এর বুকে ঢেউ জাগাতে। নভেম্বর মাসের এক বিকেলে, কয়েকদিন বিরামহীন ঝড়বৃষ্টির পর আকাশের অবস্থা শান্ত, কিন্তু তখনও মেঘে সম্পূর্ণ ঢাকা আর হাওয়া কুয়াসায় ভরা; লক্ষ্য করেছি তখনও পুকুর আশ্চর্য রকমে স্থির, এমন যে এর উপরটা ঠাহর

করে দেখা কঠিন। অক্টোবর মাসের সেই আলোকোজ্জ্বল ছায়া আর দেখা যাচ্ছে না এর বুকে, তার জায়গায় দেখা যাচ্ছে চারপাশের পাহাড়ের নভেম্বর মাসের বিষণ্ণ ছায়া। যতদূর সম্ভব আস্তে আস্তে এর উপর দিয়ে চলেছি, কিন্তু আমার নৌকো থেকে সামান্য যে ঢেউ উঠছে, তা ছড়িয়ে পড়ছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি ততদূর—ছায়াগুলো শির-তোলা দেখাচ্ছে। এর উপরে চেয়ে ছিলাম, নজরে পড়ল দূরে কি ধিকি ধিকি মিটমিট করছে, যেন স্কেটার পোকাদের যারা শীতের শিশিরপাত থেকে বেঁচেছে জড়ো হয়েছে গিয়ে সেখানটায়, কিংবা হয়তো জল এখন স্থির, তাই দেখা যাচ্ছে তলা থেকে ফুঁসে ফুলে উঠছে একটা ঝরনা। একটা জায়গায় আস্তে আস্তে দাঁড় চালিয়ে এগিয়ে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম আমার চার দিক ঘিরে পাঁচ ইঞ্চিটাক লম্বা সব কোটি কোটি ছোট পার্চ মাছ, সবুজ জলের মধ্যে গাঢ় তামাটে রঙ সবগুলোর, খেলা করছে আর ক্রমাগত ঠেলে উঠছে উপর দিকে, টোল তুলছে, মধ্যে মধ্যে বুম্বুদ ওঠাচ্ছে। এই পরিষ্কার আর আপাত অতল জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আমার মনে হ'ল আমি যেন একটা বেলুনে চড়ে শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। ওরা যে সাঁতার কাটছে, আমার মনে হ'ল ওরাও শূন্যেই উড়ছে এখানে ওখানে, যেন এক ঝাঁক পাখি, আমি যে স্তরে আছি, ঠিক তার নিচের স্তরে ডাইনে বাঁয়ে উড়ছে। নৌকোতে খাটানো পালের মতো ওদের ডানা চারদিকে মেলা। পুকুরটাতে এমনি অনেকগুলো ঝাঁক। শীত পড়বার এখনও যে সময়টা বাকি, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে উপভোগ করতে চায় সে সময়টা—শীতে আবার এর প্রশস্ত আলোর প্রবেশ-পথ ঢাকা পড়বে বরফের ঝিলিমিলিতে—মনে হচ্ছে যেন এর বুকে এখানে হাওয়ার ঝাপটা লাগল কিংবা কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল ওখানে। যখন যথেষ্ট হুঁশিয়ার না হয়ে এগিয়ে গেছি, ভয় খেয়ে গেছে ওরা, হঠাৎ ঝপাৎ আওয়াজ করে লেজ দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে পালিয়ে গেছে তৎক্ষণাৎ, একেবারে জলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে। যেন কেউ একটা গাছের ডালের ঝাড়ু দিয়ে ঘা লাগিয়েছে জলে। অবশেষে হাওয়া উঠেছে, কুয়াসা আরও ঘন হয়েছে, ঢেউগুলো ঝাঁপাঝাঁপি সুরু করেছে, পার্চ মাছগুলো জল প্রায় ছেড়ে আগের চাইতে অনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠছে—শ'য়ে শ'য়ে তিন ইঞ্চি লম্বা সব কালোফোঁটা জড়ো হয়েছে পুকুরের উপরে। এক বছর ডিসেম্বর মাসের পাঁচ তারিখ হবে তখন, তত দেরিতেও টোল খেতে দেখলাম একে। কুয়াসায় চারপাশ ভরা, মনে হয়েছে এক্ষুনি বৃষ্টি আসবে ভীষণ রকম, তাড়াতাড়ি দাঁড়ে গিয়ে বসেছি আর নৌকো চালিয়েছি বাসার দিকে। মনে হয়েছে বৃষ্টি বেশ বেড়ে গেছে তারই মধ্যে, কিন্তু গালে এক ফোঁটাও পড়ে নি তখনও, ভয় পেয়েছি আপাদমস্তক ভিজতে হবে। হঠাৎ টোল খাওয়া থেমে গেছে। শুধুই পার্চ মাছের কান্ড কারখানা। আমার দাঁড় টানার আওয়াজে ভয়ে

পালিয়ে গিয়েছিল পুকুরের একেবারে নিচে, মনে হয়েছিল ওদের ঝাঁকগুলো তবে অদৃশ্য হ'ল। অতএব সারা বিকালটা খরাই কাটল আমার।

প্রায় ষাট বৎসর আগে যখন চারপাশে বনজঙ্গল আরও নিবিড় ছিল, পুকুরটা অন্ধকার ছিল, এক বৃদ্ধ এই পুকুরে আসা যাওয়া করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি, সে সময়টায় জায়গাটা হাঁস আর অন্য জলচর পাখিতে গমগম করত, অনেক ঈগল পাখি দেখা যেত চারধারে। এখানে তিনি মাছ ধরতে আসতেন। পাড়ে একটা কাঠ-কোঁদা ডোঙা পেয়েছিলেন, সেটাকে কাজে লাগাতেন। দুটো সাদা পাইনের কুঁদো কুঁদে জোড়া লাগিয়ে তৈরি সেটা, দুটো দিক তার চৌকো ক'রে কাটা। দেখতে অত্যন্ত বিশ্রী, কিন্তু অনেক বছর টিকে ছিল, তারপর এর খোলের মধ্যে জল ঢুকে যায় এবং হয়তো জলে তলিয়ে যায়। সেটা কার সম্পত্তি কিছুই জানেন না তিনি, পুকুরটাই হয়তো মালিক হবে। হিকোরি গাছের বাকলা টুকরো করে জুড়ে তাঁর নোঙরের দড়া বানাতেন তিনি। আর এক বৃদ্ধ, সে কুমোর, বিপ্লবের আগে পুকুরের কাছে বাসা ছিল তার, তাঁকে বলেছিল যে পুকুরের তলায় লোহার সিন্দুক আছে একটা। সেটা দেখেছে সে। কখনও কখনও ভেসে তীরে এসে উঠত, কাছে যেতেই আবার গভীর জলে ডুব মেরে অদৃশ্য হ'ত। এই পুরনো কাঠ-কোঁদা ডোঙার কথা শুনে খুশি হয়েছিলাম। তার আগে ছিল ইন্ডিয়ানদের একটা ডোঙা, কাঠেরই তৈরি, কিন্তু গড়নটা সুন্দর ছিল। হয়তো প্রথম অবস্থায় পাড়ের উপরে একটা গাছ ছিল সেটা। তারপর একদিন জলের কাছে যেন আত্ম-সমর্পণ করলে এক যুগ ধরে তার বুকে ভেসে থাকবার ইচ্ছায়—এই হ্রদটার তরণী হবার যোগ্য তো সেই। আমার মনে পড়ে প্রথম যেদিন এর অতলে উঁকি মেরেছিলাম, আবছা দেখতে পেয়েছিলাম তলায় অনেক বড় বড় গাছ জমে আছে। হয়তো বহু আগে সেগুলো ঝড়ে উড়ে এসেছিল কিংবা গত কাঠ কাটার মরসুমে বরফে ফেলে রাখা হয়েছিল তাদের, কাঠ তখন সস্তা ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন এখন।

ওয়ালডেন-এ প্রথম যেদিন নৌকো চালাই, এর চারপাশ জুড়ে তখন মোটা মোটা উঁচু পাইন আর ওক গাছ। কয়েকটা খাড়িতে জলের ঠিক উপরেই যে গাছগুলো, তাদের গা বেয়ে দ্রাক্ষালতা। দ্রাক্ষাকুঞ্জের এই সারের নিচে দিয়ে একটা নৌকো যেতে পারত। এর পাড়ের পাহাড় সব এত উঁচু যে পশ্চিম দিকের প্রান্ত থেকে নিচের দিকে চাইলে মনে হ'ত পুরাকালের চক্রাকার রঙ্গমঞ্চ একটা, বনদেবতাদের কোন অভিনয় হবে সেখানে। যখন তরুণ ছিলাম অনেক সময় কাটিয়েছি এর বুকের উপর ভেসে বেড়িয়ে, পশ্চিমে বাতাস যেদিকে খুশি সেদিকে নিয়ে গেছে। দাঁড় বেয়ে নৌকোটাকে মাঝখানে নিয়েছি, তারপর চিতপাত হয়ে শুয়ে পড়েছি নৌকোটার বসবার

জায়গা জুড়ে। গ্রীষ্মের সকাল। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছি। হঠাৎ নৌকোটা বালিতে ঠেকেছে মনে হ'ল। উঠে বসলাম দেখতে ভাগ্য আমার কোন কূলে এসে ঠেকল। শ্রমশিল্প বলতে সে সময়ে আলসেমিই সব চাইতে আকর্ষণ করত আর তার ফলও পেতাম। অনেক দিন সকালেই পালিয়ে গেছি, দিনের এই সব চাইতে মূল্যবান সময়টা এমনি ভাবে কাটাতে ইচ্ছা হয়েছে ব'লে। কেন না সম্পদশালী ছিলাম আমি, টাকাকড়ির দিক দিয়ে নয়, যৌবন-দিবসের চিত্ত-তারুণ্যের দিক দিয়ে। মুক্ত হস্তে ব্যয় করতাম সেসব। আমার আরও বেশি দিন সে সময়টায় কারখানায় কি গরুমশায়গিরি করে নষ্ট হয় নি বলে দুঃখও হয় না। আমি চলে এসেছি তার তীর ছেড়ে। কাঠুরেরা তারপর গাছ-গাছড়া কেটে জায়গাটাকে আরও খালি করে ফেলেছে। এখন আরও কত বছর ধরে সেখানে বনের নির্জন পথ দিয়ে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। চলবে না দেখা তার ফাঁক দিয়ে ছবির মতো সেই জল। আমার কাব্যমানসী অতঃপর বাণীহারা হলে তাকে যেন মার্জনা করা হয়। কুঞ্জ-বিতানই যখন নির্মূল করা হ'ল, তখন পাখিদের কলকাকলি শোনার বাসনা কেন?

জলের তলার সেই গাছের গুঁড়িগুলো, পুরনো কাঠ-কোঁদা সেই ডোঙাটা, চারপাশের অন্ধকার বন-জঙ্গল সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে আজ। গ্রামবাসীরা ভাল করে জানেই না কোথায় পুষ্করিণীটার অবস্থান। তারা সেখানে গিয়ে স্নান আর জলপান না করে—যে জলকে অন্তত গঙ্গাজলের মতো পবিত্র রাখা উচিত—সেই জলকে পাইপে করে গ্রামে নিয়ে আসতে চায় তাদের বাসন-কোসন ধুতে! তারা আজ বন্দুকের ঘোড়ার মতো টিপে আর বোতাম চেপে ওয়ালডেন লাভ করতে চায়। সেই শয়তান লৌহাশ্ব, যার কর্ণপটাহবিদারণকারী হ্রেষা শহরের সর্বত্র শোনা যায়, পদ-ঘর্ষণে বয়েলিং স্প্রিংকে সে পংকিল করেছে, ওয়ালডেন তীরের সমগ্র তরু নিঃশেষে চর্বণ করেছে, ও তো সেই ট্রোজানদের অশ্ব,—উদরভাগে পুরে এনেছে হাজার লোক, অর্থগৃধ্নু গ্রীকদের উদ্ভাবন ও। কোথায় দেশের রক্ষক, মূর হলের মূর শ্রেষ্ঠ, ডিপ কাটে গিয়ে সম্মুখীন হও সে অশ্বের, স্ফীতকায় ঐ পশ্বা-ধমের পঞ্জরাস্থির মধ্যে প্রতিহিংসার বর্শার আঘাত হানো।

তথাপি, আজও পর্যন্ত যত চরিত্র দেখেছি, তার মধ্যে ওয়ালডেন-এর বৈশিষ্ট্যই সব চাইতে কম ক্ষয় পেয়েছে, সব চাইতে বেশি রক্ষা করেছে সে নিজ পবিত্রতা। অনেক মানুষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার, কিন্তু সে সম্মানলাভের যোগ্যতা কারও নেই। কাঠুরেরা এর গাছ কেটে প্রথম এক তীর পরে অন্য তীর রিক্ত করেছে, আইরিশরা খাটাল খাড়া করেছে এর পাশে, রেলরাস্তা এর সীমানায় অনধিকার প্রবেশ করেছে, বরফ-ব্যবসায়ীরা একবার

দোহন করেছে একে, তবু আজও এর পরিবর্তন হয় নি। এর যে জল আমার যৌবনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, আজও সে আছে, পরিবর্তন যা হয়েছে তা আমার। কত ছোট-খাট বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে এর বুকে, কিন্তু কোন বলিরেখাই স্থায়ী আসন লাভ করে নি সেখানে। চিরযৌবনা এ, আজও আগের মতো এখানে দাঁড়ালে দেখতে পাব, একটা সোয়ালো পাখি ছোঁ মেরে এসে ডুব দিল এর বুকে, নিশ্চয়ই কোন পোকা ধরতে চায়। আজ রাত্রে আবার আমাকে চঞ্চল করেছে এ, যেন কুড়ি বছরের বেশি কাল প্রায় রোজ তাকে দেখি নি আমি—কেন, এই তো সেই ওয়ালডেন, সেই কানন-ঘেরা হ্রদ, অনেক বছর আগে আবিষ্কার করেছিলাম যাকে। গত শীতে এখানে একটা বন কেটে ফেলা হয়, আর একটা সমান উল্লাস নিয়ে মাথা খাড়া করে উঠছে এর তীরে। সেদিনও তার বুকে যে ভাবের বান দেখেছি আজও তাই দেখছি। সেদিনও যেমন ছিল, আজও তেমনি এ এর নিজের আর এর স্রষ্টার প্রাণোচ্ছল সেই আনন্দ আর সুখ হয়ে আছে, হয়তো বা আমারও। কোন তেজস্বী পুরু-ষের রচনা এ, সন্দেহ নেই তাতে; তাঁর মধ্যে দোষের লেশ ছিল না। নিজের হাতে এই জলাশয়কে রূপ দিয়েছিলেন তিনি, নিজের মনে একে গভীর আর পরিষ্কার করেছিলেন এবং নিজের ইচ্ছাতে কনকর্ডকে উৎসর্গ করে গেছেন। আমি এর মুখ দেখে বুঝি, সেই একই ভাবনার প্রতিচ্ছবি সেখানে। বলতে ইচ্ছা করে, ওয়ালডেন, তুমি কি সেই?

স্বপনে ভাবি নি হেন,
নাম রেখে যাব কোন;
ওয়ালডেন-এরই আমি যত,
স্বরগ বিধাতার নই তত।
এর পাথর বাঁধানো তীর আমি,
যে হাওয়া বয়ে যায় দূরগামী,
আমার ভরা হাত মুঠোময়
ইহারই জল আর বালু বয়;
ইহার সুগোপন ধন-ভবন
রয় আমার ভাবনায় চিরখন ॥

লৌহ-শকট কখনই ফিরে তাকায় না এর দিকে। আমার তবু মনে হয় এর ইঞ্জিনীয়ার, ফায়ারম্যান, ব্রেকম্যান আর যাদের যাদের সিজন টিকিট আছে সেই প্যাসেঞ্জাররা—প্রায়ই যারা দেখতে পায় একে, মহত্তর হয় একে দেখবার ফলে। রাত্রে ইঞ্জিনীয়ার ভুলে থাকে না, অথবা তার প্রকৃতি তাকে ভুলতে দেবে না যে, দিনে অন্তত একবারও সে এই নির্মল, নিষ্কলুষ দৃশ্যের দর্শন লাভ

করেছে। একবার দর্শনেই স্টেট স্ট্রীট আর ইঞ্জিনের ধোঁয়াকালি ধোয়ার কাজ হয়। এর নামকরণ হ'ক্ 'বিধাতার বারি,' আমার প্রস্তাব এই।

আগে উল্লেখ করেছি যে ওয়ালডেন-এ জল ঢোকবার বা বেরোবার কোন পথ চোখে পড়ে না। কিন্তু একটু উঁচুতে যে ফ্লিণ্ট পণ্ড, তার থেকে দূরে আর ঘুরিয়ে হ'লেও তার সঙ্গে এর এক পক্ষে আত্মীয়তা আছে, ওদিক থেকে এদিকে এসেছে পর পর অনেকগুলো ছোট ছোট পুষ্করিণীর সূত্রে। অন্য পক্ষে, এর খুব সোজাসুজি, স্পষ্ট চোখে পড়ার সম্বন্ধ হচ্ছে একটু নিচুতে কনকর্ড নদীর সঙ্গে, সেও কতকগুলো পুষ্করিণীর সূত্রেই। এদের খাত বেয়েই কোন সুদূর ভূতাত্ত্বিক যুগে এর ধারা প্রবাহিত ছিল। ভগবান না করুন, কিন্তু একটু খুঁড়লেই আবার হয়তো সে ধারার পুনঃসঞ্চালন সম্ভব হতে পারে। এতদিন ধরে বনবাসী তপস্বীর মতো সংযম আর কৃচ্ছ্র সাধন করে এসে যে আশ্চর্য নির্মলতা অর্জন হয়েছে এর, তাতে, এর তুলনায় পংকিল ফ্লিন্ট পণ্ডের জল এর সঙ্গে মিশিয়ে দিলে বা এর মিষ্টত্ব সাগর-তরঙ্গে কোনদিন বিলীন হতে দিলে কার না দুঃখ হবে?

ওয়ালডেন-এর পূর্বদিকে প্রায় এক মাইল গেলেই আমাদের বৃহত্তম হ্রদ আর স্থলীয় সমুদ্র লিংকন অঞ্চলের ফ্লিন্ট অথবা স্যান্ডিপণ্ড পাওয়া যাবে। এর চাইতে অনেক বড়, একশ সাতানব্বই একর পরিমাণ জমি জুড়ে তার এলাকা বলা হয়। আর মাছ সেখানে এর চাইতে বেশি। কিন্তু এর তুলনায় অগভীর আর তেমন কিছু নির্মলও নয়। বনের পথ দিয়ে হেঁটে সেখান পর্যন্ত যাওয়া আমার প্রায়ই অবসর বিনোদনের ব্যাপার ছিল। সময়টা কাটত ভাল। আর কিছু না হ'ক গায়ে খানিকটা খোলা হাওয়া লাগত, ঢেউয়ের খেলা দেখতে পাওয়া যেত আর তাই দেখে নাবিকদের কথা মনে জাগত। হেমন্তকালে জোর হাওয়া দিলে সেখানে চেস্‌নাট কুড়োতে যেতাম। বাদামগুলো জলে পড়ে ভেসে ভেসে আসত পায়ের কাছে। এর জলা-জংলী গাছ-পাতায় ঢাকা কূল ঘেঁষে গুড়িগুড়ি চলেছি এক দিন, মুখে এসে লাগছে টাটকা জলের ঝাপটা, হঠাৎ নজরে পড়ল একটা নৌকোর ভাঙাচোরা ধ্বংসাবশেষ, পাশ দুটো নেই, পাতিতৃণ ঢাকা এর চ্যাপ্টা তলাটার আভাস পাওয়া যায় কি যায় না। কিন্তু কাঠামোটা সুস্পষ্ট, যেন শিরাল একটা সুবৃহৎ বিশীর্ণ ঘোড়া। সমুদ্রতীরে বহু ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একে রাখলে বেশ নজরে পড়ে আর তা থেকে যা শিক্ষা হয় তাও মূল্যবান। এত দিনে নিশ্চয়ই সেটা পচে গলে ঘাস পাতার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, পুকুরের তীর থেকে কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই তার— তাকে ভেদ করে উঠেছে নলখাগড়া আর ফ্ল্যাগ। পুকুরটার উত্তর দিকে তলার বালিতে ঢেউ তোলা দাগগুলো জলের চাপে বেশ দৃঢ় আর কঠিন, এমন যে

পায়ের ছাপ পড়ে না আর হুবহু তাদের নকলে — যেন ঢেউরাই লাগিয়েছে— শর গাছ, সার সার সব ইণ্ডিয়ানদের সেপাই, ঢেউ খেলানো, একটার পর একটা ছোট বড় ভাগে — দেখে মাত হয়ে যেতাম। সেখানেই দেখেছি সংখ্যায় অনেক, অদ্ভুত গোল গোল চাপড়া, মনে হয় মিহি ঘাস আর শিকড়ে তৈরি, হয়তো পাইপওয়ার্টের আঁটি হবে, আধ ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যাস, একেবারে গোল। তলার বালিতে অগভীর জলে এরা দূরে কাছে ভেসে ভেসে বেড়ায়, কখনও কখনও কূলে এসে ঠেকে। হয় সবটাই ঘাস, নয় কিছুটা বালি ভরাও থাকে ভিতরে। প্রথমে মনে হবে নুড়ি-পাথরের মতো এরা ঢেউয়ের ক্রিয়াতেই গড়ে উঠেছে, কিন্তু এদের মধ্যে সব চাইতে ছোট যেগুলো, আধ ইঞ্চিটাক লম্বা, তারাও ঐ সব আজে-বাজে মালে তৈরি; সেগুলোকে বৎসরের একটা সময়েই জমতে দেখা যায়। তাছাড়া ঢেউ কোন জিনিস গড়ে তোলে না, বরং গড়ে তোলা জিনিসকে ধ্বসিয়ে দেয়। অনির্দিষ্ট কাল ধরে শুকনো হয়ে টিকে থাকলেও এরা তাদের গঠন রক্ষা করে চলে।

ফ্লিন্ট-এর পণ্ড! আমাদের নামভাণ্ডার এমনই নিঃসম্বল। একটা ইল্লুতে নির্বোধ চাষা এই নীল হ্রদের ঘাড়ের কাছে ক্ষেত-খামার খাড়া করে তার তীরভূমির গাছপালা কেটে নির্মমের মতো তাকে নিঃস্ব করেছে, এর স্কন্ধে তার নাম চাপাবার কি অধিকার ছিল? হাড়-কঞ্জুষ একটা, চকচকে একটা সেণ্ট কি ঝকঝকে একটা ডলারের চাইতে ভাল দৃশ্য যার কাছে আর নেই, তারই মধ্যে তার নিজের নির্লজ্জ মুখের ছায়া দেখলেই হ'ত। এখানে কতকগুলো বুনো হাঁস বাসা বেঁধেছিল, সে মনে করত তারাও অনধিকার প্রবেশ করেছে, আঙুলগুলো সব আঁকড়ে ধরবার বহুকালের অভ্যাস থেকে কুঁকড়ে কর্কশ রাক্ষসের থাবার মতো হয়ে গেছে—না, এর ও'নাম আমার জন্য নয়। তাকে দেখতে কি তার কথা শুনতে ওখানে আমার যাওয়া নয়। লোকটা কখনও দেখে নি একে, কোনদিন স্নান করে নি এখানে, কখনও ভালোবাসে নি একে, কখনও এর রক্ষণাবেক্ষণ করে নি, এর কোন সুখ্যাতি করে নি কখনও, এর সৃষ্টির জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ পর্যন্ত দেয় নি কোন দিন। যে সব মাছ সাঁতার কাটে এখানে, বনের পাখি আর জানোয়ার যারা ঘোরা ফেরা করে, বনের ফুল যে সব এর পাড়ের ধারে ফোটে, কিংবা কোন বুনো-লোক কি শিশু, যার ইতিহাসের সূত্র এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে—তাদের কারও নামে এর নাম হওয়া ঢের ভাল। শুধু কবালা ছাড়া এর মালিকানার যোগ্যতার কোন প্রমাণ দিতে পারবে না যে লোকটা—তাও তো তারই দরের কোন পড়শীর কি আইন সভার দেওয়া; আবার এমন লোককে যে এর অর্থমূল্য ছাড়া আর কোন মূল্যের কথা ভাবতেই পারে না—তার নামে এর নাম হওয়া উচিত নয়। লোকটার এখানে থাকার ব্যাপারটা হয়তো এর তীরভূমির পক্ষে অভিশাপ হয়, এর

চারদিককার স্থল তো নিঃশেষ করেছেই, সুযোগ পেলে এর জলও নিঃশেষ করত নিশ্চয়ই। এখানে ইংলণ্ড-মার্কা বিচালি কি ক্র্যানবেরি না গজাতে পেরে নিশ্চয়ই তার দুঃখের অন্ত ছিল না, তার চোখে সে ক্ষতিপূরণ হতে পারে এমন কোন গুণ এর নেই—পারত তো এর জল নিংড়ে কাদার দরে বিক্রি করে দিত একে। এর জলে তার মিল পর্যন্ত চলে নি, এর রূপ দেখে সুবিধা কিছু হয় নি তার। তার খাটুনিকে পর্যন্ত আমি শ্রদ্ধা করি নে, তার খামারকেও নয়— সেখানে সব কিছুর মূল্য তো টাকায়। পারত তো এর দৃশ্যকে তথা নিজের ভগবানকে বাজারে নিয়ে গিয়ে ওঠাত সে, যদি তার বদলে কিছু পায়। বাজারই তার ভগবান। তার খামারে বিনা মূল্যের কিছুই ফলে না, ডলার ছাড়া তার ক্ষেতে কোন ফসল হয় না, তার মাঠে কোন ফুল হয় না, তার গাছে কোন ফল হয় না। প্রকৃত ঐশ্বর্য ভোগ করা যায় এমন দারিদ্র্য চাই আমি। চাষীরা আমার শ্রদ্ধার পাত্র, আমার বেশ লাগে তাদের, যে অনুপাতে তারা গরিব সেই হিসাবে। মডেল ফার্ম! একগাদা আবর্জনার মধ্যে একটা বাড়ি খাড়া করা হয়েছে ব্যাঙের ছাতার মতো; মানুষ, ঘোড়া, ষাঁড়, শুয়োর সকলেরই ঘর পাশাপাশি, পরিষ্কার অপরিষ্কার নেই কিছু। লোকজনে ভর্তি। একটা বিরাট গামলা চর্বির; সারের আর ঘোলের গন্ধ সর্বত্র। উন্নত কৃষি-ব্যবস্থার অধীন সব—মানুষের বুদ্ধি আর মনও তাই। যেন দেবমন্দিরের আঙিনায় আলু গজানো হচ্ছে। এই তো মডেল ফার্ম।

না, না। মানুষের নামে সুন্দর সুন্দর ভু-দৃশ্যের অঞ্চলের নামকরণ করতেই হয় যদি, সে যেন মহত্তম আর যোগ্যতম মানুষের নামে হয়। অন্তত আইকেরিয়ান উপসাগরের মতো সত্যানুসারী নামকরণ হ'ক আমাদের হ্রদ-গুলোর—যেখানে “সাহস দুর্জয়, কাঁপিছে তীরময়।”

ফ্লিন্ট-এ যাবার পথেই পড়ে গুজ পন্ড। আয়তনে ছোটই। এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কনকর্ড নদীরই বিস্তার ফেয়ার-হ্যাভ্‌ন, আয়তনে সত্তর মাইল বলে শোনা যায়। ফেয়ার-হ্যাভ্‌ন ছেড়ে দেড় মাইল দূরে হোয়াইট পন্ড, আয়তনে চল্লিশ একর। এই আমার হ্রদ প্রদেশ। এরা আর তার সঙ্গে কনকর্ড নদী হচ্ছে আমার জল-রাজ্য। বছরের পর বছর, দিবা-রাত্র যখন যা বয়ে নিয়ে গেছি, আমার সে কাজে তারা সাহায্য করেছে।

কাঠুরেরা, রেল-রাস্তা আর আমি নিজে ওয়ালডেনকে কুৎসিত করেছি। এখন বোধ হয় আমাদের জলাশয়দের মধ্যে সব চাইতে চিত্তাকর্ষক, সব চাইতে সুন্দরও বলা যায়, বনপ্রদেশের মণি হচ্ছে হোয়াইট পন্ড। এর জলের নির্মলতার জন্যই হ'ক আর বালির রঙের জন্যই হ'ক, নামটা যে জন্যই পাক, বড় আটপৌরে নাম এটা। এই দিক থেকে এবং আরও দিক থেকে এ ওয়াল-

ডেন-এর যমজ ভাই, ছোট। দু'জনের মধ্যে সাদৃশ্য এত বেশি যে সবাই বলবে মাটির তলা দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ক আছে। মারাত্মক ভ্যাপসা গরমের দিনে, বনের ফাঁক দিয়ে ওয়ালডেন-এর জল যেখানে কম সেখানে চাইলে যেমন দেখা যাবে জলের তলার রঙের ছায়ার ছোপ লেগেছে জলে, এরও জল তেমনি সবুজ আর নীল মিশে ধোঁয়াটে, সমুদ্রের জলের মতো নীল। অনেক দিন আগে সিরিশ কাগজ তৈরি করতে গাড়ি বোঝাই বালি যোগাড় করার জন্য সেখানে যেতাম। আজও সেখানে যাওয়ার বিরাম ঘটে নি আমার। এখানে যাওয়া আসা করেন, এমন একজন এর নামরকণ করতে চান হরিৎ সরোবর। বোধ হয় নিচের কাহিনীর হিসাবে এর নাম ইয়েলো পাইন লেক হ'তে পারে। বছর পনের আগে এখানে একটা পিচ পাইন গাছের মাথা দেখা যেত। এ অঞ্চলে তাকে বলে ইয়েলো পাইন—আলাদা কোন জাতের গাছ নয়। তীর থেকে অনেকটা দূরে গভীর জলের উপর মগ-ডালগুলো ঝুঁকে পড়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, পুকুরটা এককালে মজে যায়, তারও আগে জঙ্গলে ভরা ছিল জায়গাটা, গাছটা সেই সময়কার। ম্যাসাচুসেট্‌স্ হিস্টরিকাল সোসাইটি সংগ্রহের মধ্যে, বেশ কিছুদিন আগে, ১৭৯২ সালে এর জনৈক অধিবাসীর লেখা 'কনকর্ড শহরের ভূসংস্থান বিবরণী (টপোগ্রাফিকাল ডেসক্রিপস্‌ন অব দি টাউন অব কনকর্ড)' আমি পড়েছি। ওয়ালডেন আর হোয়াইট পণ্ডের বর্ণনা দিয়ে তার পরে গ্রন্থকার লিখছেন, "হোয়াইট পণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে, জল যখন কমে যায়, একটা গাছ নজরে পড়ে। যেন যেখানটায় খাড়া আছে, সেখান-টাতেই গাছটা জন্মেছিল মনে হয়। এর শিকড় কিন্তু জলের প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে চলে গেছে। গাছটার মাথা ভেঙে চুরে গেছে। সেখানটায় এর ব্যাসের মাপ চৌদ্দ ইঞ্চি।" ১৮৪৯ সালের বসন্তকালে একটি লোকের সঙ্গে আমার কথা হয়, সুদবেরি অঞ্চলে এই পুকুরটার খুব কাছাকাছি জায়গায় সে থাকে। লোকটা বলেছিল, দশ পনের বছর আগে গাছটা আবিষ্কার করে সে। যতদূর মনে পড়ে তার, গাছটা ছিল পাড় থেকে বারো চৌদ্দ রড দূরে, জল সেখানে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট গভীর। সময়টা শীতকাল। সকালের দিকে বরফ খুঁড়ছিল সে, বিকালের দিকটায় পাড়া-পড়শীর সাহায্যে বুড়ো ইয়েলো পাইন গাছটাকে একটু সরাবে সংকল্প ছিল। বরফ খুঁড়ে পুষ্করিণীর পাড় পর্যন্ত একটা পথ তৈরি করে, বলদ দিয়ে টেনে বরফের উপর পথটার ভিতর এটাকে এনে খাড়াও করেছিল। কিন্তু কাজে খানিকটা এগুতে না এগুতেই অবাক হয় দেখে যে, গাছটার উলটো দিকটা উপরে, আর তার ডালপালাগুলোর সব নিচের দিকে মুখ—গুঁড়িটার সরু অংশটা বালির তলায় একেবারে দৃঢ়ভাবে পোঁতা। মোটা অংশটার ব্যাস প্রায় এক ফুট। প্রথমটা মনে করেছিল যে করাত চালাবার ভাল খুঁটি হবে একটা। কিন্তু এমন

জরাজীর্ণ হয়ে গেছে যে জ্বালানি কাঠ ছাড়া আর কিছুই হয় না—তাও হয় কি না সন্দেহ। তখন চালার নিচে নিয়ে রাখে এর কিয়দংশ। কুড়ুলের আর কাঠঠোকরার চিহ্ন ছিল কুঁদোর দিকে। তার মতে গাছটা পাড়ের জমিতে মরা অবস্থায় বোধহয় পড়ে ছিল। ঝড়ে উড়ে গিয়ে শেষে পুকুরে পড়ে। সেখানে মাথার দিকটা জলে চাপা পড়ে। কুঁদোর দিকটা তখনও শুকনো আর হাল্কা। ভাসতে ভাসতে যখন ডোবে, তখন নিচের দিকটা উপরে থেকে যায়। তার বাবাও, আশী বছর বয়েস তাঁর, গাছটা কখনও ওখানে ছিল না বলে মনে করতে পরেন না। এখনও পর্যন্ত বেশ বড় বড় কয়টা গুঁড়ি জলের তলায় দেখা যায়। উপরে জলের ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে দেখলে সেগুলোকে মনে হয় যেন জল-সর্প নড়ছে চড়ছে।

এই পুষ্করিণীটা কদাচিৎ নৌকো-কলঙ্কিত হয়েছে। জেলেদের যে জন্য টান, পুকুরটাতে তা নেই। সাদা লিলি, যা কাদা না হ'লে জন্মায় না, আর সাধারণ সুইট ফ্ল্যাগের বদলে, এর পাড়ের চারিদিকে, পাথর ছড়ানো তলা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নির্মল জলে ব্লু ফ্ল্যাগ ফুল (ইরিস ভেরসিকলর) এখানে ওখানে ফুটে আছে দেখা যায়। জুন মাসে হামিংবার্ডরা গিয়ে বসে তাদের বুকে। ফুলটার রঙ, তার নীলচে পাতাগুলোর রঙ, বিশেষ করে জলের বুকে তাদের ছায়ার সংগে পুষ্করিণীটার সাগরনীল রঙের একটা অপূর্ব মিল দেখা যায়।

হোয়াইট পন্ড আর ওয়ালডেন মর্ত্যবক্ষের বৃহৎ দুটো স্ফটিক—আলোক সরোবর। যদি কোনরকমে চিরকালের জন্য জমে যেত আর হাতের মুঠোয় আঁটবার মতো ছোট হ'ত, তাহ'লে দুর্মূল্য রত্নের মতোই সম্রাটদের মুকুটের শোভা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের হুকুমবরদারদের কেউ এসে অপহরণ করত এদের। কিন্তু এরা তরল আর অঢেল হওয়ায় বংশপরম্পরায় আমাদের জন্য সুরক্ষিত রয়ে গেছে, তাই আমরা কোহিনুর-এর লোভে ছটফট করি আর এদের অবজ্ঞা করি। এরা এত খাঁটি যে বাজারে বিকোতে পারে না, কোন খাদ নেই এদের। আমাদের জীবনের তুলনায় কত সুন্দর আর স্বভাবের তুলনায় কত স্বচ্ছ। আমরা তাদের কাছ থেকে নীচ শিক্ষা পাই না। ঐ চাষার বাড়ির সামনে যে ডোবাটা দেখা যাচ্ছে, তার হাঁসগুলো যেখানে সাঁতার কাটছে, তার তুলনায় এরা অপূর্ব। এখানে কেবল পরিষ্কার বুনো হাঁসরাই আসে। প্রকৃতির মূল্য দান করতে পারে, তার ক্রোড়ে পালিত এমন মানুষ তো দেখি নে। পাখিদের কলকাকলি আর পাখার সঙ্গে ফুলের হৃদ্যতা হয়। কিন্তু কোথায় সে তরুণ-তরুণী, প্রকৃতির এই উদ্দাম, উচ্ছল সৌন্দর্যের সংগে যাদের অভিসার? শহরে জীবনযাপন করে তারা, আর এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ একান্তে। স্বর্গের চিন্তা করা সাজে না তোমাদের। তোমরা মর্ত্যেরও কলঙ্ক।

॥ ১০ ॥ বেকার ফার্ম

মধ্যে মধ্যে পাইনের উপবন পর্যন্ত চলে যেতাম ঘুরতে ঘুরতে। মন্দিরের মতো কি সমুদ্রে তোপ বাহিনীর মতো সাজসজ্জা সমেত গাছগুলো দাঁড়িয়ে; ঢেউতোলা ডালগুলো আলো পড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে, এত নরম, সবুজ আর ছায়া করা যে ড্রুইডরা তাঁদের ওকগাছ ছেড়ে এদের পুজো করতে পারতেন। কিংবা চলে যেতাম ফ্লিন্ট পণ্ড ছাড়িয়ে সিডারের বন পর্যন্ত পাকা ব্লুবেরি-ভরা গাছগুলো যেখানে গম্বুজ খাড়া করে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে গেছে, ভালহাল্লার সামনে খাড়া থাকবার তারা উপযুক্ত; আর লতানো জুনি-পার তার ফলের মালায় মাটি ঢেকে ফেলেছে। কিংবা গিয়ে পড়তাম বাদায়, যেখানে সাদা স্প্রুস গাছের গা থেকে কাগজে তৈরি মালার মতো শ্যাওলা পড়েছে ঝুলে আর জলার দেবতাদের যা গোল টেবিল সেই ব্যাঙের ছাতায় ঢাকা পড়েছে মাটি; আরও বেশি সুন্দর ছত্রাক, উদ্ভিদজগতের শামুকগুলো, প্রজাপতি কি ঝিনুকের মতো গাছের গোড়া রেখেছে সাজিয়ে; সোয়াম্প-পিংক আর ডগউডের জন্মভূমি যেখানে, বেঁটে শয়তানের চোখের মতো জ্বলজ্বল করে রেড অলডারবেরি, যত শক্ত কাঠই হ'ক খাঁজ কেটে প্যাঁচে ফেলে তাকে চেপে মারে ওয়াক্সওয়ার্ক, আর বুনো হলির ফল এত সুন্দর, যে দেখে তাকেই বাড়ির কথা ভুলিয়ে দেয়, তার চোখ ঝলসে যায় আরও সব নাম-না-জানা জংলী নিষিদ্ধ ফল দেখে—লোভ হয় খেতে কিন্তু মানুষের স্বাদ নেবার পক্ষে তারা অতিরিক্ত সুন্দর। কোন পণ্ডিতের কাছে না গিয়ে কয়েকটা বাছা বাছা গাছের কাছে বার বার যেতাম, এ অঞ্চলে সেসব জাতের গাছ দুষ্প্রাপ্য, অনেক দূরে কোন মাঠের মধ্যে, কি বন বা জলার খুব ভেতরটায়, কি পাহাড়ের মাথায় পাওয়া যায়। যেমন ব্ল্যাক বার্চের কয়েকটা দু ইঞ্চি ব্যাসের সুন্দর জাত আছে এ অঞ্চলে; এর জাতভাই ইয়েলো বার্চ আর তার ঢিলে সোনালী কুর্তা, এরই মতো খোসবায় তার; বিচ, অতি পরিপাটি সুন্দর শ্যাওলা আঁকা কাণ্ডগুলো, সব রকম খুঁটিনাটিতে নিখুঁত, এখানে ওখানে ছড়ানো এর দুয়েকটা নমুনা বাদ দিলে আমাদের শহরে প্রমাণসই গাছের একটা মাত্র ছোট ঝাড়ই টিকে আছে দেখেছি, অনেকে মনে করেন কবুতরদের পোঁতা সেটা, কাছাকাছি একটা জায়গায় বিচনাট রেখে তাদের ধরার চেষ্টা হয় একবার; কাঠ ফাড়বার সময় এর রুপালী শাঁসের চকমকানি দেখবার ব্যাপার; বাস; হর্নবিম; সেলটিস অক্সিডেন্টালিস অর্থাৎ নকল এলম্‌, একটাই আছে আমাদের,

বেশ বাড় সেটার; মাস্তুলের মতো লম্বা কয়েকটা পাইন; একটা শিঙ্গল; হয়তো সাধারণের চাইতে ভাল জাতের একটা হেমলক, বনের মধ্যে প্যাগোডার মতো খাড়া হয়ে আছে; আরও অনেক নাম করতে পারি আমি। শীত হ'ক গ্রীষ্ম হ'ক, এই সব দেবালয়ে আমি ধরনা দিয়েছি।

একদিন হ'ল, কি করে একটা রামধনুর খিলানের একেবারে শেষের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, আকাশের নিচের স্তরের সমস্তটা জুড়ে আছে সেটা, চারদিকের ঘাসপাতা সব রাঙিয়ে দিয়েছে, আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে সে, যেন রঙিন একটা কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছি। রামধনুর আলোর একটা সরোবর, খানিকটা সময় তার মধ্যে শুশুকের মতো ভেসে রইলাম। আরও কিছু বেশি সময় থাকত যদি, আমার জীবন আর কাজকর্ম সব কিছু সে রাঙিয়ে দিত। রেল লাইনের উঁচু সড়ক বরাবর যাবার সময় আমার ছায়ার চারপাশে আলোর পরিমণ্ডল দেখে অবাক হতাম।. নিজেকে মহাপুরুষদের একজন ভেবে নিতে ভাল লাগত। আমার কাছে যাওয়া আসা করতেন একজন, তিনি বললেন, এটা শুধু দেশের লোকদের বৈশিষ্ট্য, তাঁর সামনে কয়েকজন আইরিশম্যানের চারপাশে কিন্তু পরিমণ্ডল দেখেন নি তিনি। বেনভেনুতো চেলিনি তাঁর স্মৃতিকথায় বলে গেছেন, যখন তিনি সেন্ট অ্যাঞ্জেলো দুর্গে বন্দীদশায় ছিলেন, তখন একটা ভীষণ স্বপ্ন অথবা কল্প-চিত্র দেখার পর থেকে ইটালি কি ফ্রান্সে যেখানেই গেছেন, তাঁর মাথার ছায়ার চারপাশে সকাল সন্ধ্যায় একটা জ্যোতির্ময় আলো দেখেছেন। ঘাসের শিশির-ভেজা অবস্থাতেই আলোটা বিশেষ বেশি করে দেখা যেত। আমি যার উল্লেখ করেছি, এও সেই রকমই কোন নিসর্গক্রিয়া হবে, সকালেই বিশেষ করে নজরে পড়ে, অবশ্য অন্যান্য সময়েও দেখা যেতে পারে, এমন কি জ্যোৎস্নাতেও। সব সময়েই আছে এ, কিন্তু সাধারণত লক্ষ্য করা হয় না; তবে চেলিনির মতো কল্পনাপ্রবণ হলে অন্ধবিশ্বাসের খুঁটি তো সে গাড়বেই। আবার বলেছেন, খুব কম লোককেই তিনি দেখান এটা। কিন্তু, সামান্য মাত্র লক্ষ্যে পড়া নিয়েও যাঁরা সচেতন, তাঁরাও বিশিষ্ট নন কি?

আমার যৎসামান্য নিরামিষ আহারের অতিরিক্ত পদ পূরণ করতে মাছ ধরবার অভিপ্রায়ে একদিন বিকেলে বনের পথ দিয়ে ফেয়ার হ্যাভ্‌ন উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। আমার পথে যেতে প্লেজ্যান্ট মেডো পড়ে, বেকার ফার্মের লাগাও। সম্প্রতি এক কবি এই বিরামের জায়গাটি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। আরম্ভ করেছেন,—

"তব, সিংদরজায়
মধুমাঠ আলুলায়,
শ্যাওলাটে ফলগাছ তায়

ভাগ দেয় লাল ঝরনায়,
মাস্করয়্যাট-রোমেরে ভাসায়,
ছটফটে ট্রাউটে ঝাঁপায়।"

ওয়ালডেন-এ যাবার আগে এইখানে আড্ডা গাড়বার বাসনা ছিল আমার। আপেলগুলোকে বঁড়শী গেঁথে পাড়লাম, ঝরনাটা লাফিয়ে পার হলাম, মাসকোশ আর ট্রাউটগুলো হকচকিয়ে গেল। অনেক সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিকাল বেলাটা অতিরিক্ত রকম দীর্ঘ মনে হয়, যেন অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যেতে পারে ইতিমধ্যে, সেই রকমের একটা বিকাল সেদিন। কিন্তু আমি যখন বেরোই তখনই তার অর্ধেক কেটে গেছে। রাস্তায় এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় একটা পাইন গাছের তলায় আধ ঘন্টাটাক খাড়া থাকতে হ'ল; মাথার উপর মেলা ডালপালা, মাথাটা ঢাকতে রুমাল বেঁধে নিলাম। কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে গেছে, অবশেষে যখন একটা পিক্‌এরেল-উইডের উপর দাঁড়াব, হঠাৎ দেখলাম মেঘের ছায়ার নিচে গিয়ে উঠেছি। তখন এমন জোরে বাজ ডাকতে সুরু করে দিল যে তার ডাক শোনা ছাড়া আমার আর কিছু করার জো রইল না। মনে মনে ভাবলাম দেবতারা নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করছেন এমন সুতীক্ষ্ন বিদ্যুচ্চমক দিয়ে নিরস্ত্র এই মেছুড়ে বেচারাকে বিপর্যস্ত করতে পেরে। অগত্যা আশ্রয় নিতে নিকটতম কুটিরের দিকে দ্রুত এগিয়ে চললাম। যে কোন রাস্তা থেকে সেটা আধ মাইল দূরে, তাই হ্রদটার কাছাকাছি পড়ে। অনেক দিন জনহীন পড়ে ছিল ঃ—

"কবি সে হেথায় বানায়, যখন
জীবন ফুরায়ে যায়,
দেখ সামান্য কুটির মাত্র
ধ্বংসের পথে প্রায়।"

কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর গল্পগাথা হচ্ছে এই। কিন্তু আমি দেখলাম, এখন সেখানে জনৈক আইরিশম্যান, জন ফিল্ড, তাঁর স্ত্রী আর কয়েকটা ছেলেপিলে নিয়ে বাস করছেন। চাকামুখো ঐ ছেলেটি, এতক্ষণ বাবার কাজে যোগান দিয়েছে, এখন বৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্য জলার দিক থেকে বাবার পাশাপাশি ছুটে আসছে, ঐ হচ্ছে বড়, আর ছোট হচ্ছে ঐ শিশুটি, ডাইনির মতো মুখে বলিরেখা, ছুঁচলো মাথা, বাবার হাঁটুর উপর বসে, ঠিক যেমন আমীর-ওমরাহের প্রাসাদে দেখা যায়, স্যাঁতসেঁতে বাড়ি আর পেটের জ্বালা সত্ত্বেও, শিশুর দাবী নিয়ে আগন্তুককে কৌতূহলের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছে, খেয়াল নেই যে জন ফিল্ডের অনশনক্লিষ্ট বেটা মাত্র নয় সে, উঁচু ঘরের শেষ সন্তান, দুনিয়ার আশা-আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। বাইরে জোর বৃষ্টি পড়ছে, বাজ হেঁকে চলেছে, আর আমরা একত্র বসে আছি, যেখানটাতে ছাদ দিয়ে

সব চাইতে কম জল পড়ে। এই পরিবারটিকে যে জাহাজটা আমেরিকায় ভাসিয়ে এনে তুলেছে, সেটা তৈরি হবার আগেও, সেকালে আমার অনেক সময় বসে বসে কেটেছে এই জায়গাটাতে। সোজা কথায় সৎ, পরিশ্রমী, কিন্তু অকর্মা ব্যক্তি জন ফিল্ড; আর তাঁর স্ত্রীরও সাহসকে বলিহারি, গোলগাল চটচটে মুখ, খোলা বুক, উঁচু উননটার ফোকরে ক্রমাগতই রান্নাবান্না করে চলেছেন আর এখনও ভাবছেন, একদিন অবস্থা ফিরবে। এক হাতে চিরসাথী ন্যাতা, যদিও তার ছোঁয়া কোথাও লেগেছে বলে চোখে পড়ে না। মুরগী-গুলোও বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিতে সেখানে এসে জুটেছে, পরিবারের লোক-জনের মতোই ঘোরাফেরা করছে তারা, এমন মানুষের মতো ধরন-ধারন যে মাংস ভাল জমবে না মনে হ'ল আমার। এসে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভ ভাবে আমার দিকে চেয়ে রইল, কি আমার জুতো ঠোকরাতে থাকল—কিছু যেন বোঝাতে চায়। ইতিমধ্যে কর্মকর্তা মশায় তাঁর আত্মবিবরণী দিলেন, পাশের এক চাষীর বাদাভুঁই চাষের উপযুক্ত করার কাজে কি কঠিন পরিশ্রম করতে হয় তাঁকে, কোদাল কি বেলচে দিয়ে মাটি কুপিয়ে সাফ করা, মজুরি হচ্ছে একর প্রতি দশ ডলার আর বৎসরকাল সার দেওয়া জমিটার দখলী স্বত্ব। সেই চাকামুখো বাচ্চা ছেলেটা সারাক্ষণ হাসিমুখে বাপের সঙ্গে খাটছে, বাপের কারবারে লাভের কি বহর খবর রাখে না। আমার যে অভিজ্ঞতা, তাঁকে সাহায্য করতে চাইলাম তাই দিয়ে। বললাম, আমার অতি নিকট পড়শীদের একজন তিনি, মাছ ধরতে এসেছি বটে আর দেখতে বাউণ্ডুলে গোছের হলেও তাঁরই মতো আমাকেও জীবিকার্জন করেই খেতে হয়; একটা পাকা-পোক্ত, ছোটখাট অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িতে থাকি, সেটা বানাতে যা খরচা পড়েছে, তা তাঁর এই পড়ো বাড়ির জন্য মোটামুটি বার্ষিক যে ভাড়া টানতে হয়, তার চাইতে মোটেই বেশি নয়; কি করে তিনিও ইচ্ছা করলেই দুই এক মাস সময়ের মধ্যেই নিজে নিজের প্রাসাদ গড়ে তুলতে পারেন। আমি চা কি কফি পান করি নে, মাখন দুধ কি মাংস কিছুই লাগে না আমার, সুতরাং আমাকে এ সব যোগাড় করতে খাটুনিও খাটতে হয় না, আর হিম-সিম খাওয়া খাটুনিও যেমন খাটি নে, হাঁসফাঁস করার মতো খাইও নে, খাই-খরচ আমার নাম মাত্র; আর তাঁর সকালে উঠেই চা কফি মাখন দুধ আর মাংস চাই, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে আয় করতে হয়, এসবের দাম আর খাটুনি বেশি বলে খাওয়া দাওয়াও করতে হয় ঠেসে, দেহযন্ত্রের ক্ষয় পূরণ করা তো চাই—সুতরাং ব্যাপারটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া হয়ে পড়ে, চওড়াটাই বেশি হয় লম্বার চাইতে, কেন না সুখ তো হ'লই না, লাভের মধ্যে জীবনটা নষ্ট করছেন তিনি; আমেরিকায় আসতে পেরে ভেবেছিলেন, ভালই হ'ল, এখানে রোজ চা আর কফি আর মাংস জুটবে। কিন্তু একমাত্র সত্যকার

আমেরিকা তো সেই দেশ, যেখানে জীবন-যাপনের এমন ধরন অনুসরণ করার স্বাধীনতা মানুষের আছে যাতে এই সব ছাড়াও তার চলে যায়, যেখানে এই সব জিনিস ব্যবহারের প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ ফল—দাসপ্রথা, যুদ্ধ ও অন্য সব অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলান করতে রাষ্ট্রশক্তি কারও উপর জোর জবরদস্তি করে না। যেন তিনি একজন দার্শনিক, কিংবা দার্শনিক হবার ইচ্ছা আছে তাঁর, এই ধরে নিয়েই আমি তাঁর সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা চালিয়েছিলাম। মানুষের প্রায়শ্চিত্ত সূচনার ফল যদি এই দাঁড়ায় যে পৃথিবীর সব মাঠ বন্য অবস্থায় থাকবে, তাতে আমি খুশিই হব। আত্মোন্নতির জন্য কি তার পক্ষে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা,—খুঁজতে মানুষের ইতিহাস পড়ার দরকার পড়ে না। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই হ'ল যে আইরিশম্যানের আত্মোন্নতিসাধন এমন এক ক্রিয়া যা করতে গেলে নৈতিক বাদাভুঁই কোপানো কোদালের দরকার। তাঁকে বললাম, বাদার কাজে এত খাটুনি খাটতে হয় তাঁর, তাঁর জুতো মজবুদ আর কাপড়-চোপড় টেকসই হওয়া দরকার, তাও আবার তাড়াতাড়ি ময়লা হয় ছিঁড়ে যায়; কিন্তু আমি যেমন তেমন জুতো পাতলা কাপড়-চোপড় পরি, এর খরচ তাঁর খরচের অর্ধেকও নয়; তিনি হয়তো ভাবছেন ভদ্রলোকের উপযোগী পোষাক আমার (বাস্তবিক পক্ষে তা নয় অবশ্য), কিন্তু যদি ইচ্ছে যায় কষ্ট না করে, শুধু অবসর বিনোদন হিসেবেই দুদিনের জন্য আমার যত মাছ দরকার, দুয়েক ঘন্টায় তা ধরতে পারি; চাই কি এক হপ্তা চালিয়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করতে পারি। সাদাসিধে ভাবে থাকতে রাজী হ'লে, তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে মিলে আমোদ করে গ্রীষ্মে হাকলবেরি পেড়েও তা করতে পারেন। কথাটা শুনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন জন, আর তাঁর স্ত্রী মাজায় হাত দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। মনে হ'ল, একাজে নেমে পড়ার মতো মূলধন অথবা একবার সুরু করে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নেবার মতো হিসেবি-বুদ্ধি আছে কি না তাঁদের, ভেবে উঠতে পারছেন না তাঁরা। এ যে তাঁদের পক্ষে নিতান্ত চোখকান বুজে পাড়ি দেওয়ার মতো, এভাবে বন্দরে গিয়ে পৌঁছোবেন কি না, ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। সুতরাং মনে হয় আজও তাঁরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের ধরনে জীবন নিয়ে প্রাণপণ সাহসের সঙ্গে লড়ে চলেছেন। এমন এলেম নেই যে কোন সূক্ষ্ম গজাল ঠুকে এর প্রশস্ত স্তম্ভগুলো ফেড়ে ফুঁড়ে তার আদ্যন্ত দেখেন—লোকে যেমন কাঁটা উপড়োতে গিয়ে করে, একে তেমনি হেঁচকা টান দেবার কথা ভাবছেন। কিন্তু মারাত্মক অসুবিধে নিয়ে লড়াই যে এ তাঁদের,—বিনা আঁকজোকে বেঁচে থাকা, হায় জন ফিল্ড, লবেজান হ'তেই হয়।

"মাছ ধরা হয় টয়?" জিজ্ঞাসা করলাম। "হ্যাঁ হ্যাঁ, মধ্যে মধ্যে যখন

হাতে কাজ না থাকে দুই এক ক্ষেপ ধরি বই কি, বেশ ভাল পার্চ পাই।" "টোপ কি দেওয়া হয়?" "কেঁচো দিয়ে শাইনার ধরে শাইনার দিয়ে পার্চের টোপ করি।" "এখন একবার গেলে হয় না, জন?" তাঁর স্ত্রী খুশি হয়ে বললেন, চোখে মুখে আশা। জন কিন্তু দোমনা ভাব দেখালেন।

বর্ষণ তখন ক্ষান্ত হয়েছে, বনের পূর্বদিকটা জুড়ে রামধনু উঠেছে, সন্ধ্যার দিকেও পরিষ্কার থাকবে, তার লক্ষণ, সুতরাং বিদায় নিলাম। বাইরে আসবার পর বাড়িটা সম্বন্ধে আমার জরিপের কাজ সাঙ্গ করতে কুয়োটার তলা পর্যন্ত দেখব আশায় জল চাইলাম একটু। হায় রে, জল সেখানেও তলায় গিয়ে ঠেকেছে, চোরাবালি জমেছে, উপরন্তু দড়ি ছেঁড়া আর বালতিও মেলে না। ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে ঠিকমতো বাসন বাছা হ'ল, মনে হ'ল জল শোধন হচ্ছে, তারপর সলা-পরামর্শে অনেক সময় কাটল, তবে তৃষ্ণার্তকে তা দেওয়া হ'ল—তখন পর্যন্ত ঠাণ্ডা করা হয় নি, তখনও থিতনো হয় নি। বুঝলাম, জীবনযাত্রার ধারা এদের এই। সুতরাং চোখ বুজে, অনেক কৌশল করে, নিচেকার জল নাড়িয়ে ময়লা এড়িয়ে রুচিরতম সেই পানীয় অকৃত্রিম আতিথেয়তা স্মরণে পান করে ফেললাম। যখন ভব্যতার প্রশ্ন, তখন আমি খুঁতখুঁত করি নে।

বৃষ্টির পর আইরিশম্যানের আশ্রয় ছেড়ে যখন আবার হ্রদের দিকে এগোচ্ছি, প'ড়ো মাঠে, এঁদো ডোবায়, জলার গর্তে, পরিত্যক্ত জঙ্গলে ভর্তি জায়গায়, কাদাজল ভেঙে এই পিক্‌এরেল ধরার ব্যগ্রতাকে মুহূর্তের জন্য তুচ্ছ মনে হ'ল, আমাকে না ইস্কুল কলেজে লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। কিন্তু যখন পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামছি, সামনে আকাশ লাল হয়ে আসছে, মাথার উপর রামধনু, ঈষৎ রিন-রিন আওয়াজ হাওয়ায় পরিষ্কার ভেসে এল কানে, জানি নে কোন দিক থেকে, যেন আমার জীবন-দেব বলছেন,—দূর থেকে দূরে চল, মাছ আর শিকারের খোঁজে—আরও দূরে, দূরান্তরে—অনেক ঝরনা আর অনেক লোকালয়ে নিরুদ্বেগে বিশ্রাম কর গিয়ে। তোমার যৌবন-কালের বিধাতাকে স্মরণে রাখ। লেশমাত্র গ্লানি না রেখে সকাল হবার আগেই ঘুম থেকে উঠে দুঃসাধ্য সাধনে মন দাও। দুপুরে অন্য সরোবরে গিয়ে পৌঁছতে হবে। পথে যেখানে রাত হবে, তোমার ঘরবাড়ি হ'ক সেখানে। এর চাইতে বৃহত্তর ক্ষেত্র নেই, শ্রেষ্ঠতর খেলা নেই। এই শরবন আর ঝোপঝাড়ের মতো স্বভাবের বাড়ে বেড়ে চল, এসব কখনও ইংলণ্ডের বিচালি হবে না। বাজ পড়ে পড়ুক, কি আসে যায় যদি তাতে চাষীর ফসল নষ্ট হয়। তোমার লাগি এ নহে তার বারতা। আশ্রয় নাও মেঘের তলায়, ছোটে ওরা ছুটুক বাড়ি গাড়ির তলায় আশ্রয় নিতে। বেঁচে থাকা তোমার বেচাকেনার নয়, আনন্দের ব্যাপার হ'ক। মাটি থেকে আনন্দ পাও, দখল

করতে চেয়ো না তাকে। নিষ্ঠা আর আস্তিক্যবোধের অভাব মানুষকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছে, কেনা আর বেচা, ভূমিদাসের জীবন কাটিয়ে চলেছে মানুষ।

তুমি গো বেকার ফার্ম।
"এ দৃশ্যের শ্রেষ্ঠ ধন
কিছুক্ষণ নির্দোষ তপন"
"কেহ নাই করিতে বিহার
বেড়া-ঘেরা মাঠেতে তোমার।"
"মানুষের সাথে নেই বচসা,
প্রশ্নতে হও নি প্রাণান্ত
সাদামাটা পিঙ্গল পরিধান
আগের মতোই আছ শান্ত।"
"যারা ভালবাস এস তারা,
ঘৃণা কর যারা এস তবু।
বিশ্বের শান্তি-সেনারা
রাষ্ট্রের গাই ফক্স হবু,
ষড়যন্ত্রে কর কর লীন,
শক্ত তরুর শাখাসীন।"

শুধু এই পাশের মাঠ কি রাস্তাটা থেকে লোকজন রাত্রে বেচারির মতো বাড়ি ফিরছে, সেখানে পর্যন্ত তাদের সংসারের ঝামেলা হানা দেয়, বার বার করে নিজের দম নিজে যোগাতে যোগাতে হাঁপ ধরে যায় তাদের সকাল সন্ধ্যায় রোজ পা বাড়িয়ে চললেও নিজের ছায়া তাদের হটিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু রোজকার রোজ বাইরে থেকে, অসাধ্যসাধন থেকে, বিপদ থেকে, আবিষ্কার থেকে নতুন অভিজ্ঞতা আর চরিত্র নিয়ে ঘরে ফেরা উচিত আমাদের।

আমি হ্রদে পেঁাছবার আগেই জন ফিল্ডের ভাবান্তর ঘটে, নতুন ভাবাবেশ তাঁকে ঘর থেকে টেনে বার করে : সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাদা কোপানোর কাজ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন তিনি। কিন্তু যে সময়ে আমি বেশ কিছু মাছ ধরে ফেলেছি, বেচারি ততক্ষণে শুধু মাছের একজোড়া পাখনাই স্থানচ্যুত করেছেন। তিনি বললেন, ভাগ্য; কিন্তু দুজনে যেই নৌকোয় জায়গা বদল করলাম, ভাগ্যও জায়গা বদলাল। বেচারা জন ফিল্ড—এ লেখা তিনি পড়বেন না জানি, কিন্তু যদি পড়েন, তবে যেন খানিকটা জ্ঞান লাভ করতে পারেন—পুরনো জগতের সেকেলে সংস্কার নিয়ে এই সংস্কারহীন নতুন জগতে বেঁচে থাকতে চান—শাইনার দিয়ে পার্চ মাছ ধরা। মেনে নিচ্ছি, টোপটা লাগসই

হয় মধ্যে মধ্যে। কিন্তু তাঁর জগৎ যে একান্তই তাঁর নিজের জগৎ; অবশ্য গরিব বেচারি তিনি, কিন্তু গরিব হ'তেই যে জন্ম তাঁর, আয়ারল্যাণ্ডের দারিদ্র্য আর দরিদ্র জীবন যে তাঁর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া; যতদিন পর্যন্ত তাঁদের কাদাভাঙা, জালপাদ, জলা-ঘাঁটা পাগুলোয় পাখা না লাগানো হবে, ততদিন ঐ বাদাঘেঁষা মান্ধাতার যুগের কর্তা-মার রকম-সকম তাদের মাথা খাড়া করতে দেবে না,—না তাঁকে, না তাঁর বংশধরদের।

॥ ১১ ॥ পরম বিধান

বনের ভিতর দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। দড়িতে মাছ গাঁথা, মাটিতে বঁড়শির দাগ টানতে টানতে যাচ্ছে। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে. একটা উডচাক আমার সামনে দিয়ে সুড়ুৎ করে চলে গেল দেখলাম। একটা বর্বর আনন্দের অদ্ভুত শিহরণ বোধ হ'ল। ভীষণ লোভ হ'ল ওটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে কাঁচাই খেয়ে ফেলি। এমন নয় যে খুব খিদে পেয়েছিল তখন, শুধু একটা বর্বরতার প্রতীক হিসেবে ওটা সামনে এসেছিল, এই জন্য। কিন্তু পুষ্করিণীর তীরটায় বাস করবার সময় এমন দুই একবার হয়েছে যে, বনের মধ্যে অনশন-ক্লিষ্ট কুকুরের মতো এদিক ওদিক করে বেড়িয়েছি, আশ্চর্য পাগলামি নিয়ে খুঁজেছি যদি গলাধঃকরণযোগ্য কোন পশুমাংস জোটে। কোন খাদ্যই তখন অখাদ্য মনে হয় নি। ভীষণ বন তখন অকারণেই পরিচিত লেগেছে। ঊর্ধ্বতন অথবা যা বলে অভিহিত করা হয় একে, আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা নিজের মধ্যে বোধ করেছি, এখনও করি, যেমন অধিকাংশ লোকেই করে থাকে, আর সেই সঙ্গে বোধ করেছি আদিম জঘন্য আর বর্বরসুলভ প্রবৃত্তি একটা, এবং এই দুই ভাবকেই আমি শ্রদ্ধা করি। শিষ্টের তুলনায় বন্যের প্রতি অনুরাগ আমার কম নয়। মাছ ধরার মধ্যে যে বন্যতা আর অসমসাহসিকতার ঝুঁকি আছে, তার প্রতি তখনও আকর্ষণ বোধ করতাম। আমার মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা জাগে যে কষে জীবনের ঘাড় চেপে ধরি আর পশুর মতো জীবন কাটাই আমি। সম্ভবত বেশ ছেলেবেলা থেকেই এইরকম চাল-চলন আর শিকার করার দরুণই প্রকৃতির সঙ্গে আমার এত নিবিড় যোগাযোগ ঘটেছে। যে সব দৃশ্যপটের সঙ্গে ঐ বয়সে সচরাচর পরিচয় ঘটার কথা নয়, এদের জন্যই সে সবের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই পরিচিতি ঘটে, আকৃষ্টও রাখে আমাদের। দার্শনিক, এমন কি কবির মনেও প্রকৃতির কাছে প্রত্যাশা থাকে, তাই তাঁদের তুলনায় জেলে, শিকারী, কাঠুরে আর অন্য যারা নিজেরা বিশেষভাবে প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে মাঠে বনে জীবন কাটায়, তারা কাজের ফাঁকে প্রকৃতির পরিচয় লাভের পক্ষে বেশি অনুকূল মনোভাবের সুযোগ পায়। তাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হবার কোন সংকোচ থাকে না প্রকৃতির। প্রেয়ারিতে

যে পরিভ্রমণ করে ফেরে, সে স্বভাবতই শিকারী, মিসৌরি কি কলম্বিয়া নদীর উৎসের কাছে ব্যাধকেই দেখা যায় আর সেন্ট মেরি প্রপাতের কাছে যে ঘোরে, সে জেলে। শুধুই যে বেড়াবার জন্য ঘোরে, সে মারফতী শিক্ষালাভ করে, আধা-খেঁচড়া শিক্ষা হয় তার, প্রামাণিক হিসাবে যোগ্যতা তার কম। কিন্তু ঐসব লোক কাজ করতে করতে, কি আপনা থেকেই যে জ্ঞানলাভ করে, বিজ্ঞানে তার আলোচনার উপরই আমাদের ঝোঁক বেশি। মানুষের অভিজ্ঞতা হিসাবে ওদের জ্ঞানই তো খাঁটি মানব-প্রকৃতি।

মার্কিনবাসীদের এত ছুটিছাটা নেই, কি এখানকার লোকেরা আর ছেলে-ছোকরারা ইংলণ্ডের মতো খেলাধুলো করে না, তাই ইয়াঙ্কিদের জীবনে আমোদ-প্রমোদ নেই, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা ভুল করেন। কেন না, এখানে এখনও সেই শিকার, মাছ ধরা ইত্যাদি সনাতন আর নিঃসংগ আমোদ-প্রমোদ ঐ সবের কাছে হার মানে নি। আমার সমবয়সী নিউ ইংলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক ছেলেকেই দশ থেকে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে পাখিমারা বন্দুক কাঁধে ঘুরতে হয়েছে। আর ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মতো, তার মাছ ধরা আর শিকারের জায়গা সীমাবদ্ধও নয়—অসভ্য জাতিদের জায়গার তুলনাতেও সে জায়গা প্রশস্ত। সুতরাং তাকে বেশির ভাগ সময় খেলার মাঠে দেখতে না পাওয়া গেলে অবাক হবার কি আছে। কিন্তু এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। দয়াপ্রবৃত্তি বাড়ছে বলে নয়, শিকারোপযোগী জীবের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। কেন না, শিকারের প্রাণীর সম্বন্ধে সম্ভবত শিকারীর সমবেদনাই সর্বাধিক, এমন কি "জীবে দয়া" সংস্থার তুলনাতেও।

যখন পুষ্করিণীর তীরে ছিলাম, মধ্যে মধ্যে শুধু মুখ বদলাবার জন্যই মাছকে আহার্যের তালিকাভুক্ত করার সাধ হ'ত। আদিমতম মৎস্য-শিকারীরা যে প্রয়োজনে মৎস্য শিকার করত, আমিও ঠিক সেই প্রয়োজনেই বাস্তবিকপক্ষে মাছ ধরতাম। এর বিরুদ্ধ যুক্তি হিসেবে "জীবে দয়া"কে যতই ফলাও করে দেখি না কেন, সমস্তটাই কৃত্রিম—আমার দর্শনের সঙ্গে সংশিলষ্ট, অনুভূতির সঙ্গে নয়। এখন যা লিখছি, সে শুধুই মাছ ধরা সম্বন্ধে। পাখি মারার বিষয়ে মনোভাবের পরিবর্তন এর আগেই হয়েছিল, বনবাসে যাবার আগেই আমার বন্দুক বেচে দিয়েছিলাম। অপরের তুলনায় দয়াপরবশতা আমার কিছু কম নয়, কিন্তু আমি যে বিশেষ মনঃকষ্ট বোধ করতাম এমন মনে হয় না। মাছ কি পোকা-মাকড় সম্বন্ধে অনুকম্পা-বোধ ছিল না। এই রকমটাই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পাখি মারার ব্যাপারে শেষের দিকে যে কয় বৎসর বন্দুক কাঁধে ঘুরতাম, আমার অজুহাত ছিল যে, আমি পক্ষিতত্ত্ব অধ্যয়ন করছি আর শুধু নতুন কি দুষ্প্রাপ্য পাখির সন্ধানেই ফিরছি আমি। এ জন্য আমি অপরাধ স্বীকার করি। এখন আমার মনে হয় যে, পক্ষিতত্ত্ব

অধ্যয়নের এর চাইতে ভাল উপায় আছে। তার জন্য পাখিদের হাব-ভাব আরও কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ দরকার। আমি যে বন্দুক ছাড়তে রাজি হয়েছি, ঐ একটি কারণই তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু, দয়া-মায়ার দিক থেকে আপত্তি সত্ত্বেও আমার সন্দেহ আছে যে, এসবের বদলে সম-মূল্য খেলা-ধুলোর ব্যবস্থা সম্ভব কি না। তাই আমার বন্ধু-বান্ধব যখন আমাকে তাদের ছেলে-দের সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওদের শিকার করতে দেবে কি না, আমার মনে পড়ে যে নিজের শিক্ষার ব্যাপারে এর উপকারিতা অন্যতম মুখ্য সহায় ছিল; সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিই, নিশ্চয়ই; শিকারী হ'ক ওরা। প্রথম দিকটায় হয়তো শুধু খেলোয়াড় হবার জন্যই, কিন্তু সম্ভব হলে শেষে ওদের বড় শিকারীও হ'তে হবে। পরে এই উদ্ভিদের অরণ্যে বা অন্যত্র যে তাদের উপযোগী বড় শিকার নেই, এ কথা তারা বুঝতে পারবে। মানুষের সম্বন্ধেও তাদের শিকারী, তথ্য মৎস্য-শিকারী হ'তে শিক্ষা দাও। এ পর্যন্ত আমি চসারের সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে একমত যে,

"মরা মুরগিরও মরদানি যার নেই,
শিকারীরা নয় সাধু ব'লে হাঁকে সেই।"

প্রত্যেক জাতির মতোই প্রত্যেক ব্যক্তির ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে, যখন সে ভাবে শিকারীরাই 'নরশ্রেষ্ঠ', যেমন অ্যালগনকুইনরা নিজেদের বলত। যে ছেলেটি কোনদিন বন্দুক ছোঁড়ে নি, তার দুঃখে দুঃখী হতেই হয়। এর ফলে তার দয়া-মায়া বাড়ে এমন নয়, শুধু শিক্ষারই ত্রুটি থেকে যায়। যেসব তরুণ এ বিষয়ে উদ্‌গ্রীব বলে শুনতাম, তাদের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ছিল এই। আমি জানতাম, তারা ঐ নিয়েই মেতে থাকবে না চিরটা কাল। চিন্তা করার সামর্থ্য যখন থাকে না, সেই বালকাবস্থার পর সাধারণ দয়া-মায়া আছে, এমন কোন লোকই অকারণ প্রাণিহত্যা করতে চায় না। কোন প্রাণীর জীব-নের মূল্য যে তার নিজের জীবনেরই তুল্য এ কথা সে বোঝে। জীবন বিপন্ন বোধ করলে খরগোস মানুষের শিশুর মতোই চিৎকার করে ওঠে। মানব-প্রেমিকরা সচরাচর যে পার্থক্য দেখেন আমি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সেখানে একমত নই, এ কথা যাঁরা জননী, তাঁদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন করে রাখি।

বনের সঙ্গে কোন তরুণের, তার মধ্যে সর্বোত্তম যে অকৃত্রিম ব্যক্তি, তার পরিচয় প্রথমটাতে প্রায়ই এই ভাবেই ঘটে। প্রথমে সে সেখানে জীবজন্তু কি মাছ শিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে যায়। কিন্তু ভিতরে মহত্তর আদর্শের বীজ থাকলে সে ক্রমশ তার যথার্থ লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়, যেমন কবি কি প্রকৃতি-বিজ্ঞানী যাই হ'ক, আর বন্দুক কি ছিপ-সুতো পরিহার করে। মানু-ষের মধ্যে অধিকাংশই এ বিষয়ে সর্বদা সর্বত্রই তরুণবয়স্ক থেকে যায়।

অনেক দেশেই ধর্ম-যাজকে শিকার করছেন, এমন দৃশ্যের অভাব নেই। মেষ-পালকের কুকুর হিসাবে ভাল হ'তে পারেন তিনি, কিন্তু ভাল মেষপালক হবার কোন যোগ্যতাই নেই তাঁর। ভাবলে অবাক লাগে যে, কাঠ ফাড়া, বরফ কাটা আর এই রকম গোটাকয়েক কাজের কথা বাদ দিলে আমার জ্ঞানত আর যে একটিমাত্র কাজে একজন ছাড়া আমার শহরবাসী বন্ধুদের—পিতা কি পুত্র কাউকে—ওয়ালডেন পন্ড-এ দিনের অর্ধেক সময় কাটাতে দেখেছি, সে হচ্ছে মাছ ধরা। সমগ্র সময়টা পুষ্করিণীটাকে দেখার সুযোগ পেয়েও, এক গাদা মাছ না জুটলে কেউ সাধারণত ভাবে নি যে তার ভাগ্য ভাল কি সময়টা ভালই কেটেছে। হাজারবার যেতে পারে তারা সেখানে, অবশিষ্ট কয়টা মাছ পুকুরের একেবারে তলায় গিয়ে না ঠেকা পর্যন্ত, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যের কোনকালে নড়-চড় ঘটবে না এবং এতেও সন্দেহ নেই যে, প্রক্ষা-লনের এই প্রক্রিয়াও সব সময়ে চলতে থাকবে। গবর্নর আর তাঁর কাউন্সিলের সকলের পুকুরটা সম্বন্ধে স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ছেলেবেলায় তাঁরা সেখানে মাছ ধরতে যেতেন। এখন বয়েস হয়েছে, পদমর্যাদা বেড়েছে, মাছ ধরতে যেতে বাধে। সুতরাং চিরকালের মতো একে ভুলে গেছেন। তথাপি শেষ পর্যন্ত তাঁরা স্বর্গেই যাবেন, প্রত্যাশা রাখেন। বিধানমন্ডলীর যদি খেয়াল হয়, তবে পুকুরটায় ক'টা ছিপ ফেলা উচিত হবে, আসলে তা নিয়েই মাথা ঘামাবে। কিন্তু ছিপের সেরা যে ছিপ, যাতে বিধানমন্ডলীর টোপ লাগিয়ে পুকুরটাকে মাছের মতো ধরা যেতে পারে, তার খবর তাঁরা রাখেন না। এইভাবেই সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এখনও ভ্রূণমনুষ্য ব্যাধ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরে বারবার লক্ষ্য করেছি যে, আত্মমর্যাদার একটু হানি না করে মাছ ধরতে আর পারি নে। বারংবার চেষ্টা করেও দেখেছি। মাছ ধরার ব্যাপারে আমার খানিকটা নৈপুণ্যও আছে, আর আমার অনেক বন্ধুবান্ধবের মতো, একটা সহজাত ঝোঁক আছে। থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সেটা। কন্তু কাজটা করেই সর্বদাই মনে হয়েছে, মাছ ধরার মধ্যে না গেলেই ভাল ছিল। আমার মনে হয় যে আমার ভুল নয় এটা। সামান্য ইঙ্গিত মাত্র, কিন্তু সকালবেলার প্রথম কিরণরেখাও তাই। আমার এই যে সহজাত প্রবৃত্তি এ নিশ্চয়ই সৃষ্টিলীলায় কোন নিম্নস্তরের ব্যাপার। প্রতিটি বছর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মৎস্য-শিকারীত্ব হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু সেই তুলনায় মনুষ্যত্ব কি জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বর্তমানে আমি একেবারেই মৎস্য-শিকারী নই। কিন্তু মনে হয়, বনবাসী থাকতে হ'লে, আমার কাজে কাজেই আবার লোভ যাবে মৎস্য-শিকারী কি ব্যাধ হতে। উপরন্তু খাদ্য হিসেবে এর আর সব মাংসের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত একটা

অশুদ্ধির ভাব থেকে যায়। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি গৃহকার্যের আরম্ভটা কোথায়, আর এত পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ এই যে প্রয়াস—প্রতিদিন চেহারাটা যেন পরিষ্কার আর ভদ্রগোছের হয়, বাড়িটাকে যেন মনোরম রাখতে পারি, কোথাও তার দুর্গন্ধ না থাকে, কোথাও অপরিষ্কার না হয়,—এর আদি কারণ কি। আমি নিজেই নিজের কসাই খিদমতগার বাবুর্চি আবার গৃহ-স্বামী, যার সম্মুখে থালা ভরে খাবার দেওয়া হচ্ছে—আমি সবই। সুতরাং সচরাচর যেমন দেখা যাবে না, এমন চৌকশ অভিজ্ঞতা থেকে আমি কথা বলতে পারি। আমার ক্ষেত্রে আমিষ আহারের বিপক্ষে বাস্তব আপত্তি এর অশুদ্ধি। তা ছাড়া মাছ ধরে, কুটে, রেঁধে বেড়ে খাবার পর মনে হ'ত যেন আসল খাওয়াই হয় নি। ব্যাপারটা সামান্য, এত কিছু করবার দরকার ছিল না এবং যা পরিশ্রম করা হ'ল, লভ্যের অনুপাতে তা অনেক বেশি। এক টুকরো রুটি আর গোটাকয়েক আলুতেই সমান কাজ হ'ত। কষ্ট আর নোংরামি বরং কম হ'ত। আমার সতীর্থদের অনেকের মতোই অনেকদিন বলতে গেলে পশুমাংস, চা, কফি ইত্যাদি খাই নি আমি। এ সব খেলে কিছু খারাপ হয় বুঝেছি ব'লে ততটা নয়, যতটা আমার ভাব-জগতের সঙ্গে খাপ খায় না ব'লে। আমিষ খাওয়ায় আপত্তি অভিজ্ঞতা থেকে নয়, প্রবৃত্তি থেকে। অনেক কারণেই সামান্য ভাবী জীবনযাপন আর যৎসামান্য আহার সুন্দর ব'লে মনে হ'ত। কিন্তু কাজে পালন করতে পারি নি তা কখনও। তবু আদর্শ বজায় রাখতে অনেক দূর পর্যন্ত এগোতাম। আমার বিশ্বাস অন্তরের সঙ্গে ঊর্ধ্বতন অথবা কবি-মনোভাবকে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন রাখতে চাইলে যে কোন লোক সকল রকম খাদ্য সম্বন্ধে, বিশেষ আমিষ আহার বিষয়ে নিবৃত্তির ভাব পোষণ করার দরকার বোধ করবেন। কীটতত্ত্ববিদদের বিবরণীতে বিশেষ একটি ঘটনার—কিরবি এবং স্পেন্সের গ্রন্থে পাঠ করেছি—উল্লেখ পাওয়া যায় যে, "কোন কোন কীট পূর্ণ-বিকশিত অবস্থায় খাদ্য-গ্রহণের অঙ্গাদি থাকা সত্ত্বেও, সেগুলি ব্যবহার করে না।" তাঁরা সকলেই লিপিবদ্ধ করেছেন, "সাধারণ নিয়ম এই যে এই অবস্থায় প্রায় সকল প্রাণীই শূককীট অপেক্ষা কম খাদ্য গ্রহণ করে। শুঁয়োপোকা অবস্থায় যে সর্বভূক সে যখন প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, কিংবা ঔদরিক কীটাণু যখন মক্ষিকা হয়—" তখন তারা দুই এক ফোঁটা মধু কি অন্য কোন মিষ্ট পানীয়তেই তৃপ্ত থাকে। প্রজাপতি তার ডানার তলায় কুক্ষির মধ্যে শূককীটকে প্রচ্ছন্ন রাখে। এই একটি মাত্র অঙ্গ তার পতঙ্গভূক অদৃষ্টকে লুব্ধ করে চলে। মানুষের মধ্যে যারা সর্বভূক, তারা শূককীটের পর্যায়েই আছে। অনেক জাতিরও সমানই অবস্থা—সে সব জাতির উদ্ভাবনী বা কল্পনাবৃত্তি নেই। তাদের বিরাট উদর তাদের স্বভাবের মধ্যে প্রকাশ পায়।

আদর্শ আদৌ ক্ষুণ্ণ হবে না এমন অনাড়ম্বর ও পরিষ্কার খাবার রান্না আর তার ব্যবস্থা করা কষ্টকর। কিন্তু দেহের মতোই আদর্শেরও খাদ্যের দরকার আছে মনে হয়। দুয়েরই একই আসনে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা সমীচীন। সম্ভবত তেমন ব্যবস্থা করাও যায়। অল্প পরিমাণে ফলাহার করলে আমাদের ক্ষুধা সম্বন্ধে লজ্জা পাবার কারণ থাকে না, শ্রেষ্ঠ সাধনার পরিপন্থীও হয় না তা। কিন্তু অতিরিক্ত একটি মাত্র আচার পর্যন্ত বিষের কাজ করতে পারে। বেঁচে থাকার জন্য সাড়ম্বর পাকব্যবস্থা মজুরিতে পোষায় না। আমাদের আমিষ কি নিরামিষ খাবার যা প্রতিদিন অন্য লোক তৈরি করছে, নিজের হাতে ঠিক ঐ খাবারই তৈরি করার অবস্থায় কেউ দেখে ফেললে অধিকাংশ লোকই লজ্জা পাবেন। কিন্তু এই অবস্থা না বদলালে আমরা সভ্য হ'তে পারি নে, ভদ্রলোক অথবা ভদ্রমহিলা হ'তে পারলেও নারী-পুরুষ হ'তে পারি নে। এই অবস্থাই নির্দেশ করছে যে এর পরিবর্তন দরকার। আদর্শ কেন স-চর্বি আমিষ ভোজনের সঙ্গে মিটমাট করে নিতে পারবে না, এ প্রশ্ন নিরর্থক। এ সম্বন্ধে আমার মনে কোন কিন্তু নেই। মানুষের মাংসাশী জীব হওয়া কি নিন্দার ব্যাপার নয়? অন্য জন্তু শিকার করে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে বাঁচতে পারে, বাঁচতে হয়ও তাকে, একথা সত্য। কিন্তু এ অবস্থা লজ্জাকর। যে কেউ খরগোস শিকার করতে কি কচি ভেড়া কাটতে যাবেন, তিনিই এ কথা বুঝতে পারবেন। আরও নির্দোষ কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকার শিক্ষা মানুষকে যিনি দিতে পারবেন, তিনি মনুষ্যজাতির উপকার করবেন। আমার নিজের আচরণ যাই হ'ক না কেন, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মনুষ্যজাতির অদৃষ্ট এক বিষয়ে নির্দিষ্ট আছে, ক্রমোন্নতির পথে তাকে আমিষ-ভোজন ছাড়তে হবে। সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে অসভ্য জাতিকে যেমন নর-খাদকতার অভ্যাস ছাড়তে হয়েছিল—এ-ও তেমনি ধ্রুব সত্য।

মানুষের মর্মবাণী অভ্রান্ত সত্য; ক্ষীণ হলেও তার নির্দেশ বিরামহীন। সেদিকে কান দিতে গেলে মনে হতে পারে যে, বাড়াবাড়ি এমন কি পাগলামি হচ্ছে। কিন্তু সংকল্পে দৃঢ় আর নিষ্ঠায় অবিচলিত হলে সে বুঝতে পারবে যে এই তার পথ। একটা বলিষ্ঠ লোকের ক্ষীণতম কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ সমগ্র মনুষ্যজাতির যুক্তিজাল আর প্রথার বিরুদ্ধে পরিণামে জয়ী হয়। কোন লোকই বিবেক অনুসরণ করে বিভ্রান্ত হতে পারে না। শরীর হয়তো একটু দুর্বল হতে পারে, কিন্তু সম্ভবত কেউই মনে করবেন না, সেজন্য অনুশোচনার প্রয়োজন, ঊর্ধ্বতন আদর্শের সঙ্গে জীবন-যাপনের এই ধারার মিল দেখা যাচ্ছে যখন। দিন আর রাত্রিকে যদি এমন মনে হয় যে, তাদের সানন্দ অভিবাদন জানাতে ইচ্ছা করে, ফুল আর সুরভি ওষধির মতো জীবন যদি

সুগন্ধ নিঃসরণ করে, বেশি নমনীয় হয়, নক্ষত্রমুখী হয়—অমরত্বের বেশি অধিকার পায়—কৃতিত্ব তো সেইখানেই। সমগ্র প্রকৃতি অভিনন্দনময় হয়ে ওঠে। অস্থায়ী হলেও আত্মপ্রসাদ লাভের কারণ থাকে। জীবনের সর্বাধিক লাভ আর উৎকর্ষ প্রশংসা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকে। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজেদেরই অতি অল্পে সন্দেহ জাগে। অল্পে ভুলেও যাই। কিন্তু সেই তো পরম সত্য। বোধহয় যে ঘটনা সব চাইতে বিস্ময়কর, সব চাইতে সত্য, কোন লোক অপর কাকেও কখনও সে কথা বলে না। আমার দৈনন্দিন জীবনের যা আসল সঞ্চয় সে তো সকাল সন্ধ্যার শোভার মতোই খানিকটা ধরাছোঁয়ার বাইরে, বর্ণনীয় নয়। সামান্য পরিমাণ নক্ষত্র-রেণু সে, যাকে ধরতে পেরেছি—ইন্দ্রধনুর খণ্ড, কিন্তু হাতের মুঠোয় পেয়েছি।

কিন্তু নিজের কথা বলতে গেলে, বাড়াবাড়ি রকমের খুঁতখুঁতে কোনদিনই নই আমি। দরকার হলে ইঁদুর ভাজাও কখনও কখনও সানন্দে খেতে পারতাম। আফিঙখোরের স্বর্গের তুলনায় স্বাভাবিক আকাশেই আমার আনন্দ বেশি। এই জন্যই এতদিন পর্যন্ত পানীয় হিসেবে জলই পান করেছি। সর্বদা প্রকৃতিস্থ থেকেই আমি খুশি। মাতলামিরও আবার অসংখ্য রকমফের আছে। আমার বিশ্বাস বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে জলই একমাত্র পানীয়। মাদকদ্রব্য হিসেবে সুরার গুণমাহাত্ম্যই বা তেমন কি। এক পেয়ালা গরম কফি পান করে সকালের, আর এক প্লেট চা দিয়ে সন্ধ্যার সকল মনোরথ ব্যর্থ করার কথাও ভাবতে পারা যায় না। এদের উপর লোভই কি কম অধঃপতনের কারণ! এমন কি গানেও নেশা হতে পারে। সামান্য মনে হ'লেও গ্রীস আর রোমের ধ্বংস এই কারণেই হয়েছিল আর ইংলণ্ড আমেরিকারও ধ্বংস এতেই ঘটবে। কিন্তু সকালের হাওয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে যদি মাতাল হওয়া যায়, মাতলামির সে অবস্থা কে না ভালবাসে? আমার এই অভদ্র কাজ দীর্ঘকাল ধরে করে যাওয়ার বিপক্ষে সব চাইতে কঠিন আপত্তি যা শুনেছি, তা এই যে আমার পানাহারও এর ফলে অভদ্রোচিত হয়ে পড়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ-কাল এই সব বিষয়ে আমার খুঁতখুঁতে ভাব অনেক কমেছে। খাবার আসনে বসে কম ধর্মকৃত্য করি; ভগবানের আশীর্বাদও প্রার্থনা করি নে। এমন নয় যে, আমি বেশি জ্ঞানবান হয়েছি। দোষ স্বীকার না করে উপায় নেই যে, যতই দুঃখের ব্যাপার হ'ক, দেখছি বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটু বেশি অমার্জিত আর উদাসীন হয়ে পড়েছি। সম্ভবত এই সব ধারণা যৌবনেই সকলে পোষণ করে, যেমন কবিতা সম্বন্ধে অনেকের ধারণা। আমার মতামত লিপিবদ্ধ করছি এখানে, কিন্তু তদনুযায়ী আচরণ কুত্রাপি করি নে। নিজেকে আমি দৈবানুগৃহীত ব্যক্তিদের একজন হিসেবে ধরি নে, বেদে যাঁদের কথা এই বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "সর্বময় পরম ব্রহ্মে যাঁর প্রকৃত বিশ্বাস আছে,

তিনি যাবতীয় বস্তু ভক্ষণ করতে পারেন।" অর্থাৎ তাঁর কি খাদ্য, কে তা তৈরি করেছে, এসব প্রশ্ন করার কোন দরকারই নেই তাঁর। এমন কি সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, হিন্দু টীকাকার মন্তব্য করছেন, বেদান্তের মতে এই স্বেচ্ছাচার শুধু "বিপত্তিকালের" জন্যই নির্দিষ্ট হয়েছে।

খিদে তেমন না থাকলেও খাদ্যে অনির্বচনীয় স্বাদ কখনও কখনও কে না পেয়েছেন? ভেবে রোমাঞ্চ হয় যে, অতি সাধারণ স্থূল তৃপ্তিবোধ আমার মনশ্চক্ষু খুলে দিয়েছে, রসনার রসাভাস আমার রসপ্রেরণা যুগিয়েছে। পাহাড়ের ধারে কয়েকটা বেরি খেয়ে আমার প্রতিভা পুষ্টিলাভ করেছে। চেঙচু বলছেন, "আত্মা কর্ত্রী না হ'লে, চেয়ে দেখলেও নিরীক্ষণ করা হয় না, কানে শুনলেও কিছু শ্রুতিগোচর হয় না; এবং খাদ্য গ্রহণ করলেও খাদ্যের রসাস্বাদলাভ হয় না।" যে লোক খাদ্যের প্রকৃত স্বাদগ্রহণে সমর্থ, সে কখনও উদরসর্বস্ব হ'তে পারে না। যে অসমর্থ, তার আর কিছু হবার উপায় নেই। ভোজসভায় তা-বড় কোন নাগরিক কচ্ছপ-মাংস ভক্ষণ করে যে স্থূল ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করেন, কোন শুদ্ধাচার ব্যক্তি তাঁর সামান্য রুটির টুকরোতে চিরকালই সেই একই তৃপ্তিলাভ করে থাকেন। মুখগহ্বরে যে খাদ্য যাচ্ছে তার মধ্যে অশুচি হবার কিছু নেই, খাওয়ার সময় লালসার মধ্যেই অশুচিতা; গুণাগুণ নয়, পরিমাণও নয়, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার লোভের মধ্যে। যে খাদ্য গ্রহণ করা হচ্ছে, তা আমার জান্তব-জীবন রক্ষার অনুপান কি আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশসহায়ক না হয়ে যদি আমার মধ্যে যে কীটকুল আছে, তাদেরই ভক্ষণার্থ হয়—তাহ'লেই। শিকারীর লোভ কর্দম-কূর্ম, গন্ধ-গোকুল ইত্যাদি বন্যজীবের মাংসে, সুমার্জিতা মহিলার লোভ গোবৎসের পাদখণ্ডে তৈরি জেলি কি সামুদ্রিক সার্ডিন মাছে। উভয়েই সমান। একজন যাচ্ছেন মিলের পুষ্করিণীতে, অপরজন তাঁর সুরক্ষিত শিশি-বোতলের দিকে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁরা বা আমি-তুমি কি করে এই পঙ্কিল, পশুসুলভ, পানাহারসর্বস্ব জীবন যাপন করে চলেছি।

আমাদের সমগ্র জীবনটাই আশ্চর্য রকম নীতিনিষ্ঠ। ক্ষণিকের জন্যও পাপ আর পুণ্যের সন্ধি হয় না সেখানে। সততাই একমাত্র বিনিয়োগ যা ব্যর্থ হয় না। পৃথিবীময় বীণা-সঙ্গীত স্পন্দিত হয়ে চলেছে, তার মধ্যে এই একটি সুরের মূর্ছনাই আমাদের শিহরণ জাগায়। এ বীণা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বীমা-কোম্পানীর ভ্রাম্যমাণ প্রচারক, তার বিধিবিধানের সুপারিশ করে চলেছে। সামান্য সততাই আমাদের একমাত্র দেয় চাঁদা। কালক্রমে যুবক উদাসীন হয়ে পড়ে, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই আইন কখনও উদাসীন হয় না। সব সময়েই সে সংবেদনশীল ব্যক্তিদের পক্ষে। কান পেতে শুনলে শোনা

যাবে মলয়-হিল্লোলের গঞ্জনা, সেখানে সে আছেই আছে। যে শুনতে পায় না, দুর্ভাগ্য তার। যে কোন তারে ঝংকার তুললে চাবি নাড়তে গেলেই সেই মিঠে বোলই যে মন মাতায়। দূর থেকে শুনলে অনেক বিরক্তিকর শব্দই তাই সংগীতের মতো শোনায়। আমাদের জীবনযাত্রার ইতরতার উদ্দেশ্যে সে সঙ্গীত সুস্পষ্ট, সুমধুর বিদ্রূপ।

আমাদের মধ্যে যে পশু আছে, আমরা তা বুঝি। আমাদের ঊর্ধ্বতন প্রকৃতি যত ঘুমোয় পশুটা তত জেগে ওঠে। ইন্দ্রিয়-পরবশ সরীসৃপ সে, সম্ভবত একেবারে রেহাই পাওয়া যায় না তার হাত থেকে। সুস্থ হয়ে বেঁচে থেকেও আমাদের দেহ যেমন কীটের আকর। আমরা তার থেকে দূরে হয়তো যেতে পারি, কিন্তু তার প্রকৃতির পরিবর্তন করতে পারি নে। আশঙ্কা হয় নিজস্ব স্বাস্থ্য স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করে সে। আমরা ভাল থাকতে পারি, কিন্তু শুদ্ধ থাকি নে। সেদিন একটা শুয়োরের নিচের চোয়ালপাটি কুড়িয়ে দেখছিলাম। সাদা নীরোগ দন্তপাটি আর দ্রংষ্টা। দেখে মনে হ'ল আধ্যাত্মিকতা থেকে আলাদা একটা পশুসুলভ স্বাস্থ্য ও সবলতা আছে। মিতাচার আর শুচিতাকে বাদ দিয়েই প্রাণীটার কৃতিত্ব। মেনসিউস বলেছেন, "ইতর জন্তুর সঙ্গে মানুষের যে পার্থক্য, তা যৎসামান্যই। সাধারণ মানুষ অতি অল্পকালের মধ্যেই তা হারিয়ে ফেলে। অসাধারণ মানুষ সযত্নে তা রক্ষা করে।" আমরা যদি শুচিতা লাভ করতে পারতাম, কে বলবে কি রকম জীবন হ'ত আমাদের। শুচিতায় দীক্ষা দিতে পারেন, এমন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধান জানলে, এখুনি গিয়ে তাঁকে খুঁজে বার করতাম। "ভগবানকে মানসগোচর করতে হ'লে বড় রিপুর তথা বহিরিন্দ্রিয়ের জয় একান্ত আবশ্যক, বেদের এই নির্দেশ।" আত্মা সাময়িক ভাবে দেহের প্রতিটি অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে তার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে সক্ষম এবং বাহ্যত যাকে নিকৃষ্ট পর্যায়ের কামসম্ভোগ মনে হয়, তার মধ্যে সে শুচিতা ও নিষ্ঠা সঞ্চার করে। আমরা অসংযমী হলে আমাদের জননশক্তি অপচয় আর অশুচিতার কারণ হয়, সংযমী হ'লে আমাদের বীর্যবান করে, প্রেরণা দেয়। মনুষ্যত্বের ফোটা ফুল সংযম। প্রতিভা, বীরত্ব, ধর্মভাব ইত্যাদি যাই বলি, সমস্তই এর অনুগামী, এর বিবিধ ফলরূপ। শুচিতার স্রোত উন্মুক্ত হ'লেই মানুষ সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দিকে প্রবাহিত হয়। কখনও শুচিতা আমাদের ঊর্ধ্বগামী করছে, কখন অশুচিতা অধঃপতিত রাখছে। যে ব্যক্তি নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করেছেন যে, তাঁর মধ্যে দিনে দিনে পশুর তিরোধান আর দেবতার আবির্ভাব ঘটছে, তিনিই ধন্য। নিজের নিকৃষ্ট আর পশুসত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বভাবের জন্য লজ্জা বোধ করার কারণ পান না, সম্ভবত এমন কেউ নেই। আমার আশংকা যে, আমরা হয়তো সেই ফন আর স্যাটার জাতের দেবতা কি অর্ধ-

দেবতা বিশেষ, দেবতা আর পশুর সংমিশ্রণ, ইন্দ্রিয়ের দাস আর আমাদের জীবন কিছুটা পরিমাণে আমাদের কলঙ্কঃ—

"সুখী সেই যে বা মনের বনেরে নির্মূলিয়া
যোগ্য ঠাঁই দিল পশুপালে বাঁটিয়া বাঁটিয়া।

অশ্ব, ছাগ, বৃক যত জীব কাজেতে লাগায়,
অপরের কাছে গাধা বনি নাহি যায়,
অন্যথা মানুষ খালি পশুপাল নয়—
তার মাঝে গর্জি রোষ-রব
অনেক দানব,
সবে তার ঘোষে পরাজয়।"

সকল ইন্দ্রিয়ানুরাগই এক, বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায় মাত্র। সকল শুচিতাও এক। মানুষ পানাহার করে, সঙ্গম করে, কি নিদ্রা যায়—ইন্দ্রিয়-বশ্যতায় সমস্তই এক। সমস্তই এক ক্ষুধাবোধ। এর যে কোন একটি কাজ কোন মানুষকে করতে দেখলেই সে কি পরিমাণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ তা বোঝা যায়। যে অশুচি সে শুচি হয়ে দাঁড়াতে কি বসতে পর্যন্ত জানে না। সরীসৃপটাকে একটা গর্তের মুখে আক্রমণ করলে, অন্য গর্ত দিয়ে সে মুখ বার করে। সংযমী হ'তে হ'লে মিতাচারী হওয়া অত্যাবশ্যক। সংযম কি? কোন ব্যক্তি কি করে বুঝবে সে সংযমী কি না? বুঝতে পারে না সে। গুণটির কথা শুনে থাকি বটে, কিন্তু আমরা জানি নে গুণটা কি। লোকের মুখে শুনে শুনে আমরা তার প্রতিধ্বনি করি মাত্র। পরিশ্রম থেকে জ্ঞান আর শুচিতার জন্ম, আলস্য আর অজ্ঞতা থেকে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার। ছাত্রের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা মানসিক আলস্যপরায়ণতা। অশুচি ব্যক্তি সর্বত্রই অলস। আগুন পোয়াবার চুলোর কাছে সব সময়েই বসে আছে, চিতপাত শুয়েই আছে—সূর্য উঠলেও; ক্লান্তির কারণ ঘটে নি, তবু বিশ্রামই করে চলেছে। অশুচিতা তথা সর্বপাপ থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ঐকান্তিক পরিশ্রমের প্রয়োজন—এমন কি, আস্তাবল পরিষ্কার করার ব্যাপারেও। স্বভাবকে জয় করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু জয় তো করতেই হবে তাকে। তুমি খৃীস্টান বলেই গর্ব করবার কিছু নেই, যদি না অখৃীস্টানের তুলনায় বেশি শুচি হ'তে পার, তার চাইতে বেশি ভোগবাসনা ত্যাগ না করতে পার, তার চাইতে বেশি ধর্মনিষ্ঠ না হও। অনেক ধর্মমতের কথা জানি আমি, ম্লেচ্ছধর্ম মনে করা হয় তাদের, কিন্তু তাদের উপদেশ পড়লে পাঠক নিজের সম্বন্ধে লজ্জা বোধ করবেন, আর সামান্য আচারানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে হ'লেও নতুন উৎসাহ জাগবে।

এসব বলতে সংকোচ হ'চ্ছে, আলোচ্য বিষয়ের জন্য,—কথাবার্তাতে অশ্লীল হ'লাম কি না তাতে আমার বিশেষ যায় আসে না —কিন্তু এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে আমার অশুচিতার পরিচয় না দিয়ে কথা বলা যায় না। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে বিনা লজ্জায় আলোচনা করতে আমাদের বাধে না, আবার কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা মূক। মানুষের জীবনের আবশ্যক কৃত্য সম্বন্ধে সহজভাবে আমরা আলোচনা পর্যন্ত করতে পারি নে, আমরা এমনই হীন। সে-কালে কোন কোন দেশে করণীয় সবকিছুর কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে বলা হ'ত এবং বিধি অনুযায়ী তাদের নিয়ন্ত্রণও করা হ'ত। হিন্দু সংহিতাকারের দৃষ্টিতে কিছুই তুচ্ছ মনে হয় নি, আধুনিক রুচিতে তা যতই কটু মনে হ'ক। পানাহার, সঙ্গম, মলমূত্র ত্যাগ সব বিষয়েই তিনি নির্দেশ দান করে গেছেন। তুচ্ছ বিষয়ের তাতে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। তার সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে অনর্থক কৈফিয়ত দিয়ে দায় খালাস করেন নি।

প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আরাধ্য দেবতার জন্য নিজের দেহরূপ মন্দির নির্মাণ করে চলেছে। নির্মাণভঙ্গি নিতান্তই তার নিজস্ব। কেবল হাতুড়ি দিয়ে মারবেল পাথরে ঘা মেরে গেলেই চলে না। আমরা সকলেই ভাস্কর, সকলেই চিত্রকর, আমাদের দেহ, রক্ত, অস্থিই আমাদের উপাদান। মহত্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মুখ চোখে সুন্দর হয়ে ফোটে। নীচতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা তাকে পশুভাব দেয়।

জন ফার্মার সেপ্টেম্বর মাসে একদিন সন্ধ্যাবেলায় নিজের দরজায় বসে আছেন। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছেন। মনের মধ্যে সেই পরিশ্রমের ব্যাপার নিয়েই মোটামুটি নাড়াচাড়া করছেন। স্নান সাঙ্গ হলে নিজের ধীসত্তা সম্বন্ধে আবার মনোযোগ দেবার সময় পেলেন। সন্ধ্যার দিকে বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। পাড়া-পড়শীরা কেউ কেউ তুষারপাত হবে আশংকা করছেন। বেশিক্ষণ নিজের চিন্তায় মন নিবিষ্ট করবার আগেই শুনতে পেলেন কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশির সুর তাঁর মনের ভাবের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল। তখনও কিন্তু তিনি মনের মধ্যে কাজের কথাই ভেবে চলেছেন। তাই নিয়েই মাথায় তোলপাড় চলেছে আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হ'লেও তাই নিয়েই চিন্তা করছেন, ফন্দি-ফিকির আঁটছেন। অথচ মনের মধ্যে চিন্তার মূলসুর দাঁড়াচ্ছে, এসবে তাঁর মোটেই কিছু যায় আসে না। এ যে তাঁর মরা চামড়া, ক্রমাগতই খসে খসে পড়বে। কিন্তু বাঁশির সুর তাঁর কানে ভেসে আসছে, যে যে কাজ করছেন, তার বাইরে কোন আলাদা রাজ্যের খবর নিয়ে। তাঁর মনে যেসব বৃত্তি সুপ্ত, বাঁশির সুরে তাদের কাজের আভাস পাওয়া যায়। আস্তে আস্তে তাঁর রাস্তা, তাঁর গ্রাম, তাঁর দেশ, যেখানে তিনি আছেন—সব মিলিয়ে গেল সে সুরে। কার কথা যেন তিনি কানে শুনতে পেলেন,—কেন এখানে পড়ে

আছ আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হীন কাজ করে জীবন কাটাচ্ছ? তোমার ভবিষ্যৎ গৌরব তো তোমারই নাগালের মধ্যে। আকাশের এই তারারা তোমার আশপাশ ছাড়া আলাদা সব মাঠের উপরও জ্বলছে।—কিন্তু হাঁতে-কলমে এই অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়ে এখান থেকে সেখানে যাওয়ার উপায় কি? ভেবে ভেবে নতুন কৃচ্ছ্র-সাধনের জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। মনকে দেহের মধ্যে নামিয়ে তার শোধন-ব্যবস্থা করলেন। নিজের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা বাড়ল।

॥ ১২ ॥ প্রতিবেশী জীবজন্তু

মধ্যে মধ্যে মাছ ধরার সঙ্গী জুটতেন একজন। শহরের ঐ দিকটা থেকে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে আমার আস্তানায় আসতেন তিনি। সুতরাং ভোজন-ব্যবস্থা আর ভোজ-পর্ব, দুইই বেশ গল্প-সল্প করতে করতে সাঙ্গ করা যেত।

বনবাসী। বাইরের পৃথিবীতে কি হচ্ছে এখন, জানি নে। তিন ঘন্টা হ'ল সুইট ফার্নের ঝোপ থেকে কোন পঙ্গপালের ডাক পর্যন্ত কানে আসে নি। পায়রাগুলো সব ঘুমোচ্ছে নিজের নিজের খোপে—তাদের পাখার শব্দও নেই। বনের ওধার থেকে এইমাত্র শিঙার শব্দ শোনা গেল, বোধ হয় চাষারা যা দুপুরবেলায় বাজায়, তাই কেউ বাজিয়ে থাকবে। কৃষাণরা আসছে সিদ্ধ নুন-ছড়ানো মাংস, সাইডার আর ভুট্টার রুটির খাবার খেতে। এত দুশ্চিন্তা কি জন্য লোকজনের? যে খায় না, তার কোন কাজ করার দরকার নেই। জানি নে, ওদের কে কেমন ফসল পেল। কুকুরের ঘেউ ঘেউয়ের যন্ত্রণায় চিন্তা করা যায় না যেখানে, সেখানে বনবাস করবে কে; আর এই গেরস্থালি। দরজার হাতল চকচকে রাখ আর এমন সুন্দর দিনে টব ধোও। বাড়ির দরকারটা কি। গাছের একটা গর্ত হ'লেই তো চলে যায়। সকালবেলাটা এর ওর কাছে গেলাম আর তারপর কোন ডিনার পার্টি। একটা কাঠঠোকরা ঠক ঠক করছে। ঝাঁক বেঁধে আসছে ওরা, রোদের তাত লাগছে ওখানটাতে। আমার চাইতে অনেকটা এগিয়ে জন্মিয়েছে ওরা। ঝরনার জল ধরে রাখতে হয়েছে আমাকে। তাকের উপর এক টুকরো রুটিও তোলা আছে।—কিসের শব্দ! পাতার খস-খস শোনা যাচ্ছে। গাঁয়ের কোন আধপেট খাওয়া কুকুর শিকারের ঝোঁকে এসে জুটল বুঝি; না, বনের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সেই শুয়োরটা, বৃষ্টিতে তার পায়ের দাগ দেখেছিলাম সেদিন। এগিয়ে আসছে শব্দটা। সুমাক আর সুইট ব্রায়ারের ঝাড় কাঁপছে।....ও কবি, আপনি? আজকের এই মর্ত্যভূমিটা লাগছে কেমন?

কবি। মেঘগুলো চেয়ে দেখ ঐখানটাতে, যেন ঝুলে আছে। আজকে যা যা দেখছি, তার মধ্যে ঐটেই সেরা। নাম-করা যত ছবি, ওল্ড পেন্টিং, তার কোনটাতে এমনটি দেখা যায় না, বিদেশে গেলেও দেখা যাবে না, অবিশ্যি

স্পেনের সমুদ্রকুলের কাছে না গিয়ে পড়ি যদি। আকাশটা ভূমধ্যসাগরের উপরের আকাশের মতো দেখাচ্ছে হুবহু। মনে হল, আহারটা জোটানো দরকার, আর আজ যখন খাওয়া জোটে নি তখন মাছ মারতে গেলে মন্দ হয় না। সেই তো কবির উপযুক্ত উপজীবিকা। আর ঐ একটা কারবারেই তো হাতেখড়ি হয়েছে। চল, যাওয়া যাক,—

বনবাসী। লোভ সামলানো মুশকিল। সম্বল একটুকরো বাজে রুটি, ফুরোতে কতক্ষণ। আপনার সঙ্গে যেতে পারলে খুশি হ'তাম। কিন্তু একটা ভাববার মতো কথা ভাবছিলাম। বোধ হয় শেষ করে ফেলতে পারি এখনি। কিছুটা সময়ের জন্য একা থাকতে দিন আমাকে। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে, আপনি বরং মাটি খুঁড়ে টোপ দেখুন এর ফাঁকে। এখানে কিন্তু কেঁচো পাওয়া যায় না একেবারেই। এখানকার মাটি কখনও সার পায় নি, তাই পুষ্টিও হয় নি কোনদিন। কেঁচোরাও সাবাড় হয়ে গেছে এখান থেকে। মাটি খুঁড়ে টোপ বার করা মাছ ধরবার মজাটার প্রায় সমান মজা, অবিশ্যি খিদেটা যদি একটু কম থাকে। সুতরাং ঐ মজাটার সবটা আজ আপনিই ভোগ করুন। ঐ যে জনসোয়র্টের ঝোপটা দুলছে, ঐখানে ঐ গ্রাউন্ডনাটের গাদার মধ্যে খুরপিটা মাটির বুকে সেঁধিয়ে দিন। আমি জোর করে বলতে পারি, যদি ভাল ক'রে, যেন আগাছা ওপড়াচ্ছেন এই ভাবে ঘাসের শেকড় পর্যন্ত খুঁড়ে দেখেন, তবে তিন তিন চাপড়ায় এক এক কেঁচো নিশ্চয়ই পাবেন। আর, যদি খানিকটা দূরে যেতে পারেন তাহ'লেও বোকামি হবে না। কেন না, আমি দেখেছি, যত দূরে যাওয়া যায় ভাল টোপও সংখ্যাতে বেড়ে চলে।

বনবাসী (একা)। আচ্ছা, কোথায় এসেছিলাম? মনে হচ্ছে আমি মনে মনে প্রায় এইখানটাতেই ছিলাম, আর পৃথিবীটার অবস্থানও এই কোণে। স্বর্গে যাব, না মাছ ধরতে যাব? আমি যদি এখন তাড়াতাড়ি করে ধ্যান থেকে বিরাম নিই, এমন মনের মতো সুযোগ আর পাব কি? বস্তুর মর্মের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিলাম, এ পর্যন্ত জীবনে যা কোনদিন হয় নি। ভয় হচ্ছে, চিন্তার খেই এখন খুঁজে পাব না। যদি কোন কাজে লাগত, শিষ দিয়ে দেখ-তাম। চিন্তা যখন নিজে থেকে ধরা দেয়, তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা বুদ্ধি-মানের কাজ নয়। চিন্তার খেইয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, হাতড়ে পাচ্ছি নে কিছু। কি ভাবছিলাম? দিনটা কুয়াসাভরা ছিল। কং-ফুৎসির এই তিনটে শ্লোক নিয়ে চেষ্টা করে দেখা যাক হয়তো মনের ভাবটা ফিরে আসতে পারে তাতে। জানি নে, আবর্জনার রাশ না হ্লাদিনীশক্তির আভাস এসেছিল মনে; টুকে রাখার দরকার। এ রকম সুযোগ জীবনে একবার ছাড়া আসে না।

কবি। কতদূর হে বনবাসী, সময় হয়েছে কি? তেরোটা গোটা টোপ জুটেছে আমার, এছাড়া গোটাকয়েক একটু খুঁতি আর কয়েকটা ছোট। ছোট

মাছ ধরার সময়ে কাজে লাগবে এগ্‌নলো। বঁড়শির কাঁটার সবটা গিলে উঠতে পারে না। গাঁয়ের কেঁচোগ্‌নলো দিব্যি বড় বঁড়শির প্যাঁচ ম্‌নখে না প্‌নরেও একটায় শাইনার মাছের পেট ভরে যাবে।

বনবাসী। চল্‌নন, তাহলে যাওয়া যাক এবার। কনকর্ড নদীতে যাবেন? জলে যদি জোয়ার না এসে থাকে, তবে মাছ মন্দ পাওয়া যাবে না সেখানে।

এই যেসব বস্তু দেখছি, প্‌নথিবীটা ঠিক এদের নিয়েই তৈরি কেন? ঠিক এই এই জাতের জন্তুরাই মান্‌নষের প্রতিবেশী হয় কেন; যেন ঠিক ইঁদ্‌নর ছাড়া এ গর্তটার অধিবাসী আর কেউ হ'তে পারে না। মনে হচ্ছে পিলপে এণ্ড কোম্পানি জন্তুদের ঠিকমতো কাজেই লাগায়, কেন না সব জন্তুই ভার-বাহী। ভেবে দেখতে গেলে আমাদের চিন্তার খানিকটা ভার বহন করবার জন্যই তাদের জন্ম।

আমার আস্তানায় যে ইঁদ্‌নরগ্‌নলো ঘ্‌নরে বেড়ায়, তারা ঠিক সাধারণ জাতের নয়—বাইরে থেকে এ দেশে আমদানি হয়েছে বলা হয় যাদের। এরা একেবারে বনের নিজস্ব জীব, গ্রামে এদের দেখা যায় না। একটা পাঠিয়ে-ছিলাম নাম-করা জনৈক প্রাণিতত্ত্ববিদকে, তিনি দেখে খ্‌নশি হন। আস্তানাটা গড়বার সময় এদের একটার গর্ত ছিল আমার এই ঘরটার ঠিক নিচে। মেঝের দ্বিতীয় কিস্তি তক্তা লাগানো হয় নি তখনও, কাঠকুট সাফ করবার আগে, নিয়মমতো ঠিক খাবার সময় বাইরে এসে আমার পায়ের তলা থেকে র্‌নটির ট্‌নকরো কুড়িয়ে খেত। এর আগে সম্ভবত মান্‌নষ কখনও দেখে নি ইঁদ্‌নরটা। পরিচিত হ'তে বেশি দেরি লাগল না—আমার জ্‌নতো জামা-কাপড়ের উপর ছ্‌নটোছ্‌নটি লাগিয়ে দিল। ঘরের দেয়ালে ছোট ছোট লাফ দিয়ে বেয়ে উঠতে বিশেষ বেগ পেত না, কাঠবিড়ালের সঙ্গে খানিকটা মিল ছিল তার চলাফেরায়। শেষে, একদিন বেঞ্চির উপর কন্‌নয়ে ভর দিয়ে শ্‌নয়ে আছি, দেখি আমার প্যান্ট বেয়ে উঠে কোটের হাতায় চড়ে কাগজের উপর আমার খাবার ছিল, তার চারপাশে ঘ্‌নর-ঘ্‌নর স্‌নর্‌ন করেছে। খাবারটা হাতের নাগালের মধ্যে রেখে, ওটাকে ফাঁকি দিয়ে, ওর সঙ্গে ল্‌নকোচ্‌নরি খেলা জ্‌নড়ে দিলাম। তারপর বেশ খানিকটা সময় গেলে আমি আমার ব্‌নড়ো আঙ্‌নল আর তর্জনীর মধ্যে এক-ট্‌নকরো চীজ ধরে রইলাম আর ইঁদ্‌নরটা এসে সেটা কামড়ে খেতে লাগল আমার হাতের উপর বসে। খানিক পরে ম্‌নখ আর থাবা পরিষ্কার করা হ'ল, মাছি যেমন করে। তারপর চলে গেল।

চালাটাতে অচিরাৎ একটা ফিবি পাখি নীড় বাঁধল আর বাড়ির পেছনটাতে একটা পাইনগাছ ছিল, সেখানে একটা রবিন পাখি আশ্রয় নিল। জ্‌নন মাসে একটা তিতির (টেট্রও আমবেলাস্‌), বড় লাজ্‌নক পাখিটা, আমার জানালার

সামনে দিয়ে তার ছানা কটাকে বাড়ির সামনের জঙ্গলের পিছন দিক থেকে মুরগির মতো কোঁক কোঁক আওয়াজ করতে করতে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। চলন-বলন দেখে মনে হ'ল সেই যেন এই বনের গিন্নী। কেউ এদিকে আসছে কাছ থেকে সাড়া পেলে কচি ছানাগুলো সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যেন ঘূর্ণী হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে ওদের। এমন হুবহু শুকনো পাতা আর ডালের মতো দেখতে এগুলো যে, এরা কাছে আছে ঘূণাক্ষরে সন্দেহ না করে অনেকেই পথ চলতে ঠিক এদের ঝাঁকের মধ্যেই পা দিয়ে বসেন আর শুনতে পান ধাড়ি-পাখিটা ভয় পেয়ে উড়ে পালাতে পালাতে ডানা ঝটপট করছে, উৎকন্ঠায় আর্তনাদ করে ডাকছে ছানাগুলোকে মিউ মিউ আওয়াজ করে। বোঝা যায় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই ডানা নাড়াচ্ছে। মা-পাখিটা কখনও কখনও এমন গড়িয়ে পড়বে আর ঘুরতে থাকবে আলুথালু অবস্থায় সামনে এসে যে কিছুক্ষণের জন্য বুঝতে পারা যাবে না, প্রাণীটা কি। কচি ছানা-গুলো একেবারে মাটির সঙ্গে সেঁটে থাকবে চুপচাপ, মাথাগুলো পাতার তলায় প্রায় লুকিয়ে—নজর শুধু দূর থেকে মা কি সংকেত দিচ্ছে। আরও এগিয়ে যান, কখনও আবার ছুটে বেরিয়ে নিজেদের ধরা দেবে না। এমন কি একেবারে তাদের মাড়িয়ে গেলেও, কি মিনিটখানেক ধরে দেখলেও বোঝা যাবে না, এরা রয়েছে কোথাও। এই অবস্থায় আমি ওদের হাতের তেলোয় তুলে ধরে দেখেছি, তখনও ঠিক খেয়াল করে তেলোর উপর নির্ভয়ে, না কেঁপে সেঁটে শুয়ে আছে, মা-পাখি আর সহজাত সংস্কারের একেবারে বাধ্য হয়ে। সহজাত সংস্কারটা এমন নিখুঁত যে, একবার পাখিগুলোকে হাত থেকে নামিয়ে যখন আবার পাতার উপর রাখি, দৈবক্রমে একটা কাত হয়ে পড়ে, দশ মিনিটের মধ্যেই আবার দেখি বাকি ক'টার সঙ্গে ঠিক একজোট হয়ে গেছে। অন্য সব পাখির ছানাদের যেমন ডানা গজায় না, এরা তেমন নয়; সময় হবার আগেই বেশ পাকা-পোক্ত হয়ে ওঠে, এমন কি মুরগির ছানার চাইতেও। এদের খোলা আর শান্ত চোখের আশ্চর্যরকমে বড় সড় আর নিরীহ হাব-ভাব মনের মধ্যে বিশেষ ছাপ ফেলে যায়। তার মধ্যে যেন বুদ্ধির সমস্ত আলোর ছটা। ওদের মধ্যে শৈশবের শুচিতা নয় শুধু, অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া একটা বিজ্ঞতার ভাবও দেখা যায়। এমন চোখ শুধু পাখিদের জন্ম থেকে সুরু নয়, যে আকাশের ভাব এর মধ্যে ভাসছে তারই সমসাময়িক হবে। এই বনেও আর দ্বিতীয় এমন কোন রত্ন পাওয়া যায় না। এত স্বচ্ছ জলাশয় সচরাচর কোন পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে পড়ে না। বর্বর, কান্ডজ্ঞানহীন শিকারী মা-পাখিকে এই অবস্থাতে গুলি করে মারে। ফলে এই নির্দোষ ছানা ক'টা কোন ওত পেতে থাকা পশু বা পাখির খপ্পরে পড়ে, কি আস্তে আস্তে ঝরা পাতার মধ্যে মিলিয়ে যায়।—এদের সঙ্গে

সাদৃশ্য এত বেশি তার। শোনা যায়, এদের যদি মুরগিতে পালে, তখনও ভয় পেলে নিজেদের মতোই এরা চারপাশে ছড়িয়ে যায় আর হারিয়েও যায়, কেন না মা-পাখি তো নেই যে ডেকে আবার ফিরিয়ে আনবে ওদের। এরাই ছিল আমার মুরগি আর তার ছানার পাল।

কতরকম প্রাণীই যে বনের মধ্যে লুকিয়ে, হাত পা ছড়িয়ে বনে জীবন কাটায়, শহরের কাছে থেকেও আত্মরক্ষা করে, শুধু শিকারী ছাড়া আর কেউ জানেও না তাদের। ভাবলে আশ্চর্য হ'তে হয়, কি করে উদ্বিড়াল একেবারে লোকচক্ষুর অগোচরে রয়ে গেছে এখানে। লম্বায় চার ফুট, একটা ছোটছেলের মতো বড়, হয়তো কোন লোকের দৃষ্টি পড়ে না তার উপর। আমার বাসাটা যেখানে তার পেছনের বনটাতে প্রথম-প্রথম রেক্‌উন দেখতাম। এখনও বোধ হয় রাত্রে তাদের ঘোঁত ঘোঁত শোনা যায়। সাধারণত, দুপুর-বেলায়, গাছ পোঁতা সাঙ্গ করে, দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতাম ছায়ায়, জল-যোগ সারতাম, একটা ঝরনার পাশে বসে খানিকটা পড়তামও। আমার মাঠ থেকে আধ মাইল দূরে ব্রিস্টার হিল থেকে ধেয়ে ধেয়ে এসেছে ঝরনাটা—একটা জলাভূমি আর নদীর উৎস সেটা। সেখানে যেতে হ'লে পর পর ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে এমন কয়েকটা তৃণাস্তীর্ণ গহ্বরের—ছোট ছোট পিচ পাইন গাছে ভরে গেছে সেগুলো—মধ্যে দিয়ে নেমে গিয়ে উঠতে হয় জলাভূমির পাশে একটা আরও বড় বনের কাছে। সেখানে ডালপালা মেলা একটা সাদা পাইন গাছের তলায় অতি নির্জন ছায়াচ্ছন্ন একটি স্থানে তখন পর্যন্ত বস-বার যোগ্য পরিপাটি দৃঢ় খানিকটা তৃণশ্যাম জায়গা ছিল। সেখানে ঝর-নাটা খুঁড়ে পরিষ্কার জলের একটা কুয়ো বানিয়েছিলাম। না ঘুলিয়ে পুরো বালতি ভরে জল তুলতে পারতাম সেখানে থেকে। ভরা গ্রীষ্মের মধ্যে প্রত্যেকদিন সেই উদ্দেশ্যেই, পুকুরের জল যখন সব চাইতে গরম হ'ত, যেতাম সেখানটায়। আর উডকক পাখিটাও তার ছানার পাল নিয়ে যেত সেখানে কাদা খুঁড়ে পোকা-মাকড় বার করতে। তীর দিয়ে দিয়ে ঠিক তাদের এক-ফুট উপরে সে উড়ে চলেছে আর ছানার পাল ছুটছে তার নিচে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেই আমাকে দেখা, অমনি ছানাগুলোকে ফেলে চলে এসে আমার চারদিকে ঘুরতে থাকত। এগোতে এগোতে একেবারে চার পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে ভান করত যেন তার ডানা আর পা ভেঙে গেছে। শুধুই আমার চোখে পড়বার জন্য আর ছানাগুলোকে ফিরিয়ে আনবার জন্য। সেগুলো এর মধ্যেই তার দেখানো পথ দিয়ে জলা পার হয়ে সারবন্দি কুচ-কাওয়াজ সুরু করে দিয়েছে, আর একটানা অস্পষ্ট কিচমিচ করে চলেছে। মা-পাখিটাকে চোখে না দেখতে পেলেও ছানাগুলোর কিচমিচ শুনতাম আমি। সেখানেই বসে থাকতে দেখেছি ঝরনার উপর টারটল ডাভদের, কি

আমার মাথার উপর নরম-নরম সাদা পাইন গাছের এ ডাল থেকে উড়ে ও ডালে যাচ্ছে। আর লাল জাতের কাঠবিড়ালটা সব চাইতে কাছের ডাল বেয়ে সুড়সুড় করে নেমে আসছে, বিশেষ পরিচিত আর অনুসন্ধিৎসু হাবভাব তার। বনের মধ্যে মনোরম একটি স্থানে অনেকটা সময় চুপ করে বসে থাকলেই দেখা যাবে, সব বাসিন্দারাই ক্রমে ক্রমে নিজেদের নিজেরাই দেখিয়ে যাচ্ছে।

যে সব ব্যাপারের আমাকে সাক্ষী হ'তে হয়, সব ঠিক এতখানি শান্তি-ময় পরিবেশের নয়। একদিন গেছি আমার কাটা-কাঠের গাদায়, কাটা-নাড়ার গাদা বলাই ভাল, দেখি দুটো বড়-সড় পিঁপড়ে, একটা লাল, আর একটা তার চাইতে বেশ বড়, কাল, আধ ইঞ্চি খানেক লম্বা হবে, পরস্পরে ভীষণ যুদ্ধ লাগিয়েছে। একবার যদি চেপে ধরতে পারল কেউ কাউকে, আর ছাড়বে না, খালি হুড়োহুড়ি আর কোস্তাকুস্তি আর ক্রমাগত কাটা-কাঠের উপর চলবে গড়াগড়ি। মনোযোগ দিয়ে দেখতে কাঠের উপর দলে দলে যোদ্ধা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পরে বুঝলাম এটা দ্বৈরথ-যুদ্ধ নয়, রীতিমতো লড়াই—দুই জাতের পিঁপড়ের লড়াই। এক পক্ষে লাল, অন্য-পক্ষে কাল। লড়াই চলেছে জোড়ায় জোড়ায়। প্রায়ই দেখা গেল, একপক্ষে দুটো লাল আর বিপক্ষে একটা কাল। আমার কাঠের ইয়ার্ড জুড়ে অসংখ্য মহারথী সব পাহাড় আর পাহাড়তলী ঢেকে ফেলেছে, আর রণস্থলে মৃত আর মুমূর্ষু, লাল-কাল দুই দলেরই—চারিদিকে ছড়ানো। যুদ্ধ চলার অবস্থায় এই একটিমাত্র যুদ্ধই আমি দেখেছি। এই একটিমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে আমি পদচারণা করেছি—মারাত্মক যুদ্ধ, একপক্ষে লাল প্রজাতন্ত্রী দল, অপরপক্ষে কাল সাম্রাজ্যবাদী দল। সবদিকেই তারা সাংঘাতিক সংঘর্ষে লিপ্ত, কিন্তু একটুকু কোলাহল নেই, অন্তত কানে শোনা যায় না। মানুষযোদ্ধারা কখনও এমন প্রাণপণে যুদ্ধ করে না। কাঠের গাদার মধ্যে সামান্য একটু জায়গা রোদে ভরে গেছে, দেখলাম সেখানে একজোড়া পরস্পরের এমন কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ যে, এই দুপুর থেকে সূর্যাস্ত অবধি লড়ায়ের জন্য উভয়ে প্রস্তুত মনে হ'ল,—যদি না তার আগে প্রাণ হারায়। ক্ষুদে লাল-দলের পাণ্ডা সাঁড়াশির মতো আটকে ধরেছে বিপক্ষের সামনেটা আর এত ধস্তাধস্তি সত্ত্বেও সেই যে শুঁড়ের গোড়া পাকড়ে কামড়ে ধরেছে, তাতে এতটুকু শৈথিল্য নেই, অন্য শুঁড়টার দফা তো নিকেশ করেছেই। আর পালোয়ান কালটা এদিক থেকে ওদিকে গুঁতিয়ে চলেছে সেটাকে। একটু কাছে গিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি যে বিপক্ষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ কয়েকটা সাবাড় করে দিয়েছে এর মধ্যে। বুল-ডগের চাইতেও বেশি নাছোড়বান্দা হয়ে যুদ্ধ করে চলেছে দুপক্ষে। একদলও যে পিছ-পা হবে, সামান্য লক্ষণ দেখা যাচ্ছে

না তার। বেশ বোঝা যায় যে, তাদের রণ-রব হচ্ছে, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। ইতিমধ্যে দেখি একক একটি লাল-পিঁপড়ে এই উপত্যকাটির পাহাড়ের গা বেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে চোখে দারুণ উত্তেজনা, হয় শত্রু সংহার করে এসেছে, নয় এখনও যুদ্ধে নামে নি। সম্ভবত শেষেরটাই হবে, কেন না কোন অঙ্গই তার ছিন্ন হয় নি দেখা গেল। তার মাতার আদেশ হয়তো এই যে যুদ্ধে জয়লাভ না করে ফির না, ফিরতে যদি নিতান্তই হয় তবে বরং আহত হয়ে ফির। কিংবা হয়তো এপক্ষের একিলিস হবে, দূরে থেকে এতক্ষণ ক্রোধে শান দিচ্ছিল, এখন তার পেট্রোক্লাসের উদ্ধার, নয় প্রতিহিংসার জন্য এগিয়ে এসেছে। সে এই বিষম-দলের সংঘর্ষ দেখছিল দূর থেকে—কাল পিঁপড়ে লালপিঁপড়ের চাইতে আকারে অন্তত দ্বিগুণ হবে—ত্বরিত পদক্ষেপে এসে হুঁশিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে দুই যুযুৎসুপক্ষের আধ ইঞ্চিটাক দূরে। যেই সুযোগ পাওয়া অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল সে কাল দলের পান্ডার ঘাড়ে। পড়েই সুরু করে দিলে কাজ তার, সামনের দিককার ডান পায়ের গোড়ার কাছে, আর বিপক্ষকে বেছে নিতে দিলে নিজের অঙ্গ। সুতরাং তিনজনে আটকে গেল জন্মের মতো, যেন নতুন কোন আকর্ষণী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, সব তালা আর সিমেন্টকে পরাস্ত করতে পারে সে শক্তি। যদি দেখতাম যে এর মধ্যে আবার দু'পক্ষের ব্যান্ড পার্টি জমায়ত আছে কাটা-কাঠের উপর একটু উঁচুতে আর তালে তালে নিজেদের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো চলছে, যাতে মুমূর্ষ যুযুৎসুবৃন্দ উৎসাহ লাভ করে আর ক্লীবত্ব ত্যাগ ক'রে যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাতেও আমি অবাক হ'তাম না। আমি নিজেই তো বেশ খানিকটা উত্তেজনা বোধ করছিলাম, যেন ওরা মানুষ। যত ভাবা যাবে তত বোঝা যাবে তফাত বিশেষ নেই দুয়ের মধ্যে। অন্তত কনকর্ডের ইতিহাসে, এমন কি মার্কিন মুলুকের ইতিহাসেও এমন কোন যুদ্ধের বিবরণী নিশ্চয়ই লিপিবদ্ধ নেই, যার সঙ্গে এই যুদ্ধের ক্ষণিক তুলনা চলতে পারে, তা সে যুদ্ধ-লিপ্ত যোদ্ধার সংখ্যার দিক দিয়ে হ'ক কি আনুষঙ্গিক দেশপ্রেম কি বীরত্বের দিক দিয়ে হ'ক। সৈন্যসংখ্যা কি হত্যাকাণ্ডের দিক দিয়ে অস্টারলিজ আর ড্রেসডেনের তুল্য যুদ্ধ এ। কনকর্ড যুদ্ধ! কি, না দেশভক্তদের পক্ষে দুজন নিহত আর লুথার ব্লানচার্ড আহত। আর এ-যুদ্ধে প্রত্যেকটি পিঁপড়ে এক একটা যেন বুটরিক—চিৎকার করে বলছে, "গুলি মারো গুলি মারো।" আর হাজার পিঁপড়ে ছুটে চলেছে মরণাহুতির জন্য, ডেভিস আর হোসমারের মতো। একটা মাত্র ভাড়াকরা সৈনিকও নেই তাদের মধ্যে। আদর্শের জন্য তারা প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, এবিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই—যেমন আমাদের পূর্বপুরুষরা করতেন। চায়ের উপর তিনপেনি ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশে নয়। বাঙ্কার হিল-এর

যুদ্ধের মতোই, এই যুদ্ধের পরিণামও গুরুত্বপূর্ণ আর স্মরণীয় হয়ে থাকবে, অন্তত যারা লড়াই করছে তাদের ইতিহাসে।

যে ত্রয়ীর বিশেষ বর্ণনা দিলাম, তারা যে কাঠের টুকরোটার উপর লড়াই করছিল, সেটাকে কুড়িয়ে নিলাম। আস্তানা পর্যন্ত সেটাকে বয়ে এনে জানালার গোবরাটের উপর একটা কাঁচের গেলাসের নিচে রাখলাম, পরিণাম কি দাঁড়ায় দেখতে। প্রথম যে লাল পিঁপড়েটার কথা বলেছি, অনুবীক্ষণ দিয়ে লক্ষ্য করলাম সেটাকে, দেখলাম যদিও প্রাণপণ চেষ্টায় শত্রুর সামনের পা-টা কামড়ে চলছে, তার বাকি শুঁড়টা ছিন্ন করেছে এর মধ্যে, কিন্তু নিজের বুকটা একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে নাড়িভুঁড়ি যা আছে তা কাল পিঁপড়েটার নাগালের মধ্যে এসে গেছে—তার বুকের বর্ম নিশ্চয়ই এত মোটা ঠেকেছে তার যে, ভেদ করতে পারে নি। আর পৃষ্ঠ-ব্রণের মতো কাল দুটি বেদনা-বিদ্ধ চোখের দৃষ্টিতে যে হিংসার ভাব ফুটে উঠেছে, তা শুধু লড়াই-ই জাগাতে পারে। গেলাসের নিচে আরও আধঘন্টা লড়াই চলবার পর যখন আবার দেখলাম, তখন কাল সৈনিকটা তার বিপক্ষদের মুণ্ড আর ধড় আলাদা করে ফেলেছে। মুণ্ডগুলো তখনও জ্যান্ত, তার দুই পাশ দিয়ে ঝুলে আছে, যেন অশ্বারোহী সৈন্যের জিনের দুই পাশে ঝুলছে ভয়াবহ বিজয়-চিহ্ন। তখনও আগের মতোই সুকঠিনভাবে আটকানো। কাল পিঁপড়েটার দুটো শুঁড়ই গেছে, অবশিষ্ট একটিমাত্র পা, আরও শরীরে কত আঘাত লেগেছে কে জানে—তবু তাদের ঝেড়ে ফেলবার জন্য ক্ষীণ চেষ্টা করে চলেছে। আরও আধঘন্টা কি তারও বেশি সময় লাগল তার সফল হ'তে। গেলাসটা তুলে ধরলাম, ঐরকম পঙ্গু অবস্থাতেই সে জানালার গোবরাটের উপর দিয়ে চলে গেল। জানি নে এই আঘাত থেকে শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে উঠেছিল কি না এবং বাকি জীবনটা কোন যুদ্ধপঙ্গুদের সেবাশ্রমে কাটিয়ে গেছে কি না; মনে হয় এর পর যত পরিশ্রমই সে করুক, তার দাম বেশি দাঁড়াবে না। কোন পক্ষ জয়ী হ'য়েছিল, কিংবা যুদ্ধের কারণটা কি, তা জানতে পারি নি। কিন্তু বাকি দিনটা কেবলি মনে হয়েছে যে আমার চোখের উপর যেন মানুষে মানুষে সত্যিকার লড়াই হয়ে গেছে আর তার লড়ালড়ি, মারামারি আর খুনোখুনি প্রত্যক্ষ করে আমার মন-প্রাণ উত্তেজিত আর উৎপীড়িত।

কারবি এবং স্পেন্‌স বলছেন, পিপীলিকার যুদ্ধ বহু প্রাচীনকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে আর তার তারিখও না কি লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু তাঁদের মতে হুবারই একমাত্র আধুনিক লেখক, যিনি তা চাক্ষুষ দেখেছেন। তাঁরা বলছেন, "ঈনিয়াস সিলভিয়াস কোন পেয়ার-বৃক্ষের কাণ্ডের উপর ভীষণ অনমনীয়তার সঙ্গে সংঘটিত একটি বৃহৎ আর ক্ষুদ্র-জাতির পিপীলিকার সংঘর্ষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।" অতঃপর

বলেছেন, 'সংঘর্ষটা ঘটে পোপ চতুর্থ ইউজেনিয়াসের শাসনকালে, প্রখ্যাত ব্যবহারজীবী নিকোলাস পিস্টোরিয়েন্সিসের উপস্থিতিতে, তিনি সমগ্র যুদ্ধের ইতিহাসের আনুপূর্বিক বিবরণ দান করেছেন। ওলাউস ম্যাগ্-নাসও বৃহৎ আর ক্ষুদ্র দুই জাতিব মধ্যে অনুরূপ সংঘর্ষের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই যুদ্ধে ছোট পিঁপড়েরা জয়ী হয় আর স্বপক্ষের সৈনিকদের শব কবরস্থ করে, কিন্তু তাদের বিশালকায় শত্রুপক্ষের শব পাখিদের খাদ্য হিসেবে ফেলে রাখে। অত্যাচারী নৃপতি, দ্বিতীয় ক্রিস্টিয়ারনএর সুই-ডেন থেকে নির্বাসনের পূর্বে ব্যাপারটি সংঘটিত হয়।" আমি যে যুদ্ধটি চাক্ষুষ করেছিলাম, সেটা পক্ যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ওয়েবস্টারের ফ্যুজিটিভ-স্লেভ বিলের আইনবদ্ধ হবার পাঁচবছর আগে ঘটে।

খাদ্য হিসেবে খাবারের ভাঁড়ারের কর্দম-কুর্ম খাওয়ার যোগ্যতা মাত্র নিয়ে গ্রামের অনেক কুকুরই প্রভুর অজ্ঞাতসারে বনে এসে পরিপুষ্ট নিতম্বদেশ দেখিয়ে বুড়ো খেঁকশিয়ালের বিবর তথা উডচাকের গর্তের ঘ্রাণ নিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়েছে। পথ দেখিয়ে এনেছিল হয়তো একটা শীর্ণ নেড়িকুত্তা, বনের মধ্যে এখনও সন্তর্পণে চলে ফিরে বেড়ায় সেটা আর বনচর জীবেরা এখ-নও হয়তো তাকে দেখলে স্বভাবতই ভয় খায়। কিন্তু পথপ্রদর্শকের বহু পিছনে পড়ে ছোট্ট একটা কাঠবিড়াল দেখে কুকুরের মতোই ঘেউ ঘেউ সুরু করে। গাছে চড়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করার মতলব ছিল কাঠবিড়ালটার। কুকুরটা দৌড়ে ছুটতে গিয়ে নিজের চাপে ঝোপ-ঝাড় নুইয়ে ফেলেছে—তার ধারণা কোন ইঁদুর-জাতীয় জীবের সন্ধান পেয়েছে সে। একবার একটা বেরালকে পুষ্ক-রিণীর পাথর-বাঁধানো ঘাটে ঘুরতে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম, কদাচিৎ এরা বাড়ি ছেড়ে এতটা দূরে আসে। আশ্চর্য হওয়াটা উভয় পক্ষেরই। তবু সব চাইতে পোষ-মানা একটা বেরাল, আজীবন কম্বলে শুয়ে কাটিয়েছে যে, সেও বনের ভিতর দিব্যি খাপ খেয়ে যায়; তার ধূর্ত আর চোর-চোর ভাবে বেশ প্রমাণ হয় যে, এখানকার যারা নিয়মিত বাসিন্দা, তাদের চাইতেও এখানে ও বেশি লাগসই। একবার বেরি কুড়োচ্ছি, বনের মধ্যে একটা বেরাল আর তার কাচ্চা-বাচ্চার সঙ্গে দেখা—ভীষণ রোখা ভাব, মার সঙ্গে ছানাকটারও পিঠ ফোলা আর আমার উদ্দেশে মারমুখো হয়ে দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছে। বনবাসে আসার কয়েক বছর আগে, পুষ্করিণীটার কাছাকাছি লিংকন অঞ্চলে মিঃ জিলিয়ান বেকারের খামার-বাড়িতে একটা, যাকে বলে, "ডানাধারী" বেরাল ছিল। ১৮৪২ সালের জুন মাসে তাকে দেখবার জন্যই আমি ধাওয়া করি সেখানে, কিন্তু তখন সে অভ্যাসমতো শিকার ধরতে বেরিয়েছিল বনে (মাদী কি মদ্দা বেরাল সেটা তা ঠিক মনে নেই)। গৃহকর্ত্রীর কাছে শুনলাম, বছরখানেক আগে এপ্রিল মাসে কি করে বেরালটা ঐ অঞ্চলে এসে জোটে

আর শেষে তাঁদেরই বাড়িতে আশ্রয় পায়। বেরালটার রঙ নাকি কালচে বাদামি, গলার ওপর খানিকটা সাদা দাগ, সাদা পা, লেজটা বড় আর ফোলানো—খেঁকশেয়ালের মতো। শীতকালে নাকি গা-ভর্তি রোম হয়, দুই পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ে, দশ বারো ইঞ্চি লম্বা আর আধ ইঞ্চি ফালি হবে সেগুলোর। থুতনির নিচে খানিকটা মাফলারের মতো। উপরটা ঢিলে, নিচেটা ফেল্টের জটা যেন। বসন্তকালে আবার এই সব জেব-জোবনা নাকি খসে পড়ে। বেরালটার একজোড়া "ডানা" আমাকে দিয়েছিলেন তাঁরা, এখনও আছে আমার কাছে। দেখে মনে হয় না কোন ত্বকের আবরণ আছে কোথাও। কেউ কেউ বলেন, একজাতের উড়তে-পারা কাঠবেরাল বা অন্য কোন বুনো জানোয়ার হবে। অসম্ভব নয়। প্রকৃতি-তত্ত্ববিদদের মতে, ঘরোয়া বেরাল আর বন-বেজীর মিলনে দেদার সঙ্কর প্রাণী হ'তে দেখা যায়। যদি বেরাল পুষতাম, তবে এই রকম একটা বেরাল হলেই ঠিক হ'ত আমার পক্ষে। কবির ঘোড়া যেমন ডানা-ওলা পক্ষিরাজ জাতের, তেমনি বেরালেরও ডানাধারী হওয়া উচিত নয় কি?

হেমন্তে যথারীতি লুন-পাখি (কলিম্বাস গ্লেসিয়ালিস) এসে হাজির হল, পুষ্করিণীতে ডুব দিয়ে লোম-চর্ম খসাতে। ঘুম থেকে উঠবার আগেই বনস্থলী তার অট্টহাস্যে মুখরিত হ'ল। আর তার আসার গুজব রটার সঙ্গে সঙ্গেই মিল-পাড়ার শিকারীরা চকিত হয়ে এসে জুটলেন, এক্কাগাড়ি হাঁকিয়ে কি পায়ে হেঁটে, জোড়ায় জোড়ায়, কি তিন তিন জন করে পেটেন্ট রাইফেল, ছুঁচলো কার্তুজ আর দূরবীণ নিয়ে। মাথা-পিছু লুন-প্রতি অন্তত দশজন এলেন শিকারী বনের মধ্যে দিয়ে খসখস শব্দ করে হেমন্তের পাতা ঝরার মতো। কেউ পুষ্করিণীর এ পারে আড্ডা গাড়লেন, কেউ ও পারে। বেচারি পাখিটা একসময়ে সর্বত্র বিরাজ করতে পারে না। এঘাটে ডুব দিলে ও ঘাটে উঠতে হয় তাকে। কিন্তু এখন অক্টোবর মাস, বাতাসে দরদের আমেজ, পাতার মর্মর আর জলের বুকে তরঙ্গ। লুন-এর হাসি কানে এসে পৌঁছোয় না, চোখেও দেখা যায় না। তবু তার শত্রুরা দূরবীণ দিয়ে পুকুরটা চষে ফেলছে আর তাদের গুলির আওয়াজে বনানী প্রকম্পিত। ঢেউগুলো বেশ বড় আর আছড়ে পড়ছে যেন রাগ ক'রে, —জলচর পাখিদের তারা সপক্ষে। আমাদের শিকারীপুঙ্গবদের এবারে শহরমুখো ফিরতে হবে, কাউকে দোকানে, কাউকে ফেলে-আসা কাজে। কিন্তু তারা প্রায়ই কাজ হাঁসিল করত। খুব সকালে উঠে বালতি ভরে জল আনতে যেতাম যখন, প্রায়ই দেখতাম একটি এই বিহঙ্গপ্রভুকে, কয়েক রডের মধ্যেই আমার খাড়ি থেকেই পাড়ি জমাচ্ছেন। নৌকো চালিয়ে ধরবার চেষ্টা করতে যাই যদি, কি রকম ফন্দি ফিকির করে পরখ করার জন্য, তাহলে এমন ডুব

দেবে যে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর টিকিটিও দেখতে পাব না তার—হয়তো সারা বিকালবেলা ধ'রে। কিন্তু জলের উপরে আমার সঙ্গে পেরে উঠবার উপায় ছিল না ওর। সাধারণত বৃষ্টি পড়লে চলে যেত।

অক্টোবর মাসে বিকালের দিকে আকাশ খুব পরিষ্কার, আমি নৌকো বাইছি উত্তর তীর বরাবর। সচরাচর এই সব দিনে ওদের হ্রদের উপরে জমতে দেখা যায়, পাতলা আগাছার মতো। যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় একটা লুন পাখি, চারদিকে চাইতে চাইতে চলেছি, হঠাৎ দেখি তীর থেকে উড়ে আসছে পুকুরের মাঝামাঝি আমার সামনে কয়েক রডের মধ্যে এক মূর্তি। সেই অট্টহাসি—সুতরাং লুকিয়ে থাকবে কি ক'রে। আমি দাঁড় বেয়ে পিছু ধাওয়া করলাম, সে ডুব দিল, কিন্তু আবার যখন ভেসে উঠল আমি তখন আরও কাছাকাছি এসে গেছি। আবার ডুব দিল সে, কিন্তু কোনদিক যাচ্ছে বুঝতে ভুল হ'ল আমার; এবার ভেসে উঠল যখন, দেখি আমাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ রড ব্যবধান। আমিই ইতিমধ্যে ব্যবধান-বৃদ্ধির সাহায্য করেছি। আবার সে জোরে হেসে উঠল, অনেকক্ষণ ধরে। আগের চাইতে এবারকার হাসির হেতুটা স্পষ্ট। এমন চালাকির সঙ্গে ফন্দি ফিকির করতে থাকল যে আমি কিছুতেই তার আধ ডজন রড কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়ে উঠতে পারলাম না। যতবারই উপরে ভেসে উঠছে, মাথাটা একবার এদিক একবার ওদিক ফিরিয়ে দেখছে, ধীর স্থির ভাবে জল স্থল জরিপ করে চলেছে। যেন এঁচে দেখছে কি কর্তব্য তার, যাতে এবারে উপরে উঠে দেখতে পায়, তার আর নৌকোর মধ্যে জলের বিস্তার সব চাইতে বেশি আর দূরত্বও সর্বাধিক। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় কত তাড়াতাড়ি মন স্থির করে আর সংকল্প কাজে পরিণত করে। একেবারে পুকুরের জল যেখানে সব চাইতে বিস্তারে বেশি আমাকে নিয়ে তুলল সেখানে। তাকে আর নড়াতে পারি নে কিছুতেই। তার বুদ্ধিতে সে একটা জিনিষ ভাবছে, আমার বুদ্ধিতে তার ভাবটা বুঝবার চেষ্টা করছি আমি। খেলাটা মজার; খেলা চলছে পুষ্করিণীর মসৃণ বুকে, মানুষের প্রতিপক্ষে লুন পাখি। তোমার বিপক্ষের ঘুঁটি হঠাৎ বোর্ডের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সমস্যা হচ্ছে তার ঘুঁটি আবার যখন উপরে উঠবে, তখন তার কত কাছে তোমার ঘুঁটিকে নিতে পার। কখনও সে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার উল্টো দিকে এসে উঠছে, স্পষ্ট বোঝা যায় সরাসরি নৌকোর একেবারে তলা দিয়ে ভেসে গেছে। দম তার এত বেশি আর এত কম হয়রান হয় যে দূরতম দূরে সাঁতরে গিয়ে উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গেই ডুব দিতে বাধে না তার; এবং তারপর হাজার মাথা খাটিয়েও বোঝা যাবে না, ঐ গভীর পুষ্করিণীর কোথায়, ওপরের ঐ স্থির জলের কত নিচে, মাছের মতো অতিদ্রুত সে ছুটছে—পুষ্করিণীর একেবারে তলায় জল যেখানে

গভীরতম, সেখানে যাবার সামর্থ্য আর সময় দুই-ই তার আছে। শোনা যায় নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের হ্রদে আশী ফুট জলের তলাতেও ট্রাউট মাছ ধরবার বঁড়শিতে লুন পাখি ধরা পড়েছে। ওয়ালডেন-এ জল আরও গভীর। অন্য জগৎ থেকে আগত এই অপরূপ পরিব্রাজককে তাদের ঘাঁটির মধ্যে দিয়ে ছুটতে দেখে মাছরা কি বিস্মিতই না বোধ করে। জলের উপরে গতিবিধি সম্বন্ধে তাকে যেমন ওয়াকিবহাল দেখা যায়, জলের তলা সম্বন্ধেও ঠিক সে তেমনি—উপরন্তু আরও জোরে সাঁতরাতে পারে নিচে। দুই একবার দেখেছি উপরে উঠবার সময় জলে এক ফোঁটা একটু ঢেউ, সঙ্গে সঙ্গেই মাথা দেখা গেছে, উপরটা তদারক শেষ করেই আবার তৎক্ষণাৎ ডুব। বুঝতে পারলাম দাঁড়ের উপর হাত তুলে কোথায় কখন ও ভেসে উঠবে তার জন্য প্রতীক্ষা করাও যা, আর কোথায় উঠতে পারে হিসাব নিকাশের চেষ্টা করাও আমার পক্ষে তাই— কেন না বারবার আমি যখন একদিকটায় চেয়ে চেয়ে চোখ আমার ঠিকরে ফেলেছি, তখন হঠাৎ আমার ঠিক পিছনেই ওর অপার্থিব হাসি শুনে চমকে উঠেছি। কিন্তু, এত কারসাজি দেখাবার পরেও যেই ও উপরে ওঠে, অমনি ঐ অট্টহাসি হেসে নিজেকে জানান দেয় কেন; ওর ঐ ধবল বক্ষই কি ওকে ধরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? লুন-কুলে অতি আহাম্মুক সে, তাই মনে হয় আমার। সে যখন উপরে উঠছে, তখন সচরাচর জলের ছলাৎ শব্দেও আমি টের পাই। ঘন্টাখানেক এমনি কাটার পরও দেখি সে যেমন তাজা ছিল তেমনি আছে, তেমনি উল্লাসের সঙ্গে ডুব দিচ্ছে আর প্রথমটায় যা দেখেছিলাম, তার চাইতেও বেশি দূরে সাঁতরে গিয়ে উঠছে। অবাক হ'তাম দেখে যে জলের তলায় ঐ জালপাদ দিয়ে এক রাজ্যি জল ভেঙে আবার উপরে উঠে ধীর স্থির ভাবে অকম্পিত বক্ষে কি করে উড়ে বেড়ায়। তার সাধা ধুয়ো হচ্ছে এই বিকট হাসি, তবু খানিকটা জলচর পাখির মতোই লাগে সে হাসি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমাকে খুব খানিকটা বিড়ম্বিত করে বহুদূরে ভেসে উঠবার সময় অনেকক্ষণ ধ'রে যে অস্বাভাবিক আওয়াজ ক'রত সে, তা পাখির মতো নয়, নেকড়ে বাঘের মতো। যেন কোন পশু মাটিতে নাক ঘষে মতলব করে কাঁদছে। এ অঞ্চলে যত আওয়াজ কানে আসে, তার মধ্যে বিকটতম। এর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বনের মধ্যে দূরে বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। এই হ'ল লুন পাখির লুন-বাজি। আমার প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করার এবং নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধতার জন্যই এ হাসি, তাতে আর সন্দেহ রইল না আমার। আকাশ মেঘে ভরে গিয়েছিল এর মধ্যে, কিন্তু পুকুরের জল স্থির। সেই স্থির জলে কোথায় সে নড়াচড়া করছে, তা দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু কোন আওয়াজ কানে আসছিল না। তার ধবল বক্ষ, নিষ্কম্প বায়ু আর অচঞ্চল জল সমস্তই এখন তার বিপক্ষে। অবশেষে, পঞ্চাশ রড দূরে একবার ভেসে উঠে

তার বিলম্বিত আর্তস্বর উচ্চারণ ক'রে গেল সে, যেন লুন বংশের বাস্তু দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে পুবে-হাওয়া উঠল, জলে ঢেউ দেখা দিল, আর সমগ্র আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন বৃষ্টিতে ভরে গেল। আমার স্পষ্ট মনে হ'ল লুন-এর প্রার্থনার উত্তর এ, তাদের দেবতা আমার উপর বিরূপ হয়েছেন। সুতরাং তাকে রেহাই দিলাম আমি। সে তখন সেই বিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হেমন্তের দিনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে দেখতাম বুনো হাঁসগুলো কেমন ফন্দি-বাজি করে উলটে পালটে ঘুরে ফিরে শিকারীদের নাগালের বাইরে গিয়ে ঠিক পুষ্করিণীর মাঝখানটা আঁকড়ে ভেসে থাকে। লুইজিয়ানার উপসাগর অঞ্চলে তাদের এই সব ফন্দি-ফিকির কাজে লাগাবার তেমন দরকার পড়বে না। যখন উপরে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না, তখন পুকুর থেকে অনেকটা উঁচুতে উঠে তার ওপরে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরত সময়ে সময়ে। আকাশের কৃষ্ণবিন্দুর মতো অন্য পুকুর আর নদী সহজে দৃষ্টিগোচর হ'ত সেখান থেকে। যখন ভেবে নিয়েছি যে নিশ্চয়ই অনেক আগেই অপর জায়-গার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে তারা, নজরে পড়ত কোনাকুনি সিকি মাইলটাক উড়ে অনেকখানি দূরে গিয়ে আড্ডা গেড়েছে সব। সেদিকটা তখনও পরি-ষ্কার। কিন্তু ওয়ালডেন-এর মাঝদরিয়ায় লম্ফ-ঝম্প ক'রে এক নিরাপত্তা ছাড়া কি লাভ হ'ত ওদের জানি নে। না, যেজন্য আমার অনুরাগ এর জলের ওপর, ওদেরও তাই?

॥ ১৩ ॥ গৃহ-তাপন

অক্টোবরে নদীর ধারের মাঠে আঙুর পাড়তে গেলাম। থোকা থোকা আঙুর পেড়ে গাদা করা গেল। খেতে যতটা, শোভা আর গন্ধে তার চাইতে বেশি ভাল এরা। ক্র্যানবেরিরও তারিফ করা গেল সেখানে, পোঁটলা বাঁধি নি কিন্তু; মোমের তুলতুলে সব মণি, মাঠের ঘাসের গলায় লকেট, কোনটা মুক্তো, কোনটা চুনি—কুৎসিত একটা আঁকশি দিয়ে চাষীরা তুলে নিয়ে যায় এদের, শান্ত মাঠটা গজ গজ করতে থাকে। শুধু বুশেল আর ডলারের হিসেবে হেলায় ফেলায় মেপে মাঠ থেকে লুঠ করে তারা বস্টনে আর নিউ ইয়র্কে নিয়ে গিয়ে বেচে দেয় সেগুলো; সেখানকার প্রকৃতি-প্রেমিকদের তৃপ্তির জন্য পিষে মোরব্বা হওয়াই তাদের কপালের লেখা। প্রেয়ারির ঘাসবনে কসাই-গুলোও তো এমনি করে বাইসনের জিভ টেনে ছিঁড়ে বার করে, গাছগুলো শুকিয়ে গেল না মরল গ্রাহ্য করে না। বারবেরির তকতকে ফলগুলোও শুধু এমনি চোখ দিয়েই চাখলাম; কিন্তু নাড়াচাড়া করব বলে এক পুঁটুলি বুনো আপেল পেড়ে নিলাম, মালিক আর পথচারীর চোখে পড়ে নি সেগুলো। চেসনাট পাকতে শীতকালের জন্য আধ-পালিটাকে তুলে রেখেছিলাম। লিংক-নের সেই সময়কার বিশাল চেসনাট বাগানে ফলনের সময় ঘুরে বেড়ানো অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল। এখন সব রেলরাস্তার তলায় চির-ঘুম ঘুমচ্ছে। চলেছি একটা থলে কাঁধে ক'রে, হাতে খোসা ছাড়াবার একটা লাঠি; হিমের অপেক্ষায় থাকতাম না সব সময়ে; পাতার খসখস আওয়াজের মধ্যে দিয়ে লাল কাঠবিড়াল আর দাঁড়কাকের গলা ফাটানো তিরস্কারেব মধ্যে দিয়ে চলেছি, যে সব ফল তারা বাছাই করে নিত, সেগুলোয় ভাল শাঁস থাকতই থাকত, তাই তাদের আধ-খাওয়া বাদামগুলো মেরে দিতাম মধ্যে মধ্যে। এক এক সময়ে গাছে চড়ে ঝাঁকানি দিতাম গাছগুলোকে। আমার আড্ডার পেছনটায় গাছ ছিল কতকগুলো, বড় একটা গাছের ছায়া আস্তানাটাকে ছেয়ে ফেলেছে; যখন ফুল ফুটত সেটায় ফুলের তোড়ার মতো সমস্ত অঞ্চলটা গন্ধে ভরে তুলত। কিন্তু তার ফলের বেশির ভাগ যেত কাঠবিড়াল আর দাঁড়কাকদের কল্যাণে। খুব সকাল সকাল দলে দলে দাঁড়কাক এসে জুটত আর মাটিতে

পড়ার আগেই খোসা ছাড়িয়ে বাদামগুলো সাবড়ে দিত। এ বাদামগুলোর স্বত্ব ত্যাগ করে দিয়েছিলাম তাদের নামে। দূরে বনে যেখানে শুধুই চেসনাট সেখানে ধাওয়া করতাম। এই বাদামগুলো রুটির বদলে বেশ খাওয়া চলে, অবশ্য বাদাম হিসেবেই। খুঁজলে রুটির বদলে আরও অনেক কিছুই হয়তো খাওয়ার মতো পাওয়া যায়। একদিন কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে ঝাড়শুদ্ধ একগোছ গ্রাউন্ডনাট (এপিওস টিউবেরোজা) বার হ'ল—আদিম জাতদের আলু। যেন-গল্পকথায় পড়া ফল, ছোট বেলায় কোনদিন খুঁড়ে পেতাম, না খেতাম সন্দেহ হ'ল; বললাম তো, কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম না তো একে। এর পরে অনেক দিন এর কোঁকড়ানো, রাঙা মখমলের মতো কুঁড়ি নজরে পড়েছে, অন্য গাছের ডাঁটা আঁকড়ে উঠেছে, কিন্তু এক জিনিস কি না বুঝতে পারি নি। চাষ করে এর দফা এক রকম নিকেশ করা হয়েছে। স্বাদটা মিষ্টি মিষ্টি, অনেকটা হিম খাওয়া আলুর মতো। ভাজার চাইতে সিদ্ধই ভাল লেগেছিল আমার। এই কন্দজাতীয় ফলটা দেখে মনে হয়েছিল, প্রকৃতি যে নিজের ছেলেপুলেদের বাঁচিয়ে রাখতে ভবিষ্যতের জন্য সাদামাটা গোছ খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছেন এখানে এ তারই একটু আভাস। হৃষ্টপুষ্ট গরুমোষ আর ঢেউ খেলানো শস্যক্ষেত্রের এই যুগে, নগণ্য এই মূলটাকে লোকে একেবারেই ভুলে গেছে, কি শুধু এর ফুলন্ত লতাকেই জানে তারা—কিন্তু একদিন ইন্ডিয়ানদের কৌল প্রতীক ছিল এ। আর একবার অবাধ প্রকৃতির রাজত্ব হ'ক না এখানে, তখন অগুণতি বিপক্ষের সম্মুখে শ্যামল কোমল ইংলন্ডমার্কা শস্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তখন মানুষের হাত না পড়লেও কাকই হয়তো এর শেষ সম্বল একটা শস্যকণাকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইন্ডিয়ানদের আরাধ্য দেবের বিরাট মাঠে বয়ে নিয়ে ফেলবে, সেই তো সেখান থেকে একে বয়ে এনেছিল বলা হয়। আজ গ্রাউন্ডনাট এক রকম নিঃশেষই হয়ে গেছে, কিন্তু হয়তো ঠান্ডা আর জংলীপনা সত্ত্বেও আবার মাথা খাড়া করে উঠতে পারে সে, আর এই দেশজ বলে নিজেকে প্রমাণও করতে পারে, তখন আবার শিকারী জাতের খাদ্য হিসেবে এর আগেকার গুরুত্ব আর মর্যাদার অধিকার ফিরে পাবে সে। নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ানদের কোন সিরিস কি মিনার্ভা দেবীই এর উদ্ভাবন আর প্রবর্তন করেন; এখানে কাব্যরাজ্যের যখন আরম্ভ হবে, এর পাতা আর ফলের ঝাড় তখন আমাদের শিল্প-কাজে আঁকা থাকবে।

পয়লা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নজরে পড়েছিল, হ্রদের ওপারে ঠিক জলের উপর টিকলো ডাঙগার মুখে তিনটে অ্যাস্পেনের সাদা সাদা ডাঁটাগুলো যেখানে আলাদা আলাদা দিকে গেছে, তার নিচে দুটো তিনটে ছোট মেপল লাল হয়ে উঠেছে। ওদের রঙের মধ্যেই কত কাহিনী। ক্রমশ, সপ্তাহে

সপ্তাহে প্রত্যেকটি গাছের চেহারা খোলতাই হতে থাকল আর হ্রদের স্বচ্ছ আয়নায় নিজের ছায়া নিজে দেখেই মাত হ'ল তারা। প্রত্যেক দিন সকালে এই চিত্রশালার কর্মকর্তা দেয়ালে পুরনো ছবি বদলে বদলে আরও উজ্জ্বল, আরও সুষম রঙের নতুন ছবি দিতে থাকলেন।

অক্টোবরে হাজারে হাজারে বোলতা এসে জুটল আমার বাসায়, যেন সেটা শীতাবাস। এসে ভেতর দিকে আমার জানালায় আর ওপর দিকে দেয়ালে আড্ডা গাড়ল। যাঁরা বেড়াতে আসতেন, মধ্যে মধ্যে তাঁদের ঘরে ঢুকতে দিত না। সকালের দিকে ঠাণ্ডায় যখন সব জবুথবু মেরে থাকত, কয়েকটাকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিতাম, কিন্তু তাদের উচ্ছেদ করবার জন্য মাথা ঘামাই নি; বরং আমার বাড়িটাকে তারা যে পছন্দসই একটা আড্ডা বলে ধরে নিয়েছে, তাতে যেন গর্বই বোধ করতাম। এক শয্যাতেই শুতাম যদিও, আমার ওপর তারা কখনও তেমন অত্যাচার করে নি। আস্তে আস্তে শীতকালের মারাত্মক ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য কোন ফাটলের মধ্যে সব গা ঢাকা দিল, জানি নে।

নভেম্বরে পাকাপাকি রকমে আমার শীতাবাসে গিয়ে ঢোকবার আগে বোলতাগুলোর মতো আমিও ওয়ালডেনের উত্তর-পূর্ব কোণে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। পিচ পাইন বন আর পাথর বোঝাই পাড় থেকে ঠিকরে গিয়ে রোদ পড়ে সেখানে হ্রদের আগুন পোহাবার কোনা গড়ে তুলেছিল। যখন পারা যায় তখন কৃত্রিম আগুন পোহানোর চেয়ে সূর্যের তাপ উপভোগ করে নেওয়া অনেক বেশি আরামের আর স্বাস্থ্যপ্রদ। চলে যাওয়া শিকারীর মতো গ্রীষ্মকাল আগুন ফেলে গেছে, এখনও সে আগুন গনগন করছে, তাতেই গা হাত পা সেঁকে নিতাম আমি।

আস্তানার চিমনি বানাতে গিয়ে রাজমিস্ত্রিগিরির পাঠ নিতে হ'ল আমাকে। ইটগুলো ব্যবহার করা হওয়ার দরুণ কর্ণিক দিয়ে সাফ করে নিতে হ'ল, সুতরাং ইট আর কর্ণিকের গুণাগুণ সম্বন্ধে মোটামুটির চাইতে খানিকটা বেশি জ্ঞান অর্জন করলাম। ইটগুলোর চুন বালির কাজ পঞ্চাশ বছর আগেকার, কিন্তু তখনও নাকি মজবুত হচ্ছে। সত্য হ'ক না হ'ক, মানুষ বার বার করে বলতে ভালবাসে যেসব কথা, সেই জাতের কথা এটা। এই ধরনের কথাগুলোও আবার সময়ের সঙ্গে মজবুত আর পাকা-পোক্ত হয়ে ওঠে। ঝানু অহংপণ্ডিতদের কারও কাঁধ থেকে কথাগুলো নামাতে হলে অনেক কটি কর্ণিকের ঘা লাগানো দরকার। মেসোপটেমিয়ার অনেক গ্রাম আগে ব্যবহার করা বেশ ভাল জাতের ইটে তৈরি, ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপ থেকে যোগাড় করে আনা, তাদের ওপরকার সিমেন্ট আরও

শক্ত। যাই হ'ক, ইস্পাতটার অদ্ভুত কাঠিন্যে আশ্চর্য হলাম, এতসব জোর জোর ঘা না টস্‌কে হজম করল। আমার এ ইটগুলো দিয়ে আগেও চিমনিই বানানো হয়েছিল, অবিশ্যি নেবুকাডনেজারের নাম কোনটাতে খুঁজে পাই নি; খাটুনি আর বাজে খরচ বাঁচাবার জন্য যতগুলো পেলাম, চুলার যোগ্য ইট খুঁজে পেতে বার করলাম তা থেকে। চুলার কাছাকাছি জায়গার ইটের মধ্যে যে ফাঁক থাকল, হ্রদের ধার থেকে পাথর কুড়িয়ে এনে ভরাট করলাম, সেখানকার সাদা বালি এনে মসলাও বানিয়ে নিলাম। বাড়ির মর্মস্থল হিসেবে চুলাটা নিয়ে আমি ক্রমাগত খেটেছিলাম। সত্য কথা বলতে কি, এমন একাগ্র হয়ে খাটি যে সকালে নিচে কাজ সুরু করেও মেঝের থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত কটা ইট চারপাশে গেঁথে তুলতেই রাত হ'ত, সেখানেই শুয়ে পড়তাম সেটাকে বালিশ করে। তবু কখনও ঘাড়ে বেদনা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। আমার ঘাড়ে বেদনার উপসর্গটা তার আগের ব্যাপার। যে সময়টায় আমার ওখানে জনৈক কবিকে দিন পনেরব জন্য থাকতে দিয়েছিলাম; তখন জায়গা না কুলোতেই ওটার উৎপত্তি। আমার দুটো থাকা সত্ত্বেও নিজের ছুরি সঙ্গে এনেছিলেন তিনি, মাটির বুকে সেঁধিয়ে সাফ করতাম সেগুলো। রান্নাবাড়ার কাজে এটা ওটা করতেন আমার সঙ্গে। আমার পরিশ্রমের ফল তখন আস্তে আস্তে চার কোণে চাপ বেঁধে খাড়া হয়ে উঠেছে দেখে খুশি ছিলাম। যত আস্তেই কাজ হ'ক, উদ্দেশ্য অনেক দিন টিকে থাকুক, এই ভাবটা মনে ছিল। চিমনিটা বাড়ি থেকে খানিকটা আলাদা গাঁথুনির ব্যাপার, মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘর ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে, বাড়িটা পুড়ে গেলেও কখনও কখনও এটা টিঁকে গেছে দেখা যায়। তখন হচ্ছে গ্রীষ্মের শেষ দিকটা। এখন নভেম্বর।

উত্তুরে হাওয়া হ্রদটাকে ঠাণ্ডা করতে সুরু করে দিয়েছে এর মধ্যে। কিন্তু কাজটা সারা করতে অনেক সপ্তাহ ধরে ক্রমাগত বইতে হয়েছে তাকে, এত গভীর তার জল। সন্ধ্যার দিকে যখন আগুন জ্বালানো সুরু করলাম, বাড়িতে তখনও পলেস্তারা লাগানো হয় নি। তক্তার ফাঁকে অসংখ্য ফুটো থাকার দরুণ চিমনি দিয়ে একটু বেশি ভাল রকম ধোঁয়া বার হ'তে থাকল। তবু চারপাশে এবড়োখেবড়ো বাদামি রঙের জোড়াতালি লাগানো তক্তা আর মাথার ওপর উঁচুতে বাকল সমেত বরগা-ওয়ালা সেই ঠাণ্ডা খোলামেলা ঘরে কয়েকটা সন্ধ্যা আনন্দেই কাটাই। পলেস্তারার কাজ হয়ে যাবার পর আমার চোখে আর বাড়িটা তত ভাল ঠেকে নি, তবে মানতেই হয় যে বাড়িটা তখন বেশি আরামের হয়েছিল। যেখানে মানুষ থাকে, তার প্রত্যেকটা ঘর কি এত উঁচু হওয়াই ঠিক নয়, যে, মাথার দিকে খানিকটা অস্পষ্ট ভাব সৃষ্টি

করে, সন্ধ্যায় সেখানে বরগার আশেপাশে যত আবছা ছায়া যাতে কেঁপে কেঁপে ওঠে; কল্পনা আর উদ্ভাবনী বৃত্তির কাছে যতসব দামী দামী দেয়াল-চিত্র আর আসবাবের তুলনায় এই সব রূপই বেশি মনোরম।' বলতে গেলে এই প্রথম আমি আমার বাড়িতে বসবাস সুরু করলাম, আরাম আর আশ্রয় দুইই তখন সেখানে জুটতে লাগল। আগুন যাতে তক্তায় না লেগে যায়, তাই পুরনো একজোড়া শিক যোগাড় করেছিলাম, নিজের হাতে তোলা চিমনিটার পেছন দিকটায় ঝুল পড়তে দেখে আনন্দ হ'ত; সচরাচর যতটা নিতাম তার চাইতে বেশি জোর, বেশি তৃপ্তি নিয়ে আগুনটা উস্কে দিতাম। আস্তানাটা ছোট ছিল আমার, প্রতিধ্বনির জায়গা কুলোত না তার মধ্যে, কিন্তু ঘর একটা আর কাছাকাছি কোন পড়শী না থাকায় বড় বড়ই ঠেকত সেটাকে। বাড়িটার যা কিছু সুবিধে সমস্তই একটা ঘরের মধ্যে জমা হয়েছে, রান্নাঘর শোবার ঘর বৈঠকখানা কি আটপৌরে বসার ঘর সবই সেই; আর আমিও বাবা আর ছেলে, মনিব আর চাকর, বাড়িতে বাস ক'রে যে যে আনন্দ পাওয়া যায় সব একলাই ভোগ করতাম। গৃহস্বামীর (পেটারফ্যামিলিয়াস) বাগানবাড়িতে যা যা ব্যবস্থা না রাখলে নয়, সে বিষয়ে কেটো বলছেন, "তৈল আর মদ্য-ভান্ডার, অগুণতি পিপে, যাতে বিপত্তিকালের আশংকাও সুখের হয়। তাতে তাঁরই সুবিধা, পুণ্য আর সুনাম" আমার ভাঁড়ারে ছিল এক চুবড়ি আলু সের দেড়েক পোকাসমেত মটরশুটি, আর আমার তাকে ছিল কিছু চাল, এক হাঁড়ি গুড় আর এক এক ধামা জওয়ার তথা মকাই।

এক এক সময়ে স্বপ্ন দেখি, সেই স্বর্ণযুগে পাকা-পোক্ত মালমসলায় তৈরি খুব বড় একটা বাড়ি, লোকজন গিসগিস করছে, কোন খেলো কাজ নেই—সেটাতেও একটাই ঘর, বিরাট এবড়োখেবড়ো জবরদস্ত সেকালের একটা বৃহৎ হলঘর, সিলিং পলেস্তারা থাকবে না, কড়ি বরগা দেখা যাবে, ছোট একটা আকাশ তুলে ধরে আছে সেগুলো, বৃষ্টি আর বরফ থেকে মাথা বাঁচে, বিপর্যস্ত সে আমলের স্যাটার্ন-রাজের পূজো সাঙ্গ করে এসে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে দেখা গেল ছাদ থেকে বড় বড় সব খুঁটি নজরানা নিতে খাড়া হয়ে আছে; একটা গুহা গোছের বাড়ি, যেখানে ছাদ দেখতে লম্বা লগির ডগায় মশাল তুলে ধরতে হয়; যেখানে কেউ থাকবে চুলোটার মধ্যে, কেউ জানালার ফাঁকে, কেউ পিঠওলা বেঞ্চিতে, কেউ হলঘরের সেই একদিকটায়, কেউ অন্য দিকে, কেউ ইচ্ছে হ'ল তো বরগাগুলোর ওপর মাকড়সাদের সঙ্গে; এমন বাড়ি যেখানে সদর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরে গিয়ে ঢোকা যায়, ঢোকা ব্যাপারটা সাঙ্গ হয়, যেখানে হয়রান হয়ে এসে মুসাফির মুখহাত ধোবে, খাবে দাবে, গল্পগুজব করবে, ঘুমিয়ে পড়বে—আরও অনেকটা পথ না গিয়েও চলবে তার; এমন একটা আশ্রয় যেখানে ঝড়ের রাতে গিয়ে

পৌঁছলে খুশি হওয়া যায়, বাড়ির দরকারী সব জিনিস আছে, কিন্তু গেরস্থপনার কিছু নেই; যেখানে এক নজরে বাড়ির সব ধনরত্ন দেখা যাবে, মানুষের ব্যবহার্য সব কিছু একটা মাত্র গজালেই ঝোলানো থাকে; একই সঙ্গে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, বৈঠকখানা, আরাম কামরা, গুদোম ঘর, আর চিলে কোঠা; যেখানে পিপে কি মইয়ের মতো বাড়ির দরকারী মালও মিলবে, আবার মাল মসলা রাখার সুবিধে হয় এমন আলমারিও থাকবে; হাঁড়িতে কিছু ফুটলে তার আওয়াজ পাওয়া যায়, যে আগুনে রান্না হচ্ছে তাকে প্রণাম জানানো যায়, উননে রুটি সেঁকা হচ্ছে, দরকারী সব আসবাব আর বাসন কোসনই যে বাড়ির আসল সজ্জা; যেখানে কাপড়-চোপড় কাচবার বিরাম থাকবে না, উনন কামাই যাবে না, বাড়ির গিন্নীও কামাই যবেন না, হয়তো বা কখনও কখনও রাঁধুনী নিচের ভাঁড়ারে নামবে বলে ছোট দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করবে, পায়ের তলায় জায়গাটা নিরেট ফাঁপা পা না ঠুকেই বোঝা যাবে। এমন বাড়ি যার অন্দরটা পাখির বাসার মতো খোলা, কোথাও ঢাকাঢাকি নেই, বাড়ির কয়েকটা লোকের সামনা সামনি না পড়ে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চলে না; যেখানে অতিথি হয়ে অবাধে সর্বত্র চলাফেরা চলে, ফন্দিফিকির করে আট ভাগের সাত ভাগেই ঢুকতে দেওয়া হয় না এমন নয়, বরাদ্দ একটা খোপরে নির্জনাবাসে বন্দী ক'রে 'আরাম কিজিয়ে' বলা হয় না। এ যুগে গৃহস্বামী তাঁর নিজস্ব আগুন পোহানোর জায়গায় কাউকে নিয়ে যান না, মিস্ত্রিকে দিয়ে ঘুঁজির মধ্যে কোথাও অতিথির জন্য একটা আলাদা জায়গা বানানো হয়েছে দেখা যায়। চালাকি ক'রে কাউকে যতটা দূরে দূরে রাখা যায়, তাই তো আতিথেয়তা। রান্নাবাড়া নিয়ে এমন ঢাকাঢাকি করা হয় যে, তাঁর যেন বিষ খাওয়াবার মতলব আছে। অনেক লোকেরই বহির্বাটিতে আমি গেছি বলে মনে পড়ছে, সে সব জায়গা থেকে আইনত আমাকে বার করে দেওয়াও চলত, কিন্তু খুব বেশি লোকের অন্তঃপুরে ঢুকেছি বলে মনে পড়ে না। যে বাড়ির বর্ণনা দিলাম, সেখানে রাজা-রাণীও যদি সাদাসিধে ভাবে থাকেন, ও পথ দিয়ে যেতে হলে আমার এই পুরনো জামাকাপড়েই তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারি। কিন্তু আধুনিক প্রাসাদের কোন একটার খপ্পরে গিয়ে যদি কোন দিন পড়তে হয়, কি করে পালিয়ে আসব তাই শুধু জানতে ইচ্ছে করে।

আমাদের বৈঠকখানার আলাপ আলোচনার পর্যন্ত স্নায়ুর ব্যামো হয়ে উঠবে আর তার সমস্তটাই ঠকখানালাপে গিয়ে ঠেকবে বলে মনে হচ্ছে; তার আঙ্গিকের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক নেই বললেই হয়, তার উপমা শার ব্যঞ্জনায় এত হড়কানি আর ঘোরপ্যাঁচ যে সেগুলো কষ্টকল্পিত হতে

বাধ্য। ভাষান্তরে, বৈঠকখানা রসুইখানা আর কারখানা থেকে দূরে গিয়ে পড়েছে। এমন কি খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও যেন চারপাশে খাওয়া-দাওয়ার রূপকথা হয়ে উঠেছে বলে দেখা যায়। যেন, অসভ্যেরাই তো প্রকৃতি আর বাস্তবের সঙ্গে গা মাখামাখি করে থাকে, তা থেকে ব্যঞ্জনা নেওয়ার ধার তারাই ধারুক। বিদ্বান তো থাকেন নর্থওয়েস্ট টেরিটরি কি আইল অব ম্যান-এ, তিনি কি করে বলবেন, রসুইখানায় কোন কথা চলে কি চলে না!

যাই হ'ক, আমার অতিথিদের মাত্র দুয়েকজনই শুধু আমার কাছে থেকে গিয়ে খাওয়ার মতো দুঃসাহস দেখাতে চান। আমার তাড়াতাড়িতে তৈরি পুডিং খেতেও রাজী হন তাঁরা। কিন্তু যখন সংকটটা উপস্থিত বুঝতে পারলেন, তাড়াতাড়ি করে পালিয়ে বাঁচলেন তাঁরা, যেন হুড়মুড় করে বাড়িটা ভিত সমেত ভেঙে পড়ল বলে। তবু, অনেক তাড়াতাড়িতে তৈরি পুডিংএরই টাল সামলায় বাড়িটা।

বরফ জমার মতো শীত না পড়া পর্যন্ত আমি চুনকামে হাত দিই নি। সেই উদ্দেশ্যে হ্রদের ওপার থেকে কিছু বেশি সাদা আর সাফ বালি নৌকোয় করে বয়ে আনলাম। নৌকোটা এমন যান যে, দরকার হ'লে এতে করে অনেক দূর পর্যন্ত ঘুরতে লোভ যায়। ইতিমধ্যে আমার আস্তানাটার চারদিকে মাটি পর্যন্ত তক্তা লাগানো হয়ে গেল। বাতা লাগাবার সময় হাতুড়ির এক এক ঘায়ে এক একটা পেরেক নিচু পর্যন্ত ঠুকতে পেরে বেশ খুশি হলাম; তক্তার চুনকাম উঠিয়ে তাকে দেয়ালে পরিপাটি আর আড়াআড়ি করে লাগাবার সাধ ছিল আমার। জনৈক হামবড়া লোকের কথা মনে পড়ছে। বেশ ধোপদস্ত কাপড়জামা পরে গ্রামের ভেতর সে এক সময়ে অকাজে ঘুরে বেড়াত আর কাজের লোকদের পরামর্শ দিত। একদিন দুঃসাহস ক'রে আস্তিন গুটিয়ে ফেললে, কথা ছেড়ে কাজে নামবে; চুন-কামওয়ালা লোকগুলোর একজনের পাটাটা কেড়ে নিয়ে কর্ণিক ভরার কাজটা পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই চুকল; তখন মাথার ওপরে বাতাটার দিকে চেয়ে তার মুখে চোখে আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে যেই সদম্ভে সেদিকে এগিয়ে যাওয়া, অমনি—দুর্ভোগ আর কাকে বলে—সমস্তটা মসলা তার চিতনো বুকের ওপর পড়ল। চুনকামের সুবিধে আর মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে নতুন ক'রে শ্রদ্ধা হ'ল। ঠান্ডাকে এত সুন্দর রুখতে পারে, আর দিব্যি পোঁচ গায়ে নিয়ে নেয়। জ্ঞান হ'ল চুনকামওয়ালারা কত বিচিত্র বিপৎপাতের অধীন। ইটগুলো কি আন্দাজ পিপাসাকাতর থাকে দেখে অবাক হলাম। সমান করবার আগেই পলেস্তারার সবটা জল শুষে নিত তারা। নতুন অগ্নিকুণ্ড একটার গোড়াপত্তন করতে কত বালতি বালতি জল যে লাগে। গত শীতে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কিছু ইউনিয়ো ফ্লুভিয়াটিলিসের

খোলা পুড়িয়ে চুন বানিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের নদীতেই মেলে। সুতরাং আমার মাল মসলা কোথায় মেলে তাও জানা হ'ল। দুই এক মাইলের মধ্যে ভাল চুনাপাথরের সন্ধান ছিল, সেগুলো পুড়িয়ে নিজে নিজেই চুন বানিয়ে নিতে পারতাম।

ইতিমধ্যে হ্রদের যে সব খাড়িতে রোদ লাগে না, জল কম, সে জায়গা-গুলোয় অল্প অল্প বরফ জমতে সুরু করেছিল, সবটা জমে যাবার কয়েক দিন কি সপ্তাহ আগের কথা। প্রথম বরফটা ভারি মজার ব্যাপার আর নিটোলও থাকে, শক্ত কালোকোলো আর স্বচ্ছ। যেখানে জল কম, সেখানে তলা পরখ করার সব চাইতে বেশি সুযোগ এই সময়টায়। জলের ওপরকার স্কেটিং পোকার মতো লম্বালম্বি শুয়ে পড়া চলে মাত্র এক ইঞ্চি পুরু বরফের ওপর আর শুধু দুই কি তিন ইঞ্চি নিচে কাচের তলাকার ছবির মতো তলাটা ফাঁকে ফাঁকেই নিরিখ করা যায়। জল তখন অগত্যাই সব সময়ে সুনির্মল। বালির উপর অনেক দাগ কাটা, কোন প্রাণী সেখানে বার বার এঁকে বেঁকে ঘোরাফেরা করে গেছে; দাগগুলোর মধ্যে জলের পোকার খোলসের কুটি কুটি সাদা সাদা গুটির চিহ্ন। বোধ হয় কুঁচিটা এদেরই করা, তবে এত গভীর আর চওড়া যে মনে হয় না এরা করেছে। কিন্তু বরফটাই আসলে সব চাইতে মজার জিনিস। তবে দেখতে হলে যত তাড়া-তাড়ি সম্ভব সুযোগ করে নিতে হবে। বরফ জমার পর পরই সকাল বেলায় মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ বুদ্বুদই উপরকার জলের ঠিক নিচেটাতেই,—প্রথমটায় মনে হয়েছিল বুঝি সেগুলো একেবারে তলায়, আর ক্রমাগতই আরও কতকগুলো নিচে থেকে উপরে উঠছেই; তখনও কিন্তু বরফ অপেক্ষাকৃত জমাট আর কালচেই, অর্থাৎ এর ভেতর দিয়ে জলের চেহারা নজরে পড়ে। এই বুদ্বুদগুলোর ব্যাস হবে এক ইঞ্চির আশিভাগ থেকে আটভাগ পর্যন্ত, অতি স্পষ্ট আর সুন্দর। বরফের ভেতর দিয়ে এগুলোর বুকে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব চোখে পড়ে। এক এক বর্গ ইঞ্চি জায়গায় এরকম ত্রিশ চল্লিশটা দেখা যেতে পারে। বরফের নিচে এর মধ্যেই প্রায় আধ আধ ইঞ্চি সরু লম্বাটে চৌকোনো সোজা খাড়া বুদ্বুদও নজরে পড়বে—মোচার মতো ছুঁচলো চুড়োগুলো উপরের দিকে। আর বরফ যদি একেবারে সদ্য সদ্য জমে থাকে, বুদ্বুদগুলো কুটি কুটি আর গোলগোল হয়, ঠিক একটার উপর একটা, যেন একগোছা পুঁতির মালা। কিন্তু বরফের মধ্যেকার এগুলো নিচেকার গুলোর মতো অগুণতি আর গোটা গোটা নয়। বরফের জোর পরখ করে দেখতাম সময়ে সময়ে ঢিল ছুঁড়ে। যে ঢিল বরফ ফুঁড়তে পারত, সঙ্গে খানিকটা হাওয়াও ঢুকিয়ে

নিত। হাওয়াতে বেশ বড় বড় গোটাসোটা সাদা সাদা বুদ্বুদ তৈরি হ'ত তলায়। একদিন আটচল্লিশ ঘন্টা বাদে একটা জায়গায় গিয়ে দেখি বড়সড় বুদ্বুদ-গুলো তখন পর্যন্ত নিখুঁতই রয়ে গেছে, উপরে আরও ইঞ্চিখানেক পুরু বরফ জমেছে যদিও। একখণ্ড বরফের কিনারে জোড়ার জায়গাটা লক্ষ্য করতেই তা স্পষ্ট ধরা পড়ল। গত দুদিন বেশ গরম গেছে, প্রায় ভারতীয় গ্রীষ্মকাল, বরফ তাই এখন আর স্বচ্ছ নয়, নিচেকার জলের গাঢ় সবুজ রঙ আর তল নজরে পড়ে না। বরফ এখন অস্বচ্ছ, সাদাটে কি ধোঁয়াটে, দ্বিগুণ পুরু হলেও আগেকার মতো অত শক্ত নয় আর। গরমের ফলে বায়ু-বুদ্বুদ সব বেশ খানিকটা ফুলে উঠে একত্র জুড়ে গেছে, তাদের পরিপাটি ভাবটা কমে গেছে। তারা ঠিক একটার উপর একটা নেই আর, এখন যেন থলে থেকে রুপোর টাকা ঢালা হচ্ছে, একটা আর একটার গা সেঁটে পড়ছে, অনেকটা সেই রকম, কি কুচি কুচি ফুলকির মতো, যেন খানিকটা খানিকটা ফাঁক ভরে আছে। বরফের বাহার এখন খতম, তল নিরিখ করে দেখার পক্ষে বেশ দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমার সেই বড় বড় বুদ্বুদগুলোর অবস্থা আগন্তুক বরফের চাপে কি দাঁড়িয়েছে জানতে ঔৎসুক্য হ'ল। মাঝারি গোছের একটা বুদ্বুদ সমেত একখণ্ড বরফ ফাটিয়ে তার তলাটা উপরের দিকে তুলে ধরলাম। বুদ্বুদটা ঘিরে আর তার নিচে আগন্তুক বরফ জমে আছে। সুতরাং তিনি দুয়ের মধ্যে পড়ে গেছেন। গোটাটাই নিচের চাঁইয়ে কিন্তু উপরের সঙ্গেও আত্মীয়তা ঘটেছে। চ্যাপটা, হয়তো বা সামান্য কুঁজো দুধারেই, ধারটা গোল, সিকি ইঞ্চি গভীর আর ব্যাস চার ইঞ্চি। বুদ্বুদটার ঠিক নিচেটায় একটা উলটনো রেকাবির চেহারা নিয়ে খুব পরিপাটি ভাবে বরফ গলে গেছে দেখে আশ্চর্য হলাম, মাঝখানটা এক ইঞ্চির আটভাগের পাঁচ ভাগ উচু, জল আর বুদ্বুদের মধ্যে পাতলা একটা বেড়া তৈরি হয়েছে, এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ পুরুও নয়। অনেক জায়গায় এই বেড়ার মধ্যেকার ক্ষুদে বুদ্বুদ ফেটে নিচে চলে গেছে। এক ফুট ব্যাসের খুব বড় বুদ্বুদগুলোর তলায় বরফ হয়তো নেইই। বুঝে নিলাম, কুটি কুটি অসংখ্য যেসব বুদ্বুদ প্রথম দিকে বরফের ঠিক নিচেটা-তেই দেখেছিলাম, তারাও এদের মতোই জমে গেছে আর তাদের প্রত্যেকটাই নিজের পরিমাণ মতো নিচেকার বরফের পক্ষে আতশীকাচের কাজ ক'রে তাকে গলিয়ে গোল্লায় দিয়েছে। ছোট ছোট হাওয়া-ভরা সব বন্দুক এগুলো, বরফের ফটফটি আর হৈচৈ এদের জন্যই।

অবশেষে, আমার চুনকাম সাঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়ল আর বাড়িটার চারদিকে হাওয়া গর্জাতে সুরু করে দিল, যেন এতদিন

একাজ করার হুকুম তার মেলে নি। রাতের পর রাত রাজহাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে আর ডানার সাঁই সাঁই করতে করতে দলে দলে টলে টলে আসতে সুরু করল, যখন মাটি বরফে ঢেকে গেছে তখনও। কিছু ওয়ালডেনে এসে নামল, আর কিছু বনটার মাথা ঘেঁষে উড়ে ফেয়ার হ্যাভ্‌নের পথে মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। কয়েক বারই রাত দশটা কি এগারটায় গ্রাম থেকে ফিরছি, আমার আস্তানাটার ঠিক পেছনকার জঙ্গলে একটা ডোবার পাশে শুকনো পাতার ওপর ঝাঁক ধরে রাজহাঁস কি পাতিহাঁসের পায়ে চলার শব্দ পেলাম। যখন উড়ে গেল, তখন দলের পাণ্ডার ঈষৎ ভ্যাঁক ভ্যাঁক আর প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজও পেলাম। ১৮৪৫ সালে ২২শে ডিসেম্বর রাত্রে প্রথম ওয়ালডেনের সমস্ত উপরটায় বরফ জমে ফ্লিন্ট আর অন্য সব অগভীর পুষ্কেরিণী আর নদীতে দশ কি আরও কিছুদিন বেশি আগেই জমেছিল; ৪৬ সালে ১৬ই, ৪৯এ ৩১শের কাছাকাছি; ৫০এ ২৭শে ডিসেম্বর আন্দাজ; ৫২য় ৫ই জানুয়ারি; ৫৩য় ৩১শে ডিসেম্বর। ২৫শে নভেম্বর থেকেই বরফ মাটি ঢেকে ফেলে আর আমার চারপাশেও যেন আচমকা শীতের ছবি টাঙিয়ে দেয়। আমার খোলটার মধ্যে আরও বেশি করে লুকিয়ে পড়লাম আমি। আর কক্ষ ও বক্ষ দুজায়গাতেই তেজ উজ্জ্বল রাখবার তোড়জোড়ে লেগে গেলাম। বাইরে আমার কাজের মধ্যে রইল জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে হাত কি কাঁধে করে বয়ে আনা, সময়ে সময়ে এক এক হাতে এক একটা করে মরা পাইন গাছ টানতে টানতে নিয়ে আসা। আমার আসল পুঁজি হ'ল বনের একটা বাতিল ঘেরাও, তারও সময় ছিল একদিন। টারমিনাস ঠাকুরের কাজে লাগাবার আর হাল ছিল না তার, তাই ভালকান ঠাকুরের কাছে বলি দিলাম তাকে। যে লোকটাকে একটু আগেই রাঁধবার জ্বালানি কাঠ মৃগয়া করতে, বলা উচিত চুরি করতে, বরফ ফুঁড়ে আসতে হয়েছে, তার রাতের খাবার অন্যের তুলনায় একটা ব্যাপারের মতো ব্যাপার। রুটি মাংস তার কাছে অমৃত। এ অঞ্চলে প্রায় সব শহরের আশে পাশের বনই যথেষ্ট জ্বালানি আর নানা রকম আজে-বাজে কাঠে বোঝাই। অনেক আগুনের খোরাক হ'তে পারে তারা, কিন্তু বর্তমানে একটা লোকেরও হাত-পা সেঁকার কাজে লাগে না, নতুন করে বন গজাবারও তারা অন্তরায় বলে অনেকে মনে করেন। গরমের সময় বাকলাশুদ্ধ পিচ পাইনের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি একটা ডোঙা আবিষ্কার করেছিলাম, রেল-লাইন পাতবার সময় আইরিশরা সেটাকে জোড়াতাড়া দিয়ে খাড়া করে। টেনে পাড়ের উপর সেটা খানিকটা তুলে রেখেছিলাম। দুবছর জল শুষে আর ছ'-মাস ডাঙায় পড়ে থেকে একেবারে নিখুঁত রকমে কড়া পাকের হয়ে উঠেছিল সেটা, অবশ্য এমন স্যাঁতা যে আর কোন দিন শুকোবার আশা ছিল না। একদা শীতের বেলায় এটাকে আলাদা আলাদা খণ্ডে হ্রদের উপর দিয়ে প্রায় আধ

মাইলটাক গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বেশ মজা পাওয়া গেল। কাঁধের উপর একটা পনের ফ‍ুট লম্বা কাঠের গ‍ুঁড়ির এক দিক ফেলা, অন্য দিক বরফের উপর আর আমি পেছন পেছন সড়সড় করে চলেছি। কি, বার্চের ফ্যাঁকড়া দিয়ে কয়েকটা গ‍ুঁড়ি একসঙ্গে বেঁধে ফেললাম, তারপর ডগার দিকে আংটাওয়ালা একট‍ু লম্বা বার্চ কি অলডারের ডাল লাগিয়ে সেগ‍ুলো টেনে নিয়ে গেলাম। একেবারে জল-জ্যাবজেবে আর সীসের মতো ভারি হাওয়া সত্ত্বেও সেগ‍ুলোর আগ‍ুন বেশি সময় থাকত তো বটেই, আবার আগ‍ুনটায় আঁচও জমত বেশ। মনে হ'ত জল শ‍ুষেছে বলেই জ্ব‍লছে ভাল, যেন জলে আটকে পড়ে পিচ বেশিটা সময় জ্ব‍লতে পারছে, ল্যাম্পের মতো।

গিলপিন তাঁর ইংলণ্ডের বনাঞ্চলের সীমান্তবাসীদের বর্ণনায় বলেছেন, 'সেকালের বনসম্পর্কিত আইনে অনধিকার প্রবেশকারীদের উপদ্রব আর তদ্দর‍ুণ সীমান্তে বাড়িঘর তৈরি অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করা হ'ত আর পারপ্রেসট্যুর বিধায় গ‍ুর‍ুতর শাস্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল, কেন না এর ফল, শিকারের প্রাণীরা ভয় পায় আর বনেরও অনিষ্ট হয়।' কিন্তু হরিণের মাংস আর বনের শ্রী রক্ষার ব্যাপারে আমার উৎসাহ শিকারী কি কাঠ‍ুরেদের চাইতেও বেশি ছিল। এমন যে আমি স্বয়ংই যেন বন-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা, লর্ড ওয়ার্ডেন। কোন দিকে যদি আগ‍ুন লাগত, সে আগ‍ুন দৈবদ‍ুর্ঘটনায় আমার হাত থেকে লাগলেও, মালিকের চাইতে তার দ‍ুঃখ আমি বেশি সময় ধরে পেয়েছি, তার সান্ত্বনা ছিল না। এমন কি মালিকেরাও যখন জঙ্গল কেটেছেন, তাতে কষ্ট পেয়েছি। প্রাচীন কালে রোমানরা দেবতাদের নামে মানত দেওয়া কুঞ্জ (ল‍ুকাম কনল‍ুকেয়ার) ছাঁটতে কি সেখানে আলো ঢোকবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে যেমন বোধ করতেন, আমার ইচ্ছা আমাদের কৃষকরা যাঁরা বনজঙ্গল কাটেন তাঁরাও সেই রকম ভয় ভক্তি বোধ করেন। অর্থাৎ যেন মনে রাখেন সেটা দেবভূমি। রোমানরা প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে প‍ুজো দিতেন আর প্রার্থনা করতেন, দেব কি দেবী, এই কুঞ্জ যাঁর প‍ুণ্যভূমি, আমার প্রতি, আমার আত্মীয় স্বজন, প‍ুত্রকন্যার প্রতি প্রসন্ন হও।

এ য‍ুগে পর্যন্ত এই নতুন দেশেও কাঠকে কত ম‍ূল্যবান, সোনার চাইতেও স্থায়ী আর সর্বজনস্বীকৃত ম‍ূল্যে ম‍ূল্যবান মনে করা হয়, তা লক্ষ্য করবার বিষয়। এত যে আমাদের আবিষ্কার আর উদ্ভাবন, এ সব সত্ত্বেও কোন লোকই তাঁর মজ‍ুদ কাঠের অনাদর করেন না। আমাদের স্যাক্সন আর নর্মান প‍ূর্বপ‍ুর‍ুষদের কাছেও এ যেমন মহার্ঘ ছিল, আমাদের কাছেও তাই আছে। তাঁরা এ দিয়ে ধন‍ুক বানাতেন, আমরা আমাদের বন্দ‍ুকের কুঁদো বানাই। ত্রিশ বৎসরেরও আগে মিশো বলছেন দেখতে পাই, নিউ ইয়র্ক আর ফিলাডেলফিয়ার জ্বালানির জন্য কাঠের দাম "প্যারিসের সেরা কাঠের প্রায় সমান সমান, কোন

কোন সময়ে বেশি, যদিও এই বিশাল রাজধানীর প্রয়োজন বাৎসরিক তিন লক্ষ গাঁটেরও বেশি আর তার চারপাশ তিন শ মাইল দ্‌রে পর্যন্ত চষা জমিতে ঘেরা।" এ শহরে কাঠের দাম ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। একমাত্র প্রশ্ন এই যে এ বৎসর গত বৎসরের চাইতে দাম কত বাড়বে। যে সব কারিগর আর কারবারীদের নিজেদের বনে আসবার কোন দরকার পড়ে না, তাঁরাও বন নিলা-মের ডাকের সময় ঠিক হাজির হন আর কাঠ্‌রেদের পর পরই যাতে তাঁরা কাঠ নিতে পারেন, তার স্বত্ব পাওয়ার জন্য বেশি দামও কব্‌ল করে থাকেন। আজ কত বৎসর হ'ল মান্‌ষ জ্বালানির জন্য হ'ক আর শিল্পকাজের উপা-দানের জন্যই হ'ক বনের শরণ নিয়ে এসেছে; নিউ ইংলন্ড, নিউ হল্যান্ড প্যারিস, কেল্ট, সব দেশের লোক, কিষাণ আর ডাকাত, রাম আর রহিম সকলেই; প্‌থিবীর বেশির ভাগ অঞ্চলেই রাজা প্রজা, পন্ডিত ম্‌র্খ সকলেরই আজও পর্যন্ত হাত-পা সেঁকা আর খাদ্যদ্রব্য পাক করার জন্য বন থেকে কিছ্‌ কাঠ না হলে চলে না। আমারও একে বাদ দিয়ে চলে নি।

প্রত্যেকেরই তার প্‌ঁজি কাঠের উপর সস্নেহ দ্‌ষ্টি থাকে। আমার জানালার ঠিক সামনেটাতেই আমার প্‌ঁজি খাড়া আছে দেখলে আমার ভাল লাগত। গাদাটা যত বড় হ'ত, তত বেশি আমার কাজের আনন্দ মনে করিয়ে দিত। একটা মান্ধাতার আমলের কুড়্‌ল ছিল আমার, কেউ নিজের বলে দাবী করে নি সেটা; তাই দিয়ে শীতের সময় আমি আমার আস্তানার রোদের দিকে, বিন-ক্ষেতের দর্‌ণ পওয়া কাটা নাড়াগ্‌লো নিয়ে থেকে থেকে খেলা করতাম। যখন লাঙলের কাজ করি, তখন লাঙলওয়ালা যেমন ভবি-ষ্যদ্বাণী করেছিল, কাঠ আমাকে দ্‌ই দফায় তাপ দেয়; এক যখন এদের ফাড়ি, দ্‌ই যখন আগ্‌ন জ্বালাই এ দিয়ে। সেই হিসেবে আর কোন জ্বালানি এর চেয়ে বেশি তাপ দিতে পারে না। আর কুড়্‌লের কথা বলি, গাঁয়ের কামারকে দিয়ে বাঁট লাগিয়ে নেবার পরামর্শ পাওয়া সত্ত্বেও জঙ্গল থেকে একটা হিকোরির ডাল নিয়ে তাকে ডিঙিয়ে বাঁটটা নিজেই করে নিলাম; তাতেই কাজও চালিয়ে দিলাম। ভোঁতা হয়তো ছিল, কিন্তু কোপ দিতে মোক্ষম।

কয়েকটা মোটাসোটা পাইন গাছ রীতিমত ঐশ্বর্য। আগ্‌নের এই ইন্ধন কি পরিমাণে আজও মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে, ভাবলে মন ছোঁক ছোঁক করে। গত কয় বৎসর ধরে মাটির তলায় খনিজের খোঁজে একটা ন্যাড়া পাহাড়ের ধারে প্রায়ই ঘোরাফেরা করে আসছিলাম। আগে সেখানে পিচ পাইন বনের একটা আড্ডা ছিল। মোটাসোটা পাইনকটার শেকড় মিলে গেল সেখানে। প্রায় অবিনশ্বর সেগ্‌লো। অন্তত ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরেও কাটা গোড়াগ্‌লো অন্তরে অন্তরে প্রায় অক্ষতই থাকে, রসকাঠটা অবশ্য

গাছ-পচায় দাঁড়িয়ে যায়, মোটা বাকলের শকল দেখলেই তা বোঝা যাবে, অন্তস্থল থেকে চার কি পাঁচ ইঞ্চি দূরে সেগুলোয় ঢাকা চাকা দাগ পড়ে মাটির সঙ্গে সমান হয়ে। কুড়ুল আর গাঁইতি দিয়ে এই খনির গোঁচর্বির মতো হলদেটে মজ্জার রাশ খুঁড়ে খুঁড়ে যেতে হবে, যেন মাটির অনেক তলায় স্বর্ণ-পঞ্জরের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু আমি বনের শুকনো পাতা দিয়েই সচরাচর আগুন জ্বালাতাম। বরফ পড়ার আগে চালার তলায় মজুদ করে রাখতাম সেগুলো। কাঠুরেকে যখন বনে আড্ডা গাড়তে হয়, কচি হিকোরি গাছ কুচি কুচি করে কেটে তাই দিয়ে আগুন সেঁকার কাজ চালায় সে। কালে-ভদ্রে এও কিছু কিছু জুটে গেছে আমার। দিগন্তের ওপারে গ্রামবাসীরা যখন আগুন জ্বালিয়েছে, আমিও আমার চিমনি থেকে ধোঁয়ার নিশান উড়িয়ে ওয়ালডেন অঞ্চলের বিচিত্র সব বনের বাসিন্দাদের জানিয়ে দিয়েছি, আমি তো রয়েছি জেগে।

হাল্কা-পক্ষ ধোঁয়া, কল্পলোকের পাখি,
পালক গলায়ে চল আকাশের উঁচু পথে,
গীতিহারা লার্ক যেন, ঊষার অগ্রদূত,
গাঁয়ের আকাশে ঘোরো বুঝি সে তোমার নীড়;
অথবা স্বপন শেষ, ছায়াটে চেহারা নাও
রাত দুপুরের ছবি, আঁচল গুটায়ে যাও;
রাত্রে তারারে ঢাকো, দিনের বেলায় হেলায়
কালো কর আলোকেরে, সূর্যেরে মুছে দাও;
ধূপ-সুগন্ধি ধাও এই গৃহকোণ ছাড়ি
ক্ষমা চেয়ো দেবতার, এই শিখাটির হয়ে।

আর কোন কিছুর চাইতে সদ্য সদ্য কাটা শক্ত কাঁচা কাঠে আমার কাজ ভাল চলত, যদিও খুব কমই কাজে লাগাই একে। শীতকালে কোনদিন বিকাল বেলায় বেড়াতে বেরোলে বেশ ভাল করে আগুন জেবলে রেখে যেতাম, তিন চার ঘণ্টা পরে যখন ফিরতাম, তখনও আগুন গনগন করে জ্বলছে। আমি বাইরে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঘর খালি ছিল না। হাসি-খুশি কোন গিন্নীকে ঘরে রেখে গিয়েছিলাম যেন। আমার ঘরণী সচরাচর নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই পরিচয় দিয়ে এসেছেন। একদিন কিন্তু কাঠ ফাড়ছি, কেমন মনে হ'ল জানালা দিয়ে দেখি ঘরে আগুন লাগল কি না, মনে হচ্ছে এই একটি বারই এ বিষয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা হয়; কাজে কাজেই চাইতে হ'ল, দেখি আগুনের একটা ফুলকি আমার বিছানায় এসে পড়েছে, ভেতরে গিয়ে নিভিয়ে দিলাম সেটা, হাতখানেক জায়গা বেশ পুড়ে গেছে। কিন্তু আমার বাড়ি যে

জায়গাটায় সেখানে এমন রোদ তার চারদিকে এমন ঢাকা আর বাড়িটার ছাদ এত নিচু ছিল যে, শীতকালেও রাত দুপুরে আমি বেশ আগুন নিভিয়ে দিতে পারতাম, তাতে কোন অসুবিধা হ'ত না।

আমার ভাঁড়ারঘরে ছুঁচোরা আড্ডা গাড়ে, তিনটে আলুর অন্তত একটা তারা ঠুকরে দেখতই। পলেস্তারা লাগাবার পর দুই এক গাছি চুল আর মোড়কের কাগজ যা পড়ে ছিল, তাই দিয়ে এ হেন স্থানেও তারা পরিপাটি একটা বিছানা বানিয়ে ফেলে; মানুষের মতোই অতিবন্য জীবরাও আরাম আর তাপ ভালবাসে; শীত সহ্য করেও তারা যে বেঁচে থাকে, সে শুধু এ সব জোটানোর ব্যাপারে তারা এত হুঁশিয়ার বলে। ঠাণ্ডায় হিম হয়ে মরার পণ নিয়েই আমি বনে গিয়ে বাস করছি, আমার কয়েকজন বন্ধু এই ভাবের কথা বলেছেন। জীবজন্তুরা নিরালা একটু জায়গায় একটা বিছানা গুছিয়ে সেটাকে নিজেদের গায়ের তাপ লাগিয়ে গরম করে নেয়; আর মানুষের আবিষ্কার বিরাট একটা ঘরে খানিকটা হাওয়া বাক্সবন্দী করে তাই গরম করে নেয়, নিজেকে বঞ্চিত করে না, সেই তার শোবার জায়গা; মোটা কাপড়-চোপড় ছেড়ে রেখে এখানে সে ঘুরে বেড়াতে পারে, ভরা শীতের মধ্যে এক রকম গ্রীষ্ম বানিয়ে নেয়, এমন কি জানালার ফাঁক দিয়ে আলো ঢোকবার আর বাতি জ্বালিয়ে দিনকে টেনে বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা করে নেয়। এই ভাবে সহজাত বৃত্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে দুই এক ধাপ এগিয়ে গেলে তবেই মানুষ কলাশিল্পের জন্য হাতে একটু সময় পায়। হয়তো অনেকটা সময় অতি নির্মম ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাইরে থাকতে হয়েছে আমাকে, আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেছে, যেই বাড়িটার মনের মতো পরিবেশে এসে দাঁড়িয়েছি, অমনি সর্ব শরীরে সাড়া ফিরে পেয়েছি, আয়ু বেড়ে গেছে। বিলাসের উপকরণে বোঝাই ঘরবাড়িতে যাঁদের দিন কাটে, এ রকম বড়াই তাঁরা কদাচিৎ করতে পারবেন। আর মানুষের জাতের কিসে মৃত্যু হবে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কষ্ট নাই বা করলাম। উত্তুরে হাওয়া একটু জোর করে বইলেই তাদের জীবনসূত্র অনায়াসেই ছিঁড়ে পড়তে পারে। কোল্ড ফ্রাইডে আর গ্রেট স্নো বলে আমরা আমাদের দিনকালের নামকরণ করি, কিন্তু সামান্য বেশি ঠাণ্ডা, কি সামান্য বেশি বরফ পড়লেই এ দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্বই খতম হ'তে পারে।

পর বছর শীতে আমি খরচ বাঁচাতে ছোট একটা স্টোভে কাজ চালাতাম, —কেন না বনের মালিক তো আর আমি নই। কিন্তু এতে খোলা উননের মতো ভাল আগুন জমত না। রান্নার কাজটা তখন আর কাব্যিক রইল না, শুধু একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়াল। এই স্টোভের যুগে, অচিরাৎ লোকে ভুলে যাবে যে আমরা ইণ্ডিয়ানদের কায়দায় ছাইয়ের আগুনে আলু

পুড়িয়ে নিতাম। স্টোভ তো শুধু জায়গা জুড়ে থাকে না আর ঘর দুর্গন্ধ করে না, তার মধ্যে আগুনই যে ঢাকা থাকে; আমার মনে হত যেন কোন সঙ্গী হারিয়েছি আমি। আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে সব সময়েই একটা না একটা মুখ দেখা যায়। দিনমজুর সারাটা দিন ধরে পাঁক আর ধুলোমাটি সঞ্চয় করে, সন্ধ্যাবেলায় এর দিকে চেয়ে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটে। কিন্তু আমার আর আগুনের পাশে বসে তার দিকে চেয়ে থাকার উপায় রইল না, জনৈক কবির লাগসই কয়েকটা কথা নতুন করে আমার মনে খালি ফিরে ফিরে ভেসে উঠতে থাকল।

"কভু. ওগো দীপ্তশিখা, না হ'ক অস্থির, ,
তব প্রিয়, প্রাণরূপ দেওয়া প্রেম সুনিবিড়।
আমার উড্ডীন আশা, যদি বা উচ্ছল, কি বা প্রভা তায়;
রাত্রিগর্ভে ঢাকে ভাগ্য যদি, কি বা আসে যায়;
গৃহকোণ, গৃহমধ্য হ'তে তোমারে কে দিল নির্বাসন,
সবে চায় আনন্দে যাহারে, সবাকার নিতান্ত আপন;
তোমার অস্তিত্ব তবে, শুধু সে কি নিছক কল্পনা,
আমরা নিষ্প্রাণ তাই, বাধা পায় জীবন-যাপনা;
তোমার জ্বলন্ত দ্যুতি, গোপনে কি আলাপন করে,
আত্মীয়াত্ম আমাদের সাথে দুঃসাহিসে কি রহস্য ভরে ?

ভাল তাই বুঝি নিরাপদে বলীয়ান জীবন গোঙাই,
গৃহকোণে আসন গেড়েছি. ছায়াছন্ন অস্পষ্টতা নাই,
নাই হেথা আনন্দ বিষাদ, শুধু এই অগ্নিকুণ্ড আছে,
তাপ সেঁকে হাত পায় সবে, এর বেশি কিছু নাহি যাচে।
সুরক্ষিত হিতকর তাপে
বর্তমান থাকুক আশ্রিত সুখনিদ্রা ঘোরতর চাপে।
অস্পষ্ট অতীত হ'তে জাগা প্রেতাত্মারে নাহি করি ভয়
সমিধে জ্বালায়ে যারা সব আমাদের সাথে কথা কয়।"

॥ ১৪ ॥ প্রাক্তন পুরজন; আর শীতের অতিথি

আমার সেই গৃহকোণে আগুনের তাপে বসে একাধিক তুষারঝঞ্ঝা আর গুটি কয়েক শীতের সন্ধ্যা আনন্দে কাটানো গেল। বাইরে তখন দুর্দান্ত বরফ পড়ছে, পেঁচাগুলোর ডাক পর্যন্ত শোনা যায় না। অনেকগুলো সপ্তাহ বেড়াবার সময়েও কারও সঙ্গে দেখা হয় নি আমার। শুধু যারা কাঠ কেটে স্লেড গাড়ি করে গাঁয়ে নিয়ে যাবার জন্য কালেভদ্রে বনে আসত, তাদের সঙ্গে ছাড়া। পঞ্চভূতরা কিন্তু বনের পুরু জমাট বরফের ভিতর দিয়ে পথ কেটে চলতে আমাকে সাহায্য করে। আমি এক দফা বেরোতে পারলেই বাতাসে ওক পাতার রাশ উড়িয়ে এনে আমার পথে ফেলে রেখে যেত, সেগুলো সেখানে থিতু হয়ে থেকে সূর্যের তেজ শুষে বরফ গলিয়ে দিত। ফলে আমার চলার পথ তো শুকনো পেতামই, রাত্রে তাদের কালো দাগ দেখে আমি পথও ঠাহর করতে পারতাম। মানুষের সঙ্গে পেতে হ'লে এই বনের আগেকার বাসিন্দাদের কল্পনায় চাক্ষুষ করে নিতে হ'ত। যে পথের উপর আমার বাড়িটা, একদিন তা এই বাসিন্দাদের হাসিগল্পে মশগুল থাকত, এর লাগাও বনের সবটাই প্রায় তাদের ছোট ছোট বাগানে আর বাড়িঘরে দাগা আর ফুটকি চিহ্নে ভর্তি ছিল। কিন্তু তখন এখনকার চাইতেও জায়গাটা বেশি বনের মধ্যে ছিল। শহরের লোকদের অনেকেরই এসব কথা মনে আছে। আমারই মনে পড়ে, এক একটা জায়গায় গাড়ির দুদিকটায় একই সঙ্গে পাইনগাছগুলো খসখস আওয়াজ করে চলত। ছেলেপুলে নিয়ে মেয়েদের একা একা পায়ে হেঁটে এই পথে লিংকন যেতে হ'লে ভয়ে ভয়ে পথ হাঁটত তারা, অনেকটা রাস্তা দৌড়িয়েই পার হ'ত। আসলে যদিও এটা আশপাশের গাঁয়ে যাবার কি কাঠুরেদের চলাচলের সামান্য রাস্তা একটা, সেদিন কিন্তু এর বৈচিত্র্যে আজকের চাইতে পথিক বেশি আমোদ পেত, অনেকটা বেশি সময় তার মন জুড়ে থাকত সেদিন এ। এখন যেখানে দস্তুরমতো খোলতাই মাঠ গাঁ থেকে বন পর্যন্ত জুড়ে আছে দেখা যায়, তখন এ রাস্তায় যেতে হ'লে কয়েকটা কাঠের গুঁড়ির মাচানে মেপ্‌ল গাছে ভরা জলাভূঁই ভাঙতে হ'ত। এখন যেখানে আমস-হাউজ, ফার্ম, তখন ছিল সেখানে দি স্ট্র্যাটন। সেখান থেকে ব্রিস্টার হিল পর্যন্ত ঐ যে ধুলোয় ভরা

বড় রাস্তাটা, তার নিচে নিশ্চয়ই সেগুলোর ভাঙাচোরা কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে।

আমার বিন-ক্ষেতের পূব দিকটায় রাস্তার ওপারে থাকত কনকর্ড গ্রামের ভদ্র মহোদয় ডানকান ইনগ্রাহাম এস্কয়ারের ক্রীতদাস কেটো ইনগ্রাহাম। তাঁর সেই ক্রীতদাসকে তিনি একটা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন, ওয়ালডেনের বনাঞ্চলে বসবাস করবার অনুমতিও দিয়েছিলেন তাকে—নিতান্তই কনকর্ড গ্রামের কেটো সে, ইউটিকার কেটো নয়। কেউ কেউ বলেন, গিনি থেকে আসা কাফ্রি সে। অনেকে আজও আছেন, ওয়ালনাট গাছগুলোর মধ্যে তার ছোট্ট ভিটেটার কথা যাঁদের মনে পড়ে। বুড়ো বয়সে কাজে লাগবে বলে গাছগুলোকে সে বড় হ'তে দেয়। তারপর একটু কমবয়সী আর বেশি শ্বেতাঙ্গ কোন মুনাফা সন্ধানীর হাতে পড়ে সেগুলো। সেও কিন্তু আজ ঐ রকম সংকীর্ণ একটা আবাসেই জীবন কাটাচ্ছে। কেটোর সেই গুদামের গর্তটা অর্ধলুপ্ত অবস্থায় আজও রয়ে গেছে। কিন্তু খুব কম লোকেই জানে তা, পথিকের চোখের বাইরে পাইনের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। সুইট সুমাক (রাস গ্লাব্রা) ঢেকে ফেলেছে তাকে, এক জাতের আদিম গোল্ডেনরড (সলিডাগো স্ট্রিক্টা) প্রচুর গজিয়েছে সেখানে।

আমার ক্ষেতটার একেবারে কোণ ঘেঁষে এইখানে কালা আউরত জিল্‌ফার ছোট একটা ঘর ছিল। বাজখাঁই সুরে গান গেয়ে ওয়ালডেন বনাঞ্চলকে সচকিত করে সেখানে বসে সে শহরের লোকদের কাপড় বুনত। তার কন্ঠে ভার আর ধার দুইই ছিল। তারপর একদিন ১৮১২ সালের যুদ্ধের সময় চুক্তিবদ্ধ ইংরেজ বন্দী সেপাইরা তার ঘরটায় আগুন লাগিয়ে দেয়, সে তখন ছিল না। তার বেরাল কুকুর আর মুরগীগুলো সব একসঙ্গে পুড়ে মরে। জীবন তার সুখের ছিল না, খানিকটা অমানুষিকও ছিল। সে আমলে বনে যাতায়াত ছিল এমন কোন লোকের মনে আছে, একদিন দুপুর বেলায় তিনি তার বাড়িটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পান, কড়াইয়ে কি ফুটছে আর সে তার উপর উপুড় হয়ে বিড় বিড় করে বলছে—"মর মর সব মরে যা।" সেখানে ওকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে ইটপাটকেল নজরে পড়েছে আমার।

পথ ধরে একটু গেলে, দক্ষিণ দিকে, ব্রিস্টার হিলের ওপর "কাফ্রি ওস্তাদ" ব্রিস্টার ফ্রিম্যান থাকত, এক সময়ে স্কয়ার কামিংসের ক্রীতদাস ছিল সে,—ঐ যেখানটায় আজও আপেল গাছগুলো দেখা যায়, ব্রিস্টারেরই পোঁতা ওগুলো, সেই দেখাশোনা করত ওদের; গাছগুলো এখন বেশ বড় হয়েছে, কিন্তু ফলগুলো কেমন আমার জিভে বুনো আর সাইডারের মতো ঠেকে। বেশি দিন যায় নি, লিংকনের পুরনো কবরখানার এক টেরে, জন-কয়েক বৃটিশ গ্রেনেডিয়ারের নামহীন কবরগুলোর কাছাকাছি—কনকর্ড

থেকে পিছু হঠার যুদ্ধে মারা যায় তারা—ব্রিস্টারের গোরের ওপরকার লেখাটা পড়লাম। সেখানে তার নাম "সিপিয়ো ব্রিস্টার" লেখা হয়েছে—সিপিয়ো আফ্রিকেনাস নামেও তার কিছু দাবী ছিল—"কৃষ্ণকায়", যেন তার রঙ মুছে দেবার জন্যই। লেখাটায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে সে এই সময়টায় মারা গেছে, লোকটা যে কোনদিন বেঁচে ছিল তাই যেন ঘুরিয়ে মনে পড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার সঙ্গে থাকত তার অতিথি-পরায়ণা স্ত্রী, সে আবার ভাগ্য গণনা করত, অবশ্য রেখে ঢেকে,—বিপুলা, কৃষ্ণা, অন্ধকারের প্রাণীদের চাইতেও কালো, তার আগে কি পরে কনকর্ডের আকাশে এমন কালোশশীর আর উদয় হয় নি।

পাহাড়ের আর একটু নিচে বাঁ দিকে বনের ভেতরে পুরনো রাস্তাটার উপর স্ট্র্যাটন পরিবারের বাস্তুভিটের কিছুটার সাক্ষ্য পাওয়া যায়; ব্রিস্টার হিলের সমস্তটা গা জুড়েই তো একদিন ওদের ফলের বাগান ছিল, কিন্তু সেই কবে পিচ পাইনের ঝাড় তাদের উচ্ছেদ করেছে, তাদের বুড়ো শেকড়গুলো এখনও গাঁয়ের অনেক বাড়-বাড়ন্ত গাছের মাচানের কাজ করছে।

শহরের আরও কাছাকাছি রাস্তার ওদিকে বনের ধারে ব্রিডের আস্তা-নার সন্ধান মিলবে, এক অপদেবতার লীলাক্ষেত্র হিসেবে জায়গাটার নামডাক আছে; পুরাণে এঁর নাম স্পষ্ট ভাবে করা হয় নি, কিন্তু নিউ ইংলণ্ডের জীবনে বেশ একহাত জবর খেল দেখিয়ে গেছেন ইনি, পুরাণকথার সব নায়কের মতোই এঁর জীবনীও ভবিষ্যতে লেখার মতো; ইনি প্রথমে কোন পরিবারে বন্ধু কি মাইনে-করা লোকের ছদ্মবেশে আসেন, এসে লুঠতরাজ করে তাদের সবাইকে জবাই করেন—নিউ ইংলণ্ডের উচিত গঞ্জিকা। কিন্তু যে সব মর্মান্তিক নাটকের অভিনয় এখানে হয়েছে, আজও তা ইতিহাসে উল্লিখিত হবার উপযুক্ত হয় নি; কালের হাত পড়ে খানিকটা ফিকে হ'ক সব কিছু, নীল পোঁচ লাগুক তাতে। ঘোর ঘোর ঘোলাটে কিংবদন্তী, এক সময়ে এখানে একটা শুঁড়িখানা ছিল, এই ইঁদারাটাও ছিল, সুতরাং মুসাফির লোকের পানীয়ে মেশাবার জলের যোগাড় ছিল আর তার ঘোড়াটাও জিরোতে পারত। এখানেই লোকজন পরস্পরকে সেলাম আলেকম করত, খবর দেওয়া নেওয়া হ'ত, তারপর যে যার পথে বেরিয়ে পড়ত।

এই বছর বারো আগেও ব্রিডের কুঁড়েটা খাড়া ছিল, কিন্তু অনেক দিন ধরেই লোকজন সেখানে বাস করে না। আমার আস্তানাটার প্রায় সমান আয়তনের হবে সেটা। যদি ভুলে না গিয়ে থাকি, ইলেক্‌শনের সময় রাত্রে কয়েকটা ছ্যাঁচড়া ছোকরা সেটায় আগুন লাগিয়ে দেয়। আমি তখন গাঁয়ের কিনারায় বাস করি, ডেভেনান্টের গণ্ডিবার্ট সবে পাঠ করে মাত হয়ে আছি;

কালটা শীত, পরিশ্রম করতে কুড়েমি লাগে,—এইখানে বলে রাখি এই ব্যাধিটা বংশগত কি না সে সম্বন্ধে কোনদিনই আমি নিঃসন্দিগ্ধ হই নি, জনৈক আত্মীয় আমাদের ছিলেন কিনা, ঘুমোতে যাবার আগে তিনি দাড়ি কামাতেন, আর রবিবারটা ভাঁড়ারে বসে আলু বেছে কাটাতেন, যাতে ঘুমিয়ে না পড়েন, আর সঙ্গে সঙ্গে রবিবারটাও রক্ষা করা হয়: কিংবা সেটা কোন অংশ বাদ না দিয়ে চামার্সের ইংরেজী কাব্যসংগ্রহ পাঠ করবার চেষ্টারই ফল হবে। আমার স্নায়ুগুলো বেশ জখম হয় তাতে। মাথাটা সেদিন এর মধ্যে কেবল চুবিয়েছি, পাগলাঘন্টি শোনা গেল, আগুন লাগার। ইঞ্জিন-গুলো বোঁ বোঁ শব্দে সেদিকে ছুটেছে, আর সামনে এধারে ওধারে ছড়ানো এক দঙ্গল লোক, ছেলেরাও আছে। ঝরনাটা লাফ দিয়ে পার হয়েছিলাম, তাই আমিও সামনেওয়ালাদের মধ্যে পড়ে গেছি। আমরা যারা এর আগেও আগুন লক্ষ্য করে কত ছুটেছি, আমাদের মনে হ'ল আগুনটা বেশ খানিকটা দক্ষিণে বনের ওদিকটায়, গোলাবাড়িতে, দোকান পাটে, বাড়িঘরে কি সব-গুলোয় একসঙ্গে লেগেছে। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেকারের গোলা ওটা।" আর একজন হাঁকলেন, "কডম্যানের বাড়িটা"। সঙ্গে সঙ্গেই বনের মাথা ছাড়িয়ে নতুন ফুলকি উড়তে দেখা গেল, বুঝি ছাদটা ধ্বসে পড়ল, আর আমরা সকলে একসঙ্গে জিগির দিয়ে উঠলাম, "সামাল কনকর্ড।" ঢাউশ-গাড়িগুলো ভীষণ জোরে ছুটেছে, ঠেসে বোঝাই, হয়তো তাতে অনে-কের মধ্যে বীমা কোম্পানির দালালও আছেন, তাঁকে তো যেতেই হবে যত দূরই হ'ক। পেছনে ইঞ্জিনটার ঘন্টা ক্রমাগতই ঢং ঢং করে বেজে চলেছে, একটু আস্তে কিন্তু একটু ভরসা নিয়ে; কানাঘুষো শুনেছি পরে, যারা আগুন লাগিয়ে, আবার নিজেরাই বিপদের ঘন্টা বাজায়, তারাও সকলের পেছনে ছুটেছিল। এই ভাবে অকৃত্রিম ভাবপন্থীদের মতোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে আমরা এগোচ্ছি, হঠাৎ রাস্তার একটা মোড় ঘুরতেই কানে গেল, ফট ফট, চট চট। আর পাঁচিলের ওধার থেকে আগুনের হলকা এসে গায়ে লেগে জানান দিল, বুঝতেই পারলাম, ওরে বাবা, ঐ যে সাম-নেই। আর আগুনের কাছে যেই আসা, অমনি আমাদের সব উৎসাহ একে-বারে জল। প্রথমটায় ভাবা গিয়েছিল বুঝি ডোবা উপুড় করে জল ঢেলে দিলেই হবে ওর উপর; কিন্তু এত বাড় বেড়ে গেছে তখন এর, আর এমন অনাসৃষ্টি কান্ড যে মন ঠিক করে ফেলা গেল, যাক, জ্বলে খাক হয়ে যাক। সুতরাং আমাদের ইঞ্জিনটা ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, পরস্পর ঠেলা-ঠেলি করতে থাকলাম, মুখে চোঙ লাগিয়ে ভাবোচ্ছ্বাসও প্রকাশ করা গেল, আর দুনিয়ায় যত মহামারি অগ্নিকান্ড ঘটে গেছে ফিস ফিস করে তার আলোচনায় লেগে গেলাম, তার মধ্যে বেসকমের দোকানের কথাটাও এসে গেল,

নিজেরাই ঠিক করে ফেলা গেল, আমরা যদি না কি একবার "ঘট" নিয়ে সেখানে সময় মতো হাজির হতে পারতাম, আর এক ডোবা জল যদি হাতের কাছে থাকত, তবে গত বারের ঐ ভয়ংকর সর্বগ্রাসী আগুনকে জলপ্লাবন না করে ছাড়তাম কি। শেষ পর্যন্ত কোন অনিষ্ট না করেই কিন্তু আমরা পিটটান দিলাম—ফেরা গেল ঘুমোতে আর গন্ডিবার্ট পড়তে। কিন্তু গন্ডিবার্ট প্রসঙ্গে বলছি, বইটার ভূমিকায় একটা অংশ আমি বাদ দিতে চাই, রসিকতাকে যেখানে আত্মার বারুদ বলা হয়েছে—"কিন্তু বেশির ভাগ লোকেরই রসিকতার সঙ্গে পরিচয় নেই, ইন্ডিয়ানদের যেমন বারুদের সঙ্গে নেই।"

ঘটনাচক্রে পরের দিন রাত্রে মাঠ পার হয়ে ঐ পথটাতে প্রায় একই সময়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, জায়গাটা থেকে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ পেয়ে অন্ধকারের মধ্যে আরও ওদিকটায় এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ঐ পরিবারের একমাত্র উত্তরজীবী বলে যাকে জানতাম, সে. এখন ওদের দোষ আর গুণ দুয়েরই উত্তরাধিকারী, পেটে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে মাটির নিচের গুদোমঘরটার পাঁচিলের ওদিকে চেয়ে আছে বেচারি, নিচে তখন পর্যন্ত আগুন ধিক ধিক করছে, আর সে নিজের মনে অভ্যাসমতো কি বিড় বিড় করে চলেছে। সারাদিন নদীর ধারের মাঠটায় কাজ করেছে আর এখন যেই নিজে একটু ফুরসত পেয়েছে অমনি সুবিধে করে তার বাপ-পিতেমোর ভিটে, নিজের যৌবন কাটিয়েছে যেখানে, ছুটে দেখতে এসেছে। চারদিক থেকে অনেক রকম করে বার বার গুদোমটার ভেতর উঁকি মেরে দেখল সে, সব সময়েই উপুড় হয়ে, যেন সেখানে পাথরগুলোর তলায় লুকানো ধনরত্ন ছিল মনে পড়ে গেছে তার। একগাদা ইট আর ছাইপাঁশ ছাড়া আর কিছুই নেই সেখানে। আমার উপস্থিতির মধ্যে যেটুকু সমবেদনা প্রকাশ পেল, তাই তার সান্ত্বনা। আমাকে সে ইঁদারাটা যেখানে চাপা পড়েছে, অন্ধকারের মধ্যে যতটুকু দেখা যায়। ভগবানের দয়া যে আগুন লেগে ইঁদারা কখনও পুড়ে যায় না। তার বাবা একটা জল তোলার লাঠঠা বানিয়ে সেটা খাড়া করেছিলেন, সেটার লোহার আংটা কি গজালটা ছুঁতে চায়, তাই থেকে ভারি দিকটায় একটা শিল ঝুলত, আঁকড়ে ধরার মতো শুধু তো ঐটেই এখন—আমাকে বোঝাতে চায় সেটা বাজেমার্কা লাঠ্ঠা নয়। আমিও সেটা ছুঁয়ে দেখলাম। এখনও প্রায় রোজই বেড়াতে গিয়ে লক্ষ্য করি ওটা, একটা পরিবারের ইতিহাস ওটা আঁকড়ে ঝুলে আছে।

আরও পরে এখনকার ঐ খোলা মাঠটার মধ্যে বাঁয়ের দিকে যেখানে ইঁদারাটা আর পাঁচিলের উপর লাইলাকের ঝাড় নজরে পড়ে, সেখানে নাটিং আর লি গ্রসরা থাকত। কিন্তু লিংকনের দিকেই মুখ ফেরাই।

এগুলোর চাইতেও বনের আরও ভেতরে রাস্তাটা যেখানে হ্রদটার সব

চাইতে কাছ ঘেঁষে গেছে, ওয়াইম্যান কুমোর ঐখানে মাটির উপর বসত, শহরের লোকদের মাটির হাঁড়িকুড়ি যোগাত সে, বংশধরদের জন্য রেখেও যায় জায়গাটা। তারাও বিশেষ টাকা কড়ির সুবিধে কেউ করতে পারে নি, যত-দিন বেঁচে ছিল ততদিন জায়গাটা কোন রকম করে আঁকড়ে ধরে ছিল শুধু: প্রায়ই ট্যাক্সদারোগা আসতেন ট্যাক্স আদায়ের মিথ্যা চেষ্টায়, নিয়ম রক্ষা করতে একটা কিছু ক্রোকও করতেন, দখল করবার মতো তেমন কিছু ছিলও না, হিসেবও দেখেছি তার। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি একদিন মাঠে কাজ করছি, একটা লোক এক বোঝা মাটির জিনিস নিয়ে হাটে যাবার পথে আমার মাঠের কাছে ঘোড়াটা থামিয়ে কনিষ্ঠ ওয়াইম্যানের খোঁজ করলে। অনেক আগে তার কাছ থেকে একটা কুমোরের চাকি কিনেছিল সে, জানতে চাইলে কি হ'ল লোকটার। কুমোরের চাকি, কুমোরের মাটির তালের কথা বাইবেলেই পড়েছি, কোনদিন ঘটে আসে নি, আমরা যে হাঁড়িকুড়ি নাড়াচাড়া করি সেগুলো সে সময় থেকে সরাসরি পাওয়া নয়, কি লাউ কুমড়োর মতো গাছেও গজায় না কোথাও। কেমন আনন্দ হ'ল জেনে যে আমাদের এ অঞ্চ-লেও এই রকম একটা মৃৎশিল্পের চর্চা কোনদিন হ'ত তা'হলে।

আমার ঠিক আগেই এই বনের শেষ বাসিন্দা ছিলেন জনৈক আইরিশ-ম্যান হিউ কোয়েল (নামটার বানানে যথোচিত কায়দা দেখাবার সাধ আমার), ওয়াইম্যানের বাসভবনটি ভোগদখল করতেন—লোকজন কর্নেল কোয়েল বলে ডাকত। গুজব যে তিনি ওয়াটার্লুতে লড়াই করেছিলেন। যদি বেঁচে থাকতেন আমি তাঁকে সবটা লড়াই আবার করিয়ে ছাড়তাম। এখানে তাঁর পেশা ছিল খাল কাটা। নেপোলিয়ান গেলেন সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে, কোয়েল এলেন ওয়ালডেন বনে। যেটুকু জানি তাঁর সম্বন্ধে সবটাই দুঃখের। দুনিয়াকে দেখেছেন যাঁরা তাঁদের যেমন হয়—আদবকায়দাদুরস্ত লোক ছিলেন। এমন ভব্যতা রক্ষা করা কথাবার্তা বলতে পারতেন যে মন দিয়ে শোনাও কঠিন। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে কাঁপুনি রোগে ভুগতেন, তাই ভরা দুপুরেও গ্রেটকোট পরে থাকতেন, আর মুখটা ছিল টকটকে লাল। আমি বনে এসে বসবাস আরম্ভ করবার অতি অল্প দিনের মধ্যেই ব্রিস্টার হিলের নিচে পথে পড়ে তিনি মারা যান, সুতরাং পড়শী হিসেবে ঠিক আমার মনে নেই তাঁকে। চেলাচামুণ্ডারা তাঁর বাড়িটাকে অলক্ষুণে বলে এড়িয়ে চলতেন, সেটাকে ভেঙে ফেলার আগে দেখতে গিয়েছিলাম একদিন। উঁচু তক্তাপোশে তাঁর বিছানার উপর পুরনো কাপড়চোপড়গুলো পড়ে রয়েছে, ব্যবহারের দরুন কুঁকড়ে গেছে, যেন হুবহু তিনি। চুলোর উপর তাঁর পাইপটা ভেঙে পড়ে আছে—ঝরনার ধারে ভাঙ্গা কলসী নয়। এ উপমাটা তাঁর মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে একেবারেই অচল, আমার কাছে তিনি কবুল

করেছিলেন যে, ব্রিস্টার স্প্রিংয়ের কথা কানে শুনেছেন বটে, কিন্তু কখনও চোখে দেখেন নি। ময়লা ময়লা তাস, রুইতন ইস্কাবন হরতনের সাহেব সব মেঝের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। কালো একটা মুরগীর ছানা, সেটাকে সরকারের লোকে পাকড়ে উঠতে পারে নি, রাতের মতো মিশকালো আর চুপচাপ, রা শব্দ পর্যন্ত নেই, যেন শেয়ালের প্রতীক্ষাতেই এখনও পাশের ঘরটাতেই আড্ডা গেড়ে পড়ে আছে। পেছনটায় একটা বাগানের ঝাপসা চিহ্ন, সেখানে বীজ পোঁতা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সেই মারাত্মক কাঁপুনির তাড়সে একবারও নিড়ানি চালানো হয় নি, যদিও ফসল কাটার সময় চলেছে এখন। সারা জায়গায় রোম্যান ওয়র্মউড আর বেগার-টিক, তাদের একমাত্র কাজ দেখলাম আমার জামাকাপড়ে লাগা। বাড়িটার পেছন দিকটায় তাঁর সর্বশেষ ওয়াটার্লুর বিজয়চিহ্ন হিসেবে একটা উডচাকের ছাল সবে মাত্র মেলা অবস্থাতেই রয়ে গেছে, কিন্তু গরম টুপি আর দস্তানার কোন দরকার আর তাঁর হবে না।

আগেকার বাড়িঘরের নিশানা বলতে এখন শুধু মাটির উপর খানিকটা ঢোল আর মাটির তলায় গুদোমঘরের ইটপাথর; জায়গাটার ঘেসো মাঠে রোদে স্ট্রবেরি রাস্পবেরি থিম্বলবেরি, হ্যাজেলের ঝাড় আর সুমাক গজিয়ে চলেছে। আগুন পোহাবার কোনা ছিল যেখানটায়, একটা পিচ পাইন কি গাঁটওয়ালা ওকগাছ সে জায়গাটা দখল করেছে আর দরজার সামনের পাথরটার জায়গায় হয়তো খোসবায়ওয়ালা একটা ব্ল্যাকবার্চ হাওয়ায় দুলছে। একদিন যেখানে ফোয়ারা ঝিরঝির করত, সময়ে সময়ে তার খাঁজটা নজরে পড়ে, এখন সেখানে শুধু ঘাস, শুকনো, একফোঁটা চোখের জলও নেই হয়তো বা বংশের শেষ লোকটি যখন মারা গেছে, তখন ঘাসের চাপড়ার নিচে পাথর চাপা দেওয়া হয় তার উপর, যাতে অনেক দিন পর্যন্ত নজরের আড়ালে থাকে। একদিকে চোখের জল বাঁধ মানছে না, অন্যদিকে ফোয়ারার মুখে বাঁধ চাপা দেওয়া—এ দুঃখের হিসেব করবে কে। একদিন যে জায়গা জীবন্ত মানুষের চলাফেরায় আর গল্পগুজবে মশগুল ছিল, সেখানে থাকবার মধ্যে রয়েছে শুধু খেঁকশেয়ালের খালি কয়েকটা গর্তের মতো, তাও অনেক দিনের গর্ত সব, এই মাটির তলায় গুদোম-ঘরের কয়েকটা ঢিবি, যেখানে একদিন কোন না কোন ঠাটে কি বুলিতে কি যে কোন ছাঁদে "অদৃষ্ট, পুরুষকার, পূর্ণপ্রজ্ঞা" নিয়ে আলোচনার অন্ত ছিল না। তাঁদের এই সব সিদ্ধান্তের যেটুকু মর্ম উপলব্ধি করতে পারি আমি, তার মোদ্দা কথা দাঁড়ায় এই যে "কেটো আর ব্রিস্টার শুধু কুকুরের লেজ সোজা করার চেষ্টাই করে গেছেন।" একথা আর অন্য সব নাম-করা দার্শনিক মতবাদের ইতিহাসই সমান সারগর্ভ।

দরজা, গোবরাট, ঝনকাঠ নিশ্চিহ্ন হওয়ার এক যুগ পরেও ফুল্ল

লাইলাক গজিয়ে চলেছে, প্রতি বসন্তে তার সুগন্ধি ফুল ফুটিয়ে তুলছে, অন্যমনস্ক পথচারী তাদের ছিঁড়ছে। কবে কোনদিন সামনের খানিকটা খোলা জায়গায় সেগুলো শিশুরা হাতে করে পুঁতেছিল, পালন করেছিল—এখন নতুন বনানীর মাথা খাড়া করবার জায়গা ছেড়ে দিয়ে প'ড়ো গোচারণের মাঠে পাঁচিলের গা বেয়ে উঠেছে সব;—বংশের সে একমাত্র উত্তরজীবী, সর্ব-শেষ ধন। কালোকোলো ছেলেগুলো ভাবতেও পারে নি যে একরত্তি সেই দুচোখওয়ালা একটা বীজ বাড়িটার ছায়ায় যেটা মাটিতে পুঁতেছিল তারা, জল দিত রোজ এমন শিকড় গাড়বে সেটা যে তাদের পরে, আর পেছনের যে বাড়িটা তাদের ছায়া যোগাত তাকেও ছেড়ে বেঁচে থেকে সে একদিন গোটা মানুষের বাগান আর বাগিচা বানিয়ে তুলবে; তারা নিজেরা বড় হবে, মৃত্যু হবে তাদের, তারও অর্ধ শতাব্দী পরে একটা ঘরছাড়া পথিককে আভাসে আত্মকথা শোনাবে—সেই প্রথম বারকার বসন্তে যেমনটি ছিল তেমনি সুন্দর ভাবে ফুটে সুগন্ধ ছড়িয়ে। এখনও আমার চোখে ভাসছে কোমল নিরীহ হাসিখুশি তাদের লাইলাক শোভা।

কিন্তু সেই ছোট পল্লীটার বৃহত্তর সত্তার বীজ সত্ত্বেও কেন পতন হ'ল তার আর কনকর্ড খাড়া রইল? প্রকৃতির দেওয়া সুযোগ ছিল না সেখানে—জলের সুবিধে, কথাটা কি সত্য? এই যে সুগভীর ওয়ালডেন পন্ড আর সুশীতল ব্রিস্টার স্প্রিং, মনপ্রাণ ভরে এদের বেশ খানিকটা জল পান করা তো ভাগ্যের ব্যাপার, লোকগুলো তো নিজেদের পানীয় মদ্যে জল মেশানো ছাড়া এদের ফেলেই রেখেছে। পানীয়পায়ী জাতের লোক হিসেবে সকলেই জানে তাদের। ঝুড়ি, আস্তাবলের ঝাড়ু, পাটি বোনা, ধান সেদ্ধ করা, কাপড় বোনা, মাটির বাসনকোসন—এসবের কারবার কি এখানে জেঁকে উঠতে পারত না? এই জংলা ভূমি কি গোলাপবাগ হ'তে পারত না? পূর্বপুরুষের জোতজমা অগণিত বংশধরেরা ভোগ করতে পারত না? আর কিছু না হ'ক এর অনুর্বর ভূমি নিম্নভূমির নিম্নগামিতার বিরুদ্ধে তো রক্ষাকবচ হ'তে পারত। ভাবলে দুঃখ হয়, এত মনুষ্য বাসিন্দার সামান্য স্মৃতির ছবিও কি প্রকৃতির বুকে শোভা বাড়াবার জন্য নেই আজ! হয়তো বা প্রকৃতি আবারও চেষ্টা করবেন, আর আমিই হব তার প্রাথমিক পুরজন। তখন গত বসন্তে তৈরি আমার এই আস্তানাটা সেই ছোট পল্লীর সর্বজ্যেষ্ঠ হিসেবে গণ্য হবে।

আমি যেখানটায় আড্ডা গেড়েছি, আগে সেখানে কোন লোক ঘর তুলেছিল বলে আমার জানা নেই। মাল-মশলা মানেই যেখানে ধ্বংসস্তূপ, বাগান মানে শ্মশান, তেমন পুরনো শহরের ঘাড়ের উপর গড়া নয়া পত্তন থেকে রক্ষা কর বাপু। মাটিও সেখানে পুয়ে খাওয়া, ভূতে পাওয়া, তেমন

কিছু ঘটার আগে পৃথিবী রসাতলে যাবে। স্মৃতির ছবি দিয়ে বনকে লোকজনে ভরে তুলে নিজেকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এই সময়টায় কদাচিৎ কেউ আমার অতিথি হয়েছেন। বরফ যখন জমে গিয়ে বেশ পুরু হ'ত তখন এক নাগাড়ে হপ্তা খানেক কি একপক্ষ কাল আমার আস্তানার কাছে আসবার সাহসই পেয়ে উঠতেন না কোন পথচারী। আমি কিন্তু বেশ আরামেই কাটিয়ে দিতাম, মেঠো ইঁদুর কি গরু-ভেড়ার মতো। এদের সম্বন্ধে শোনা যায় দুর্ঘটনায় মাটি চাপা পড়েও, এমন কি অনাহারে থেকেও অনেক দিন বাঁচতে পারে এরা। কিংবা এই অঞ্চলের সাটন শহরের সেই প্রথম ঔপনিবেশিকদের এক পরিবারের কথা যেমন শোনা যায়। ১৭১৭ সালের দারুণ তুষার পাতের সময় তাদের বাড়িটা একেবারে ঢাকা পড়ে যায়, গৃহকর্তা তখন বাড়িতে ছিলেন না। তারপর, বরফের গাদার মধ্যে থেকে বাড়িটার চিমনির নিঃশ্বাসে খোঁদল হ'তে দেখে জনৈক ইন্ডিয়ান বাড়িটার হদিস পায়, পরিবারটা উদ্ধার হয়। কিন্তু কোন ইন্ডিয়ান বান্ধবও আমার সম্পর্কে মাথা ঘামান নি। আর তার দরকারও ছিল না। গৃহকর্তা তো হাজিরই ছিল। দি গ্রেট স্নো, দারুণ তুষারপাত শুনতে সুন্দর লাগে। কিন্তু তখন চাষীরা পর্যন্ত বন কি জলা অবধি এসে উঠতে পারে নি, ঘোড়া বলদ হাঁকিয়েও, তাদের বাড়ির সামনের ছায়াতরু সব কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছে তারা। পরে বরফ যখন আরও শক্ত হয়েছে, তখন জলার গাছপালার মুণ্ডচ্ছেদ করেছে। বসন্তকালে দেখা গেছে, মাটি থেকে সেগুলো দশ ফুট উঁচুতে।

জবর রকম বরফের সময়ে বড় রাস্তা থেকে যে আধ মাইল টাক লম্বা মেঠো পথটা ধরে আমার আস্তানায় ফিরতাম, সেটাকে একটা আঁকাবাঁকা ফুটকি ফুটকি লাইন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, এ ফুটকি থেকে সে ফুটকির মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক। হপ্তাখানেক যখন ভাল আবহাওয়া গেছে এর মধ্যে, আমার যাতায়াত করতে বারবারই গুণতিতে ঠিক সমান, আর সমান মাপের পদক্ষেপ লেগেছে। আমার নিজেরই দৃঢ় পায়ের চিহ্নের উপর যেন কোন সংকল্প নিয়ে একজোড়া কম্পাসের নিশ্চয়তার সঙ্গে পদক্ষেপ করে চলেছি—কি একঘেয়েমির মধ্যেই না শীত ঠেলে ফেলে আমাদের। তবু প্রায়ই সেগুলো আকাশের নিজস্ব নীলিমায় ভরাট হয়ে গেছে। কিন্তু কোন জলহাওয়াই আমার বেড়ানোর কি বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে মারাত্মক কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে নি। আমি সব সময়েই খুব বরফ ভেঙেও আট দশ মাইল ঠেঙিয়ে একটা বিচ গাছের, কি ইয়েলো বার্চের, কি পাইন গাছগুলোর জানা-শোনা কারও সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে বেরোতাম। তুষার আর বরফের ভারে তাদের হাত-পা নুয়ে পড়েছে তখন, মাথার দিকটা এত ছুঁচলো যে পাইন

গাছগুলো ফার গাছের চেহারা নিয়েছে; সর্বত্র দু ফুট পুরু বরফ তখন জমাট, আমি জলকাদা ভেঙে উঠছি সব চাইতে উঁচু পাহাড়টার চুড়োয়, প্রত্যেকটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথা ঝাঁকিয়ে আবার একটা তুষারঝঞ্ঝার ঠেলা সামলাতে হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে হাত দিয়ে হাঁটুর উপর ভর রেখে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কি গড়িয়ে গড়িয়েই চলেছি। শিকারীরাও তখন শীতাবাসে আশ্রয় নিয়েছেন। একদিন বিকেল বেলায়, ডোরাকাটা একটা পেঁচা (স্ট্রিক্স নেবুলোসা) একটা হোয়াইট পাইনের গুঁড়ির কাছটায় নিচুকার এক মরা ডালে ফুটফুটে দিনের আলোয় বসে আছে দেখে মজা লাগছে, আমি তার এক রডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। আমার নড়াচড়ায় পায়ের তলায় বরফ মচমচ করছে, শুনতে পাচ্ছে সে, কিন্তু আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। যখন খুব বেশি আওয়াজ হচ্ছে আমার, গলার পালকগুলো ফুলিয়ে গলাটা বাড়িয়ে চোখদুটো বড় বড় করে তাকিয়ে থাকছে। একটু পরেই আবার চোখের পাতা স্তিমিত হয়ে এল, মাথাটা দোলাতে লাগল সে। আধ ঘণ্টা ধরে তার দিকে চেয়ে থেকে আমিও কেমন তন্দ্রার আবেশ বোধ করলাম—ঠায় বসে আছে ওটা, চোখ দুটো বেরালের মতো আধবোঁজা, বেরালেরই যেন একটা ডানাওলা ভাই। চোখের পাতার মধ্যে ঈষৎ ফাঁক, তাই দিয়ে আমার সঙ্গে কেমন উপদ্বীপের মতো যোগ রক্ষা করে আছে। ঐ ভাবে ঐ আধবোঁজা চোখ দিয়ে তার স্বপ্নপুরী থেকে চেয়ে সে বুঝি বোঝবার চেষ্টা করছে আমাকে,— ঝাপসা কি একটা বস্তু না এককণা বালি, এটা কি তার দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে। বেশ কিছু পরে একটু কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম আমি, একটু বেশি শব্দ হ'ল, চকিত হয়ে ডালটার উপর আলস্যভরে খানিকটা নড়ে বসল, যেন স্বপ্নে বাধা ঘটায় অধৈর্য বোধ করছে। তারপর যখন পাইন গাছগুলোর মধ্যে পাখা ঝটপট করতে করতে ডানাদুটো অপ্রত্যাশিত রকমে চওড়া করে মেলে উড়ে দূরে চলে গেল, আমি তার এক ফোঁটা আওয়াজ পেলাম না। এই ভাবে কেমন একটা সূক্ষ্ম বোধ দিয়ে, চোখে দেখে ততটা নয়, আশপাশের পাইনের ডালপালাগুলো ঠাহর করে, যেন তার সংবেদনশীল ডানাদুটো দিয়েই সে তার আলো-আঁধারি পথ এঁচে নতুন একটা জিরোবার ঠাঁই খুঁজে পেতে নিলে, যাতে শান্তিতে সেখানে তার দিন সুরুর প্রতীক্ষায় থাকতে পারে।

রেলরাস্তার জন্য যে পাকা সড়কটা মাঠ ফেড়ে তৈরি হয়েছিল, তার উপর দিয়ে বেড়াতে গিয়ে দমকা কনকনে হাওয়ার অনেক অনেক ঝাপটার সামনে পড়তে হ'ত, আর কোথাও তো এত অবাধ চলাফেরা নয় তার। হিমকণা এসে যখন এক গালে আঘাত করছে, বিধর্মী হয়েও আমার আর একটা গাল তার কাছে এগিয়ে দিচ্ছি। ব্রিস্টার হিল থেকে গাড়িঘোড়ার যে রাস্তা, সেখানেও এর চাইতে ভাল হাল দাঁড়াত না। তখনও আমি শহরে যাতায়াত করি, যেন

সেখানকার ইণ্ডিয়ান বন্ধু-বান্ধবদের কেউ। ফলাও খোলা মাঠের মজুদ বরফ ওয়ালডেনের রাস্তার পাঁচিলের মধ্যে গাদা করে রাখা, আগেকার পথচারীর পায়ের দাগ মুছে ফেলার পক্ষে আধঘন্টা সময়ই সেখানে যথেষ্ট। যখন ফিরতাম, তখন আবার নতুন পুঁজি জমে গেছে, তার মধ্যে দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে পথ করে চলতাম রাস্তার একটা তেরছা বাঁকের ওদিকটায়, ব্যস্তসমস্ত উত্তর-পূবে হাওয়া গুঁড়ো বরফ ঢেলে চলেছে। একটা খরগোসের পায়ের দাগও নেই, এমন কি মেঠো ইঁদুরের ক্ষুদে অক্ষরের মিহি ছাপ পর্যন্ত নজরে পড়ে না। তবু ভরা শীতের মধ্যেও দেখেছি, দলদলে ডগমগ জলা, সেখানে ঘাস কি অতি বাজে কোন বুনো গাছ কি পাতা তার চিরহরিৎ শোভা নিয়ে ফুটে আছে, কি হয়তো বা কোন দড় গোছের পাখি বসন্তকাল ফেরার প্রতীক্ষায় আছে—এ সব দেখি নি এমনটা কদাচিৎ ঘটেছে।

কোন কোন দিন বরফ পড়া সত্ত্বেও, সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফিরে আসার সময় আমার দোরের সামনের পথে কোন কাঠুরের পায়ের গভীর দাগ পেরিয়ে এসে দেখেছি, আমার চুল্লীর পাশে তার কুচো কাঠ রেখে গেছে সে, তার খাওয়া তামাকের গন্ধে ঘর ভরে আছে। অথবা কোন রবিবারে বাড়িতেই রয়ে গেছি হয়তো, বরফ মাড়িয়ে চলার মচমচ আওয়াজ কানে এল, বিচক্ষণ সেই কিষাণজীর পায়ের শব্দ। বন-বাদাড় ভেঙে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে আমার আস্তানার খোঁজে আসতেন, মজলিশী দুই একটা চুটকি কথাবার্তা বলার বাসনায়। তাঁর পেশার লোকজনের মধ্যে যাঁরা নিজেরা ক্ষেতে কাজ করেন, সেই মুষ্টিমেয়ের তিনি একজন। প্রফেসরের মতো গাউন ঝুলিয়ে থাকেন না, আঁটসাঁট কুর্তা পরেন। যেমন তাঁর খামারবাড়ির উঠন থেকে গাদা করা সার বইতে, তেমনি ধর্ম কি রাষ্ট্র থেকে মর্মাংশটুকু নিতে উদ্‌গ্রীব। যখন লোকজন এই রকম ঠাণ্ডা চাঙ্গা আবহাওয়ায় বিরাট আগুন জ্বালিয়ে মাথা সাফ রেখে তার চারপাশ গুলজার রাখত, সেই কাঠখোট্টা সাদাসিধে সে আমল নিয়ে কথাবার্তা হ'ত দুজনার। যখন অন্য কোন খাবার-দাবার জুটত না আমাদের, ধুরন্ধর কাঠবিড়ালরা যে সব বাদাম অনেকদিন আগে ফেলে গেছে, সেইগুলোই চিবোবার চেষ্টা করা যেত। খোসা যার খুব ডাঁটো, সচরাচর শূন্যসার হতে দেখা যায় তাকেই।

যত দুর্দান্ত বরফ পড়ুক, যত দারুণ ঝড় হ'ক, সব চাইতে দূর থেকে আমার আস্তানায় এসে ঠিক জুটতেন যিনি, তিনি কবি। চাষী, শিকারী, সেপাই, খবরের কাগজের লোক, এমন কি দার্শনিক পর্যন্ত দমতে পারেন, কিন্তু কবিকে কোনকিছুই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তাঁকে যে দম যোগায় খাঁটি প্রেম। আগে থাকতে কে বলবে, কখন তিনি আসবেন, কখন যাবেন। তাঁর কারবার যে সব সময়েই বাইরে ডাকছে তাঁকে। ডাক্তারও তখন ঘুমিয়ে

থাকেন। সেই ছোট বাড়িটা আমাদের হৈ-হল্লার ঝংকারে গম গম করত, সঙ্গে অনেক গম্ভীর আলাপ-গুঞ্জনের মিড়—ওয়ালডেন অঞ্চলের সুদীর্ঘ নীরবতার খেসারত জুটত। ব্রডওয়েকে তুলনায় তখন চুপচাপ আর বিজন ঠেকত। খানিক খানিক বিরামের ফাঁকে হাসির হুল্লোড় চলছে তালে তালে, যে হাসিঠাট্টাটা সাঙ্গ হ'ল কি হবে, তার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই তার। জীবন সম্বন্ধে অনেক "হাতে-গরম" মীমাংসাই করে ফেলতাম আমরা, সামনে শুধু একপাত্র মাড় নিয়ে—এর দুটো সুবিধে—পানভোজনের আমোদও পাওয়া যায়, মাথাটাও পরিষ্কার থাকে, দর্শনের জন্য যা নিতান্ত দরকার।

ভুলে যাওয়া ঠিক নয়, এই হ্রদে থাকার সময়ে শেষবার শীতে আমার আর একজন মনের মতো অতিথি আসা যাওয়া করতেন, একবার গ্রাম পার হয়ে বরফ বৃষ্টি অন্ধকার মাথায় নিয়ে আমার আস্তানার আলো গাছের ফাঁক দিয়ে দেখে সেখানে আসেন। এসে বেশ খানিকক্ষণ ধরে শীতের ক'টা সন্ধ্যা কাটিয়েছেন আমার সঙ্গে। দার্শনিকদের অবশিষ্ট কয়েক জনের একজন—কনেকটিকাটের কাছ থেকে বিশ্বপৃথিবী পেয়েছে তাঁকে—প্রথমটায় সেখানকার মাল ফিরি করতেন; এখন করেন নিজেই বলেন, নিজের মস্তিষ্ক। এখনও তাই ফিরি করে চলেছেন, ভগবানকে মনে পড়িয়ে দেন, মানুষের ধিক্কার জাগে। পশরা থাকে শুধু নিজের মস্তিষ্ক, বাদামের যেমন থাকে শাঁস। আমার বিবে-চনায় বর্তমানে সব চাইতে আস্তিক্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি, তাঁর কথাবার্তায় ভাবভঙ্গীতে সব সময়েই চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে অন্য লোকের অগোচর একটা আশার আভাস থাকে, নিরবধি কালেও হতাশ না হওয়া লোকজনের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তিনি থাকবেন নিশ্চয়। বর্তমান নিয়ে তাঁর কারবার নয়। আজ কেউ তেমন পাত্তা না দিলেও, তাঁর দিন যখন আসবে আর যে সব বিধানের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রায় লোকেরই জ্ঞান নেই, সে সবের ফল যখন ফলবে, তাঁর নির্দেশের জন্য তখন পরিবারের প্রতিপালক আর রাষ্ট্রশাসকদের আসতেই হবে।

"অন্ধ এমনই আজ লোকে, প্রশান্তি পড়ে না ক' চোখে।"

মানুষের অকৃত্রিম বান্ধব; বোধহয় মানুষের একমাত্র উন্নতিকামী বান্ধব। লোকের মতো লোক, অমরলোকের লোকই বলি, মানুষের দেহে যে মূর্তি খোদাই করা হয়েছে, অক্লান্ত ধৈর্য আর বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে—নরাকার যাঁর বিকার, বিকলাঙ্গ স্মৃতি মাত্র, সেই নারায়ণকে—ফুটিয়ে তুলে চলেছেন। শিশুদের, কাঙালদের, পাগলদের, ছাত্রদের সবাইকে নিয়ে, সর্বাশ্রয়ী তাঁর মনস্বিতা, সকলের জন্যই তাঁর ভাবনা আর সবের সঙ্গে জুড়ে থাকে তাঁর হৃদয় আর শীলের কিছুটা। আমার ইচ্ছে হয় দুনিয়ার বড়রাস্তার উপর সব জাতির দার্শনিকরা এসে জমায়েত হতে পারে এমন কোন সরাইখানার ভার

নিয়ে বসুন তিনি, আর সেখানে সাইনবোর্ডে লেখা থাক "চিত্তরঞ্জন : মানুষের জন্য, তার পশুর জন্য নয়। যাঁদের অবসর আছে, যাঁদের মন ঠিক আছে, যাঁরা মনে প্রাণে সত্য পথ খুঁজছেন, তাঁরাই আসুন।" আমার সঙ্গে যাঁদের জানাশোনা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সব চাইতে সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি, সব চাইতে বিটলেমি তাঁর কম, এখনও যা তখনও তাই। আগে কত দিন দুজনে ঘুরে বেড়িয়েছি, কত কথা হয়েছে, দুনিয়াকে একদম ভুলে গেছি। কোন সমিতির ধার ধারেন না তিনি, জন্ম-স্বাধীন, মুক্ত পুরুষ। দুজনে যেদিকেই গেছি, মনে হয়েছে স্বর্গে আর মর্ত্যে মিলন ঘটেছে, তিনি যে মর্ত্যদৃশ্যের চেহারা ফিরিয়ে দেন। নীল রঙের পোষাক তাঁর পরনে, তাঁর প্রশান্তির প্রতিরূপ আসমানের ঐ খিলানের মতো বাঁকা ছাদের তলাই তাঁর শ্রেষ্ঠ ঠাঁই। ভাবতেই পারি নে যে তাঁর মৃত্যু হতে পারে, প্রকৃতি তো তাঁর বিচ্ছেদ সইবেন না।

দুজনেরই বেশ খটখটে ফালি-করা ভাবগুলো, বসে বসে কুটি কুটি করে কাটতাম সেগুলো আর পার্মাকিন পাইনের তকতকে সোনালী শাঁসে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। এত সন্তর্পণে আর শ্রদ্ধার সঙ্গে দুজনে কাদা ভেঙে চলছি, কি দুজনে মিলে এত আলগোছে ছিপ টানছি যে ভাবরূপী মাছগুলো জলের তোড়ে পালিয়ে যায় নি, কি পাড়ে কোন মৎস্যশিকারী আছে বলে ভয় খায় নি, আস্তে আস্তেই চলাফেরা করেছে তারা, যেন পশ্চিমের আকাশে মেঘেরা ভেসে চলেছে, ঝিনুকের মতো দেখতে সব, মধ্যে মধ্যে দল পাকায় আবার মিলিয়ে যায়। কাজ করেছি আমরা তখন, পুরাণ সংস্কার করেছি, এখান থেকে কি সেখান থেকে নিয়ে এক একটা কাহিনী জোড়াতালি দিয়েছি, মাটিতে যার ভিত গাড়া চলে না শূন্যে সেই ইমারত গড়েছি। মহান দ্রষ্টা, মহান শুভদর্শী তিনি, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা কওয়া নিউ ইংলণ্ডের যে কোন রাতের উৎসবের মতো উৎসব। বনবাসী, দার্শনিক আর সে আমলের ঔপনিবেশিক যাঁর কথা বলেছি, আমাদের এই তিন জনে কত রকম আলোচনাই যে হয়েছে—আমার ছোট ঘর বড় করে তুলেছে, তোলপাড় করে গেছে তা। প্রতি ইঞ্চি বৃত্তের চাপের ওজন চারপাশের উপরে কতখানি করে বেড়েছিল, বলার দুঃসাহস নেই আমার। জোড় ফুটো হয়ে গেছে তার। ফলে ছ্যাঁদা বন্ধ করে তাকে কাজ-চলা গোছ করে নিতে বেশ নীরস লেগেছে। কিন্তু সেজন্য যে পুরনো কাছির ফেঁসোর দরকার, তার তো যথেষ্ট পুঁতিরই যোগাড় রাখতাম আমি।

গ্রামে আরও একজন ছিলেন, তাঁর আস্তানায় দীর্ঘকাল মনে রাখার মতো জমাটি মজলিসও হয়েছে আমার। মধ্যে মধ্যে তিনিও আমার সঙ্গে

দেখা করতে এসেছেন। এছাড়া আমার মেশার মতো সেখানে আর কেউই ছিল না।

যেমন অন্যত্র, সেখানেও মধ্যে মধ্যে আমি সেই চির-অনাগত অতিথি-রাজের প্রতীক্ষায় থেকেছি। বিষ্ণুপুরাণ বলছে, "সন্ধ্যায় যতক্ষণ গরু দোওয়া শেষ না হবে, গৃহস্থ অতিথি আসবার প্রতীক্ষায় তাঁর আঙিনায় অপেক্ষা করবেন, ইচ্ছে হ'লে আরও বেশি অপেক্ষা করবেন।" প্রায়ই আতিথেয়তার এ কর্তব্য আমি পালন করেছি। এক গোয়াল গরু দুইতে যে সময় লাগতে পারে, ততক্ষণ প্রতীক্ষায় থেকেছি আমি, কিন্তু শহর থেকে কোন লোককেই আসতে দেখি নি।

॥ ১৫ ॥ শীতের জীবজন্তু

জলাশয়গুলো যখন জমে শক্ত কাঠ হয়ে গেছে, তখন তাদের উপর দিয়ে অনেক জায়গায় যাবার নতুন নতুন কম দূরের পথের সুবিধা হ'ত। কেবল তাই নয়, সেগুলোর উপর থেকে চারপাশের পরিচিত ভূদৃশ্যের নতুন নতুন শোভা নজরে পড়ত। ফ্লিন্ট পন্ড বরফে ঢেকে যাবার পর যখন পার হতাম, তখন তার উপরে আগে এতবার ডিঙি চালিয়ে যাওয়া আর স্কেট করা সত্ত্বেও এমন আশাতীত চওড়া আর অদ্ভুত লাগত তাকে যে ব্যাফিন উপসাগর ছাড়া কিছুর কথাই মনে করতে পারতাম না। অনেকটা জায়গা জুড়ে সামনে বরফ, তার একেবারে শেষ দিকটায় আমার চারপাশ ঘিরে লিংকন পাহাড় মাথা খাড়া করে রয়েছে, মনেও হ'ত না কোনদিন এর আগে সেখানে দাঁড়িয়েছি; অন্তহীন দূরে বরফের উপর জেলেরা তাদের নেকড়ে বাঘের মতো কুকুরগুলো সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাফেরা করে বেড়াচ্ছে, সীল সন্ধানী কি এস্কিমো বলে ঠেকছে তাদের। কিংবা আবছা আলোয় কোন রূপকথার প্রাণীরা দিগন্তে বুঝি হানা দিয়েছে, বুঝতে পারছি নে তারা দানব না বামন জাতের। লিংকনে সন্ধ্যা বেলায় বক্তৃতা দিতে গেলে এই পথ ধরে যেতাম, আমার আস্তানা থেকে বক্তৃতামণ্ডপ পর্যন্ত যেতে কোন রাস্তা মাড়াতে হ'ত না, আশে পাশে কোন বাড়ি পড়ত না। পথে গুজ পন্ড পড়ত, সেখানে একপাল মাস্করয়াট উপনিবেশ গেড়ে বরফের উপর অনেকটা উঁচুতে তাদের খোপ খাড়া করেছিল; তার পাশ দিয়ে যাবার সময় কিন্তু একটাকেও বাইরে দেখতে পেতাম না। অন্য সব পুকুরের মতোই ওয়ালডেনে সচরাচর বরফ জমত না, জমলেও খুব কম, এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া করে ছড়ানো। কিন্তু অন্য জায়গার মতো এখানে যখন প্রায় দুফুট উঁচু বরফ জমত, গাঁয়ের লোকরা নিজেদের রাস্তাটুকুর মধ্যে বন্দী, ওয়ালডেন তখন আমার বেড়াবার জায়গা হ'ত, হাত-পা মেলে সেখানে ঘুরতে পারতাম। সেখানে, গাঁয়ের রাস্তা থেকে অনেকটা দূরে, খুব পরপর ছাড়া শ্লেজগাড়ির ঠঙ ঠঙ আওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছায় না, আমি সড়সড়িয়ে চলছি, স্কেট করছি, যেন হরিণদের চলাচলে সমান হওয়া এদিক ওদিক জোড়া চওড়া একটা চরবার মাঠ তাদের, মাথার উপর ওক গাছের জঙ্গল আর ভারিক্কি পাইন

গাছের সার, বরফের ভারে নুয়ে পড়েছে, বিন্দু বিন্দু ফোটা বরফে চকচক করছে।

শীতকালের রাত্রে, শীতকালের দিনেও প্রায় তাই, শব্দ বলতে শুনতে পেতাম অনেক অনেক দূরে পেঁচার ডাক, উদাস কিন্তু সুরেলা; জুতমতো মেজরাপের ঘা দিলে এই বরফজমা মাটির বুক থেকে যে সুর শোনা যাবে, তাই—ওয়ালডেন বনের নিজস্ব মাতৃভাষা, এতদিন পরে যার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছে; কিন্তু ডাকত যখন পাখিটাকে তখন কোনদিন দেখতে পাই নি। শীতকালের সন্ধ্যায় দোর খুললেই এর ডাক শুনি নি, এমন কদাচিৎ ঘটেছে: ঝংকার দিয়ে উঠল, হেঃ হেঃ হেরর্ হে, আগের তিনটে পর্দায় জোর দিয়ে যেন জানতে চাইছে, কেমন কাটছে; কি শুধুই হে হে। শীতের আরম্ভে একরাত্রে পুষ্করিণীর বুকে তখনও বরফ জমাট বাঁধে নি, ন'টার সময় একটা রাজহাঁসের জোর প্যাঁক প্যাঁক শুনে সচকিত হয়ে উঠলাম, দরজায় পা দিতেই দেখি আমার বাড়িটার উপর দিয়ে উড়ে চলেছে সব, তাদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ শুনতে পেলাম, বনে যেন ঝড় উঠেছে। পুকুরটার উপর দিয়ে ফেয়ার হ্যাভ্নের দিকে উড়ে গেল তারা, মনে হ'ল আমার আলো দেখেই এখানে ছাউনি ফেলতে ভরসা পায় নি। তাদের পাণ্ডা নিরন্তর প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ করে চলেছে তালে তালে। হঠাৎ আমার খুব কাছ থেকেই, একটা বেরালপেঁচাই নিশ্চয়, বনচরদের যত রকম আওয়াজ জীবনে শুনেছি তাদের সব চাইতে কর্কশ আর নিদারুণ গলা করে রাজহাঁসদের দুয়ো দিতে লেগে গেল, একেবারে তালে তাল রেখে। যেন পণ করেছে যে নিজেদের ভাষায় গলাবাজির কারদানি আর জোর শুনিয়ে সে এই হাডসন উপসাগরের অনধিকারীর হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চায়, তার মুখে চুনকালি দিতে চায়, ধ্যেৎ ধ্যেৎ করে তাকে কনকর্ডের ত্রিসীমানা থেকে ভাগাতে চায়। আমার নামে উচ্ছুগ্যু করা রাতকালের এই প্রহরটায় দুর্গে হুম্‌কি দেওয়ার মধ্যে মতলবটা কি হ্যা! মনে ভাব বুঝি এ সময়টাতেও কখনও আমাকে ঘুমন্ত দেখতে পাবে! তোমার মতোই ফুসফুস নেই আমার, স্বরযন্ত্র নেই! দুয়ো, দুয়ো, দুয়ো। রোমহর্ষক যত বিদঘুটে আওয়াজ এ পর্যন্ত কানে শুনেছি, তার একটা বটে এ। কিন্তু তবু যার কান তৈরি হয়েছে, এর মধ্যেও সারিগামের যে আলাপ তার কানে বাজবে, এ তল্লাটে তার দেখাশোনা ঘটে না।

জলাশয়ে ধুপ ধুপ করে বরফ পড়ছে, কানে আসছে। কনকর্ডের এ পাড়ায় আমার অন্তরঙ্গ শয়নসঙ্গী এ। যেন শয্যাকন্টক হয়েছে তার, এ পাশ ফিরলে যদি ভাল লাগে, বদহজমে দুঃস্বপ্ন দেখে কষ্ট পাচ্ছে; কি হিম পড়ে মাটি মচমচ করার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠলাম, বুঝি কেউ ঘোড়াটোড়া

হাঁকিয়ে আমার দরজার সামনে দিয়ে চলে গেল; সকাল বেলায় দেখলাম মাটির উপরে সিকি মাইল লম্বা, একের তিন ইঞ্চি চওড়া এক ফাটল।

কখনও কখনও আওয়াজ পেতাম, জ্যোৎস্না রাত্রে খেঁকশেয়ালরা সার বেঁধে জমাট বরফের উপর দিয়ে পায়রা কি আর কোন শিকারের খোঁজে চলেছে; বনের কুকুরদের মতো কাটকাট রাক্ষুসে রব তুলে, যেন কোন দুশ্চিন্তা ওদের উপর ভর করেছে, কিছু বুঝি বলতে চায়, আলো খুঁজছে, পুরোদস্তুর কুকুরই বুঝি বনে যেতে চায়, রাস্তায় হাত-পা মেলে ছুটোছুটি করে বেড়াতে ইচ্ছে হয়েছে। যুগযুগান্তের হিসেব ধরলে মানুষের মধ্যেও যেমন পশুদের মধ্যেও তেমনি সভ্যতার সাধনা চলেছে বলে মনে হয় না? আমার মনে হ'ল ওরা সব আদিম গুহাশ্রয়ী মানুষ, এখনও আত্মরক্ষা করে চলেছে, কিন্তু রূপান্তরের অপেক্ষা মাত্র। মধ্যে মধ্যে এদেরই কেউ আলোর মোহে আমার জানালার কাছে আসত, আমার উদ্দেশ্যে খ্যাঁক খ্যাঁক করে শেয়াল-মার্কা গালিগালাজ করত, খানিক পরে পিছপাও হয়ে পালাত।

সচরাচর রাঙা-কাঠবিড়ালই (স্কিউরাস হাডসনিয়াস) সকালে ছাদের উপর চড়ে কি বাড়ির দেয়াল বয়ে ওঠানামা করে আমার ঘুম ভাঙাত, যেন সেই মতলব করেই কেউ বন থেকে পাঠাত তাদের। শীতের সময়টাতে, আমার দোরের পাশে জমাট বরফের উপর আধ বুশেল মিষ্টি ভুট্টার শীষ ছড়িয়ে রেখেছিলাম—সেগুলো পাকে নি। যে সব বিচিত্র জন্তু এগুলোর লোভে এসে জুটত, তাদের রকম-সকম দেখলেই মজা লাগত। সন্ধ্যার দিকে আর রাত্রে ঠিক নিয়মিত সময়ে খরগোসগুলো এসে জুটত, দিব্যি পেট পুরে খেয়েও যেত। সারাদিন ধরে রাঙা-কাঠবিড়ালগুলো আসত যেত, ফন্দিফিকির সব দেখিয়ে আমার মজার খোরাক যোগাত। একজন এলেন প্রথম দিকটায় অতি সন্তর্পণে শ্রাবওকের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে তাল তাল জমাট বরফের উপর হাওয়ায় ওড়া পাতার মতো, একটু একটু করে দৌড়িয়ে, আশ্চর্য রকম জোরে, আর উৎসাহ অপব্যয় করে। এই কয়েক পা এগিয়ে এদিকে এল, একেবারে হন্তদন্ত হয়ে এমন কদমে ছুটে যে বিশ্বাস করাই শক্ত—বুঝি বাজি ফেলেছে; তারপরই আবার ওদিকে ঠিক সেই কয় পা এগিয়ে গেল, কিন্তু একবারে কখনও আধ রডের বেশি এগুবে না; অতঃপর হঠাৎ একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করে আর অকারণ একটা ডিগবাজি দিয়ে থেমে গেল, যেন দুনিয়ার যত চোখ সব তার দিকেই ঠায় চেয়ে আছে—কাঠবিড়ালদের সব ভাবভঙ্গিই বনের একেবারে এক কোণে হলেও এমন যেন চারপাশ থেকে দর্শকরা দেখছে তাকে, যেমন লোকে বাইজির নাচ দেখতে আসে—খুটখুট করে আর খুঁতখুঁতি নিয়েই এত সময় কাটায় যে তার অনেক কম সময়ে সমস্তটা জায়গা ঘুরে আসার পক্ষে যথেষ্ট—একটাকেও কোন দিন হেঁটে

চলতে দেখি নি আমি—আবার তার পরপরই হঠাৎ মুখের কথা খসতে না খসতেই কচি পিচ পাইন গাছটার একেবারের মগডালে গিয়ে উঠে বসে অদৃশ্য সব দর্শকদের মুণ্ডপাত করতে করতে দম নিতে লেগেছে, একই সঙ্গে স্বগতোক্তি আর সারা দুনিয়াকে বক্তৃতা দেওয়া চলেছে, কিন্তু কেন যে তা কখনও আঁচতে পারি নি আমি, সে নিজেও পেরেছে কি না আমার সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত ভুট্টা অবধি এসে পেঁছুল সে, আর ভালমতো একটা শীষ বেছে নিয়ে আমার কাঠের গাদার সব উপরের লকড়িটাকে তাগ করে তার সেই অনিশ্চিত ত্রিকোণমিতিক ভঙ্গিতে সেখানে তুড়ুক করে গিয়ে উঠে বসল, আমার জানালার সামনেই সেটা, সেখানে উঠে আমার দিকে প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে থাকল; ঘন্টার পর ঘন্টা বসেই আছে, মধ্যে মধ্যে এক একটা নতুন শীষ যোগাড় করে নিয়ে যাচ্ছে, প্রথমটায় বেশ পেটুকের মতো সেটাকে ঠুকরে আধ-খাওয়া খোলাগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলছে। অনেক পরে এক সময়ে সে আরও যেন শৌখীন হয়ে উঠে কেবল তার খাবার নিয়ে খেলাই করতে থাকল, শুধু শাঁষের ভিতরটাই চেখে দেখছে, আর যে শীষটাকে এতক্ষণ একটা থাবা দিয়ে লকড়িটার উপর কোনক্রমে টাল সামলে ধরে রেখেছিল, সেটা তার মুঠো আলগা পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল; তখন তার সেই অনিশ্চিত বিশ্রী ভঙ্গি করে সেটার দিকে চেয়ে দেখল সে, যেন ভাবছে ওটার কি প্রাণ আছে, মনটা ঠিক করতে পারছে না ওটাই আবার কুড়িয়ে নেবে, না নতুন একটা নিয়ে আসবে, না চলেই যাবে। এই শীষ নিয়ে ভাবে, তার পরই কান পেতে শোনে হাওয়ায় কি বলে। এই রকম করে একটা বিকালের মধ্যেই বেঁটে বজ্জাতটা কত যে দানা ফেলাছড়া করল। শেষে নিজের চাইতে বড় লম্বা চওড়া একটা শীষ কায়দা করে টাল সামলে বাগিয়ে ধরে বনের দিকে পাড়ি দিল, যেন মোষ কাঁধে একটা বাঘ, ঠিক তেমনি আঁকাবাঁকা পথে চলেছে আর মধ্যে মধ্যেই থেমে থাকছে, নিজে ঘষড়াতে ঘষড়াতে চলেছে, ওটাও সঙ্গে, কত যেন ভারি ওর পক্ষে; পড়ছে হরবকত, ঠিক লম্ব আর অনুভূমিকের মাঝখানটিতে কোনাকুনি করে ওটাকে নিয়েই পড়ছে, যে করেই হ'ক নিয়ে যাবেই ওটাকে পণ করেছে—অতিমাত্রায় ফাজিল আর গোঁয়ার একটা জীব। এই ভাবে টেনে টুনে নিয়ে উঠল গিয়ে যেখানে থাকে, হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ রড দূরে একটা পাইন গাছের ডগাতেই নিয়ে তুলল, পরে দেখলাম খোলাগুলো বনের সর্বত্র ছড়ানো।

অবশেষে দাঁড়কাকরা এসে জুটলেন; অনেক আগে থাকতেই একের আট মাইল দূর থেকে যখন ধীরে সুস্থে এ দিক পানে ধাওয়া করেছে, তাদের বেসুরো চিৎকার শোনা গিয়েছিল। একটা চোরচোর ছ্যাঁচড়ছ্যাঁচড় ভাব, গাছ থেকে গাছে তিড়িং বিড়িং করে ক্রমে ক্রমে এগোচ্ছে, আর কাঠ-

বিড়ালরা যে বাদাম ফেলাছড়া করে গেছে, সেগুলো কুড়োচ্ছে। তারপর, একটা পিচ পাইনের ডালে গিয়ে বসে নিজের গলার ফুটোর পক্ষে বেশ বড় একটা বাদাম যেই গিলতে যাওয়া অমনি সেটার গলায় আটকানো, সুকঠিন চেষ্টার পর সেটা গলা থেকে বার করল, আর একঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তি করল চঞ্চু দিয়ে বার বার ঠুকে ঠুকে সেটা ফাটাতে। স্পষ্টাস্পষ্টিই চোর এগুলো, আর আমার বিশেষ শ্রদ্ধাও নেই এদের সম্বন্ধে। কিন্তু কাঠ-বিড়ালগুলো প্রথমটায় একটু সংকোচ দেখালেও এমন কাজের রকম তাদের, যেন যা কিছু আত্মসাৎ করছে, সবই তাদের।

ইতিমধ্যে চিকাডিরাও ঝাঁক ধরে এসে গেছে, কাঠবিড়ালরা যে সব টুকরোটাকরা ফেলে গিয়েছিল, সে গুলো কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে কাছাকাছি যে ডাল পেল, সেখানে উড়ে গিয়ে বসল; তারপর সেগুলো তাদের নখরের তলায় চেপে ধরে যতক্ষণ না সেগুলো তাদের কণ্ঠনালীর ভিতর ঢুকবার মতো ছোট হ'ল, ততক্ষণ ছোট ছোট চঞ্চু দিয়ে ঠুকতে থাকল তাদের, যেন গাছের ছালের মধ্যে পোকা সেগুলো। এই চটককুলের ছোট একটা ঝাঁক রোজই এসে জমত—আমার কাঠগাদা থেকে খাবারের যোগাড়ে, কি আমার দোরের পাশে যে সব কুটোকাটা পড়ে থাকত, তাই খেতে, ঘাসের মধ্যে বরফ কণা পড়ার রিমঝিম সুরের মতো, ক্ষীণ ফুস ফাস আওয়াজ করতে করতে, কি উল্লাসে দে-দৈ সোর তুলে; কি তেমন বসন্তের মতো দিনে খুব কদা-চিৎ বন থেকে এসে জুটত ফি-বি আওয়াজ তুলে। আমাকে ওরা এমন চিনে গিয়েছিল যে, আমি হাত বোঝাই কাঠ নিয়ে যাচ্ছি, একটা এসে তার উপর উঠে বসে নির্ভয়ে লকড়িগুলো ঠোকরাতে থাকত। একবার তো একটা চড়ুই পাখি আমার কাঁধের উপর এসে কিছুক্ষণের জন্য বসেই রইল, আমি তখন গাঁয়ের এক বাগানে খুরপি চালাচ্ছি। যে কোন সম্মানের স্কন্ধ-সজ্জা পরার তুলনায় এই ব্যাপারে আমি বেশি গৌরব বোধ করেছিলাম। কাঠ-বিড়ালগুলোও শেষে আমাকে বেশ আপনার মতো করে নেয়, এক এক সময় তাদের পথ লাঘব করতে আমার জুতোর উপর দিয়েই চলে যেত।

সবটা জায়গা যখন একেবারে বরফে ঢাকা পড়ে নি, কি আবার শীতের শেষ দিকটায় বরফ যখন আমার দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের গা আর কাঠগাদা থেকে গলে গেছে, পারাবতকুল বন থেকে বেরিয়ে এলেন, সকাল বিকাল সেখানে তাঁরা খানা খান। বনের যেদিকেই যাই, দেখি পায়রারা ডানা ফরফর করতে করতে সেদিক থেকেই পালায় আর উঁচু ডাল আর শুকনো পাতা থেকে তাদের ঝাঁকুনিতে বরফ ঝরে পড়ে, সূর্যের কিরণ বেয়ে স্বর্ণরেণুর মতো ঝুর ঝুর করে ঝরতে থাকে সব। শীতে ঘাবড়াবার পাত্র নয় এই বেপরোয়া বিহঙ্গটি। উড়ো বরফগুঁড়োয় প্রায়ই চাপা পড়ে যায় এরা।

শোনা যায়, কখনও কখনও ডানামেলা অবস্থাতেই তুলতুলে বরফের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে, সেখানে দু এক দিন গাঢাকা দিয়েও থেকে যায়।” বুনো আপেল গাছগুলোয় বউল ধরার মতো তারা বন থেকে সূর্যাস্তের সময় বেরিয়ে আসত আর আমি সেই ফাঁকা মাঠেও তাদের চমকে দিয়েছি। বিশেষ বিশেষ গাছে, রোজ সন্ধ্যায় গতিবিধি আছে এদের, সেই সব জায়গায় গিয়ে ধূর্ত শিকারী ওত পেতে থাকে এদের জন্য। বনের পরই দূরের ফলবাগিচাগুলোর এর ফলে কম অনিষ্ট হয় না। কিন্তু যে ভাবেই হ'ক, পায়রাগুলোর যে খাবার জুটছে, এতেই আমি খুশি। বউল খেয়ে থাকে, সামান্য জলেই চলে যায়—প্রকৃতির ঘরের পাখি এ।

শীতকালে সকাল বেলার অন্ধকারে কি সংক্ষিপ্ত বিকাল বেলার দিকে মধ্যে মধ্যে শুনতে পেতাম, হল্লা করে এক পাল কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে শিকারের খোঁজে বনের এদিক ওদিক ফুঁড়ে ছুটেছে, শিকারের সহজাত প্রবৃত্তি চাপতে পারছে না, আর থেকে থেকে শিকারীর শিঙার ফুঁ থেকে বোঝা যাচ্ছে, পিছনে মানুষ আসছে। বন কাঁপিয়ে আবার শিঙার আওয়াজ হ'ল, কিন্তু জলাশয়ের মসৃণ খোলা বুকে না ছুটে বেরোল কোন খেঁকশেয়াল, না দেখা গেল কোন শিকারীর পিছনে দৌড়িয়ে আসতে কুকুরের পালকে। একেবারে সন্ধ্যার দিকে হয়তো দেখতে পেলাম শিকারীরা ফিরছে, সরাইখানার খোঁজ নিচ্ছে তারা, আর তাদের শ্লেজগাড়ির পিছনে ঝুলছে বিজয়চিহ্ন হিসেবে একটা খেঁকশেয়ালের পুচ্ছ। লোকের কাছে শুনেছি, বরফজমা মাটির তলায় লুকিয়ে থাকাই খেঁকশেয়ালের পক্ষে নিরাপদ, আর সে যদি সোজা লাইন বরাবর ছুটতে পারে কোন শিকারী কুকুরই তাকে ধরতে পারে না। যারা ধাওয়া করেছে, তাদের বেশ খানিকটা পিছনে ফেলে আসতে পেরে কান খাড়া করে তাদের আসা পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নেয়, তারপর আবার দৌড় লাগিয়ে ঘুরে ফিরে গিয়ে ওঠে নিজের পুরনো গর্তে, সেখানেই শিকারীরা তার অপেক্ষায় থাকে। মধ্যে মধ্যে কিন্তু কয়েক রড ধরে কোন পাঁচিলের উপর দিয়েই দৌড়োতে থাকে, আর এক সময়ে খুব খানিকটা লাফ দিয়ে ওদিকে নেমে পড়ে। মনে হয় ওরা জানে জলের মধ্যে ওদের গন্ধ থাকে না। এক শিকারী আমাকে বলেছিলেন, একটা খেঁকশেয়াল একবার কুকুরের তাড়া খেয়ে ওয়ালডেনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অল্প অল্প জলের ডোবার নিচে বরফ তখন চাপা পড়ে গেছে, তাই খানিকটা দূর গিয়েই তাকে আবার তীরেই ফিরে আসতে হয়। একটু পরেই কুকুরগুলো এসে পৌঁছুল, কিন্তু এখানে এসে আর গন্ধ পেল না তার। সময়ে সময়ে এক এক পাল কুকুর আমার দরজার পাশ দিয়ে গিয়ে আবার আমার বাড়িটারই চারিদিকে পাক দিতে থাকে, আমাকে একটুকু গ্রাহ্য না করে ঘেউ

ঘেউ ঘোঁত ঘোঁত করেই চলেছে, যেন এক ধরনের ক্ষ্যাপামিতে পেয়ে বসেছে ওদের, তাই অন্য কোন কিছুতেই মন ফেরাতে পারছে না শিকার ছেড়ে। এমনি পাক দিয়ে চলে তারা, যতক্ষণ না নাকে কোন খে'কশেয়ালের সদ্য সদ্য গন্ধ পায়। ওস্তাদ কুকুর এর জন্য সব ছাড়তে পারে। একদিন লেক-সিংটন থেকে এক ব্যক্তি তাঁর কুকুর খুঁজতে আমার কুঠিতে আসলেন, এক হপ্তা হ'ল নিজেই শিকারের খোঁজে বেরিয়ে অনেকখানি পথ চলে এসেছে কুকুরটা। কিন্তু আমি এত করে বলাতেও তাঁর একটুও জ্ঞানোদয় হ'ল না, যতবারই আমি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি, আমাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "এখানে আপনি কি করতে আছেন?" হারাল তাঁর কুকুর আর খুঁজে পেলেন মানুষ।

কথাবার্তায় ভাবলেশহীন জনৈক বৃদ্ধ শিকারী বৎসরে একবার করে ওয়ালডেনে স্নান করতে আসতেন, এর জল তখন সব চাইতে বেশি গরম। এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতেন। তাঁর কাছ থেকে শুনেছি, বহু বৎসর আগে একদিন বিকেলের দিকে বন্দুকটা কাঁধে করে তিনি ওয়ালডেনের বন ঢুঁড়তে বেরিয়েছেন, ওয়েল্যান্ডের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে কুকুরের ডাক শুনতে পেলেন, সেদিকেই আসছে। দেখতে না দেখতে একটা খে'কশেয়াল পাঁচিল টপকে রাস্তায় এসে পড়ল, আর ভাবতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই অন্য দিকের পাঁচিলটা টপকে রাস্তা ছেড়ে একেবারে হাওয়া, তাঁর জোর গুলি তাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারল না, কিছু পিছনে ধাড়ি একটা কুকুর আর তিনটে বাচ্চা, নিজেরা নিজেরাই শিকারে বেরিয়েছে তারা, খুব জোরে ছুটে ধরতে আসছে তাকে; এসেই বনের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। বেলা করে বিকেলের দিকে তিনি ওয়ালডেনের দক্ষিণে জঙ্গলের মধ্যে যখন জিরোচ্ছেন, ফেয়ার হ্যাভ্‌নের দিক থেকে অনেক দূরে কুকুরের ডাক শুনতে পেলেন, তখন পর্যন্ত খে'কশেয়ালটা খুঁজছে ওরা, এদিকেই এগোচ্ছে, তাদের ঘোঁত ঘোঁত চিৎকার সমস্ত বনে প্রতিধ্বনি তুলেছে, একটু একটু করে কাছ থেকে কাছে আসছে, এই ওয়েলমেডো থেকে, এই বেকার ফার্ম থেকে। অনেক ক্ষণ ধরে তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে শিকারীর কানে সুধাঢালা সেই সঙ্গীত শুনলেন, এক সময়ে হঠাৎ খে'কশেয়ালটাকে দেখা গেল, রাশভারী গাছগুলোর সারের মধ্যে একরকম গা এলিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে, পাতাগুলোর সুরে সুর মেলানো খসখস শব্দে তার আওয়াজ চাপা পড়েছে, ছুটেই আসছে কিন্তু শব্দ নেই, নিজের কোট বজায় রেখে কুকুরগুলোকে বেশ পিছনে ফেলে এসেছে; এসে বনের মধ্যে একটা টিলার উপর লাফ দিয়ে উঠে সোজা হয়ে কান খাড়া করে শিকারীর দিকে পিছন ফিরে বসল। পলকের জন্য কেমন দুঃখ হ'ল, শিকারীর হাত উঠল না, কিন্তু নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ভাব সেটা, আবার পলকের মধ্যেই, এক ভাবের

পিছনে অন্যটা আসতে যেটুকু সময় লাগে, তিনি বন্দুকটা তাগ করে ধরলেন, তারপরই গুড়ুম।—খেঁকশেয়ালটার প্রাণহীন দেহ টিলা থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ল। শিকারী তখনও নিজের জায়গাটিতেই দাঁড়িয়ে কুকুরের পালের ডাক শুনছেন। ক্রমেই এগিয়ে আসছে তারা, তাদের রাক্ষুসে হুংকার কাছাকাছি বনজঙ্গল আর গাছের সারগুলোর মধ্যে গমগম করছে। শেষটায় ধাড়ি কুকুরটাকে চোখের সামনে দেখা গেল, তার নাক চিবুক মাটির সঙ্গে লাগানো, চারদিকের হাওয়া ভূতে পাওয়ার মতো তছনছ করে একেবারে সোজা টিলাটাকে লক্ষ্য করে দে ছুট; কিন্তু মরা খেঁকশেয়ালটা যেই নজরে পড়া, তৎক্ষণাৎ তার শববৃত্তিরও ক্ষান্তি, যেন অবাক হয়েই হতভম্ব মেরে গেছে সে, শব্দটি না করে তাকে পাক দিয়ে ঘুরতে থাকল শুধু। একে একে তার বাচ্চাগুলোও এসে পৌছুল, আর ঠিক মায়ের মতোই রহস্যের সামনাসামনি এসে ঠাণ্ডা হয়ে চুপ মেরে গেল। তখন শিকারী এগিয়ে এলেন, এসে তাদের মধ্যে দাঁড়াতেই রহস্যের কিনারা পেল তারা। যতক্ষণ তিনি শেয়ালটার ছাল ছাড়ালেন, ততক্ষণ চুপ মেরে অপেক্ষায় থাকল, তারপরও কিছুটা দূর পর্যন্ত পুচ্ছটার পিছু পিছু গিয়ে শেষটায় ফিরে বনে গিয়ে ঢুকল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ওয়েস্টন অঞ্চল থেকে এক তালুকদার কনকর্ড অঞ্চলের শিকারীর আস্তানায় তাঁর কুকুরগুলোর খোঁজে এসে উঠলেন। এসে বিবরণ দিলেন কি করে তাঁর কুকুরগুলো নিজেরা ওয়েস্টন অঞ্চলের বন থেকে বেরিয়ে এই এক হপ্তা কাল শিকার ঢুঁড়ে বেরিয়েছে। কনকর্ড অঞ্চলের শিকারী যেটুকু জানতেন, তাঁকে নিবেদন করলেন, তার ছালটাও তাকে দিতে চাইলেন; কিন্তু তিনি সেটা না নিয়ে চলে যান। সে রাত্রে কুকুরগুলোর কোন সন্ধান তিনি পান নি, কিন্তু পরদিন খবর পেলেন তারা নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে যায়, গিয়ে একটা খামার বাড়িতে রাতটার জন্য আশ্রয় নেয়, সেখানে দিব্যি খাওয়াদাওয়া সেরে, পরদিন খুব সকাল থাকতেই বিদায় নিয়েছে।

যে শিকারী আমাকে গল্পটা করেন, স্যাম নাটিং নামে একটা লোকের কথা মনে আছে তাঁর, সে ফেয়ার হ্যাভ্ন লেজেসে ভালুক শিকার করে বেড়াত আর কনকর্ড গাঁয়ে এসে তার ছালের বদলে রাম যোগাড় করত; একটা মুজ হরিণ সেখানে সে দেখেছে, এ কথাও সেই বলে তাঁকে। নাটিংয়ের একটা ডাকসাইটে ফক্সহাউণ্ড ছিল নাম ছিল বারগয়েন,—বুগাইন বলে উচ্চারণ করত সে—আমার সংবাদদাতা এটিকে ধার নিতেন। এই শহরের সে আমলের এক ব্যাপারির—তিনি আবার ক্যাপটেন, শহরের মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী আর পাঞ্চায়েত ছিলেন—"জাবদা বহি"তে লেখা দেখেছি—জানু ১৮ই ১৭৪২-৩, "হিঃ জন মেলভেন খাতে, ১টা গ্রেফক্স বাবদ ০—২—৩;" এখন এর দেখা মেলে না এখানে, আর তার 'খতেন বহি'তে, ফেব ৭ই, ১৭৪৩ হিঃ

হেজেকিয়য়া স্ট্রাটন খাতে "বাবদ ½ বিরালের ছাল ০—১—৪½"; নিশ্চয়ই বনবিড়াল হবে, স্ট্র্যাটন সে আমলে ফরাসীদের সঙ্গে লড়ায়ে সারজেন্ট হয়েছিলেন, কোন কমদরের শিকার বাবদ লেন-দেনের পাত্র ছিলেন না। হরিণের ছাল নিয়েও ধারে কারবার চলত, রোজই বিক্রি হ'ত তা। এ অঞ্চলে শেষবার যে হরিণ শিকার হয়, জনৈক ব্যক্তি এখন পর্যন্ত তার শিঙ নষ্ট হতে দেন নি, আর এক ব্যক্তি তার খুঁটিনাটির বিবরণ দেন আমাকে। এ অঞ্চলে আগে শিকারীরা বেশ দলে ভারি আর আমুদে ছিলেন। জনৈক হাড্ডিসার নিষাদ-পুঙ্গবকে আমার মনে পড়ে, সে পথের উপর থেকে তবতলক একটা পাতা কুড়িয়ে নিয়ে—যদি ঠিক স্মরণ থাকে আমার—তাতে যে কোন শিকারীর শিঙের চাইতে বেশি জংলী আর বেশি মিষ্টি সুর তুলতে পারত।

চাঁদ থাকলে মাঝ রাতে মধ্যে মধ্যে পথের উপর কুকুরদের দেখা পেতাম, বনের ভিতর ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে, যেন ভয় খেয়েই আমার পথ থেকে চুপিসাড়ে সরে পড়ত আর আমার চলে যাওয়া পর্যন্ত ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকত।

আমার বাদামের পুঁজি নিয়ে কাঠবেরাল আর জংলা ইঁদুরদের ঝগড়া হ'ত। আমার আস্তানার চারপাশ ঘিরে এক থেকে চার ইঞ্চি ব্যাসের কয় কুড়ি পিচ পাইন গাছ ছিল, গত শীতে ইঁদুরগুলো সেগুলোকে দাঁত দিয়ে কুটে ফেলে—শীতটাও যা পড়ে তাদের পক্ষে তা নরওয়ের শীতের মতো, অনেকদিন পর্যন্ত পুরু হয়ে বরফ জমে ছিল, সুতরাং অন্য খাবারের সঙ্গে বেশ খানিকটা করে পাইনের বাকলার মেশাল দিতে বাধ্য হ'ত ওরা। গাছগুলো সতেজ ছিল, ভরা গ্রীষ্মের মধ্যেও বেশ জোর বাড় ছিল, অনেকগুলো এক ফুট পর্যন্ত বেড়ে ওঠে, অবিশ্যি একেবারে ঘেরার মধ্যে; কিন্তু আর একটা শীত কাটতেই সবগুলো মরে যায়, একটাও বাদ পড়ে নি। লক্ষ্যের বিষয় যে একটা ইঁদুরকে এই রকম করে একটা আস্ত পাইন গাছ উদরস্থ করতে দেওয়া হ'ল—উপর থেকে সোজা নিচে পর্যন্ত নয়, বেশ ঘুরে ঘুরে দাঁতে কুটে গেছে সে তাকে। কিন্তু সম্ভবত, এই সব গাছের ঝাড় কমাবার জন্য এর দরকার, এত ঘন হয়ে বাড়ার ধাত এদের।

খরগোসগুলো (লেপাস অ্যামেরিকেনাস), দিব্যি আপনার মতো হয়ে যায়। আমার বাড়িটার তলায় গা ঢাকা দিয়ে থাকত একটা, আমার সঙ্গে তার আড়াল শুধু মেঝেটার, আমি নড়াচড়া সুরু করলেই ঝটপট করে বেরোতে গিয়ে রোজ সকালে আমাকে হকচকিয়ে দিত সেটা—ঠক ঠক ঠক, মাথা ঠুকত মেঝের তক্তাতে, তাড়াহুড়োতে। একটু আঁধার হলেই আমার দোরগোড়ায় এসে জুটত ওরা, আমি যে সব আলুর খোসাটোসা ফেলে দিতাম এসে সেগুলো ঠোকরাত, আর প্রায় হুবহু মাটির মতো রঙ ছিল

বলে যখন স্থির হয়ে থাকত তখন ওদের আলাদা করে বোঝাই যেত না। সময় সময় আবছা আলোতে আমার জানালার তলাতে একটা নিস্পন্দ হয়ে বসে আছে, আমি পালাক্রমে এই দেখতে পাচ্ছি সেটাকে, আবার পাচ্ছি নে। সন্ধ্যার দিকে দোর খুলতেই ক্যাঁচোর ম্যাঁচোর করতে করতে লম্ফঝম্প দিয়ে সবাই মিলে একেবার দে-ছুট। হাতের কাছে এলে, ওদের দেখে দুঃখ হ'ত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার থেকে দু পা দূরে দোরগোড়ায় একটা বসে আছে, প্রথমটা তো ভয়ে কেঁপেই সারা, কিন্তু নড়বারও ইচ্ছে নেই; অতি বেচারি, এতটুকু একটা প্রাণী, রোগা, হাড়-জিরজিরে, কানগুলো খস-খসে, নাকটা চোখা, এইটুকু লেজটা আর ছোট ছোট থাবা। দেখলে মনে হয়, বনেদি রক্তের ঝাড় নিঃশেষ হয়ে গেছে প্রকৃতির, একেবারে শেষ সম্বলে এসে ঠেকেছে। বড় বড় চোখ, কচি কচি দেখায় কিন্তু কেমন অসুস্থ, শোথে ফোলার মতো খানিকটা। এক পা এগিয়ে গেলাম আমি অমনি শরীরটা সোজা করে দেহের ধারগুলোকে বেশ রঙ্গভরে বাড়িয়ে তুলে বরফের উপর দিয়ে একেবারে রবারের টুকরোর মতো তড়াক করে সরে আমাকে ছাড়িয়ে বন পার হয়ে নিমেষের মধ্যে উধাও—অবাধ উন্মুক্ত জীব, প্রকৃতির প্রতাপ আর মর্যাদা প্রমাণ করছে। মিথ্যাই কৃশ তনু নয় তার। এই তার প্রকৃতি তা'হলে। (লেপাস, লেভাইপ্‌স অর্থে ক্ষিপ্রগতি বোঝেন অনেকে)।

খরগোস আর পায়রা ছাড়া আবার দেশ কি? জীবজগতের মধ্যে এরাই সব চাইতে মৌলিক আর খাস দেশী; সেকাল আর একালে সবাই এদের বনেদি আর মানী বংশকে জানে; প্রকৃতির স্ববর্ণ, স্বজাত, মাটি আর পাতার জ্ঞাতগোষ্ঠী, পরস্পর জ্ঞাতি, এর হ'ল ডানা, ওর হ'ল পাখা। খরগোস কি পায়রা ফরফর করলে জংলী কোন জীব দেখা গেল বলে মনেই হয় না, নিতা-ন্তই স্বাভাবিক ব্যাপার একটা, পাতার খসখসানির মতোই মামুলী। যত ওলট পালটই হ'ক, দেশের আপন সন্তানের মতোই এদের নির্ঘাত বাড়-বাড়ন্তই হতে থাকবে। বন জঙ্গল কেটে ফেলা হলেও চারাটারা ঝোপঝাড় সে সব গজাবে, তাতেই তাদের নেপথ্যবিহার চলে যাবে আর আগের চাইতেও গুষ্টিতে বাড়বে। যে দেশ খরগোস পালে না, নিতান্তই হতচ্ছাড়া দেশ সেটা। আমাদের বনবাদাড় তো দুয়েতেই গিজগিজ করছে, যে কোন জলার চারপাশে দেখা যায়—পায়রা আর খরগোস ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে,—বালামুচি বাঁধা কচি কচি ডালপালার বেড়ার ফাঁদ, রাখাল ছেলে পেতেছে সেগুলো।

॥ ১৬ ॥ শীতের জলাশয়

শীতকালে এক নিঝুম রাত্রের শেষে ঘুম থেকে এই ভাব নিয়ে জাগলাম যেন আমাকে কোন প্রশ্ন করা হয়েছিল; আর ঘুমের ঘোরে মিথ্যাই প্রশ্নটার কি—কেমন-করে—কোথায় এর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঐ যে প্রকৃতির ভোর হ'ল, তার মধ্যেই তো সব প্রাণীর প্রাণ; আমার প্রশস্ত বাতায়নের দিকে প্রশান্ত পরিতৃপ্ত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে সে. ওষ্ঠাধরে কোন প্রশ্ন নেই তার। জেগেই দেখলাম প্রকৃতির দিনের আলো, আমার প্রশ্নেরও জবাব পেয়ে গেলাম। কচি পাইন গাছগুলোর ফুটকি চিহ্নে ভরা মাটির উপর গভীর হয়ে বরফ জমে আছে, আমার আস্তানাটা যে পাহাড়ের উপর, তার ঢালুটা পর্যন্ত যেন বলছে, আগে চল। প্রকৃতি কোন প্রশ্ন করে না, প্রশ্নের জবাবও দেয় না, নশ্বর মানুষেরই যত প্রশ্ন। বহুদিন আগে প্রকৃতি মন স্থির করে ফেলেছে, "হে কুমার, এই বিশ্বের যে বিস্ময়কর বিচিত্র রূপ আমার নয়নের ধ্যান আর শ্রদ্ধার বস্তু আমার আত্মাকে সবই নিবেদন করে তারা। এই মহিমময় সৃষ্টির একাংশ রাত্রি নিঃসন্দেহে তার অবগুন্ঠনে ঢেকে রাখে, কিন্তু দিন হয়, মর্ত্য থেকে নভস্থল পর্যন্ত প্রসারিত এই বিপুল সৃষ্টিকে প্রকাশ করে সে।"

অতঃপর সকালের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। কুড়ুলটা আর বালতি-টা হাতে নিয়ে প্রথমেই জলের ধান্ধায় বার হলাম, স্বপ্নের সামগ্রী না হয়ে থাকে যদি। কনকনে বরফের রাতের অন্তে জলের খোঁজ করতে খনিসন্ধানী দণ্ডের দরকার। পুষ্করিণীটার জল ঢলঢলে উপরটা, নিঃশ্বাস পর্যন্ত যেখানে আগে দাগ ফেলেছে, আলোছায়ার সব খেলা যেখানে ফুটে উঠেছে, শীতের সময় প্রত্যেক বারই সেটা এক কি দেড় ফুট পর্যন্ত জমে যায়; তখন বোঝাই গাড়িঘোড়ার ভারও বইতে পারে তা, হয়তো বা অত-খানি জায়গা জুড়েই নিচেও বরফ থাকে, তখন সমান উঁচু ডাঙা থেকে আর আলাদা করে বোঝা যায় না তাকে, চারপাশের পাহাড়ের ইঁদুর-টিদুরগুলোর মতোই তিন চার মাসের জন্য চোখের পাতা বুজে নিস্পন্দ হয়ে থাকে সে। বরফে ঢাকা সেই জায়গাটায়, যেন চারপাশের পাহাড়ের মধ্যে গোচারণের মাঠ

একটা, দাঁড়িয়ে প্রথমে একফুট ঝুরঝুরে বরফ খুঁড়ে পথ করলাম, তারপর আর এক ফুট বরফের চাঁই ফুঁড়ে আমার পায়ের কাছে একটা গবাক্ষ তৈরি করা গেল; সেখানে হাঁটু গেড়ে জল খেতে বসে নিচু হয়ে মাছদের নিরালা বৈঠকখানাটা দেখতে পেলাম, ঘসা কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে যেমন দেখা যায় সেই রকম মৃদু আলোয় ভরা জায়গাটি, গ্রীষ্মকালের মতোই মেঝেয় বালি চকচক করছে; যেন গোধূলির সময়কার আকাশ, বিরামহীন তরঙ্গহীন শান্তির রাজ্য, ঠিক সেখানকার বাসিন্দাদের ঠান্ডা, মোলায়েম মেজাজের মতো। স্বর্গ দু'জায়গাতেই—আমাদের মাথার ওপর আর আমাদের পায়ের নিচেও।

খুব সকাল থাকতেই, যখন তুহিনে সব মুচ-মুচে হয়ে রয়েছে, মাছ ধরবার ছিপ আর যা কিছু হ'ক জলখাবার সঙ্গে নিয়ে লোকজন এসে জুটতে থাকে, এসে পিক্‌এরেল আর পার্চ ধরবার জন্য লিকলিকে ছিপগুলো সেই বরফে ঢাকা মাঠের মধ্যে নামিয়ে ধরে; লোকগুলো জংলী, সহজ সংস্কার মেনে চলে, আলাদা ধরন-ধারন, আলাদা বিধিবিধানে বিশ্বাস রাখে—শহরের লোকদের নয়; তাদের যাতায়াতের টানাপোড়েন দিয়ে শহরে শহরে কিছু কিছু অংশ জুড়ে রাখে, নইলে ছিঁড়ে যেত সেখান থেকে। খালাসীদের পরনের টেকসই পশমের জামাকাপড় পরা, ডাঙায় বসে শুকনো ওক পাতায় জলখাবার খেয়ে নেয়; শহরের লোকরা যেমন মানুষের তৈরি শাস্ত্রে, এরা তেমনি প্রকৃতির শাস্ত্রে পারদর্শী। পুঁথিপত্রের ধার ধারে না কখনও, বিদ্যা কম, ব্যাখ্যান তার চাইতেও কম। ওদের সব অনুষ্ঠানের খবর এখন পর্যন্ত জানা যায় নি বলে রটনা আছে। এই যে একজন, বড়সড় একটা পার্চের টোপ লাগিয়ে পিক্‌এরেল ধরছে। ওর খালুই-এর ভেতর উঁকি মারলে হকচকিয়ে যেতে হবে, যেন গ্রীষ্মকালের পুকুর একটা, গ্রীষ্মকালকে বুঝি নিজের ঘরে তালাবন্দী করে রেখেছে, কি কোথায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে সে তার হদিস জানে। এই ভরা শীতের মধ্যেও এত সব সে যোগাড় করল কি করে, কে বলবে? বুঝেছি মাটি বরফে ঢাকা, তাই কেঁচো পেয়েছে গাছের পচা গুঁড়ি থেকে, ধরে এনেছে সেগুলো। পড়াশোনা ক'রে প্রকৃতিবিজ্ঞানী প্রকৃতির যে মর্মের সন্ধান পান, এর জীবনযাত্রার চলাফেরাই তার চাইতে গভীরে; এ নিজেই তো প্রকৃতিবিজ্ঞানীর পাঠ্য। তাঁকে পোকামাকড়ের খোঁজে আস্তে ছুরি চালিয়ে শ্যাওলা, গাছের ছাল সব চুঁড়তে হয়; আর এ কুড়ুল দিয়ে কোপ মেরে গাছের ভেতরটা পর্যন্ত খুলে মেলে ধরে, শ্যাওলা ছাল সব ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গাছের ছাল-বাকলা ফেড়ে ফুঁড়েই একে জীবিকা যোগাড় করতে হয়। এ রকম লোকের মাছ ধরার দস্তুরমতো দাবী আছে। এর মধ্যে প্রকৃতির ক্রমবিকাশ দেখে ভাল লাগে

আমার। পার্চ গিলছে কেঁচো, পিক্‌এরেল গিলছে পার্চ, আর মেছুড়ে গিলছে পিক্‌এরেল; পুরো সৃষ্টির স্বরগ্রামের সব ফাঁক একেবারে ভরাট।

চারধার কুয়াসায় ঢাকা, হ্রদের চারপাশে টহল দিতে দিতে, এক একটা গেঁয়ো মেছুড়েকে সেকেলে ফিকিরে মাছ ধরতে দেখে মজা লেগেছে সময় সময়। বরফের মধ্যে ছোট ছোট সব ফোকর, চার পাঁচ রড দূরে দূরে, তীর থেকেও অতটাই হবে; সে হয়তো অলডারের ডালপালাই ঠেলে নিয়ে গেছে সেগুলোর ওপর, ছিপটার একটা ধার একটা খোঁটায় বেঁধেছে, যাতে টেনে না নিয়ে যেতে পারে সেটা, বরফ থেকে এক ফুট কি একটু বেশি উঁচুতে অলডারের একটা ছোট ডালের উপর দিয়ে ছিপটার ডগার দিকটা ঝুলিয়ে দিয়েছে আর তাতে একটা শুকনো ওকপাতা বাঁধা, যখন সেটায় টান পড়বে, বোঝা যাবে তার বঁড়শী মাছে ঠোকরাচ্ছে। পুকুরটার পাশ দিয়ে আধাআধি পথ গেলে এই রকম সব অলডার সমান দূরে দূরে কুয়াসার মধ্যে বেশ খোলতাই হয়ে উঠছে, দেখা যাবে।

আহা মরি, ওয়ালডেনের সেই পিক্‌এরেল! যখনই দেখি, বরফের উপর গা-ঢাকা অবস্থায়, কি জল ঢোকবার জন্য ছোট গর্ত খুঁড়ে মেছুড়েরা যে কুয়ো বানায় তার মধ্যে, তখনই তাদের অসাধারণ সৌন্দর্যে অবাক হয়ে যাই, যেন রূপকথার মাছ আর আমাদের রাস্তায় এমন কি বনের ভিতরও কত যে বেমানান; কনকর্ডের জীবনে তারা ঠিক আরব মুল্লুকের মতো পর-দেশী। একেবারে চোখ ঝলসে দেওয়া অলৌকিক সৌন্দর্যের অধিকারী, তাই আমাদের রাস্তাঘাটে এত নামডাকের ঢাক পেটাপেটি যাদের, সেই মরার মতো ফ্যাকাসে কড আর হ্যাডকের সঙ্গে এদের আকাশ-পাতাল তফাত। পাইনের মতো এরা সবুজ নয়, পাথরের মতো পাটল নয়, আকাশের মতো নীল নয়, আমার চোখে এদের রঙ আরও অনেক অপরূপ ঠেকে, যদি সম্ভব হয় তা, ফুল কি বহু দামী মণিমাণিক্যের জাত, বুঝি মুক্তোই হবে তারা, ওয়ালডেনের জলের নিউক্লিয়সের প্রাণিরূপ কি কেলাস। সর্বরকমে ওয়াল-ডেন তো বটেই তারা, প্রাণিরাজ্যে তারা ওয়ালডেন-অনু, জাত-ওয়ালডেন। এখানে কি করে যে তাদের মারা হয়, আশ্চর্য! ওয়ালডেনের রাস্তায় গরু ঘোড়া গাড়ি ঝকর-ঝকর করে ছোটে, ঝুমঝুম করে শ্লেজগাড়ি যায়, তার কত নিচে এই অঢেল ঢালাও জলের মধ্যে সাঁতরে বেড়ায় সোনাঢালা মরকত-কান্তি এই মহামীন। কোন মাছপটিতে এর জোড়া কখনও নজরে পড়ে নি আমার; সেখানে তাহ'লে সকলেরই চোখে পড়ত। গা এলিয়ে দিয়ে দুচার-বার আইঢাই ঘাই মারছে আর এর জললীলার অবসান ঘটছে, একটা মানুষই যেন অকালে আকাশের হাল্‌কা হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

ওয়ালডেন পণ্ডের বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট তল উদ্ধারের কামনা ছিল

আমার, তাই ৪৬ সালের গোড়ার দিকে বরফ গলবার আগে কম্পাস, চেন আর ওলন দড়ি হাতে আমি সযত্নে এর জরিপ করলাম। জলাশয়টার তল কি অতল যাই হ'ক, নিয়ে নানা রকম গল্প আছে, সেগুলোর কোনটারই নিজস্ব কোন ভিত্তি নেই। কোন জলাশয়ের তলের হদিস পাবার জন্য এতটুকু কষ্ট না করেই লোকজন তার অতলগহ্বরতা সম্বন্ধে কতকাল ধরে যে নিঃসংশয় থেকে যায়—লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার তা। এ অঞ্চলে একবার বেড়াতেই এমনি দু দুটো অতলগহ্বর জলাশয় আমার পথে পেয়েছি। অনেকেরই বিশ্বাস, ওয়ালডেন একেবারে পৃথিবীকে এফোঁড় ওফোঁড় করেছে। কেউ কেউ কত দিন বরফের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে, তাঁদের ভ্রান্তিকর ফোকরে চোখ লাগিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন—লাভের মধ্যে হয়তো চোখ জলে ভেসে গেছে—আর বুকে ঠান্ডা লাগার ভয়ে সাত তাড়াতাড়িতে একটা সিদ্ধান্তও করে ফেলেছেন; তাঁদের নজরে পড়েছে বিরাট সব গর্ত "তার মধ্যে বিচালির আঁটি সেঁধিয়ে যায়," যদি কেউ তা সেঁধতে এগোয়— বৈতরণীর উৎসই নিশ্চয়, আর এ অঞ্চল থেকে রসাতলে যাবারও পথ সেটা। গাঁ থেকে আরও কত লোক কলকব্জাচাকা নিয়ে ইঞ্চি মার্কা দেওয়া কাছিতে গাড়ি বোঝাই করে এসেছেন, কিন্তু তবু এর তলের হদিস করে উঠতে পারেন নি; কলকব্জাচাকা রাস্তার মতো রাস্তাতেই থেকে গেছে, তাঁরা নিজেদের বিশ্বাস করার অবিশ্বাস্য রকমের বাহাদুরির তল পাবার ব্যর্থ চেষ্টায় দড়িকাছি নিয়ে টানাটানি করে গেছেন। আমি কিন্তু বলতে পারি পাঠকদের, মোটামুটি শক্ত রকমের একটা তল ওয়ালডেনের আছে, ধরাছোঁয়ার বাইরে নয়, তবে সচরাচর যা দেখা যায় তার চাইতে অতলে। একটা কড মাছ ধরবার ছিপ আর দেড় পাউন্ড ওজনের পাথর দিয়ে আমি এক রকম অনায়াসেই তার হদিস করতে পেরেছি, আর ঠিক করেই বলতে পারি কখন পাথরটা তলা থেকে উপরে উঠল, কেন না যতক্ষণ তার তলায় জল গিয়ে আমার সাহায্যে না লেগেছে, ততক্ষণ ভীষণ জোর লেগেছে সেটাকে টেনে তুলতে। এর চরম গভীরতা হচ্ছে একশ' দু ফুট, এর সঙ্গে যোগ দিতে হবে পাঁচ ফুট, এতটা জল বেড়েছে তখন থেকে, হ'ল একশ' সাত। এত কম আয়তনের হিসেবে এই গভীরতা লক্ষ্যের যোগ্য, তবু কল্পনার খাতিরেও এর এক ইঞ্চি কমানো চলে না। সব জলাশয়ই যদি অগভীর হ'ত, তা হ'লে? মানুষের মনে কি তার কোন প্রতিক্রিয়া হ'ত না? প্রতীক হিসেবেই এই জলাশয়টা গভীর আর নির্মল করা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। যতদিন অনন্তের প্রত্যয় থাকবে মানুষের, ততদিন কোন কোন জলাশয়কে অতল মনে করা হবেই।

আমি এর এতখানি গভীরতা বাতলেছি শুনে কোন কারখানার

মালিক ভাবেন, কখনও ঠিক হতে পারে না তা, কেন না বাঁধ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার বিচারে বালি কখনও এত খাড়া কোণে থাকতে পারে না। অতি গভীর সব জলাশয় ঠিক যতখানি গভীর বলে অনেকে মনে করেন, আয়তনের হিসেবে কিন্তু তারা ঠিক ততখানি গভীর নয়, যদি তাদের জল ছেঁচে ফেলা হ'ত লক্ষ্য করার মতো নিম্নভূমি অবশিষ্ট থাকত না সেখানে। পাহাড়ে ঘেরা পেয়ালা ঠিক নয় সেগুলো; আয়তনের তুলনায় অসাধারণরূপে গভীর এই জলাশয়টির মধ্যবিন্দু বরাবর উল্লম্ব ছেদদৃশ্য অগভীর পাত্রের চাইতে কিছু বেশি গভীর দেখাবে না। বেশির ভাগ জলাশয়কেই খালি করে ফেললে একটা মাঠ পড়ে থাকবে, সচরাচর যেমন দেখি তার চাইতে বেশি নিচু হবে না সেটা। ভূ-দৃশ্যের সব বিষয়ে উইলিয়ম গিলপিন বিশেষ শ্রদ্ধার যোগ্য আর মোটামুটি নির্ভুলও বটে; স্কটল্যাণ্ডের লক ফাইনের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি, "লবণ জলের উপসাগর, ষাট সত্তর বাঁও গভীর, চার মাইল চওড়া" আর পঞ্চাশ মাইল লম্বা, চারপাশে পাহাড়;— এর শীর্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বলে গেছেন, "মহাপ্লাবন নিঃস্রবের, কিংবা প্রকৃতির যে আলোড়নে এর উদ্ভব, তার অব্যবহিত পরেই যদি এর দর্শনলাভ ঘটত আমাদের, জলস্রোত নিঃসৃত হওয়ার পূর্বেই কি ভয়ানক বিদারণ বলেই না এ প্রতীয়মান হ'ত।"

"স্ফীত পাহাড়ের উৎক্ষেপ সম উঁচু, নিচু এত
যেথা নিমগ্ন হয় শূন্যগর্ভ নৌ, প্রশস্ত সুগভীর,
অতি-পরিসর জলস্রোতের শয্যার বিস্তার।"

কিন্তু লক ফাইনের ক্ষুদ্রতম ব্যাসের হিসেব ধরে আমরা যদি ওয়ালডেনকে সেই অনুপাতে দেখতে যাই—দেখা গেছে লম্বালম্বি ভাবে অগভীর পাত্রের মতো লাগে তাকে—তবে তাকে চতুর্গুণ অগভীর ঠেকবে। লক ফাইনকে জলহীন করলে তার ভয়াবহতা কতটা বাড়বে, তা এ থেকেই বোঝা যাবে। গা-ভরা শস্যের ক্ষেত সমেত অনেক হাসিখুশি মাঠই এই রকম ভয়াবহ বিদারণকেই জুড়ে থাকে, শুধু সেখান থেকে জল সরে গেছে, কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে অজ্ঞ লোকজনকে এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় করতে গেলে ভূতত্ত্ববিদদের অন্তর্দৃষ্টি আর দূরদৃষ্টি থাকা দরকার। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, দিগন্তের ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে আদিকালের অনেক জলাশয়ের তীর নজরে পড়বে, তাদের ইতিহাস ঢাকবার জন্য পরবর্তী কালে সমতল মাঠের উঁচু হয়ে ওঠবার দরকার পড়ে নি। আবার যাঁরা রাস্তার কাজ করেন তাঁরা জানেন এক পশলা বৃষ্টির পর খালি গর্তগুলো জল ভরা অবস্থায় দেখাই রাস্তার খোঁদল ঠিক করার সহজতম উপায়। মোদ্দা কথা

দাঁড়ায় যে, কল্পনা—একটু ছাড়া পেলেই হ'ল, প্রকৃতি যত না যায়, সে তার চাইতে অতলে ডুবতে পারে, উপরে উড়তে পারে। সুতরাং মনে হচ্ছে পরিসরের সঙ্গে তুলনা করলে মহাসমুদ্রের গভীরতাও অত্যন্ত যৎসামান্য দাঁড়াবে বলেই হয়তো দেখা যাবে।

আগাগোড়া বরফে ঢেকে যায় না, এমন বন্দর জরিপ করতে গিয়ে যতটা সম্ভব তার চাইতে বেশি সঠিক ভাবে, বরফে সাড়া তুলে তুলে এর তলদেশের একটা আদল ঠিক করে ফেললাম, আর মোটামুটি সামঞ্জস্যে আশ্চর্য হলাম। রোদ ঝড় লাঙলের মুখে খোলা থেকে মাঠ যতটা, এর গভীরতম অংশে প্রায় তার যে কোনটার চাইতে বেশি কয়েক একর জুড়ে ও অনুভূমিক। একবার যেমন ইচ্ছা একটা সীমারেখা বেছে দেখা গেল, ত্রিশ রডে এক ফুটের বেশি গভীরতার এদিক-ওদিক হয় না। আর সাধারণত মাঝখানটার কাছাকাছি যে কোন দিকে প্রতি একশ ফুটে এই তারতম্য আগে থাকতেই হিসেব করে তিন চার ইঞ্চির মধ্যে ধরতে পারলাম। অনেককেই বলতে শোনা যায়, এরকম শান্ত জলাশয়ের বালির তলাতেও সাংঘাতিক গভীর খাদ থাকতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে জলের কাজই দাঁড়ায় সব এবড়োখেবড়োকে পাট করে ফেলা। তলদেশের সামঞ্জস্য আর তীরের আশপাশের পাহাড়গুলোর প্রসারের সঙ্গে এর সঙ্গতি এমন নিখুঁত যে, জলাশয়ের ঠিক ওপারটাতেই দূরের একটা অন্তরীপ হাতে হাতে ধরা দিল আর ঠিক বিপরীত পাড় লক্ষ করতেই তার মুখটা কোন দিকে তাও বোঝা গেল। অন্তরীপই চড়া আবার সোজাসুজি জলা হয়ে যায়, আর উপত্যকা তথা সংকীর্ণ গিরিপথ গভীর জলাধার তথা প্রণালী হয়ে পড়ে।

দশ রডকে এক ইঞ্চি ধরে জলাশয়টার নক্সা আর মোট একশ'র বেশি গভীরতার অঙ্কের তালিকা তৈরি করে ফেলবার পরই এই আশ্চর্য মিল নজরে পড়ল আমার। যখন বোঝা গেল সব চাইতে গভীরতাসূচক সংখ্যাটা স্পষ্টই নক্সাটার মাঝখানে পড়ছে, তখন নক্সাটার উপর একটা রুল প্রথমে লম্বালম্বি, পরে আড়াআড়ি করে রাখতেই আশ্চর্য হলাম দেখে যে, সর্বাধিক দৈর্ঘ্যের আর সর্বাধিক বিস্তারের রেখা দুটো যেখানে পরস্পরকে ছেদ করছে, ঠিক সেই-খানটাতেই সর্বাধিক গভীরতার বিন্দু—মাঝখানটা প্রায় অনুভূমিক, জলাশয়ের বেড়রেখা একেবারেই নিয়মিত নয় আর তা সর্বাধিক দৈর্ঘ্য আর বিস্তার মাপতে খাড়িগুলোর ভিতরটা ধরা সত্ত্বেও। তখন নিজের মনেই বললাম, তবে কি একটা পুকুর কি ছোট ডোবার বেলায় যেমন, মহাসমুদ্রের গভীরতর অংশ-টাও কি এই সংকেতই দেখিয়ে দেবে, কে বলবে তা? তার পাহাড়ের উঁচু হবার নিয়মটাও কি তবে এই, নিম্নভূমির উলটো সংস্করণ হিসাবেই তো দেখা হয় তাকে? আমরা তো জানিই যে পাহাড় যেখানে সব চাইতে সংকীর্ণ সেখানে সব চাইতে উঁচু নয়।

পাঁচটা খাড়ির তিনটেয়, অর্থাৎ যে ক'টায় গভীরতা পরিমাপ করা হয় সবগুলোতেই দেখা গেল, মোহানার ঠিক সামনেতেই চড়া, কিন্তু ভিতরের দিকটায় জল গভীর, ফলে বাঁকটার স্থলভাগের মধ্যে কেবল সমান্তরাল নয়, লম্বালম্বি ভাবেও জল থই থই করে আর একটা বড় গোছের উপ-পুষ্করিণী কি আলাদা একটা পুকুরই গড়ে তোলে; অন্তরীপ দুটোর অবস্থান থেকেই চড়াটার ভাবগতিকও ধরা যায়। খাড়ির মুখের দিকটা দৈর্ঘ্যের তুলনায় যতখানি চওড়া, চড়ার ওপরে জলও সেই অনুপাতে উপ-পুকুরের জলের চাইতে গভীর হয়। সুতরাং খাড়ির দৈর্ঘ্যপ্রস্থ আর চার পাশের তীরের রকম-সকম জানা থাকলে, সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার মতো সাধারণ একটা সূত্র বার করবার প্রায় সব তথ্যই যোগাড় হতে পারে।

এই অভিজ্ঞতা নিয়ে, জলাশয়ের উপরকার বেড়রেখা আর তার তীরের রকম-সকম দেখে তার গভীরতম অংশটা কোথায় তা কত নির্ভুল ভাবে অনুমান করা যায় পরীক্ষার জন্য আমি হোয়াইট পন্ডের একটা নক্সাও বানিয়ে ফেললাম; এর সব চাইতে বেশি চওড়া আর সব চাইতে কম চওড়ার রেখা খুব কাছাকাছি —সেখানে বিপরীত দুটো অন্তরীপ পরস্পরের সামনা সামনি হয়েছে, আবার বিপরীত উপ-পুকুর দুটো পরস্পর থেকে দূরে গেছে—দেখে সাহস করে শেষ রেখাটার একটু দূরে গভীরতম অংশ হিসেবে একটা ফোঁটা কেটে দিলাম, তাহ'লেও সব চাইতে লম্বা রেখার উপরই সেটা পড়ল। দেখা গেল, গভীরতম অংশটি এর একশ' ফুটের মধ্যেই, যে দিকটায় আমি ঝুঁকেছিলাম, তা ছাড়িয়েও খানিকটা দূরে, আর সেখানে শুধু একফুট বেশি গভীর, অর্থাৎ একষট্টি ফুট। অবশ্য, জলাশয়টার ভেতর দিয়ে কোন স্রোতস্বিনী বয়ে গিয়ে থাকলে, কি কোন দ্বীপ থাকলে সমস্যাটা অনেক বেশি জটিল হ'ত।

আমাদের যদি প্রকৃতির সব নিয়মকানুন জানা থাকত, তা হ'লে কোন বিষয়ের ভাল-মন্দ সব দিক জানবার জন্য তার একটি মাত্র তথ্য কি প্রত্যক্ষ নিসর্গক্রিয়ার একটার বিবরণ পেলেই চলে যেত। বর্তমানে আমরা কেবল দুচারটে নিয়মই জেনেছি, তাই আমাদের ফল দাঁড়াচ্ছে অষ্টরম্ভা; প্রকৃতিতে কোন গোঁজামিল কি অনিয়ম রয়ে গেছে বলে অবশ্য নয়, গণনার জন্য যে মালমশলা না হলেই নয় সে সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার ফলে। এর নিয়মকানুন আর ছন্দ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তা আমরা এর যতটুকু ধরতে পেরেছি, তার গণ্ডীর মধ্যেই মোটামুটি ধরাবাঁধা রয়েছে; কিন্তু উপর উপর পরস্পর-বিরোধী অথচ আসলে একাত্ম আরও অনেক যে সব নিয়মকানুনের ধরাছোঁয়া আমরা পাই নি, তাদের ছন্দোবদ্ধতায় আরও বেশি বিস্মিত হতে হয়। নিয়মকানুনগুলো আলাদা লাগে আমাদের আলাদা আলাদা করে

দেখবার জন্য, পাহাড়ের চেহারা যেমন পথিকের চোখে প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে বদলায়, কিন্তু এধার ওধার থেকে এর আকৃতি সংখ্যায় অনেক দেখালেও মূর্তি আসলে একই। এমন কি ফাটিয়ে কি ফুঁড়ে দেখলেও, সমস্ত মূর্তি-টার আদল ধরা পড়ে না।

জলাশয় দেখে আমি যা সার বুঝেছি, নীতির ক্ষেত্রেও তা কম খাঁটি নয়। এই হচ্ছে গড়পড়তার নিয়ম। এই যে দুই ব্যাসরেখার কানুন, এ যে শুধু অখণ্ড মণ্ডলে সূর্যের, আর মানুষের শরীরে হৃৎপদ্মের পথ দেখায় আমাদের তাই নয়, মানুষের দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ আচরণের আর জীবন-স্রোতের খাড়ি আর ফাটকের মোট পরিমাণের দৈর্ঘ্য প্রস্থের এদিক থেকে ওদিক লাইন দেগে দেয় আর যেখানে তাদের পরস্পরের ছেদ, সেখানেই তার চরিত্রের শীর্ষ কি চরিত্রের গভীরতা। সম্ভবত, তার চরিত্রের গভীরতা আর দৃষ্টির অগোচর তলদেশের খবর পেতে গেলে আমাদের তার পাড়ের আর আশপাশের অঞ্চল আর অবস্থার মুখ কোন দিকে জানবার দরকার। কারও আশপাশের অবস্থা যদি পর্বতাকীর্ণ হয়, পাড় যদি বীরোপম হয়, পাহাড়ের চুড়ো সেখানটা ছায়ায় ঢেকে রাখে আর বুকে তার প্রতিচ্ছায়া পড়ে তবে এসব তাঁর সমান গভীরতা নির্দেশ করছে। কিন্তু পাড় যেখানে নিচু আর অবন্ধুর, সেখানে তাঁর অগভীরতার সাক্ষ্য দেয়। আমাদের চেহারায় নির্ভীক উত্তুঙ্গ ললাট সম পরিমাণ গভীর চিন্তাশক্তির আশ্রয় আর চিহ্ন। আবার আমাদের প্রত্যেকটা খাড়ির, অর্থাৎ বিশেষ প্রবৃত্তির ফাটকের সামনাসামনি চড়াও পড়ে; এদের এক একটা এক এক সময়ে আমাদের বন্দর হয়, সেখানে আমরা বন্ধ থাকি, খানিকটা ডাঙার ভিতরে গিয়ে পড়ি। এই সব প্রবৃত্তি সাধারণত যথেচ্ছ হয় না, বরং তাদের আকার-প্রকার ঝোঁক সবই পাড়ের অন্তরীপ, উঁচু হবার সনাতন কেন্দ্ররেখা থেকে গড়ে ওঠে। যখন চড়াটা ক্রমে ঝড়বাদলে, জোয়ার ভাটায় কি স্রোতের মুখে বেড়ে ওঠে, অর্থাৎ তার জলের তোড় কমে যায়, তখন প্রথমে যা পাড়ে বাঁক হয়ে ছিল, যেখানে কোন ভাব বন্দর গেড়েছিল, তা আলাদা একটা হ্রদ হয়ে পড়ে, মহাসমুদ্র থেকে তার ছেদ ঘটে, সেখানে সে তার নিজস্ব হাবভাব গড়ে তোলে, হয়তো বা ভোল পালটে নোনাজল থেকে স্বাদু মিঠাপানির সাগর হয়, হেজে মজে যায় কি বাদাভুঁই হয়ে ওঠে। কোন লোকের মধ্যে এই জীবনের উন্মেষ দেখলে আমরা কি ধরে নিতে পারি নে যে এই রকম কোন চড়া সেখানে কোথাও মাথা খাড়া করে উঠছে? একটা কথা ঠিক, মাঝি হিসাবে আমরা এতই অকর্মণ্য যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ভাব খালি খালি বন্দরবিহীন অবস্থায় উপকূলে পড়ে থাকে, যত জারিজুরি তার কাব্যোপসাগরের খাল বিল নালার মধ্যেই, কি বারোয়ারির বন্দরের দিকেই তার পাড়ি, অথবা

বিজ্ঞানচর্চার জলহীন জেটিতে গিয়ে জুটেছে, সেখানে শুধু সেই দুনিয়াদারির জন্যই সাজসজ্জা করে, স্বাভাবিক কোন জলস্রোতের মেলামেশায় আত্মস্থ হয়ে ওঠে না।

ওয়ালডেনে জল ঢোকবার কি বেরোবার পথ বলতে আমি তো বৃষ্টি, বরফ আর বাষ্প ছাড়া আর কিছুর সন্ধান পাই নি, যদিও হয় তো একটা তাপমান যন্ত্র আর ছিপ নিয়ে এমন জায়গা বার করা যেতে পারে, কেন না বাইরের জল এসে যেখানে জলাশয়ে পড়ছে, সেখানটায় সম্ভবত গরম কালে সব চাইতে ঠাণ্ডা আর শীতকালে সব চাইতে গরম হবে। ৪৬—৪৭ সালে যখন বরফের ব্যাপারিরা এখানে কাজ করছিল, তখন একদিন বরফের চাঁইগুলো ডাঙায় পাঠানো হলে, সেগুলো অন্যগুলোর সঙ্গে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখবার মতো যথেষ্ট পুরু নয় বলে যারা গাদা করে রাখছিল, তারা ফেরত দিল। তাই বরফ-কাটিয়েরা আবিষ্কার করে যে অল্প খানিকটা জায়গায় এর বরফ অন্য জায়গার তুলনায় দুই কি তিন ইঞ্চি পাতলা। এই থেকে তাদের মাথায় আসে যে জায়গাটাতে জল ঢোকবার কোন পথ থাকতে পারে। তারাই আমাকে আর একটা জায়গা দেখিয়ে দেয়, সেখানে কোন 'চোরা ছিদ্র' আছে বলে তাদের ধারণা, আর সেই ছিদ্র ভেদ করে জলাশয়ের জল একটা পাহাড়ের তলা দিয়ে পাশের মাঠে গিয়ে পড়তে পারে কি না পরখ করবার জন্য তারা আমাকে বরফের একটা চাঁইয়ের উপর উঠিয়ে দিলে। কিন্তু আমার মনে হয়, যতদিন আরও বড় কোন ছিদ্র ধরা না পড়বে, ততদিন জলাশয়টা মেরামত করার কথা উঠতে পারে না, এ কথা নিশ্চয় করেই বলা যায়। একজন বুদ্ধি বাতলিয়েছেন যে, এমন কোন 'চোরা ছিদ্রে'র সন্ধান মিলে থাকলে মাঠটার সঙ্গে এর যোগাযোগ প্রমাণ করা যেতে পারে—খানিকটা রঙিন আবীর কি করাতগুঁড়ো ছিদ্রটার মুখে ছেড়ে মাঠটার ঝরনাটার উপর একটা ছাঁকনি চাপিয়ে দিলেই হ'ল, স্রোতে গুঁড়োটুড়ো ভেসে আসলে কিছু তার মধ্যে ধরা পড়বেই।

জরিপ করবার সময় আমার চোখে পড়েছে, ষোল ইঞ্চি পুরু বরফও সামান্য হাওয়া উঠলেই জলের মতো দুলছে। বরফের উপর যে লেভেল যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না, এ কথা সকলেই জানে। ডাঙায় লেভেল রেখে বরফের উপর মাপখুঁটি লক্ষ করলে দেখা যাবে, পাড় থেকে এত রড দূরে এর সর্বাধিক তারতম্য তিনের-চার ইঞ্চি, কিন্তু মনে হয় যেন বরফ আর পাড়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। মাঝখানে হয়তো বা এর বেশিও হ'তে পারে। আমাদের যন্ত্রপাতি সেরকম সূক্ষ্ম হলে মাটির বুকের ওঠানামাও ধরতে পারতাম কি না কে জানে। যখন আমার লেভেলের দুটো পায়া ডাঙায়,

তৃতীয়টি বরফে, আর সেটার মাথার উপর দিয়েই দেখাদেখি চলছে, তখন বরফের তিল পরিমাণ ওঠানামাতেই জলাশয়ে ওপারের কোন গাছের কয়েক ফুট পর্যন্ত হেরফের হ'তে দেখা গেছে। যখন গভীরতা পরিমাপের জন্য গর্ত কাটতে সুরু করেছি, বরফের ঘাড়ে দেখি তিন চার ফুট জল, উপরে জোর বরফ পড়ে অত নিচুতে ওকে ঠেলে নামিয়েছে; কিন্তু গর্ত খোড়বার সঙ্গে সঙ্গেই জল এসে সেগুলোর মধ্যে গিয়ে জমতে থাকল আর দুদিন ধরে বেশ তোড়েই বয়ে চলল; ফলে চারদিকের বরফ সব ক্ষয়ে ধুয়ে গেল আর আসলে, প্রধানতই বলা চলে, সেই কারণেই জলাশয়ের উপরটাও শুকিয়ে উঠল, কেন না জল এর মধ্যে গিয়ে পড়ে বরফকে টেনে উঠিয়ে ভাসিয়ে তুলছে। এ যেন খানিকটা, জল বার করতে গিয়ে জাহাজের তলাতেই ছ্যাঁদা করা হয়েছে। যখন এই সব গর্তে বরফ জমে যায় আবার পর পরই বৃষ্টি হয় আর শেষটায় হালফিল বরফ জমে সব কিছুর উপর টাটকা তুলতুলে বরফের পাটি বিছিয়ে দেয়, তখন তার ভিতরটা কালো কালো মূর্তির সুন্দর ফুটকির দাগে ভরে যায়, মাকড়সার জালের মতো চেহারা কিছুটা, বরফ দিয়ে তৈরি কাগজের গোলাপ বলা যায় তাদের, চারপাশ থেকে জল এক কেন্দ্রবিন্দুতে বয়ে আসবার ধারায় এর জন্ম। সময়ে সময়ে বরফ যখন কম কম জল ভরা ছোট ছোট গর্তে ছেয়ে যেত, তখন নিজের দু' দুটো ছায়া দেখতে পেতাম, একটা আর একটার মাথার উপর দাঁড়িয়ে, এটা বরফের উপর, ওটা গাছ কি পাহাড়ের গায়।

জানুয়ারি মাসে তখনও শীত আছে আর তুষার তথা বরফ পুরু তথা জমাট রয়ে গেছে, গ্রাম থেকে প্রাজ্ঞ এক তালুকদার মশায় আসলেন বরফের যোগাড়ে, তাঁর গ্রীষ্মকালীন পানীয় ঠান্ডা হবে; বেশ জানান দেওয়া গেছে, এমন কি একটু দুঃখী রকমের বিচক্ষণ ব্যক্তি, নইলে এই জানুয়ারিতে জুলাই মাসের গরম আর তেষ্টার স্বপ্ন দেখেন,—গরম কোট আর দস্তানা চাপিয়ে। যখন কত সব জিনিসেরই যোগাড় করা হয় নি। বুঝি বা তাঁর পরকালের গ্রীষ্মকালীন পানীয় ঠান্ডা রাখবে, ইহকালে এমন কোন ধনদৌলতও তিনি মজুদ করে উঠতে পারেন নি। জমাট জলাশয়টা কাটলেন, ফাড়লেন তিনি, মাছগুলোর বাড়িঘরের ছাদ তুড়ে দিলেন আর গাড়ি বোঝাই করে তাদের প্রাণরক্ষার সব উপকরণ এমন কি হাওয়াও, দড়িকাছি দিয়ে বাঁধাছাঁদা কাঠের মতো করে শেকল আর খোঁটাখুঁটি দিয়ে এঁটে সেটে সেগুলোকে অনুকূল ঠান্ডা বাতাসে তাঁর ঠান্ডা-ঘরের উদ্দেশ্যে চালান দিলেন, সেখানে গ্রীষ্মকালের অপেক্ষায় মজুদ থাকুক সব। রাস্তার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের, দেখাচ্ছে যেন চাপ চাপ নীলিমা চলেছে। বরফ-কাটিয়েরা কিন্তু বেশ স্ফূর্তিবাজ লোক, হাসিঠাট্টায় গালগল্পে বেশ মশগুল থাকে, ওদের

মধ্যে গিয়ে পড়লে আমাকে ওদের সঙ্গে খানায় খাড়া হয়ে করাত চালাবার বরাত দিত, আমাকে নিচে দাঁড়াতে হ'ত।

৪৬—৪৮ সালের শীতকালটায় শতখানেক খাস সুদূর উত্তর মুল্লুকের লোক একদা সকালে আমাদের জলাশয়ে এসে জুটল, সঙ্গে অনেক গাড়িবোঝাই কিম্ভূত কিমাকার দেখতে সব চাষের যন্ত্রপাতি, তুষারশকট, লাঙল, নালা তৈরির ঠেলাগাড়ি, ঘাস ছাঁটাইয়ের ছুরি-ছোরা, কাস্তে করাত, বিদে; এক একটা লোকের হাতে এক একটা দো-ফলা বল্লম, নিউ ইংলণ্ড ফারমার-এ কি কাল্টিভেটর-এ উল্লেখ নেই তার। বুঝতে পারলাম না এরা হৈমন্তী রাইশস্য, না আইসল্যাণ্ডের সেই সম্প্রতি আমদানি নতুন ধরনের দানাশস্য পুঁততে এল সার-টার কিছু দেখতে পেলাম না, তাই মনে হ'ল মাটিটা নিচে আর অনেকদিন পতিত আছে দেখে আমি যা করেছিলাম, সেই রকম মাটির অদল বদল করার মতলব তাদের। ওরাই খবর দিলে, জনৈক সম্ভ্রান্ত চাষী এর মূলে, তাঁর টাকাকড়ি ডবল করার ফন্দি আঁটছেন; এমনিতেই তার পরিমাণ লাখ পঞ্চাশেক বলে শোনা গেল, তার উপর সেই এক একটা ডলারকে অন্য আর একটা দিয়ে মোড়বার সাধ হয়েছে; তাই এই নিদারুণ শীতের মধ্যে ওয়ালডেনের একমাত্র বসন, তার পক্ষে ছাল-চামড়া, খসাতে তাঁর আগমন। আসা মাত্রই কাজ সুরু করে দিল এরা, পরিপাটি করে লাঙল চালাল, মই ঠেঙগাল, দুরমুশ পিটল, শিরালা ফুঁড়ল, যেন এখানে মডেল ফার্ম খাড়া করতে উঠে পড়ে লেগেছে; কিন্তু আমি যেই একটু ফাঁকে দেখতে গেছি, শিরালার মধ্যে কিসের বীজ ছড়াচ্ছে, অমনি আমার পাশ থেকেই একপাল লোক, বলা কওয়া নেই কেমন এক রকম হেঁচকা মেরে মেরে একেবারে বালি, মায় কাদাজল পর্যন্ত ফুঁড়ে এর অচষা গর্ভমাটি তুলতে সুরু করে দিলে—বেশ সুন্দর দলদলে মাটিটা,—একেবারে খাঁটি মাটি বলতে যা কিছু ছিল—আর শ্লেডগাড়ি বোঝাই করে টেনে নিয়ে চলল সব, তখন ঠাওরালাম তারা জলা থেকে বোদ-মাটির যোগাড়ে এসেছে। এমনি করে, ইঞ্জিন একটা কি রকম শিস দেয় আর তারা রোজ রোজ আসে আর যায়। আমার কেমন মনে হ'ত উত্তর মেরুর এক ঝাঁক তুষার পাখিই বুঝি মেরু অঞ্চলের কোন মুল্লুক থেকে আসাযাওয়া করছে। কিন্তু ওরই মধ্যে ওয়ালডেন-মায়ীও শোধ নিতে থাকলেন, জন মজুরদের কে একজন গাড়ি-বলদ হাঁকিয়ে আসতে পথে হঠাৎ মাটির ফাটলের মধ্যে পা হড়কে একেবারে নরককুণ্ডের মুখে গিয়ে পড়ে আর কি। খানিকটা আগেই যার এত পরাক্রম দেখা গিয়েছিল, আস্ত একটা মানুষের নয় ভাগের এক ভাগ হয়ে গেল সে, প্রায় প্রাণসংশয় ব্যাপার; আমার আস্তানায় আশ্রয় যোটায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, স্টোভও যে একটু আধটু কাজে লাগে, তাও মানতে হ'ল তাকে। কখনও বা বরফবেশী মাটিই কোন লাঙলের ফাল

থেকে ইস্পাত এক টুকরো আত্মসাৎ করে নিত, কি শিরালার ফাঁকে লাঙল-টাই আটক পড়ত, কেটে কুটে বার করতে হ'ত সেটা।

আসল কথা হচ্ছে, একশ' জন আইরিশম্যান ইয়াংকি ওভারসিয়ারদের নিয়ে রোজ বরফ খুঁড়ে নিয়ে যেতে আসত। সেগুলো কি উপায়ে খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয় সকলেরই তা এত ভাল জানা আছে যে তার বর্ণনার দরকার করে না। তারপর সেগুলো বরফের উপর দিয়ে তুষারগাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ঝটপট একটা বরফ-মঞ্চে তুলে ফেলা হ'ত আর লোহার আংটা, কুঁদো, দড়াদড়ি সব লাগিয়ে ঘোড়া দিয়ে উঁচুতে তুলে বরফের গাদার ওপর ময়দার সব বস্তার মতো অক্লেশে খাড়া করে রাখা হ'ত, সেখানে সার সার বেশ পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হ'ত তাদের—যেন মেঘ বিঁধতে পারে এত উঁচু চৌকোণা একটা স্তম্ভ বসাবার কথা, এরা তাকে খাড়া করবার পাকা বনেদ। লোকগুলো আমাকে বলেছে কাজ ভাল চললে দিনে হাজার টনের মতো, অর্থাৎ এক জায়গায় যতটা পাওয়া যায় বরফ খুঁড়ে নেওয়া চলে। বারবার তুষারগাড়ির যাতায়াতে বরফের বুকে খটখটে মাটির মতোই গভীর হয়ে চাকার দাগ, পাকাপাকি রকমের গর্ত পড়ত সব আর ঘোড়াগুলো নির্ঘাত বরফের চাঁইগুলোর বালতির মতো ফোকর হওয়া ফুটো থেকে তাদের দানা চিবিয়ে যেত। এই ভাবে তারা খোলা জায়গাতেই বরফের চাঁইগুলো গাদা করে রাখল, পাশ থেকে পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু স্তূপ একটা, ছয় কি সাত রড চৌকো হবে, যাতে হাওয়া না ঢুকতে পারে বাইরের দিকে খাঁজের ফাঁকে ফাঁকে বিচালি গোঁজা; কেন না সব সময়ে খুব ঠাণ্ডা না হলেও হাওয়া একটু পথ পেলে হয়, এখানে ওখানে সামান্য দুয়েকটা ঠেকনো কি গজাল বাদ দিয়ে বড় বড় সব ফাটল ধরিয়ে শেষাশেষি সবটাকেই উলটিয়ে ফেলে দেবে। প্রথম দিকে সেটাকে নীল রঙের একটা বিরাট দুর্গ কি ভালহাল্লা বলে ঠেকত, কিন্তু বাজে মার্কা মেঠো খড় দিয়ে যখন তার ফুটো ফাটায় গুঁজি দিতে আরম্ভ করল তারা আর সেটা নীহারকণার আর কুচি কুচি বরফের তলায় ঢাকা পড়ল, তখন গৌরবময় তুষারকিরীট প্রাচীন একটা আপাদমস্তক শ্যাওলা-ছাওয়া ধ্বংসস্তূপ মনে হ'ত সেটাকে—নীল রঙের মারবেল পাথরে তৈরি শ্রী শীতের আবাস, পঞ্জিকায় যে বৃদ্ধের দেখা পাই, তাঁর খুপরি, বুঝি আমাদের সঙ্গেই থেকে গরম কাটাবার মতলব আঁটছেন তিনি। ওরা খতিয়ে বুঝল যে, এর শতকরা পঁচিশভাগও লক্ষ্যস্থল অবধি পৌঁছবে না আর শতকরা দু তিন ভাগ গাড়িতে অপচয় হবে। যাই হ'ক গাদা দেওয়া মালের বেশি ভাগ যা বাকি রইল তাও ইচ্ছার অতীত নিয়তির ভোগে লাগল; কেন না হিসেবের অতিরিক্ত হাওয়া ঢোকায়, যতটা ধরা হয়েছিল ততটা না টেকার জন্যই হ'ক কি আর যে কারণেই হক বরফটা বাজার

পর্যন্ত গিয়ে উঠল না। ৪৬—৪৭ সালের শীত ঋতুতে মজুদ হিসেব মতো দশ হাজার টন পরিমাণ গাদা দেওয়া মালটা শেষে খড় আর তক্তা দিয়ে মোড়া হ'ল আর পরের বছর জুলাই মাসে তার সে আবরণ মুক্ত করে কিছু মাল নিয়ে যাওয়া হলেও বাকিটা রোদে খোলা অবস্থাতেই পড়ে থাকল; এমনি ভাবে সারাটা গ্রীষ্ম আর শীতকাল খাড়া রইল এ, ১৮৪৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্তও সম্পূর্ণটা গলে যায় নি। কিন্তু অবশেষে এর অধি-কাংশটা জলাশয়ই পুনরুদ্ধার করে নিল।

ওয়ালডেনের জলের মতোই বরফও কাছ থেকে খানিকটা সবুজ দেখায়, কিন্তু একটু দূর থেকে মনোরম নীল; নদীটার সাদা বরফ, কি সিকি মাইল ওধারেই যে ক'টা পুষ্করিণী, সেগুলোর শুধু সবুজ বরফ থেকে একে বেশ আলাদা বলে চেনা যায়। এক এক সময় বরফওয়ালার গাড়ি থেকে এই বিরাট চাঁইয়ের এক একটা গ্রামের রাস্তায় পড়ে যায় আর সপ্তাহ ধরে পথের লোকদের বিরাট মরকত-মণির মতোই কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে থাকে। আমি লক্ষ্য করেছি, একই জায়গা থেকে ওয়ালডেনের একটা ধার জলভরা অবস্থায় সবুজ লাগছে, আবার জমে গেলে সেখানটাই নীল লাগছে। এই রকম শীতকালে এই পুষ্করিণীটার চারপাশের সব খাদ কখনও এর জলের মতো সবুজে ভরে যায়, কিন্তু পরদিনই আবার বরফ জমে নীল হয়ে ওঠে। সম্ভবত ভিতরের জল আর হাওয়ার দরুণই জল আর বরফ নীল লাগে, সুতরাং; যেখানটা খুব স্বচ্ছ, সেখানটাই খুব নীল। চিন্তার খোরাক হিসেবে বরফ বিচিত্র ব্যাপার। লোকের কাছে শুনেছি, ফ্রেশ পণ্ডের কয়ে-কটা বরফের আড্ডায় পাঁচ বছরের বাসি বরফও একেবারে টাটকা থাকে। বালতিতে জল কেন অচিরাৎ দূষিত হয়, জমে গেলে কেনই বা অতকাল ধরে সুস্বাদু থাকে? রাগদ্বেষ আর বুদ্ধিবিবেচনার যে পার্থক্য তাও মোটা-মুটি এই বলে শোনা যায়।

এই রকম আমার জানালা থেকে ষোলটা দিন ধরে শতখানেক লোককে বলদ ঘোড়া আর, দেখে যা মনে হ'ত, চাষের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে চাষীদের মতোই হন্তদন্ত হয়ে কাজ করতে দেখলাম, ঠিক পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠাতে যেমন চোখে পড়ে, সেই ছবি; আর যতবারই চেয়ে দেখেছি সেই ভরত পাখি আর শস্যসংগ্রাহকদের কথা আর বীজবপনকারীর কাহিনী ইত্যাদি সবই মনে পড়েছে; আজ আর কেউ কোথাও নেই, হয়তো আর ত্রিশটা দিন পরেই এই জানালা দিয়ে চাইলে দেখতে পাব ওয়ালডেনের সেই নির্মল সাগর-নীল জলে মেঘের আর গাছের ছায়া পড়েছে আর একা একা আকাশে সে বাষ্প তুলে চলেছে শুধু, একটা মানুষও যে কোনদিন এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, কোন চিহ্নই নেই তার। হয়তো বা শুনতে পাব একলা

একটা লুন হাসছে আর ডুব খাচ্ছে আর ডানা ঝাপটাচ্ছে, কি দেখব ভাসা পাতার মতো একলা একটা মেছুড়ে ঢেউয়ের মধ্যে নিজের মূর্তির ছায়ার দিকে চেয়ে আছে—এইখানে, এই সেদিন যেখানে একশট্টা লোক নির্বিঘ্নে দৌড়ঝাঁপ করে গেছে।

তাহ'লে দেখি, তাপে জর্জর সব লোকই, চার্লস্টন আর নিউ অরলিন্স, মাদ্রাস আর বোম্বাই আর কলকাতা, সব জায়গা থেকে আমারই ঘাটের জল খান। ঊষাকালে আমি ভগবদ্গীতার বিরাট বিশ্বরূপের দর্শনে নিজের ধীকে অবগাহন স্নান করাই, এই রচনার পর কত ভাগবদ্‌বর্ষ কেটে গেছে, তবু তার তুলনায় বর্তমান কাল আর তার সাহিত্যকে কি নগণ্য আর তুচ্ছই না মনে হয়; এর বিরাটত্বের ধারণা আর আমাদের ধারণার মধ্যে এত ব্যবধান যে, এতে প্রাক্তন কোন সৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে বলে আমার মনে হয়। পুঁথি বন্ধ করে ঘাট থেকে জল তুলতে গেলাম আমি, চেয়ে দেখি ব্রহ্মা-বিষ্ণু ইন্দ্রের সেই পূজারী ব্রাহ্মণের শিষ্য, এখনও যিনি গঙ্গার ধারে তাঁর মন্দিরে বসে আছেন, কি লাঠি-লোটা নিয়ে গাছের তলা সার করেছেন। তাঁর শিষ্যের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁর গুরুর জন্য জল নিতে এসেছেন তিনি, আমাদের দুজনের ঘটই যেন একত্র এক ঘাটে ঝনাৎ করে বেজে উঠল। ওয়ালডেনের নির্মল জলের সঙ্গে গঙ্গার পুণ্যোদক এক হয়ে গেল। বায়ু অনুকূল ছিল, পৌরাণিক আটলান্টিস আর হেসপেরাইডিস দ্বীপাঞ্চল ছেড়ে ভেসে চলল, হ্যানোর পথে সমুদ্র পাড়ি দিল, তারপর টারনট দ্বীপ আর টাইডোর, পারশ্য উপসাগরের উপকন্ঠ হয়ে ভেসে গিয়ে ভারত মহাসাগরের অয়নান্তবৃত্তের প্রবল হাওয়ার মধ্যে যেসব বন্দরে গিয়ে উঠল, আলেকানারাই শুধু তাদের নাম শুনেছিলেন।

॥ ১৭ ॥ বসন্ত

বরফ সাফ করার গাঁইতি দিয়ে বেশ খানিক জায়গা খুঁড়ে ফেললে সাধারণত পুষ্করিণীর বরফ তাড়াতাড়ি গলে যায়, কেন না, শীতের মধ্যেও বাতাসের ধাক্কায় ছল ছলিয়ে উঠে জল জমাট বরফে ধ্বস নামায়। কিন্তু সে বৎসর ওয়ালডেন-এ ব্যাপার এমন ঘটে নি, জীর্ণবাসের বদলে অচিরাৎ দেখা গেল সে পুরু নববাস জুটিয়ে ফেলেছে। এর গভীরতা বেশি বলে, আর একে ভেদ করে কোন স্রোতস্বিনী না যাওয়ার দরুন এর বরফ গলে যেতে বা ধ্বসে পড়তে পারে না বলে, চারপাশের আর ক'টা পুষ্করিণীর মতো এর বরফ তেমন তাড়াতাড়ি গলে যায় না। শীত থাকতে এর বরফ গলেছে বলে কখনও শুনি নি আমি, পুষ্করিণী মাত্রকেই যে সময়টাতে কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, সেই বাহান্ন-তিপ্পান্ন সালেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। পয়লা এপ্রিলের কাছাকাছি সাধারণত এর বরফ পরিষ্কার হয়, ফ্লিন্ট পন্ড কি ফেয়ার হ্যাভ্-নের সাতদিন কি দশ দিন পরে; গলা সুরু হয় উত্তর দিকটাতে আর যে দিকটা থেকে প্রথম জল জমতে সুরু করে সেই অগভীর অংশে। এ অঞ্চলের কোন জলাশয়ের চাইতে ঋতুপরিক্রমার অভ্রান্ত লক্ষণ এখানেই বেশি মেলে—আবহাওয়া বদলের ক্ষণিক প্রভাব একে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। মার্চ মাসে কয়েক দিনের জন্য শীতের প্রকোপ বেশি হ'লে আর সব পুষ্করিণীর বরফ গলার সময় বেশ কিছুদিন পিছিয়ে যায়, কিন্তু ওয়ালডেন-এর তাপমাত্রা প্রায় অব্যাহত ভাবেই বাড়তে থাকে। ১৮৪৭ সালের মার্চ মাসের ছয় তারিখে ওয়ালডেন-এর মাঝখানে থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল সেখানে তাপ ৩২ ডিগ্রী অর্থাৎ হিমাঙ্ক; তীরের কাছ ঘেঁষে ৩৩ ডিগ্রী; ফ্লিন্ট পন্ডের মাঝখানে ঐ দিনের তাপমাত্রা ৩২½ ডিগ্রী; তীর থেকে কয়েক ডজন দূরে, অগভীর জলে, এক ফুট পুরু বরফের তলায় ৩৬ ডিগ্রী। এই পুকুরটার গভীর আর অগভীর অংশের তাপমাত্রায় সাড়ে তিন ডিগ্রীর এই পার্থক্য আর পুকুরটার জল তুলনায় বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই অগভীর—এ থেকে বেশ বোঝা যায় কেন ওয়ালডেন-এর চাইতে এর বরফ এত আগে গলে যায়। জল যেখানে সব চাইতে অগভীর, এই সময়টায় সেখানে যে বরফ জমে ছিল, তা

মাঝ-পুকুরের বরফের চাইতে কয়েক ইঞ্চি কম পুরু। আবার গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীর ধারে ধারে জল ভেঙে যিনিই গিয়েছেন তিনিই নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, তীরের কাছে যেখানে জল তিন কি চার ইঞ্চি গভীর সেখানকার জল খানিকটা দূরের জলের তুলনায়, কি জল যেখানে গভীর, তার উপরের দিকের জল, তলার কাছাকাছি জলের তুলনায়, কম গরম। বসন্তকালে সূর্য হাওয়া আর মাটির তাপ বাড়িয়ে তার মারফত তাপ বিকিরণ তো করেই, উপরন্তু সেই তাপ এক ফুট কি বেশি পুরু বরফ ফুঁড়ে নিচে গিয়ে জল যেখানে অগভীর তার তলায় পেঁাছে প্রতিফলিত হয়, জল তাতিয়ে দেয়, নিচের দিককার বরফও গলিয়ে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে আরও সোজাসুজি বরফ গলার কাজ চলতে থাকে, সুতরাং উপর দিকটা অসমান হয়ে পড়ে আর ভিতরে যে বুদ্বুদ থাকে তা উপরে নিচে সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়ে পুরোপুরি মৌচাকের আকার ধারণ করে; তারপর হঠাৎ একদিন এক পশলা বাসন্তী বৃষ্টিতে সব উবে যায়। বরফেরও আঁশ থাকে হুবহু কাঠেরই মতো; বরফের চাঁই যখন একটু একটু গলতে সুরু করে, মানে চাক বাঁধে, অর্থাৎ মৌচাকের মতো চোহারা নেয়, তখন যে অবস্থাতেই থাক, তার বায়ুকোষগুলো জলের যেটা উপরিভাগ ছিল, তার সমকোণী থাকে। যেখানে নিচে থেকে একটা পাথর কি কাঠ প্রায় উপর পর্যন্ত উঠে আসে, তার গায়ে বরফ বেশ কম পুরু হয়ে জমে, আর প্রায়ই তা প্রতিফলিত তাপে গলে যায়; শুনেছি, কেম্ব্রিজে যখন কাঠ দিয়ে অগভীর জলাশয় বানিয়ে জল জমাবার পরীক্ষা করা হয়, তখন যদিও তার নিচে ঠান্ডা হাওয়ার চলাচল-ব্যবস্থা আর দুপাশেই তা লাগাবার বন্দোবস্ত থাকে, তখন তলা থেকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে অনুকূল অবস্থার বেশি প্রতিকূল ক্রিয়া সৃষ্টি করে। শীতের মাঝামাঝি কালে গরম বৃষ্টিতে ওয়ালডেন-এর চাপধরা বরফ গলে গিয়ে যখন তার মাঝখানটিতে কঠিন, কালচে কি স্বচ্ছ বরফের চাঁই জমে, তখন এক চাপড়া রদ্দি অথচ বেশ পুরু সাদা বরফ, এক কি তারও বেশি রড জুড়ে, কূল ঘেঁষে প্রতিফলিত তাপ লেগে জমে থাকে। আবার, যে কথা আগে বলা হয়েছে, বরফের মধ্যেকার বুদ্বুদই আতশী কাচের মতো কাজ ক'রে নিচেকার বরফ গলিয়ে দেয়।

বাৎসরিক এই নিসর্গ-ক্রিয়া প্রত্যেক দিন যে কোন জলাশয়েই অল্পবিস্তর ঘটছে। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রত্যেকদিন সকালবেলায় অগভীর জল গভীর জলের চাইতে বেশি তাড়াতাড়ি গরম হ'তে থাকে, যদিও তেমন কিছু গরম হয়তো হয় না; আবার, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত আরও তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হ'য়ে চলে। দিন বৎসরের সংক্ষিপ্তসার। রাত্রিটা শীতকাল, সকাল আর সন্ধ্যা বসন্ত আর শরৎকাল, আর দুপুরটা

গ্রীষ্মকাল। বরফের চড়াৎ আর ফট ফট শব্দ থেকে তাপমাত্রার বদলের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৫০ সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারি, শীতার্ত রাত্রির অবসানে স্নিগ্ধ প্রভাতে ফ্লিন্ট পণ্ডে দিন কাটাতে গেছি; আমার কুড়ুলের ডগা দিয়ে বরফে ঘা মারতেই অবাক হলাম শুনে যে চারপাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঝাঁজরের মতো আওয়াজ দিচ্ছে যেন একটা শক্ত ঢোলকের গায়ে ঘা দিয়েছি। পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্যকিরণ ঢালু হয়ে এসে এর গায়ে তাত লাগতেই সূর্যোদয়ের পর প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সারা পুষ্করিণীটা যেন গমগম করতে থাকল; একটা মানুষ যেন ঘুম ভেঙে উঠে আড়ামোড়া ভাঙছে আর হাই তুলছে, প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরে আওয়াজটা ক্রমশ বেড়ে বেড়ে ক্ষান্ত হ'ল। দুপুরবেলায় খানিক দিবানিদ্রা দিয়ে নিল, পরে সূর্য যেই তাত গুটিয়ে নিল, রাত্রের দিকে আবার সেই আওয়াজ শুনতে পেলাম। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে পুষ্করিণী নিত্য নিয়মিতভাবে সন্ধ্যার তোপ দেগে যায়। কিন্তু ঠিক দুপুর বেলায় চারপাশের ফটাফট শব্দে আর হাওয়ারও তেমন খেলা থাকে না বলে এর অনুনাদ একেবারে নীরব থাকে, তখন এর গায়ে ঘা দিলে কোন মাছ কি মাস্করাাটও বুঝি বিহ্বল হয় না। জেলেরা বলে যে, "পুকুরের গর্জনে," মাছেরা ভয় পেয়ে টোপ গেলে না। প্রতিদিন সন্ধ্যাতেই যে পুকুর গর্জন করে, তা নয়, ঠিক ক'রে বলাও যায় না কখন গর্জন করবে; কিন্তু আমি বাইরে কোন পরিবর্তন দেখতে না পেলেও এ ঠিক বোঝে। কে সন্দেহ করতে পারবে যে এই বৃহৎ হিমশীতল স্থূলচর্ম বস্তুর এমন স্পর্শকাতরতা; তবু, বসন্তে যেমন ফুল ফুটবেই ফুটবে, তেমনি এর নিজেরই বিধানের ইঙ্গিতে এও গর্জন করে। প্রাণময়ী ধরিত্রীর চতুর্দিক চক্ষুময়। আবহাওয়ার পরিবর্তনে নলের ভিতর পারদবিন্দুর মতো সুবৃহৎ জলাশয়ও সাড়া দিয়ে ওঠে।

বনবাসে যাবার আমার একটা লোভ ছিল এই যে বসন্তের আবির্ভাব লক্ষ্য করার অবসর আর সুবিধে মিলবে। পুষ্করিণীর বরফ শেষ পর্যন্ত চাক বাঁধতে সুরু করল, পায়ের গোড়ালি ঢুকিয়ে তার উপর হাঁটতে পারি এখন। ব্যাঙ, বৃষ্টি আর তপ্ত সূর্য ক্রমশ বরফ গলাতে সুরু করলে; দিন বড় হয়ে আসছে বেশ বোঝা যায়; বুঝলাম আরও কাঠ গাদা না করেও শীতকালটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে—খুব জোর আগুনের আর দরকার হবে না। বসন্তের প্রথম ইশারার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি, আগন্তুক কোন পাখির আচমকা কাকলি শোনবার জন্য কান পেতে রয়েছি, ডোরা-কাটা কাঠবেরালের শীতের ভাঁড়ারও তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এতদিনে, তার কিচমিচ কখন শুনতে পাব, উডচাক কখন তার শীতাবাস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় দেখব। মার্চ মাসের তের তারিখ পর্যন্ত, ব্লু-বার্ড, সংস্প্যারো, আর

রেড-উইং-এর ডাক শোনার পরও বরফ প্রায় এক ফুট পুরু হয়ে জমে আছে। আবহাওয়া গরম হয়ে আসছে, কিন্তু বরফ জলে ধুয়ে যাবার, কি গলে যাবার, কি নদীতে যেমন দেখা যায়, ভেঙে ভেসে যাবার তেমন কোন লক্ষণই দেখা যায় না; পাড়ের কাছে প্রায় আধ রড চওড়া জায়গার বরফ সম্পূর্ণ গলে গেছে বটে, মাঝখানে তবু চাক ধরে আছে, জলে জলময় হয়ে আছে, এমন যে ছয় ইঞ্চি পুরু বরফের মধ্যেও অনায়াসে পা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়; পরদিন সন্ধ্যার মধ্যেই হয়তো কি তার আগেই এক পশলা গরম বৃষ্টি হ'ল আর পরে কুয়াসা করল—সব একেবারে সাফ হয়ে যাবে, কুয়াসার সঙ্গে সঙ্গে সব উধাও হবে, উবে যাবে। এক বৎসর, এমনি সব উধাও হয়ে যাবার পাঁচ দিন আগে আমি মাঝপুকুর পার হয়েছিলাম। ১৮৪৫ সালে সবপ্রথম পয়লা এপ্রিল ওয়ালডেন পরিষ্কার হয়ে যায়; ৪৬ সালে হয় ২৫শে মার্চ; ৪৭ সালে ৮ই এপ্রিল; ৫১ সালে ২৮শে মার্চ; ৫২ সালে ১৮ই এপ্রিল; ৫৩ সালে ২৩শে মার্চ; ৫৪ সালে ৭ই এপ্রিলের কাছাকাছি।

আমরা যে দেশে বাস করি, সেখানে শীত আর গ্রীষ্ম দুইই প্রচণ্ড হওয়ায় আমাদের কাছে নদী আর পুষ্করিণীর বরফ মোচন আর আবহাওয়ার থিতু হওয়ার ব্যাপারের প্রত্যেকটি ঘটনাই বিশেষ রমণীয়। যখন দিনের তাপ বেড়ে ওঠে, তখন যারা নদীর ধারে বাস করে তারা কামান দাগার আওয়াজের মতো রাত্রে বরফ ফাটার পিলে চমকানো হুংকার শুনতে পায়, যেন তার বরফের শেকলের আগাগোড়া ছিঁড়ে পড়ল; তার কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পায় হু হু করে বরফ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে। যেমন কাদার আড়াল থেকে কুমীররা ভূমিকম্পের সময় বেরিয়ে আসে। জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রকৃতিকে এমন অন্তরঙ্গ ভাবে লক্ষ্য করে এসেছেন আর তার কাণ্ড-কারখানা সম্বন্ধে তিনি এত ওয়াকিবহাল যে মনে হয় তিনি যখন শিশু তখনই কেবল প্রকৃতির যাত্রা সুরু এবং সেই যাত্রার দিনে তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন—যে অবস্থায় তিনি এসে পৌঁছেছেন, এর পর মেথুসেলার মতো অনাদি অনন্তকাল বেঁচে থাকলেও প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন কোন পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারবেন না—প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁরও বিস্ময়বোধ আছে, এমন কথা তাঁর কাছ থেকে শুনে অবাক হয়েছিলাম, কেন না, আমার যেন কেমন মনে হ'ত প্রকৃতির সব রহস্যই তিনি জেনে ফেলেছেন; তিনি আমাকে বলেছিলেন, একদা এক বসন্তের দিনে নৌকো নিয়ে বেরোন, সঙ্গে তাঁর বন্দুক, ইচ্ছা যে একটু শিকার-শিকার খেলা করেন হাঁসেদের নিয়ে। মাঠে তখনও বরফ রয়েছে, কিন্তু নদীতে তার চিহ্ন নেই; তিনি থাকতেন সুডবেরি অঞ্চলে, সেখান থেকে নির্বিঘ্নে নৌকো বেয়ে ফেয়ার

হ্যাভ্‌ন পণ্ডে এসে পৌঁছে দেখলেন পুকুরটার বেশিটাই তখনও শক্ত বরফে ভরা, এমনটা আশা করেন নি। দিনটা গরম অথচ প্রায় সমস্তটা বরফই রয়ে গেছে দেখে খটকা লাগল। হাঁসেদের পাত্তাই নেই দেখে পুষ্করিণী-টার উত্তর অর্থাৎ পিছন দিকটাতে একটা দ্বীপের আড়ালে নৌকোকে লুকিয়ে রাখলেন আর নিজে তাদের প্রতীক্ষায় দক্ষিণ দিকটায় ঝোপঝাড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেন। কূল থেকে তিন চার রড পর্যন্ত বরফ গলে গেছে, স্থির ঈষদুষ্ণ জলে সেখানটা টুবুটুবু, তলায় পাঁক—হাঁসেরা যেমনটি ভালবাসে; ভাবলেন অচিরাৎ কয়েকটা উড়ে এসে জুটতেও পারে। ঘন্টাখানেক চুপ করে পড়ে আছেন—অস্পষ্ট ধ্বনি শুনতে পেলেন যেন অনেক দূর থেকে আসছে, কিন্তু আশ্চর্য রকম গুরু-গম্ভীর আর মর্মস্পর্শী আর অশ্রুতপূর্ব, ক্রমশ ফুলে আর বেড়ে উঠছে, যেন চাপা দুঃখ আর রাগের ঝাপটা একটা আর গোঙানি বিশ্বময় ছড়িয়ে অবিস্মরণীয় পরিণতি চাইছে, হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল যেন বিরাট এক ঝাঁক পাখি উড়ে এসে বসবে এখানে, বন্দুক পাক্‌ড়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন উত্তেজিত হয়ে, কিন্তু দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, তিনি যে সময়টা বসে কাটিয়েছেন, তার মধ্যে একজোটে সমস্তটা বরফ নড়তে আরম্ভ করেছে, পাড়ের কাছে এসে গেছে, আর যে শব্দ তিনি শুনেছেন, তা তারই পাড়ে আছড়ে পড়ার শব্দ—প্রথমটায় আস্তে আস্তে যেন ঠোকরাচ্ছে, তারপর গুঁড়ো হবার আওয়াজ আর সবশেষে ফুঁসে ফুলে অনেকখানি উঁচুতে উঠে সারা দ্বীপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে একেবারে নিথর মেরে যাওয়া।

অবশেষে সূর্যকিরণ সমকোণে এসে পৌঁছোল, গরম হাওয়া কুয়াসা আর বৃষ্টি ফুঁ দিয়ে দূর করে দিল, বরফের পাড় গলে পড়ল; কুয়াসা তাড়িয়ে হাসিতে সূর্য ধূসর-ধবল বন্ধুর ভূ-দৃশ্য ভরে দিল; সুগন্ধির নির্যাস উঠছে, তার মধ্যে দিয়ে পথিক এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পায়ে হেঁটে চলেছে, নদী-নালার হাজার গুঞ্জনের সুরে তার মন খুশি হয়ে ওঠে, তাদের ধমনী যেন শীতের রক্তে ভরে গেছে—তারা তাই বেয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলছে।

গাঁয়ে যেতে পথে রেলরাস্তা পড়ত, সেই রেলরাস্তার গভীর খাদের দুপাশ বেয়ে বালি আর কাদা নানা চেহারা নিয়ে বরফের সঙ্গে গলে গলে ঝরে পড়ছে—প্রকৃতির এই খেলা দেখে যে আনন্দ পেয়েছি কদাচিৎ তা পাওয়া যায়; সচরাচর এতখানি জায়গা জুড়ে এমন দৃশ্য দেখা যায় না, কিন্তু রেল আমদানির পর থেকে ঠিকঠাক মালের হালফিল পাড়ের সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক বেড়ে থাকবে। উপাদানটা হ'ল হরেক রকম সূক্ষ্ম কণা আর রকমারি রঙবেরঙের বালি, তার সঙ্গে কাদার মেশাল সব সময়ে লেগে আছে।

বসন্তকালে যখন তুষারপাত এমন কি শীতকালে বরফ গলা সুরু হয় যেদিন বালুকণাগুলো ঢালু পাড় বেয়ে লাভার মতো ছুটে নামতে থাকে সেদিন—বরফ ফেড়ে ফুঁড়ে ছড়িয়ে যায় মধ্যে মধ্যে, আগে যেখানে বালি দেখা যায় নি সেখানেও উপছে পড়ে। অসংখ্য ছোট ছোট খাল ছুটে চলেছে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, কখনও মিলে মিশে একাকার হয়ে বিচিত্র এক সংকর দ্রব্য বুকে নিয়ে—অর্ধেক যার স্রোতস্বিনীর নিয়ম মানে, বাকি অর্ধেক উদ্ভিজ্জের। গড়িয়ে যেতে যেতে এরা সব রসালো পাতা কি দ্রাক্ষালতার আকার নেয়, শাঁসালো ডাঁটার মতো এক ফুট কি আরও বেশি পুরু, উপর থেকে দেখলে মনে হবে থরে থরে সাজানো খাঁজকাটা তুলতুলে পাহাড়ী শাওলা সব দল মেলেছে; মনে পড়বে প্রবালপুঞ্জের কথা, কিংবা চিতাবাঘের থাবা কি পাখির পা, কিংবা মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড কি পাকস্থলী কি নাড়ীভুঁড়ি আর সব রকমের ক্লেদ। বাস্তবিকই কিম্ভুতকিমাকার সৃষ্টি একটা, ব্রোঞ্জে এর চেহারা আর রঙের নকল দেখা যায়, স্থাপত্য গাত্রের পত্রপল্লবচিত্রের মতো, একান্থ্যাস-এর চাইতেও প্রাচীন আর প্রতীকাত্মক, চিকরি, আইভি আর ভাইন কি ঐ সব জাতের উদ্ভিদের পাতার মতো, হয়তো কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের কোন ভূতাত্ত্বিকের কাছে প্রহেলিকা হ'বার নিয়তি আছে এর। সমস্ত খাদটাকে মনে হ'ত আমার যেন স-স্ট্যালাকটাইট কোন গুহা আলোয় ধরা পড়েছে। বিভিন্ন বর্ণের বালুকণার আশ্চর্য মনোরম সমাবেশ, লোহাটে সব রঙ নজরে পড়ে, বাদামি, ধূসর, হলদে, লাল। যখন সব সমেত পাড়টার নিচে নালার মুখে গিয়ে জমে, তখন চারপাশে বহুধারায় ছড়িয়ে পড়ে। আলাদা আলাদা স্রোতস্বতী সব, অর্ধ গোলাকৃতি, ক্রমশ বদলে চ্যাপ্টা হয়ে আসছে আর চওড়ায় বাড়ছে, যত জলে চুপসে যাচ্ছে সব, এক হয়ে ছুটছে, পরিণামে প্রায় বালুচরে পরিণত হবে, কিন্তু এখনও নানা সুন্দর রঙের আভাস দেয় আর আদিপর্বে যে চেহারা নিয়ে জন্মেছিল, তারও হদিস পাওয়া যায়, শেষপর্বে জলে গিয়ে পড়ে সব ব-দ্বীপের মতো হয়ে যায়, নদীর মোহানার মুখে যেমন হয়, জন্মকালের সে উদ্ভিজ্জের চেহারা নদীর জলে বীচিমালার চিহ্নে লীন হয়ে যায়।

বসন্তকালে একটা দিনের মধ্যেই, কুড়ি থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু সমস্তটা পাড়ের একটা দিক, অথবা দুইদিকেই সিকি মাইলটাক নিয়ে কখনও কখনও এই রকম পত্রগুচ্ছের স্তবকে, অর্থাৎ চূর্ণ বালিতে, ভরে যেত। বালির এই পত্রপুঞ্জের এমন আকস্মিক আবির্ভাবই লক্ষ্যের বিষয়। একদিকে পাড় নিঃস্পন্দ পড়ে রয়েছে—সূর্যের আলো প্রথম একটা দিকেই পড়ে—অন্য দিকে একঘন্টার কীর্তি এই পত্রপুঞ্জ যখন দেখতাম, তখন মনকে বড় আশ্চর্যরকমে নাড়া দিত, যে শিল্পী এই বিশ্ব আর আমাকে সৃষ্টি করেছেন

তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে যেন দাঁড়িয়েছি, যেখানটিতে তিনি এখনও কাজ করে চলেছেন, এই তীরকে নিয়েই তাঁর খেলা চলেছে, সেখানে তিনি অজস্র শক্তিতে তাঁর নতুন পরিকল্পনার দেদার নক্সা এঁকে চলেছেন। মনে হয়, বিশ্ব পৃথিবীর অন্তঃস্থলের নিকটে গিয়ে পৌঁছেছি যেন, কেন না প্রাণিদেহের অন্তঃস্থলও তো এই বালুময় লীলা-প্রাচুর্যের মতো পত্রাত্মক একটা পদার্থ। এই বালুকণার ভিতরেই তাই উদ্ভিদ-পত্রের সম্ভাবনা দেখা যায়। ধরণী যে ভাব নিয়ে অন্তরালে এমন সাধনা করছেন, বাইরে পত্রাকারে তার প্রকাশে অবাক হবার কিছু নেই। পরমাণুরা ইতিমধ্যেই সে-বিধান আয়ত্ত করে ফলপ্রসবোন্মুখ হয়ে আছে। পাতারা উপর থেকে এইখানেই তাদের মূল আদর্শের সন্ধান লাভ করছে। অভ্যন্তরে ভূদেহ কি প্রাণিদেহ যারই হ'ক, এ হচ্ছে সিক্ত, পুষ্ট গোলাকৃতি প্রত্যঙ্গ, 'লোব', যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড কি মেদরাশির পত্রসন্নিবেশ সম্বন্ধেই যে কথাটা বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয় (লেবার, ল্যাপসুস—নিম্নমুখী নিঃসরণ কি ক্ষরণ; গ্লোবাস, লোব, গ্লোব; আবার ল্যাপ, ফ্ল্যাপ ইত্যাদি অনেক শব্দই); কিন্তু বাহ্যত এর প্রকাশ একটা শুকনো শীর্ণ পাতায়। ঠিক যেমন b শুকিয়ে আমশী হয়ে দাঁড়ায় f আর v। লোব কথাটার মূল শব্দ হচ্ছে এল-বি, তরল এল কোমল পিণ্ড বি-কে পেছন থেকে এগিয়ে দিচ্ছে (এক লতি হ'ল b আর দু' লতি হল B)। গ্লোব শব্দে জি-এল-বি, কন্ঠ্য বর্ণ জি-র অর্থকে কণ্ঠের শক্তির জোর যোগাচ্ছে। পাখির ডানা আর পালক হচ্ছে আরও শুকনো শীর্ণ পাতা। অমনিভাবেই একতাল পিণ্ডাকৃতি কীটাণু থেকে আকাশচারী প্রজাপতির সৃষ্টি। ভূমণ্ডলটাই ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করে' রূপান্তরিত হয়ে নিজের কক্ষপথে ডানা মেলে চলেছে। বরফেরও সুরু সূক্ষ্ম কেলাসিত পত্ররূপে, যেন জলময় দর্পণে জলজ চারারা তাদের পাতার যে প্রতিবিম্ব এঁকে রেখেছে, সেই ছাঁচে ঢালাই হয়েছে। সমস্ত গাছটাই তো একটা পাতা আর নদীগুলোও পাতারই আরও বৃহৎ সংস্করণ, মাঝখানে মাটির অংশ সেই পাতার মজ্জা, তার উপরে নগর আর শহরগুলো যেন পোকা-মাকড়েরা ডিম পেড়েছে।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বালুকা-স্রবণে বিরাম ঘটে, কিন্তু সকালেই আবার স্রোত বইবে, শাখা-উপশাখায় অগণিত ধারায় আবার বয়ে চলবে। রক্তবাহিকা শিরা-উপশিরা কি ভাবে গড়ে ওঠে সম্ভবত এর মধ্যে তার সন্ধান মিলতে পারে। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রথমটায় গলিত পিণ্ড থেকে নরম বালুর একটা ধারা আঙুলের ডগার মতো একটা ছুঁচলো মুখ নিয়ে, পথ ঠাহর করতে না পেরে আস্তে আস্তে এঁচে দেখতে চাইছে সামনে কি আছে; তারপর বেলা যত বাড়ে, ততই আরও তাপে আরও বরফ

গলে আর তখন তার সব চাইতে তরল ভাগটা সব চাইতে অনড় পিণ্ড যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে অনুসরণের চেষ্টা করে তার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়, সে তখন নিজের পথ নিজেই আঁকাবাঁকা ধারায় অর্থাৎ ধমনীতে খুঁজে বার করে, মধ্য ভাগে দেখা যায় ক্ষীণ রজতধারা বিদ্যুতের মতো এক গোছা রসালো পত্রপুঞ্জের অথবা শাখা-প্রশাখার ক্রম থেকে ক্রমান্তরে ঝলক দিয়ে চলেছে আর প্রতিনিয়তই বালুকাস্তরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগে কত তাড়াতাড়ি আর নিখুঁতভাবেই না বালুকণারা পথ চলার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে নিজে রূপদান করতে পারে—স্তূপীকৃত বালুরাশি থেকে সব চাইতে উপযোগী মাল-মশলা যা পাওয়া যায়, তাই সংগ্রহ হয়ে চলার পথের খাড়া কিনারা কি ভাবে তৈরি করে চলে। নদীর উৎপত্তিও ঠিক এই ভাবেই। জল থেকে যেমন পাথুরে বস্তু থিতিয়ে পড়ে, হয়তো অস্থিসংস্থানও সেই রকমেই ঘটে আর একটু ভাল মাটি অথবা জৈব পদার্থ থেকে মাংসল অংশু তথা কোষাত্মক শিরার উৎপত্তিও একই রকমে ঘটে। গলিত এক তাল কাদা ছাড়া মানুষ আর কি? মানুষের আঙুলের ডগা শুধু এক বিন্দু জমাট কাদা। মনুষ্য-শরীরই গলে গলে হাতের আর পায়ের আঙুল পর্যন্ত বয়ে গেছে। কে বলতে পারে, দেবতা আরও অনুকূল হলে মনুষ্য-শরীর আরও কত বিস্তার আর প্রবাহ লাভ করত। হাতটা কি একটা শিরাল আর সপিণ্ড ছড়ানো তালপাতা নয়? কল্পনা করা যেতে পারে যে মাথার পাশ দিয়ে কান গজিয়েছে শৈবালের মতো স-লতি অর্থাৎ ঝোলা দিকটা। ঠোঁট—লেবিয়াম, লেবার (?) থেকে—দুটোকে ধরা যেতে পারে মুখগহ্বরের দুপাশের ভাঁজ কি খাঁজ। নাকটা তো স্পষ্ট একটি জমাট ফোঁটা, স্টালাকটাইট থুতনিটা আরও একটু বড় ফোঁটা, মুখমণ্ডলের সব কটি ফোঁটা গলে পড়ে এখানে থিতিয়ে গেছে। গাল দুটো যেন ভ্রূ থেকে মুখের উপত্যকায় ধ্বস নেমেছে, গালের হাড়ে বাধা পেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। উদ্ভিদপত্রের প্রত্যেকটা লতিকে ধরা যেতে পারে মোটা রকম ফোঁটা, ঘুরে ফিরে যা কখনও বড় কখনও ছোট হচ্ছে, পাতার আঙ্গুল গুলো লতির মতো। যতগুলো লতি ততদিকে এর বিকাশের ঝোঁক। যদি আরও তাপ পেত কি অন্য সব অনুকূল পরিবেশে আরও খানিকটা প্রবাহিত হতে পারত।

তাই মনে হয় প্রকৃতির কাণ্ড-কারখানার মূল সূত্রের দৃষ্টান্ত এই একটা পাহাড়ের ধারেই মেলে। এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা পেটেন্ট নিয়েছিলেন মাত্র পাতার। এমন শাঁপোলিয়োঁ কোথায় যিনি এই সাঙ্কেতিক লিপির অর্থোদ্ধার করবেন, যা দেখে আমরা আজও নতুন পাতা ওলটাতে পারি? দ্রাক্ষাকুঞ্জের শ্যামল ফলভারের চাইতেও এই আলৌকিক ব্যাপারে আমার বেশি উল্লাস। বিশেষত্ব বিচার করতে গেলে ব্যাপারটা খানিক কৃত্রিমতামূলক নিশ্চয়ই, যকৃৎ,

ফুসফুস আর অন্ত্রের গাদার অন্ত নেই, ভূমণ্ডলকে যেন উলটিয়ে দেখার মতো। কিন্তু এতে অন্তত মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃতিরও অন্ত্র আছে এবং মনুষ্যগোষ্ঠীর তিনিই গর্ভধারিণী। মাটির শীতের ঘটাও এই, বসন্তও তো এই। শ্যামল পুষ্পময় বসন্তের আগের খেলা তার, যেমন খাস কাব্য-রচনার আগে পৌরাণিক গাথার। শীতের জড়তা আর অগ্নিমান্দ্যের এমন ওষুধ আর কিছু জানা নেই আমার। এই থেকেই আমার নিশ্চিত ধারণা যে, ধরণী এখনও আষ্টেপৃষ্টে শিশুর মতো আঁটসাঁট কাপড় মোড়া আর চারদিকে শিশুর মতোই আঙ্গুল বাড়িয়ে রয়েছেন। ভ্রূর চিহ্ন নেই, অল্প অল্প কোঁকড়ানো চুল উঠছে মাত্র। কিছুই অজৈব নয়। কারখানার চুল্লীর ধাতুমলের মতো এই পত্রাত্মক স্তূপ পাড়ে বিছানো থেকে প্রকৃতির কারখানা যে পুরোদমে চলেছে, তারই প্রমাণ দিচ্ছে। পৃথিবী তো আসলে শুধু ভূতত্ত্ব-বিদ আর প্রত্নতত্ত্ববিদদের পাঠোপযোগী স্তরে স্তরে সাজানো পুঁথির পাতার পুরাতন ইতিহাসের খণ্ডমাত্র নয়, প্রাণস্পর্শী কাব্য সে. ফুল আর ফলের যারা অগ্রদূত সেই গাছের পাতার মতো—প্রস্তরীভূত কঙ্কাল নয়, পৃথিবী প্রাণবন্ত; তার বিরাট মর্ম-জীবনের তুলনায় সমগ্র প্রাণী আর উদ্ভিদ জীবন তো পরাঙ্গপুষ্ট। এর গর্ভ-যন্ত্রণায় আমাদের মরা প্রাণ তার কবর থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়ায়। তোমাদের সব ধাতু জড়ো করে গলাবার জন্য যত সুন্দর পার ছাঁচে ঢালাই কর; পৃথিবীর এই বিগলিত স্রাবের রকমফেরের মধ্যে যে মজা পাই আমি, তার মধ্যে সে মজা নেই। শুধু পৃথিবীটা নয়, পার্থিব সব সংস্থাই কুমোরের হাতে কাদার তালের মতো স্থিতিস্থাপক।

কিছুদিন পরেই শুধু এই পাড়গুলোর উপর নয়, প্রত্যেকটি পাহাড় সমতলভূমি আর প্রত্যেকটি ফাঁকা জায়গায় চতুষ্পদ জন্তুর মতো হিম তার জড়ত্বের বিবর ছেড়ে উঠে সাগর লক্ষ্য ক'রে সুরে তালে ছুটবে কি মেঘে চড়ে অন্য জলবায়ুর খোঁজে পাড়ি দেবে। বরফগলানো থ'-র প্রতাপ গদাধারী থর দেবতার চাইতেও বেশি, শুধু মৃদু প্ররোচনার জোরে। একজন গলায় আর একজন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।

কয়েকটা দিনের গরমে মাটির উপরটা শুকিয়ে মাটি থেকে বরফ যখন খানিকটা মিলিয়ে যায়, তখন সারা শীতের ঝামেলা-পোহানো জীর্ণ জীবনধারণের মহিমান্বিত দৃশ্যের সঙ্গে নবজাত বর্ষের মৃদু জীবন-স্পন্দনের সদ্য চোখ মেলে দেখার তুলনা করতে বেশ লাগে—লাইফ এভারলাস্টিং, গোল্ডেনরড, পিনউইড, আর লকলকে বুনো ঘাস, গরম কালের চাইতেও যাদের এখন বেশি চটকদার আর চিত্তহারী লাগে, যেন আগে তাদের রূপ যথেষ্ট খোলে নি; এমন কি কটন-গ্রাস, ক্যাট টেল, মালিন, জনসোয়ার্ট, হার্ডহ্যাক, মেডো-সুইট, আরও কত দৃঢ়বৃন্ত গাছ, যাদের ভাণ্ডার সব সময়েই

অফুরন্ত, যাদের দেখে ভোরের পাখিরা খুশি হয়—বৈধব্যাবস্থায় প্রকৃতির একমাত্র শোভন আভরণ আগাছা সব। উল-গ্রাস এর ধানশীষের মতো বাঁকানো ডগা আমাকে সব চাইতে বেশি আকর্ষণ করে; গরমকালে শীতের স্মৃতি মনে আনিয়ে দেয় এরা, শিল্পে যাদের আকারানুকরণ করা হয়, তাদের একজন; জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে সব ছাঁচ মানুষের মন জুড়ে আছে আগে থেকে, উদ্ভিদ-রাজ্যে এদের স্থান তাই। সুপ্রাচীন এদের শৈলী, গ্রীক আর মিশরীয়ের চাইতেও পুরনো। শীতকালের অনেক ক্রিয়াকলাপই অবর্ণনীয় কারুণ্য আর ভঙ্গুর ভঙ্গিমার স্মারক। কিন্তু শীতের যিনি রাজা, তিনি কর্কশস্বভাব আর ভব্যতাহীন একথাই আমরা শুনে থাকি। অথচ প্রেমিকের মতো দরদ দিয়েই তিনি গ্রীষ্মের কবরী সাজান।

বসন্ত আসতেই আমার আস্তানার নিচে লাল কাঠবেরালদের আগমন হচ্ছে, দুটো করে এক এক বারে; আমি বসে পড়ছি কি লিখছি, এরা আমার ঠিক পায়ের নিচে এসে অদ্ভুত কিচিরমিচির আর হৈ চৈ সুরু করেছে, যেখানে ছলাচ্ছল আওয়াজ সব যেন একসঙ্গে, স্বররাজ্যে নৃত্যচক্র, পা দিয়ে ঠোক্কর দিলাম তো আরও জোরে ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠল, যেন ক্ষ্যাপার মতো চীৎকার করে চলেছে, ভয়-ডর নেই, ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, মানুষকে বুক ঠুকে বলতে চায়, থামাও তো। না, তোমার সাধ্যে কুলোবে না—দুত্তোর, দুত্তোর। যে যুক্তিই দিই না কেন শুনবে না কানে একেবারেই, তাদের সমীচীনতা অগ্রাহ্য করবে আর এমন জোর গলাবাজি করবে যে রোখে কার সাধ্য।

বসন্তের প্রথম সেই স্প্যারো। অতীত সব আশা-ভরসা অতিক্রামী নতুন বছরের সুরু। খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেলেও তখনও জল জমে আছে মাঠে, তারই উপর দিয়ে ভেসে আসছে ব্লুবার্ড, সংস্প্যারো আর রেড-উইংগের অস্ফুট রুপালী কাকলি, যেন শীতের শেষ ফুলকিটা মাটিতে পড়ে ঠুনঠুন করছে। ইতিহাস, কালপঞ্জী, ঐতিহ্য আর লিখিত প্রত্যা-দেশের কি মূল্য এ মুহূর্তে? স্রোতস্বতী বসন্তের উদ্দেশে আনন্দ আহ্লাদের গান করে চলেছে। মার্শ-হক মাঠ ছুঁয়ে উড়ে চলেছে, জানতে চায় কাদা থেকে কোথায় কোন প্রাণী মাথা খাড়া করেছে। উপত্যকা জুড়ে বরফ গলে গিয়ে ডুবে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়। চাপ-চাপ বরফ হৈ হৈ করে পুষ্করিণীতে গলে পড়ছে। পাহাড়ের গা ভরে তৃণের শিখা ঝলকে উঠছে, যেন দাবানল, যেন ঘরমুখো সূর্যকে ধরণী হৃদয়ের তাপে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সে শিখার বর্ণ তো পীত নয়, সবুজ;—চিরন্তন যৌবনের প্রতীক এই তৃণাঙ্কুর লম্বা একটা সবুজ রিবনের মতো, ঘাসের চাপড়া

থেকে গ্রীষ্মের উদ্দেশে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে, হিমের জন্য পারে নি এতদিন, তবু কিন্তু বারবার সব সময়েই মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করেছে, এর পুরনো বছরের শুকনো ডগা মাটির তলায় নতুন খোরাক পেয়ে ফুঁড়ে বার হচ্ছে। উৎস যেমন মাটির তলা থেকে অবিরাম বয়ে আসে এ-ও ঠিক তাই করে। হুবহু তার মধ্যে প্রায়, জুন মাসে যখন দিন গরম হয়ে ওঠে, উৎসমুখ শুকিয়ে যায়, তখন তৃণাঙ্কুরই তাদের নালীর কাজ করে, বছরের পর বছর গরু-মোষরা এই চিরশ্যামল স্রোতের জল খেয়েই বাঁচে। আর ঘেসুড়েরাও সময় থাকতে শীতকালের জন্য এ দিয়েই তাদের ভাঁড়ার ভরে রাখে। এমনি, মানুষের জীবন একেবারে মূল পর্যন্ত মৃত্যুর পরও আবার অনন্তের উদ্দেশে নবাঙ্কুর তুলে ধরে।

ওয়ালডেন দ্রুত গলছে। উত্তর আর পশ্চিম দিকটায় দুই রডটাক চওড়া খাল হয়েছে, পূর্বদিকে আরও বেশি চওড়া। আসল পাঁজা থেকে বেশ বড় এক মাঠপ্রমাণ বরফ আলাদা হয়ে গেছে। তীরের ঝোপ থেকে একটা সংস্প্যারোর গান শোনা যায়—অল-ইট—অল-ইট—অল-ইট, চিপ—চিপ—চিপ চে—চার—চে—উইস—উইস। বরফ সাফের তালেই, যেন তাল দিচ্ছে সে। বরফের কিনারাগুলোর আঁকাবাঁকা ঝাপটাগুলো কি সুন্দর, পাড়ের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় খানিকটা, কিন্তু আরও সুডৌল। সম্প্রতি যে কিছুদিনের জন্য ভীষণ ঠান্ডা পড়ে, তার ফলে অস্বাভাবিক রকমের শক্ত হয়েছে এটা, কিন্তু হর্ম্যতলের মতো খাঁজ কাটা, জলে ধোওয়া। বাতাস কিন্তু বৃথাই এর অস্বচ্ছ উপরিভাগ দিয়ে পূর্বদিকে বয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওদিকে প্রাণোচ্ছল অংশে গিয়ে ঠেকছে এ। সূর্যকিরণে ঝিকমিক করে উঠছে খানিকটা জলের রেখা, দেখলে মন আনন্দে ভরে ওঠে। যৌবন-তরঙ্গে হাসিখুশি পুষ্করিণীটার নিরবগুন্ঠন মুখমন্ডল যেন এর বুকের মীনকুলের আর তীরের বালুরাশির আনন্দের খবর দিচ্ছে—মাছের আঁশের মতোই রুপালী একটা পুরো জলজ্যান্ত মাছ। শীতে আর বসন্তে এই হ'ল তফাত। ওয়ালডেন মরে গিয়েছিল, আবার বেঁচে উঠেছে। কিন্তু এবারকার বসন্তে এর ভাঙার রীত একটু ধীর স্থির, আগেই বলেছি সে কথা।

ঝড়বাদল আর ঠান্ডা থেকে প্রশান্ত, স্নিগ্ধ আবহাওয়ায়, অন্ধকার জবুথবু অবস্থা থেকে আলো আর প্রাণঢালা জীবনে ক্রমাবর্তন করতে বিশ্বসৃষ্টির সব কিছুকে স্মরণযোগ্য সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মনে হয় সবটা চোখের সামনে পলকে ঘটে গেছে। অকস্মাৎ আমার আস্তানা আলোয় ভরে গেল, যদিও সন্ধ্যা আসন্ন আর শীতকালের মেঘে চারদিক ঢাকা আর ধানের শীষ থেকে বরফ-গলা জল ঝরে পড়ছে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি, এ কি! কাল যেখানটায় ধূসর শীতল বরফ ছিল

স্বচ্ছ পুষ্করিণীটা জুড়ে, সেখানে ঐ গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার মতো আশ্বাসভরা প্রশান্তি। বুকে তার গ্রীষ্মসন্ধ্যার আকাশের প্রতিবিম্ব, কিন্তু উপরে তার সন্ধান নেই— যেন আর কোন দূর দিগন্তের সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে। দূরে রবিন পাখির ডাক শুনলাম, কত হাজার বৎসর পরে যেন প্রথম শুনছি মনে হ'ল, আরও কত হাজার বৎসর ধরে ভুলতে পারব না যে সুর—অতি প্রাচীন কালে শোনা সেই সুমধুর, প্রাণমাতানো সুর। নিউ ইংলণ্ডে গ্রীষ্ম-দিনের বেলাশেষে সন্ধ্যার এই যে রবিন পাখি, কোনদিন যদি যে শাখায় সে বসে তার খোঁজ পেতাম--শাখাকেও বটে, তাকেও বটে। এ অন্তত টুরডুস মাইগ্রেটোরিয়াস নয়। আমার আস্তানার চারপাশের পিচ পাইন আর শ্রাব ওক সব এতদিন মুষড়ে ছিল, এবারে যে যার স্বরূপ ফিরে পেল, আরও উজ্জ্বল, আরও সবুজ আর- ঋজু, আরও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠল, যেন বৃষ্টির ধোয়ামোছায় কাজ দিয়েছে, পুনর্জীবন লাভ করেছে। জানতাম, আর বৃষ্টি হবে না। বনে যে কোন একটা শাখা, এমন কি নিজের কাঠের গাদা দেখলেও বলা যায় শীত কেটেছে কি না। অন্ধকার বাড়ছে, বন-বাদাড়ের গা ছুঁয়ে রাজহাঁসেরা প্যাঁক-প্যাঁক করে হকচকিয়ে দিয়ে উড়ে ফিরছে; যেন দক্ষিণ সরোবর থেকে ফিরতে যাত্রীদল ক্লান্ত, দেরি হয়েছে বলে পরস্পর গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে, আবার সান্ত্বনাও দিচ্ছে। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ডানার ঝাপটানি শুনতে পাচ্ছি তাদের; আমার আস্তানার দিকে আসতে হঠাৎ আলো দেখতে পেয়ে চেঁচামেচি কমিয়ে ঘুরে গিয়ে পুষ্করিণীর বুকে বসল সব। অগত্যা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে হ'ল; বনবাসে প্রথম বসন্তরজনী কাটল আমার।

সকালবেলায় কুয়াসার মধ্য দিয়ে দোর থেকে লক্ষ্য করে দেখলাম রাজহাঁসদের; পঞ্চাশ রডটাক দূরে মাঝ-পুকুরে ভেসে বেড়াচ্ছে, এতগুলো, বড় বড় আর এত চেঁচাচ্ছে যে, মনে হ'ল ওয়ালডেন যেন ওদেরই স্ফূর্তির জায়গা হিসেবে খোঁড়া কৃত্রিম জলাশয়। আমি পুকুরপাড়ে গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই তাদের দলপতির নির্দেশে একসঙ্গে দারুণ রকম ডানা ঝাপটিয়ে উঠে পড়ল, উঠে সার বেঁধে আমার মাথার উপর উড়তে সুরু করল—সব সমেত ঊনত্রিশটা, অতঃপর সোজা কানাডার মুখে অভিযান সুরু হ'ল তাদের, মধ্যে মধ্যে দলপতি নিয়মিত প্যাঁক-প্যাঁক আওয়াজ দিচ্ছে, মাঝপথে তেমন কাদাভরা জলাশয়ে নেমে অনশন ভঙ্গ করবার আশা রাখে। এক ঝাঁক পাতিহাঁসও একই সঙ্গে আকাশে উড়ে তাদের এই হুল্লোড়বাজ জ্ঞাত-ভাই-দের পিছু পিছু উত্তরদিকে যাত্রা করল।

এক হপ্তা ধরে শুনলাম কয়েকটা সঙ্গিহীন রাজহাঁস সঙ্গিনীদের খোঁজে হাতড়ে বেড়ানো কটরকটর শব্দ করে কুয়াসাঢাকা সকালবেলায় ঘুরছে

ফিরছে, বনেই রয়েছে কিন্তু বৃহত্তর কোন জীবনের বাণী নিয়ে—নিজের মধ্যে যার সংকুলান নেই। এপ্রিল মাসে আবার পায়রাদের সব ছোট ছোট ঝাঁকে সোঁ সোঁ উড়তে দেখা গেল। যথাসময়ে মার্টিনের দলেরও কিচমিচ আমার আস্তানার উপর শোনা গেল। আগে কিন্তু মনে হয় নি যে এরা আবার শহরের আনাচে-কানাচে সংখ্যায় এত যে আমার এখানে এসেও দু' একটা জুটতে পারে। কল্পনা করলাম, শ্বেতকায় মনুষ্যদের আসবার আগে যে প্রাচীন জাতি বৃক্ষকোটরে বাস করত, এরা নিতান্তই সেই গোত্রের কেউ-কেউ। প্রায় সব দেশেই কচ্ছপ আর ব্যাঙের দল এই ঋতুর অগ্রবর্তী আর অগ্রদূতদের মধ্যে থেকে যায়, পাখিরা গান গেয়ে পাখনা মেলে ওড়ে আর ছোট ছোট গাছ গজায়, ফুল ধরে তাতে, হাওয়া বয়—মেরুর যে সামান্য নড়া-চড়া হয়েছে তা শোধরাতে চায় এরা, সাম্য রক্ষা করতে চায় প্রকৃতির।

প্রত্যেক ঋতুকেই যেমন সময় হলে সব চাইতে ভাল লাগে আমাদের, তেমনি বসন্তের আবির্ভাবও বিশৃংখলা থেকে বিশ্ব-সৃষ্টির মতো, স্বর্ণ-যুগের উপলব্ধির মতো—

> "পূব-হাওয়া উবে যায় আরোরার গায়, নাবাথীয় রাজ্যেতে ধায়,
> পারশীক দেশে, প্রভাত-রবিতে ঝলে যে পাহাড়-টিলা।
>
> * * * *
>
> ভূমিষ্ঠ হ'ল নর। সেই যাদুকর সৃষ্টি-বিধাতা কি,
> সুন্দরতর ধরণীর আদি, সুর-বীজ হ'তে সৃজন করিল তারে;
> কিংবা পৃথিবী, নবজাত আর বিশিলষ্ট যে বা উর্ধ্ব ব্যোমের থেকে
> স্বর্গ-গোত্র রেখেছে কিছু সে বীজ?"

সামান্য এক পশলা বৃষ্টিতে ঘাস কত সবুজ হয়ে ওঠে। সেইরকম সৎচিন্তা অব্যাহত থাকলে, আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। যেমন অতি সামান্য এক বিন্দু শিশিরের প্রভাবও ঘাসে প্রকাশ পায়, তেমনি যদি প্রত্যেকটি মুহূর্তে আমাদের জীবনবোধ সজাগ থাকত আর জীবনে যে আকস্মিক ঘটনাই ঘটুক সব কিছু থেকে উপকৃত হ'তে পারতাম, তবে আমরা ধন্য হতাম: যদি আমাদের কর্তব্য করা হচ্ছে ভেবে, অতীতের সব সুযোগ অবহেলা করার জন্য অনুতাপে সময় নষ্ট না করতাম। বসন্ত এসে গেলেও আমরা শীতকালে ঘোরাফেরা করছি। বসন্তের স্নিগ্ধ প্রভাতে সব মানুষের পাপই মার্জনা পায়। এমন দিনে পাপাচরণের বিরাম। সূর্য যদি এমনি ভাবে আলো দিতে থাকে, তবে জঘন্যতম পাপীরও আত্মশুদ্ধি হ'তে পারে। আমাদের নিজেদের অপাপবিদ্ধতার মধ্যে দিয়েই প্রতিবেশীর

অপাপবিন্ধতা আমাদের চোখে পড়ে। গতকাল প্রতিবেশীকে চোর, মাতাল, ইন্দ্রিয়পরায়ণ জেনে পৃথিবী সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন, তার সমব্যথী হয়েছিলেন কি অবজ্ঞা করেছিলেন তাকে; আজ এই বসন্ত প্রভাতে সূর্যের আলোতে চারদিক ছেয়ে গেছে, পৃথিবী নব-জন্ম লাভ করেছে, এখন তাকে দেখুন, কাজে সমাহিত হয়ে আছে সে, তার ক্লান্ত কামক্লিষ্ট স্নায়ু নিরুপদ্রব আনন্দে ভরে গেছে, দিনটা ভাল লাগবে; বসন্তের এই আশীর্বাদ শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে নিতে পারলে লোকটার সব দোষ মার্জনীয় মনে হবে। তার চারদিক ঘিরে সুবুদ্ধির আলো এমন কি বুঝি দিব্য ভাবেরও আভাস পাওয়া যায়, হয়তো তা হঠাৎ পাওয়া সহজ বুদ্ধির অন্ধ নিষ্ফল হাতড়ানো মাত্র—কিন্তু তবু খানিকক্ষণের জন্য হলেও, দক্ষিণের পাহাড় থেকে ইতর কোন রসিকতার প্রতিধ্বনি ভেসে আসবে না। তার ঘাঁটাপড়া গা ফুঁড়ে গুটিকয় নিষ্পাপ নিরীহ অংকুর বার হচ্ছে দেখা যাবে—অতি ছোট চারা গাছটির মতো তুলতুলে তাজা—নতুন বৎসরের পণ। বিশ্ববিধাতার আনন্দভোগে সেও ভাগ চায়। জেলের কর্তা ফাটকের ফটক খোলা রাখে না কেন,—জজ সাহেব কেন তার সব মোকর্দমা খারিজ করে দেয় না—ধর্মধ্বজী কেন তার দলবল নাকচ করে না! মূলে এই ঈশ্বর তাদের যে ইশারা দেন, তারা তা মেনে চলে না আর যে মার্জনা তিনি সকলকে না চাইতেই দিয়ে রেখেছেন, তা মাথা পেতে নেয় না।

"প্রতিটি দিন সকালবেলার মন্দ মঙ্গল হাওয়ায় কল্যাণবুদ্ধির পুনরভ্যুদয় ঘটছে, পুণ্যে আসক্তি, পাপে অনাসক্তি আসছে; মানুষের মনে সনাতন প্রকৃতি ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছে, বনে যে সব গাছ কাটা হয়েছে, তার কচি চারার মতোই। এমনি আবার সাধু সংকল্প জাগতে সুরু করে মনে, কিন্তু দিনের ফাঁকে কোন অসাধু কাজ করলেই, সাধু সংকল্পের অংকুরকে তা বাধা দেয়, নষ্ট করে।

"সাধু সংকল্পের অঙ্কুর সব এমনি বারে বারে বাধা পেয়ে আর বাড়তে পায় না, সন্ধ্যার মঙ্গল হাওয়া তাদের বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে তখন আর যথেষ্ট হয় না। আর সন্ধ্যার এই হাওয়া যখন আর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, তখন মানুষের আর পশুর স্বভাবে বেশি পার্থক্য থাকে না। তখন সে ব্যক্তির স্বভাবের সঙ্গে পশুর সাদৃশ্য দেখে মানুষ মনে করে যে, বুদ্ধি বিবেচনার সহজ-বৃত্তি কোনদিন ছিল না তার। এভাব কি মানুষের পক্ষে প্রকৃত আর স্বাভাবিক?"

"সত্য যুগের সৃষ্টি প্রথম, না ছিল শাস্তা কেউ,
কানুন ছিল না, স্বতঃই নিষ্ঠা-শ্রদ্ধাটা ছিল চালু;

না ভয় শাস্তি; ঝুলানো পিতল-পাত্রে
শঙ্কা-বাক্য না হ'ত পাঠ। ব্যাকুল জনতা
বিচার-বাণীর করিত না কোন ডর।
শাস্তা ছিল না, নিরাপদ ছিল সব।
পাহাড় হইতে তখন পাইন তরল জলের বুকে
ভাসিত না যেতে বিদেশে বিশ্বতরে। নিজের ঘাটটি
ছাড়ি, আন-ঘাটে আনাগোনা ছিল না কো কোন।

*   *   *   *

বসন্ত ছিল চিরন্তন, স্নিগ্ধ মলয় বহি
হিল্লোলে তার আদর করিত ফুলে—
বীজহীন যেন তবু ফুটিয়াছে যারা।"

২৯শে এপ্রিল নাইন-একার-কর্ণার সাঁকোর কাছে নদীর পাড়ে যেখানে মাস্করাটরা ঘোরাফেরা করে, শিউরে ওঠা ঘাস আর উইলোর শিকড়ের উপর দাঁড়িয়ে সেখানে মাছ ধরছিলাম; অদ্ভুত একটা কড়কড় আওয়াজ শুনলাম, যেমন ছেলের দল লাঠির উপর আঙুল চালিয়ে খেলার সময় করে; উপরের দিকে চেয়ে লক্ষ্য করলাম অতি ছোট সুন্দর দেখতে একটা হক, নাইটহকের মতো লাগল, একবার উপরে কুচো ঢেউয়ের মতো উড়ে যাচ্ছে, আবার এক কি দুই রড নিচে ডিগবাজি খেয়ে নামছে বারবার, তার ডানার নিচের দিকটা দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলোয় সাটিনের ফিতের মতো কি ঝিনুকের ভিতর দিকটার মৌক্তিকের মতো চিকচিক করে উঠেছে। দৃশ্যটা দেখে আমার সেকালের শ্যেন পাখি ওড়ানোর কথা মনে পড়ল, খেলাটার সঙ্গে কত না গর্ব আর কাব্যের স্মৃতি জড়ানো আছে। পাখিটা বোধ হয় মারলিন হবে; নাম যাই হ'ক কি আসে যায়। জীবনে কত পাখির ওড়া দেখেছি, সকলের তুলনায় এই পাখির ওড়াটাকে অলোকসুন্দর মনে হয়েছে। প্রজাপতির মতো এ শুধু ডানার খেলাই দেখায় না, কি বড় বড় বাজপাখির মতো উচুতে উড়েই ক্ষান্ত নয়, এ যেন গগনে গগনে আপনার মনে সদম্ভে খেলে চলেছে; বারে বারে উপরে উড়ে যাচ্ছে—উল্লাসের আশ্চর্য হাসি হেসে, আবার চিলের মতো অনেক অনেক বার করে ঘুরে ফিরে, তার অবাধ সুন্দর নেমে আসা বার বার দেখিয়ে, যেন এই ধুলোর ধরণীতে কোন দিনই তার চরণ পড়ে নি, এমনি ভাবে তার সেই ঝটিতি অবতরণ সামলে নিচ্ছে। বিশ্ব-পৃথিবীতে এর কোন সঙ্গী আছে মনে হ'ল না—একা একাই খেলে চলেছে আকাশে—ওর খেলার সাথী ঐ সকাল আর শূন্য ব্যোম ছাড়া আর কিছু দরকার বলেও মনে হ'ল না। নিজে সে

একা বোধ করছিল না, নিচের সমস্ত পৃথিবীর কিন্তু নির্জন লাগছিল ওর জন্য। কোথায় ওর মা, যে ওকে পালন করেছে, ওর আপনার জন, আর ওর শূন্যচারী বাপ? আকাশের অধিবাসীই হবে, মনে হয় মাটির সঙ্গে এর সম্বন্ধ একটা ডিমের, কোন পাহাড়ের চুড়োর কোন ফাটলে সেটাকে তা দিয়ে ফোটানো হয়েছিল; না, এর নিজস্ব নীড় মেঘের কোন কোণে সূর্যাস্তের আকাশ আর রামধনুর ছাঁট দিয়ে বোনা হয়েছে, মাটি থেকে নেওয়া স্নিগ্ধ মধ্যগ্রীষ্মের আবছা আলো যার আস্তরণ; এখন এর শৈলাবাস মেঘরাজ্যের চুড়োয়।

এর উপর কদাচিৎ দেখা যায় এমন একঝাঁক সোনালী, রুপালী আর চকচকে তামাটে মাছ জুটে গেল, দেখতে একগোছা মণিহারের মতো। কত না বসন্তের প্রথম দিনের সকালে ঐসব মাঠ একেবারে ভেদ করে চলে গেছি, এ চুড়ো থেকে ও চুড়োয়, এ উইলো থেকে ও ইউলোর মূলে লাফ দিয়ে পড়েছি, নদীর পাশের সমস্তটা উপত্যকা আর বন কেমন এক রকম উজ্জ্বল নির্মল আলোয় স্নান করে উঠেছে তখন, যে আলোতে মরা লোকও প্রাণ ফিরে পায়, তা তারা যতই অনেকে যেমন মনে করে কবরে পড়ে ঘুমোক। এর চাইতে অমরত্বের আর কি বেশি প্রমাণ চাই? চরাচর এই আলোয় বেঁচে উঠবেই। কোথায় তোমার দংশন তখন, ওগো মরণ? কোথায়ই বা তোমার জারিজুরি, হে কবরস্থান?

এর চারপাশ জুড়ে বন আর প্রান্তর যা অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, তা না থাকলে আমাদের এই গ্রামের জীবন একেবারে হেজে মজে যেত। বন-জঙ্গলকে আমাদের সঞ্জীবনী রস হিসেবে দরকার—যেখানে বক আর মাঠ-মুরগী ছোঁক ছোঁক করে ঘোরে ফেরে, সেই জলাবিলে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে হেঁটে যাওয়া চাই মধ্যে মধ্যে, কাদাখোঁচার ডাক শোনা চাই; যেখানে বেজীর দল মাটিতে পেট ঠেকিয়ে গুড়িসুড়ি মেরে চলে বেড়ায় আর বেশি বুনো আর বেশি ঘরকুনো কয়েকজাতের পাখি নীড় বেঁধে থাকে, সেখানে গিয়ে চুপি চুপি কথা কওয়া জলা ঘাসের গন্ধ শোঁকা চাই। চরাচরকে চষে ফেলে অকপটে জানতে চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে এও চাই যে চরাচর রহস্যময়, দুরধিগম্য থাক, জল স্থল আমাদের কাছে অনন্ত বনময়, অজানা, অকূল থাক, কেন না সবকিছুই তো অজ্ঞেয়। প্রকৃতির রঙ্গের শেষ নেই। এর অফুরন্ত শক্তি, বিপুল বিশাল রূপ, এর সমুদ্রপাড়ের ধ্বসকলাপ, বনজঙ্গল, আর জীবন্ত আর মরুককু গাছপালা, বজ্রগর্ভ মেঘ, বানডাকানো তিন সপ্তাহ ধরে বিরাম-হীন বৃষ্টি—আনন্দ জাগিয়ে রাখার জন্য যে সব কিছু দেখার দরকার। আমাদের নিজেদের সাধ্যের বাইরের ঘটনা দেখার দরকার—যেখানে আমরা

যেতে পারি নে, কি অনায়াসে সেখানে অন্য প্রাণী চরে বেড়াচ্ছে। শকুনের শব খাওয়া দেখতে আমাদের অনিচ্ছা আর বিতৃষ্ণা, কিন্তু ঐ থেকে তার স্বাস্থ্য আর শক্তি সংগ্রহ করতে দেখলে আনন্দ হবে। আমার আস্তানার পাশ দিয়ে যে পথটি গেছে, তার পাশের গর্তে একটা ঘোড়া মরে পড়ে ছিল, ফলে সোজাপথ ছেড়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হতাম, বিশেষ করে রাত্রে যখন বায়ু চলাচল মন্থর; কিন্তু ক্ষতিপূরণ হ'ত এক দিক দিয়ে—এ থেকে প্রকৃতির দুরন্ত ক্ষুধার আর অটুট স্বাস্থ্যের ধারণা হয়। দেখে ভাল লাগে আমার প্রকৃতির প্রাণের এই ছড়াছড়ি, সেখানে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি হচ্ছে, পরস্পরে হানাহানি করতে পাচ্ছে; নরমসরম গড়ন হলে তাকে এমন নিশ্চিন্তভাবেও মণ্ডের মতো পিষে তার অস্তিত্ব লোপাট করা যায়—বকগুলো ব্যাঙাচিদের ক্রমাগত গিলে খাচ্ছে, কাছিম আর কোলাব্যাঙ রাস্তায় পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে; আবার কখনও কখনও না কি মাংস আর রক্ত বৃষ্টিও হয়। আকস্মিক দুর্ঘটনার এমন বাড়াবাড়ি, আর কেমন সব অগ্রাহ্য করে চলছে তাই দ্রষ্টব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই জ্ঞান হতে বাধ্য যে, চরাচরে সমস্তই নির্দোষ। বিষ কখনও বিষাক্ত নয়, কোন আঘাতেই মৃত্যু হয় না। সমদুঃখের স্থান সংকুলান হওয়া দায়। মারমার কাটকাট করে চলতে হবে। ঘ্যান ঘ্যান করে কান্নাকাটি সয় না কেউ।

মে মাসের প্রথম দিকটায় ওক, হিকরি, মেপল, আরও অন্য সব গাছ পুষ্করিণীর চারপাশে পাইনের জঙ্গলের মধ্য থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে চারপাশের দৃশ্য আলোয় ভরে দিল, রোদের আলোতে যেমন হয়, বিশেষ করে মেঘলা দিনে, যেন সূর্যকে কুয়াসার মধ্য দিয়ে ফুটে বেরোতে হচ্ছে আর পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে ছিটে-ফোঁটা আলো পড়ছে। তেসরা চৌঠা মে পুকুরের বুকে একটা লুনকে দেখা গেল, আর মাসের প্রথম সপ্তাহেই ডাক শুনলাম হুইপ-পুয়োর-উইল-এর, ব্রাউন থ্রাশার, ভিয়েরি, উড পিউই, চিউইংক আর অন্য সব পাখির। উড-থ্রাশের সাড়া আগেই পেয়েছি। ফিবি এর মধ্যেই একবার এসে আমার দরজা জানালায় উঁকি মেরে আমার আস্তানাটা তার গুহার যোগ্য কি না পরখ করে দেখে গেছে, থাবাগুলো মুঠো করে গুণগুণ করা ডানার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, যেন আস্তানাটা দেখছে কিন্তু শূন্য আঁকড়ে আছে। পিচ পাইন গাছের গন্ধকের মতো রেণু পুকুর পুকুরপাড়ের সোঁদা কাঠ আর পাথর সব অচিরাৎ ঢেকে ফেললে, ইচ্ছে করলেই পিপে ভরে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। একেই "গন্ধক-বর্ষণ" বলা হয় যার কথা শুনতে পাওয়া যায়। এমন কি কালিদাসের নাটক শকুন্তলাতেও উল্লেখ আছে, "সোনার বরণ কমল-রেণুতে দীঘি সে হলুদ-ছোপা।" এমনি ভাবে

ঋতুর পর ঋতু কেটে গিয়ে নিদাঘ এল, ঘাসের বনে চলতে গিয়ে যেমন উঁচু থেকে উঁচু ঘাসের মধ্যে গিয়ে উঠতে হয়।

এইভাবে আমার বনবাসের প্রথম বৎসর সাঙ্গ হ'ল, দ্বিতীয় বৎসরও ঠিক এই একই ভাবে কাটে। ১৮৪৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর শেষবারের মত ওয়ালডেন ছেড়ে চলে আসি।

॥ ১৮ ॥ উপসংহার

ডাক্তাররা অসুখ হ'লে হাওয়া আর জায়গা বদলাবার পরামর্শ দিয়ে ভালই করেন। সারা জগৎটা যে এখানে নয়, ভগবানকে এর জন্য ধন্যবাদ্ দিই। নিউ ইংলণ্ডে বাকয়াই জন্মায় না, মকিংবার্ডের সাড়াও কালেভদ্রেই মেলে এখানে। বুনোহাস আমাদের চাইতে বিশ্ববাসী বেশি; কানাডায় খায় প্রাতরাশ, ওহিয়ো নদীতে দুপুরের খাওয়া, আর রাত কাটাতে সেই দক্ষিণ মুলুকের বেয়ু গাছে পাখা গুটিয়ে বসে। বাইসন পর্যন্ত কিছুটা ঋতুর সঙ্গে তাল রেখে চলে, কলোরাডো নদীর মাঠের ঘাসপাতা খেয়ে কাটায় যতদিন না ইয়েলোস্টোনের পাড়ে আরও সবুজ আর মিষ্টি ঘাস তাকে ডাক দেয়। তবু আমরা মনে করে নিই যে রেল-লাইনের পাঁচিলটা ভেঙ্গে ফেলে আমাদের ক্ষেতখামারের চারদিকে পাথর দিয়ে পাঁচিল তুললেই আমাদের জীবনের গন্ডী আর আমাদের অদৃষ্ট স্থির হয়ে গেল। শহরের খাস কেরানীর পদে বহাল হলে এই গ্রীষ্মে অবশ্য টিয়েরা ডেল ফুয়েগোতে যাওয়া হবে না, কিন্তু তবু নরকের অগ্নিকুণ্ডে যাওয়ার বাধা কি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের ধারণায় যত বড়ই হ'ক তার চাইতেও সেটা বড়।

তবু বেকুব মাঝিমাল্লার মতো দড়াদড়ির ফেঁসো কুড়োতে না সমুদ্র পাড়ি দিই, কৌতূহলী সওয়ারীর মতো নৌকোর গলুইএর ওপারে চোখ রেখেই যেন বেশি সময় কাটাই। ভূমন্ডলের ওদিকটায় তো আমাদের জুড়িরই দেশ। ডাক্তাররা ওষুধ বাতলান শুধু চর্মরোগের, আর আমাদের এই পাড়ি দেওয়া অকূল ঢেউয়ের তালে তালে। একজন ছুটছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, জিরাফ শীকার করবেন; কিন্তু ঐ লক্ষ্য নিয়ে কিছু চিরটা কাল কাটবে না তাঁর। সুবিধে না হয় আছে, কিন্তু একটা মানুষ জিরাফ শীকার করে কতকাল কাটাতে পারে শুনি? স্নাইপ আর উডকক শীকারে দেদার মজা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস অহং শীকার করাতেই সেরা মজা।

> "তাগ করে অন্তরে চক্ষু হান,
> হাজার মুলুক মনে খোঁজ না জান;

মনের মুলুকে ঢোঁড় সুরধুনী,
আত্ম-বিশ্বজ্ঞানে হও গো গুণী।”

আফ্রিকাই বা কি—আর পশ্চিম অঞ্চলই বা কিসের নিশানদিহি করছে? নক্সাতে তো আমাদের ভিতরটাও সাদা, কিন্তু খোঁজ নিতে গেলে দেখা যাবে উপকূলের মতোই সেটা কাল। নীল না নাইজার না মিসিসিপি নদীর উৎস, কি এই মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিয়ে বেরোবার পথ—এই সবের পাত্তা নেওয়ারই কি কথা আমাদের? এই সবই মানুষের চরম সমস্যার ব্যাপার না কি? ফ্রাংকলিনই বুঝি একমাত্র লোক যাঁর পাত্তা নেই, তাই তাঁর তল্লাসে তাঁর স্ত্রী এত উঠে পড়ে লেগেছেন? মিঃ গ্রিনেল নিজে কোথায় আছেন জানা আছে তাঁর? বরং নিজের নিজের নদীনালা আর সমুদ্রের মাংগো পার্ক, লিউইস, ক্লার্ক আর ফ্রবিশার হও; নিজেদের মহত্তর অক্ষাংশের পাত্তা কর-- যদি দরকার হয় জাহাজ জাহাজ টিন বোঝাই মাংস প্রাণ বাঁচাতে সঙ্গে নাও; আর খালি টিনগুলো আকাশের সমান উঁচু করে গাদা করা থাক। টিনের মাংসের উদ্ভাবন শুধুই কি মাংস রক্ষার জন্য? চুলোয় যাক সব, নিজের মনের নতুন নতুন গোটা মহাদেশের কলম্বাস হও, বাণিজ্যের নয়, চিন্তার নতুন নতুন পথ আবিষ্কার কর। প্রত্যেক মানুষই নিজের মুলুকের মালিক, তুলনায় জারের পার্থিব সাম্রাজ্য তো এতটুকু রাজ্য একটা, বরফ গলার পর অবশিষ্ট ছোট একটা ঢিবি। তবে কারও কারও আত্মমর্যাদাবোধ নেই, দেশাত্মবোধ আছে, তারা অল্পের জন্য বহু খোয়াচ্ছে। যে মাটি দিয়ে গোর তৈরী হবে, তার জন্যই তাদের টান, দেহের মাটিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে যে আত্মা, তার সম্বন্ধে টান নেই একটুও। দেশাত্মবোধ তাদের মাথার পোকা। এত বহ্বাড়ম্বর আর খরচা করে দক্ষিণ সাগর আবিষ্কারের এই অভিযানের মানে কি প্রকারান্তরে এই কথাই মেনে নেওয়া নয় যে আমাদের নৈতিক জগতেও অনেক মহাদেশ আর সমুদ্র রয়েছে, এক একটা মানুষ যার এক একটা যোজক অথবা খাড়ি, আজও যে সব তার কাছে অনাবিষ্কৃত? এবং একথাও মেনে নেওয়া যে একলা হওয়ার অতলান্তিক আর প্রশান্ত মহাসাগর অভিযানের তুলনায় এক জনকে সাহায্য করতে পাঁচশ জন বয়স্ক লোক আর ছোকরা নিয়ে সরকারের জাহাজে চড়ে শীত আর ঝড় আর নরখাদকের মধ্য দিয়ে অনেক হাজার মাইল পাড়ি দেওয়া সহজ।

ঘুরুক তাহারা, ঢুঁড়ুক তাহারা বিজাতীয় সেই অস্ট্রেলীয়দের দেশ,
আমার কেবল ভগবান ভরসা,
তাদের ভরসা কেবল মাত্র পথ।

জাঞ্জিবারে কটা বেরাল তাই গোনবার জন্য সমস্ত দুনিয়া পাড়ি দেওয়া মজু-

রিতে পোষায় না। তবু যতদিন না এর চাইতে ভাল কিছু করা যায়, ততদিন এইই কর, হয়তো বা একটা "সাইমস-এর ফোকর" খুঁজে পেতে পার, তাই দিয়ে শেষাশেষি একেবারে ভিতরে গিয়েও ঢোকা যেতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স পর্তুগাল, গোল্ডকোস্ট আর স্লেভ কোস্ট, সব অঞ্চলের মুখই তো এই ভিতরকার সাগরের দিকে; কিন্তু এ সব পিছনে ফেলে একটা নৌকোও তো ডাঙ্গা ছেড়ে দূরে পাড়ি দেয় না, অথচ সন্দেহ নেই যে ভারতের সোজাসুজি পথ এটাই। সব ভাষায় কথা কইতে জানতে হলে, সব জাতের রীতিনীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হলে, আর সব যাত্রীর চাইতে দূরের পাড়ি দিতে গেলে, সব দেশকে নিজের দেশ করতে হবে, স্ফিংকস যাতে পাথরে মাথা খোঁড়ে তাই করতে হবে, প্রাচীন দ্রষ্টার উপদেশ: "আত্মানং বিদ্ধি" পর্যন্ত অভ্যাস করতে হবে। সেই জন্যই তো দৃষ্টি আর স্নায়ুর জোর চাই। জীবন-যুদ্ধে হটে যারা পিটটান দিতে চায়, যুদ্ধে যায় তারাই; কাপুরুষরাই পালিয়ে গিয়ে সৈন্যদলে ভর্তি হয়। এখনই বেরিয়ে পড় সুদূর পশ্চিমমুখো ঐ পথ ধরে, ও পথ মিসিসিপি কি প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে থামে নি, জরাজীর্ণ চীন কি জাপানে গিয়েও ওঠে নি, ও পথ বরাবর চলে গেছে, ভূমণ্ডলের স্পর্শক, গ্রীষ্ম আর শীতকালের দিন আর রাত্রের, সূর্য ডুবে যায়, চাঁদ ডুবে যায়, অবশেষে পৃথিবীও ডুবে যায়।

শোনা যায়, মিরাবো "ব্যক্তিগত ভাবে নিজে সমাজের অতি পবিত্র নিয়ম কানুনের ব্যবহারগত বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে কতখানি দৃঢ়সংকল্প হওয়া দরকার, তাই ঠিক করতে" রাহাজানি রপ্ত করেছিলেন। তিনি বলে গেছেন, "দলে ভিড়ে গিয়ে সেপাইরা যে লড়াই করে, তাতে রাহাজানির আধা মাত্রা সাহসের দরকার পড়ে না"—"বিবেচনা বুদ্ধি করে যদি দৃঢ়সংকল্প হওয়া যায়, মর্যাদা আর ধর্মবোধ বিপক্ষতা করে না।" দুনিয়ার যা হালচাল সে হিসেবে মরদকা বাত এ; কিন্তু অর্থহীন এমন কি বেপরোয়াও বলা চলে একে। আর একটু সুবুদ্ধি লোক হলে বুঝতে পারতেন সমাজের অতি পবিত্র নিয়মকানুন বলে যা গণ্য হয় পবিত্রতর বিধান পালনে ক্রমাগতই তার ব্যবহারগত বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়, সুতরাং বিপথে না গিয়েও সংকল্পকে যাচাই করে নিতেন। সমাজের সঙ্গে এই রকম সম্পর্ক ঘটানো মানুষের মতো কাজ নয়, স্বধর্ম পালন করতে গিয়ে মানুষ যে অবস্থাতেই পড়ুক, তাই বজায় রাখা চাই; কখনও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন-ব্যবস্থার প্রতিকূল হয় না তা, অবশ্য যদি সে রকম শাসন-ব্যবস্থার দর্শন তাঁর ভাগ্যে জোটে।

বনে যাবার আমার যেমন যথেষ্ট কারণ ছিল, বন ছেড়ে আসিও তেমনি যথেষ্ট কারণেই। হয়তো বা মনে হয়ে থাকবে, আরও কয়েক ছাঁদের জীবন কাটাতে হবে আমার, তাই একটা ছাঁদ নিয়ে আর সময় কাটানো নয়।

কত অনায়াসে আর অজানতেই যে আমরা ধরাবাঁধা একটা পথে গিয়ে পড়ি, আবার নিজেরাই নিজেদের মামুলী একটা ছকও বানিয়ে ফেলি, সে একটা লক্ষণীয় ব্যাপার। জায়গাটাতে এক সপ্তাহ কাটাতে না কাটাতেই, আমার দরজা থেকে পুষ্করিণীর পাড় পর্যন্ত আমার চলাফেরায় একটা পথ তৈরি হ'য়ে গেল; সে পথে চলাচল করতাম যখন তারপর যদিও পাঁচ ছয় বৎসর কেটে গেছে, এখনও পর্যন্ত কিন্তু সেটা বেশ স্পষ্টই রয়ে গেছে। হতে পারে, অন্যেরা সত্যি সত্যিই সেই পথে চলে চলে সেটাকে চলাচলযোগ্য রেখেছে। মাটির বুক নরম, মানুষের পায়ের দাগ পড়ে তার ওপর; মন যে পথ ধরে চলে সেও ঐ রকমই। দুনিয়ার সদর রাস্তাগুলোর তাহ'লে কতকাল ধরে পায়ে পায়ে আর পিছু পিছু চলার দাগে দাগে কত না জরাজীর্ণ আর ধুলোয় ধুলো অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আমার তো কেবিন ভাড়া করে যাওয়ার কোন সাধ ছিল না, দুনিয়ায় ডেক-যাত্রী হয়ে মাস্তুলের সামনে খাড়া হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে চাঁদের আলো দেখে দেখে যাওয়ার সাধ আমার। এখন আর নিচে নামবার ইচ্ছে নেই।

এই পরীক্ষায় আমি অন্তত এটা শিখেছি যে কেউ যদি তার স্বপ্ন লক্ষ্য করে ভরসা করে এগিয়ে যায় আর নিজের কল্পনামতো জীবন কাটাবার চেষ্টা করে, তবে হামেশা যা দেখা যায়, তার চাইতে ফল বেশি পাবেই। কিছু কিছু জিনিস পিছনে ফেলে যেতে যেতে অলক্ষ্য সীমানাটা পার হয়ে যাবে সে; বাইরে আর মনের মধ্যে নতুন, সর্বজনীন, সর্বদর্শী নিয়ম-কানুনের ভিত গড়ে উঠবে, কিংবা পুরনো নিয়মকানুনই প্রসারে বাড়বে, তার মতের সঙ্গে সেগুলোর মানের মিল দেখতে পাবে, একটু ব্যাপক ভাবে বুঝবে সেগুলো, আর উঁচু স্তরের লোকদের মুক্ত ভাব নিয়ে জীবন কাটাতে পারবে। তার জীবনযাত্রা যত সরল হতে থাকে পৃথিবীর নিয়মকানুনও তেমনি কম জটিল লাগে তার কাছে, নিঃসঙ্গতা নিঃসঙ্গতা থাকে না, দারিদ্র দারিদ্র থাকে না, ক্লৈব্যও আর ক্লৈব্য থাকে না। কেউ যদি শূন্যে সৌধ খাড়া করে থাকে, সে কাজও বিফলে যাবে না; সেখানে খাড়া হওয়ারই কথা তার। এখন নিচে ভিতটা গাড়তে হবে।

ইংলণ্ড আর আমেরিকার দাবীটা একটু বিদঘুটে—তারা বুঝতে পারে এমন করে কথা বলতে হবে। মানুষ কি ব্যাঙের ছাতা কিছুই ও নিয়মে বাড়ে না। তাদের বোঝাটাই যেন এত দরকারী, যেন তারা ছাড়া তোমার কথা বোঝবার লোক প্রচুর নেই। প্রকৃতি যেন মাত্র এক ধরনেরই বোঝাবুঝির ক্ষমতা রাখে, যেন পাখি আর চতুষ্পদ, উড়ন্ত খেচর আর সরীসৃপ—সব প্রাণীরই সমান এক্তিয়ার নয় সেখানে, যেন সফরীদের বোঝার মতো করে 'হাশ' আর "হোয়া" বলাই উচ্চাঙ্গের ইংরেজী। বুঝি বোকা হওয়াতেই

বাঁচোয়া। আমার আসল ভয় হচ্ছে, আমার বক্তব্যে পাছে যথেষ্ট অতিবর্তন না থাকে, আমার রোজকার জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডী কাটিয়ে দূরের পাড়ি না জমাতে পারে তা, যে সত্য সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছি, তার উপযুক্ত না হয় তা। অতি বর্তন! সে তো নিজের গণ্ডীর উপর নির্ভর করছে। অন্য সব অক্ষাংশে নতুন নতুন চরবার মাঠের খোঁজে দেশ-দেশান্তর পাড়ি দিচ্ছে মোষ, কিন্তু গরুর মতো অতিবর্তন তার নয়, দুধ দুইতে গেলে যে পা দিয়ে বালতি উলটিয়ে গোয়ালের বেড়া টপকে বাছুরের পেছন পেছন ছুট দেয়। জায়গায় জায়গায় মাত্রা ছাড়িয়ে কথা বলতে ইচ্ছে যায় আমার, যে জাগে সে যেমন যারা জাগে তাদের শুনিয়ে বলে। গানের সুর যার একবার কানে বেজেছে তার কি আর ভয় থাকে যে চিরকালের জন্য না আবার তাকে মাত্রাহীন কথা কয়ে যেতে হয়? ভবিষ্যৎ কি সম্ভাব্যতার খাতিরে আমাদের উচিত হচ্ছে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে চলা, কোন্ দিকে মুখ বুঝতে না দেওয়া, আমাদের ওদিকটার সীমানা ঝাপসা, কুয়াসা ঢাকা থাক; যেমন সূর্যতাপে ঘর্মাক্ত কলেবর আমাদের ছায়ার মধ্যে ধরা দেয় না। আমাদের বক্তব্যের উদ্‌বায়ী সত্যটা যেন সব সময়েই আমাদের ফাজিল কথাবার্তার ফাঁকটা দেখিয়ে দেয়। ওর সত্যটা নিমেষের মধ্যে চারিয়ে যায়, থাকে শুধু আক্ষরিক চিহ্ন। আমাদের ভক্তি বিশ্বাসের ভাষা তো স্পষ্ট নয়। কিন্তু তা নিগূঢ়, আর সাত্ত্বিক লোকের কাছে গুগ্‌গুলের মতো সুরভি।

চব্বিশ ঘন্টাই আমাদের তামসিক ধারণাগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকেই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে এত তারিফ করাই বা কেন? ঘুমন্ত লোকের যে কাণ্ডটা নাক ডাকার মধ্যে জানান দেয়, সাধারণতম কাণ্ডজ্ঞান তো তাই। যাঁরা দেড়া বুদ্ধি রাখেন, আধপাগলাদের সঙ্গে তাঁদের একগোষ্ঠী বলে ধরে নেওয়ার জন্য রোখ চাপে আমাদের এক এক সময়, কেন না তাঁদের বুদ্ধির তিন ভাগের এক ভাগই তো আমাদের বুদ্ধির গোচর। তেমন সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেলে কেউ কেউ ভোরের আলোর ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দেন। শুনেছি যে, "অনেকে মনে করেন কবীরের দোঁহার অর্থ চতুর্বিধ,—মায়া, আত্মা, বুদ্ধি আর বেদের দুর্বোধ্য তত্ত্ব"; কিন্তু এ ভূখণ্ডে কারও রচনার যদি একাধিক অর্থ করা সম্ভব হয়, তবে তা নিন্দার ব্যাপার। আলুর পচ ধরা সারাবার জন্য ইংলণ্ডের যত তোড়জোড়, কেউ কি মাথার পচ ধরা সারাবার চেষ্টা করে না—তার প্রকোপ তো আরও বেশি, আরও মারাত্মক।

আমার মনে হয় না যে দুর্বোধ্যতাকে সড়গড় করতে পেরেছি আমি। কিন্তু সে হিসেবেও ওয়ালডেন-এর বরফের চাইতে আমার রচনার খুঁত বেশি মারাত্মক মনে না হলেই গর্ব বোধ করব আমি। নির্মলতার যা প্রমাণ, সেই নীল রঙেই দক্ষিণদেশী কারবারীদের আপত্তি, তাকেই তারা পংকিলতা

ঠাউরে নেয় আর কেম্ব্রিজের বরফ পছন্দ করে, যার রঙ সাদা অথচ আস্বাদে আগাছার মতো। লোকে যে নির্মলতা পছন্দ করে, তা মাটিকে ঢাকে যে কুয়াসা তার মতো, ঊর্ধ্ব আকাশের নীল তাদের মনে ধরে না।

আমাদের কানে কেউ কেউ দেখি মন্ত্র পড়ছেন, আমরা মার্কিনরা তথা সব আধুনিকরাই না কি প্রাচীনদের, এমন কি এলিজাবেথের সময়কার লোকজনের তুলনায়ও বুদ্ধির দিক থেকে বামন। কিন্তু কথাটা কি প্রাসঙ্গিক হ'ল? মরা সিংহের চাইতে জ্যান্ত কুকুরও যে ভাল। বামন জাতের মধ্যে জন্মেছে বলে কেউ কি গিয়ে গলায় দড়ি দেবে, না বামনদেরই কেউ-কেটা হবার জন্য যতটা পারে চেষ্টা করবে? নিজের নিজের চরখায় তেল দিক সবাই, যা হ'তে জন্ম, তার জন্যই সাধনা করুক।

সাফল্যের জন্য এই বেপরোয়া রকম হাঁসফাঁস করা কেন, আর কেনই বা মরিয়া হয়ে এই লম্ফঝম্প দেওয়া; হয়তো আলাদা কোন ঢাকীর বাজনা কানে শুনেছে বলেই একজন কেউ তার সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রেখে চলছে না। যত ঢিমে তালেই হ'ক আর যত দূর থেকেই শোনা যাক, তার কানে যে সুর বাজে, তার তালেই পা ফেলে চলুক না সে। আপেল কি ওকের মতো তাড়াতাড়ি যদি না বাড়ে তো এত তাড়াহুড়ো কিসের। তার বসন্তকালকে সে কি গ্রীষ্মকাল করে তুলবে? যে রকম অবস্থার জন্য আমরা তৈরি, যদি এখনও তা না হয়ে থাকে, এমন বস্তু কি হ'তে পারে, যা দিয়ে তার ফাঁক ভরা যায়? মিথ্যা কোন বাস্তবের জন্য ভরাডুবি হ'তে চাই নে। মাথার ওপর নীল কাঁচ দিয়ে আকাশ খাড়া করতে কোমর বেঁধে লাগতে হবে না কি? তাও যদি বা খাড়া করা যায়, ওটাকে ছাড়িয়েও যে আরও অনেক উপরের সত্যকার ব্যোমময় আকাশ তা তো চোখে পড়বেই পড়বে, তখন ওটা না থাকার সামিলই হবে।

কুরু দেশে এক কারুশিল্পী ছিলেন, নিখুঁত কাজ করার বাতিক ছিল তাঁর। একদিন তাঁর মনে হ'ল, কাঠের একটা দণ্ড বানাবেন। খুঁতওলা কাজেই সময়ের হিসেব, নিখুঁত কাজে সময়ের কথাই ওঠে না, এই সাব্যস্ত করে মনে মনে ঠিক করলেন, আমাকে দিয়ে জীবনে যদি আর কোন কাজও না হয়, এই দণ্ডটা সর্বাঙ্গসুন্দর করেই গড়ে তুলব আমি। সেটা যাতে বাজে মাল দিয়ে তৈরি না হয় এই সংকল্প করে সঙ্গে সঙ্গে বনের দিকে যাত্রা করলেন। কাঠের পর কাঠ খুঁজে চলেছেন আর ফেলে দিচ্ছেন; তাঁর বন্ধু-বান্ধব সবাই ক্রমশ তাঁকে ছেড়ে গেলেন, কাজ করতে করতে তাঁরা বুড়ো হয়ে পড়লেন, মৃত্যু হ'ল তাঁদের, তিনি কিন্তু কিছুমাত্র বুড়ো হলেন না। তাঁর একাগ্র লক্ষ্য আর সংকল্প, তাঁর সর্বাতিক্রমী নিষ্ঠা তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁকে চিরযৌবনে অভিষিক্ত করেছে। কালের সঙ্গে কোন রফার মধ্যে তিনি

যান নি, কালও তাঁর কাছ থেকে দূরে থেকে গেল, তাঁকে কায়দা না করতে পেরে দূর থেকে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে থাকল। সব রকমের উপযোগী মাল তাঁর মজুদ হবার আগেই কুরু দেশ ভগ্ন স্তূপে পরিণত হ'ল আর তিনি তার একটা ঢিবির ওপর বসে দণ্ড কুঁদে চললেন। সেটাকে নিখুঁত করে গড়ে তোলবার আগে চন্দ্রহার বংশের পতন হ'ল, তিনি তাঁর দণ্ডের ডগা দিয়ে সে বংশের শেষ লোকটির নাম বালির ওপর লিখে রাখলেন, তার-পর আবার তাঁর কাজে মন দিলেন। তাঁর দণ্ডটা ঘষে মেপে চকচকে করে তুলতে যে সময় লাগল, ততদিনে কল্পও আর ধ্রুব নক্ষত্রে রইল না; আর সেটার ডগার টুপি পরিয়ে মাথায় দামী পাথরের সাজ পরাতে পরাতে ব্রহ্মা বেশ কয়েকবার নিদ্রা গেলেন, জেগে উঠলেন। কিন্তু সে সবের বিবরণ দিয়ে আমার লাভ কি? যেই তাঁর কাজে শেষ দাগটি পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সেটি শিল্পীর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ব্রহ্মার সৃষ্টির মোহিনীরূপ নিয়ে ফুটে উঠল। দণ্ড তৈরির কাজে তিনি নতুন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছেন, সর্বাঙ্গ সুঠাম নতুন একটা জগতের; এর মধ্যে কত পুরনো দেশ আর জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, আরও সুন্দর কত দেশ আর জাতি তাদের জায়গা দখল করেছে। তখন তাঁর পায়ের কাছে সদ্য সদ্য কাটা কাঠের দিকে নজর পড়ল, বুঝতে পারলেন মধ্যে যে টুকু সময় কেটেছে, তাঁর আর তাঁর কাজের হিসেবে তা মায়া মাত্র, ব্রহ্মার ব্রহ্মরন্ধ্রের একটা স্ফুলিঙ্গ নশ্বর নরদেহের মস্তিষ্কে ছিটকে পড়ে তার বিকিরণে যেটুকু সময় লাগে। তার চাইতে এতটুকু সময় বেশি লাগে নি। উপকরণ যখন কলুষহীন, কাজের কৌশল যখন নিষ্পাপ, তখন তার ফল অলোকসুন্দর হবে না তো কি হবে?

কোন বিষয়কে যে চেহারাই আমরা দিতে যাই না কেন আখেরে সত্য ছাড়া আর কোন কিছুতেই আমাদের তেমন কল্যাণ হতে পারে না। ধোপে টেকে শুধু এই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা যেখানে আছি, সেখানে নেই, গোঁজামিল একটা থাকেই। আমাদের স্বভাবে কোথায় ত্রুটি আছে, আমরা একটা অবস্থা কল্পনা করে নিয়ে তার মধ্যে নিজেকে ফেলে রাখি আর তাই একই সময়ে দু'রকম অবস্থায় পড়ে যাই, ফলে নিস্তার পাওয়া দ্বিগুণ দুর্ঘট হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে তখন বাস্তব অর্থাৎ আসল অবস্থাটা কি, তা ধরতে পারি। তোমার যা বলবার তাই বল, যা বলা উচিত তা নয়। মনগড়া ধারণার চাইতে সত্যের যে কোন একটা রকম ভাল। ঝালা-কাঁসারি টম হাইডকে যখন ফাঁসিকাঠে ঝুলনো হবে, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তার কিছু বলবার আছে কি না। সে শুধু বলে, "থলিফাদের বাতলে দিয়ো সেলায়ের প্রথম ফোঁড়টা দেবার আগে সুতোয় গিঁট দেবার কথা যেন মনে রাখে।" তার স্যাঙাতের কথা কেউ মনে রাখে নি।

তোমার জীবনকে যত ইতরই ঠেকুক, তাকে জান, তাকে মেনে নাও, তাকে এড়িয়ে চল না; তাকে কটুকাটব্যও ক'র না। তুমি নিজে যতটা খারাপ জীবন ততটা নয়। তুমি যখন সব চাইতে ধনী, তখন তাকে সব চাইতে কাঙাল দেখায়। যে নিন্দুক সে স্বর্গেরও খুঁত দেখে। হ'ক দীন, নিজের জীবনকে ভালবাস। তোমার হয়তো বা গরিবখানাতেই আমোদ-আহ্লাদ করে সব চাইতে আনন্দে কয়টা দিন কাটবে। গরিবখানার জানালা থেকেও যেমন, আমিরের ইমারতের ঝরোকা থেকেও ঠিক তেমনি সমারোহে সূর্যাস্তের আলো ঠিকরে পড়ে, দুয়ের দরজাতেই বসন্তকালে একই সময়ে বরফ গলে যায়। কেন যে স্থিরচিত্ত লোক রাজপ্রাসাদের মতোই সেখানেও সমান সন্তুষ্ট হয়ে আর মনে সমান স্ফূর্তি নিয়ে জীবন কাটাতে পারে না, আমি তা বুঝে উঠতে পারি নে। আমার তো মনে হয় শহরের হতদরিদ্র লোকরাই সবার চাইতে মুক্ত জীবন যাপন করে। হ'তে পারে তাদের এই ফাঁকা মাহাত্ম্য শুধু কিছু সংকোচ না রেখে দান নিয়ে যাওয়ায়। বেশির ভাগ লোকই ভাবে শহর তাদের ভরণপোষণ করবে, তার তোয়াক্কা রাখে না তারা; কিন্তু আবার প্রায়ই দেখা যাবে অসৎ উপায়ে ভরণপোষণের তারাই বেশ তোয়াক্কা রাখছে—সেটাই তো আরও গর্হিত। সাধু সন্ন্যাসীদের আদর্শে দারিদ্র চর্চা করতে হবে, যেন ওটা বাগানের ওষধি। কাপড়-চোপড় বন্ধুবান্ধব যাই হ'ক, নতুন নতুন জিনিসের জন্য মাথা ঘামাতে যেয়ো না, পুরনোগুলোই উলটে পালটে নাও, ফিরে তাদেরই কাছে যাও। আর কিছু বদলায় না, আমরাই বদলাই। কাপড়-চোপড় বেচে দাও, পুঁজি কর চিন্তা। মেলামেশার লোকের অভাব হবে না তোমার, ভগবান ঠিক ব্যবস্থা করবেন। সারা জীবন ধরে মাকড়সার মতো কুঠুরির একটা কোণে জীবনই যদি কাটাই, চিন্তাশক্তি যতদিন বজায় থাকবে পৃথিবী তো আমার পক্ষে সমান বড় হয়েই রইল। দার্শনিক বলেছেন, "তিন ডিভিসন সৈন্যদল থেকে সেনাপতিকে সরিয়ে দিয়ে বিশৃংখলা আনা যায়, কিন্তু অতি দীন-হীন লোকেরও চিন্তাশক্তি কেড়ে নেওয়া যায় না।" বড় হতে গিয়ে নিজেকে অনেকের খেলার পুতুল করে তোলবার জন্য আঁকুপাঁকু নাই বা করলে, সবটাই তো অপচয়। অভিমানশূন্যতা আলোকশূন্যতার মতোই দিব্য জ্যোতির সন্ধান দেয়। আমাদের চারদিক ঘিরে তো অনটন আর নীচতার ছায়া, কিন্তু "চেয়ে দেখ ঐ দৃষ্টির আগে সৃষ্টি চমৎকার।" কুবেরের ঐশ্বর্যও যদি আমাদের জুটে যায় তবু আসল লক্ষ্য আর পথ তো নিশ্চয় এইই থাকবে,—প্রায়ই যে কথাটা মনে জাগে। আবার অর্থাভাবের দরুন যদি ব্যয়সংকোচ করতে হয়, যেমন বই আর খবরের কাগজ কেনবার পয়সাই যদি না জোটে, তাহ'লে তো ভালই, সব চাইতে অর্থপূর্ণ সব চাইতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা নিয়েই থাকা যাবে;

নিরুপায় হয়ে যাতে শর্করা বেশি, শ্বেতসার বেশি সেই সব মালমশলার কারবারে লেগে যেতে হবে। অস্থিমজ্জায় লেগে থাকে যে জীবন, তাই তো বেশি উপাদেয়। নিরংকুশ হওয়ার জো থাকে না। যে লোক বড় বড় ব্যাপারে দরাজ হ'তে পারে, ছোটখাটো ব্যাপারে তার কখনও লোকসান হয় না। অনাবশ্যক টাকাকড়িতে শুধু অনাবশ্যক সামগ্রীই কেনা যায়। আত্মার জন্য দরকারী একটা সামগ্রী কিনতেও টাকাকড়ির দরকার হয় না।

সীসের দেয়ালের একটা কোণে আশ্রয় নিয়েছি, কিন্তু তৈরি করার সময় তার মধ্যে একটু কাঁসার মেশাল ঢেলে দেওয়া হয়। দুপুরে তাই জিরোই যখন, আমার কানে দূর থেকে একটা পাঁচমিশালী গুনগুন রব এসে পৌঁছয়। আমার সমসাময়িকদেরই হৈহৈ। আমার পড়শীরা এসে তাদের বাহাদুরির বৃত্তান্ত শুনিয়ে যায়, তা-বড় তা-বড় ভদ্র মহোদয় আর মহোদয়া-দের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল, কোন ভোজসভায় হোমরা-চোমরা কার কার সঙ্গে একত্র বসে খেয়েছে, কিন্তু এসবের মধ্যে কোন রস পাই নে আমি, যেমন ডেইলি টাইমস খবরের কাগজের বিষয়বস্তুতেও পাই নে। রস আর কথাবার্তা সবই পোষাক-আষাক আর কেতা-কায়দা নিয়ে। কিন্তু যত খুশি পোষাক পরাও, হাঁস হাঁসই। ওদের সকলের মুখেই ক্যালিফোর্নিয়া আর টেক্সাস, ইংলণ্ড আর ইণ্ডিজ, জর্জিয়া কি ম্যাসাচুসেটসের মহামান্য শ্রী অমুকের কথায় খই ফুটছে, ক্ষণস্থায়ী আর অলীক সব আতশবাজি, শুনতে শুনতে মামেলুকদের সেই বে-র মতো তাদের হাতা থেকে লাফ দিয়ে পালাতে ইচ্ছে করে। আমার নিজের কোটে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি—লোক জানান দিয়ে হৈ হল্লা করে হাটের মধ্যে মিছিলে ভিড়ে যাওয়া পোষায় না, পারলে বিশ্বস্রষ্টার পাশাপাশি চলতাম—এই অস্থির জর্জর হুল্লোড়বাজ অসার ঊনবিংশ শতাব্দীর তালে তাল দিতে চাই নে আমি, পাশ দিয়ে চলে যাক ও, আমি ধ্যানাসনেই থাকব দাঁড়িয়ে কি বসে। কিসের উৎসব লোকগুলোর ? যেন সব ব্যবস্থা-সভার বৈঠকে বসেছে, ঘন্টায় ঘন্টায় কেউ না কেউ বক্তৃতা দিক, এই চায় তারা। আজকের সভায় সভাপতি ভগবান আর ওয়েবস্টার তাঁর বক্তা। হিসেব নিকেশ, বোঝাপড়া করতে চাই আমি, যা আমাকে সজোরে প্রাণের সঙ্গে টানে, তার দিকেই ঝোঁক আমার ;—দাঁড়িপাল্লার দাঁড়িতে ঝুলে পড়ে ভার কমাতে চাই নে—মামলা সাজাতে চাই নে, যা ঘটেছে হুবহু, তাই থাক ; যে একটা পথ দিয়ে পারি, সেই পথ দিয়েই যেতে চাই আমি, সে পথে কারও কোন প্রতাপই আমাকে রুখতে পারবে না। জবরদস্ত ভিত না গেড়ে খিলান খাড়া করতে লেগে যাওয়া আমার পছন্দসই নয়। বেলে খেলা যেন না খেলি সবাই। সর্বত্রই তো তলাকার মাটি শক্ত। গল্পে পড়েছি, এক পথিক এক বালকের কাছে জানতে চায়, সামনের জলাটায় তলাকার

মাটি শক্ত কি না। বালক জানায় হ্যাঁ। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে পথিকের ঘোড়ার পেটি পর্যন্ত যখন জলে ডুবে গেল, তখন পথিক বালককে বলে, তুমি না বলেছিলে জলাটার তলার মাটি শক্ত? বালক জবাব দেয়, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে এ পর্যন্ত অর্ধেক পথও যান নি। সমাজের জলা আর চোরাবালির মধ্যেও সবই ঠিক এই রকম; কিন্তু পুরনো পাপীই শুধু জানে সে কথা। যা ভাবা বলা আর করা যায় শুধু কালেভদ্রেই তা খাটে কাকতালীয়বৎ। আকাট মূর্খের মতো বাতা আর পলেস্তারার উপর গজাল ঠুকে যাওয়ার মধ্যে নেই আমি; সে রকম কাজে রাত্রে ঘুম হবে না আমার। আমার হাতুড়ি চাই, গোঁজটা সমান হ'ল কি না দেখতে হবে আমাকে। শুধু আঠার উপর নির্ভর করা চলবে না। গজালের মাথায় ঘা দিয়ে দিয়ে একেবারে নিখুঁত করে আটকে দিতে হবে সেটাকে, তবেই তো রাত্রে ঘুম থেকে উঠে নিজের বাহাদুরিতে নিজেই খুশি হওয়া যাবে—তবেই না কাজ এমন হবে যে কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আবাহন করে আনতে লজ্জা হবে না। তবেই—শুধু তবেই ভগবান দয়া করবেন। প্রত্যেকটি গজাল যা ঠোকা হবে, একেবারে ভূ-যন্ত্রের শঙ্কু হ'তে পারে যেন তা—সে কাজের ভারও তো তোমারই উপর।

প্রেম নয়, অর্থ নয়, যশ নয়, চাই সত্য। খাবার নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেখানে অঢেল পোলাও-কালিয়া, অঢেল মদ, কত জোহুকুম খিদমতগারি, কিন্তু না আন্তরিকতা, না সাচ্চা ভাব; হৃদ্যতাহীন ভোজপর্ব থেকে খিদে নিয়ে ফিরে এলাম। আদর-আপ্যায়ন বরফের মতো ঠাণ্ডা কনকনে ঠেকল। মনে হ'ল ঠাণ্ডা হতে এদের আর বরফের দরকার হয় না। সবাই কত ব্যাখ্যান করে শোনালে আমাকে, কত সাবেকী মদ, কত তার নাম-করা বনেদীয়ানা; কিন্তু আমার মনে হ'ল এক আরও সাবেকী আরও আহেলী, আর খাঁটি মদের কথা, ইলাহী নামডাক যার, কোথায় পাবে তারা তা, কিনবে কি দিয়ে। আদব-কায়দা, ইমারত, বাগবাগিচা আর 'খানাপিনা'কে আমি থোড়াই দাম দিই। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে তাঁর বৈঠক-খানায় বসিয়ে রাখলেন, হাবভাবে মনে হ'ল আপ্যায়ন করা কাকে বলে জানেন না। কিন্তু এ অঞ্চলেই একটা লোক ছিল, থাকত ফোঁপরা গাছে, অথচ রকম সকম আসল রাজার মতো। তার কাছে গেলেই ভাল করতাম।

আর কতকাল দাওয়ায় বসে বসে সেই মান্ধাতার আমলের ফক্কিকারী ধর্ম ধর্ম করে কাটবে আমাদের—কাজের কাজ করতে নামলেই যার জোচ্চুরিটা ধরা পড়ে। যেন কত কষ্টের মধ্যেই না ভোর হয়—আলু ক্ষেত নিড়োবার জন্য মজুর খাটাতেই হবে; বিকেলে আবার খ্রীস্টানি বিনয়, আর দানধ্যান,

আর ছুকে ফেলা সৎকাজ করতে বেরুনো আছে। আবার মানুষের ঠুনকো হামবড়াই আর এঁদোপড়া আত্মপ্রসাদ দেখ। আজকাল সবায়েরই বড় ঘরের শেষ পুরুষ হিসেবে নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়াবার ঝোঁক এসেছে; কি বস্টন, কি লণ্ডন, কি প্যারিস, কি রোম সর্বত্রই নিজেদের লম্বা কুলজী স্মরণ করে কলা, বিজ্ঞান আর সাহিত্যের উন্নতি নিয়ে গালভরা আলোচনা হয়; দর্শনতত্ত্বালোচনা সভার অনুলেখ রাখা হচ্ছে, মহামানবদের প্রকাশ্যে স্তবগান হচ্ছে। এ সেই আদ্যিকালের আদমের নিজের গুণে নিজেই মোহিত হওয়া। "আলবত; আমরা সব ইলাহী কাণ্ড করেছি, কেয়াবাত কেয়াবাত কাব্য লিখেছি, বিনাশ নেই তার," অর্থাৎ যতদিন আমরা মনে রাখতে পারি ততদিনই। এসিয়ার বিশ্বজ্জনমণ্ডলী আর মহাপুরুষরা—ক গতা? কি প্রচণ্ড সব দর্শন-বীর আমরা আর কি সাধক সব। আমার পাঠকদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি পুরোপুরি একটা মানুষের মতো জীবন কাটিয়েছেন। হয়তো জাতির এই সবে ফুল ফোটার কাল। কনকর্ডে আমাদের সাত বছরের কণ্ডুতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আজও সপ্তদশী পঙ্গপাল বাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। আমাদের যে ভূমণ্ডলে বাস, তার সামান্য একটু খোসার সঙ্গেই মোলাকাত হয়েছে আমাদের। খোসার নিচে ছয় ফুটের বেশি অনেকেরই খোঁড়া হয় নি, আর উপরের দিকে তো অতটাও লাফানো হয় নি। কোথায় আছি আমরা তাই জানি নে। আর প্রায় অর্ধেক সময় তো অঘোরে ঘুমিয়েই কাটাই। তবু নিজেদের অতিবিজ্ঞ ভাবি আমরা, আবার এই খোসাটার উপর একটা ডেরাডাণ্ডাও খাড়া করে তুলেছি। সত্যিই, মহা চিন্তা-বীর আমরা, দুঃসাহসী আত্মা আমরা! মাটিতে ঝরা পাইনপাতার মধ্যে একটা পোকা গুড়ি গুড়ি এসে আমার দৃষ্টির আড়ালে যাবার চেষ্টা করছে, আমি দাঁড়িয়ে দেখছি আর ভাবছি, এই রকম নীচ চিন্তা পোষণ করা কেন ওটার, হয়তো আমি ওর উপকারেই লাগতে পারি, হয়তো কীট জাতির পক্ষে কোন আনন্দ-বার্তার দূতও হ'তে পারি আমি, আমার কাছ থেকে লুকিয়ে পালানোর চেষ্টা কেন ওর? সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল সেই পরম কারুণিক ধীস্বরূপের কথা, এই মনুষ্যকীট আমাকে যিনি দাঁড়িয়ে দেখছেন।

বিশ্বজোড়া অফুরন্ত বৈচিত্র্যের এত লীলা আর আমাদের মনজোড়া এমন বিতৃষ্ণা, এ যেন বিশ্বাস হয় না। অতি সভ্য সব দেশেও কি সব ধর্মোপদেশ মন দিয়ে শোনে—তার খোঁজ নিতে বলি। আনন্দ দুঃখ, কথা সবই আছে, কিন্তু নাকী সুরে গাওয়া ধর্মসঙ্গীতের ধুয়োই শুধু, আর আমাদের মন পড়ে আছে সেই থোড়বড়িখাড়া আর ইতরামিতে। আমাদের

ধারণা যে পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরলেই হ'ল। বলা হয়ে থাকে, বৃটিশ সাম্রাজ্য অতি বৃহৎ আর মান্যগণ্য, বলা হয়ে থাকে, য়ুনাইটেড স্টেট্স প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তি—আমাদের মনে হয় না যে, সব মানুষের পিছনেই যে জোয়ার-ভাঁটার ওঠানামা, একবার তার ইচ্ছে হলেই, হয়, কুঁটোর মতো বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ভাসিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে সে। কে জানে কেমন সে সতেরো বছর ব্যাপী পঙ্গপালবাহিনী, মাটি ফুঁড়ে এর পর যার আসার কথা। আমি যে-দুনিয়ায় বাসিন্দা, বৃটেনের মতো তার শাসনতন্ত্র কিন্তু ভোজনান্তিক মদ্যপানের ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তার সূত্রে তৈরি নয়।

আমাদের জীবন নদীর জলের মতো। হয়তো এ বৎসর এত জল বাড়তে পারে, আগে যা কেউ দেখে নি, আর শুকনো ডাঙাও বানে ভাসাতে পারে; কে জানে এই বছরই সেই বান ডাকার বছর কি না, সব মাস্করয়্যাটের যাতে ডুবে মরার কথা। আমরা সেখানটায় আছি, সেটা চিরকাল শুকনো ডাঙা ছিল না। বিজ্ঞানে যখন থেকে বন্যার হিসেব রাখছে, তারও আগে যেখান পর্যন্ত সে কালে নদীর জল বইত, অনেকটা ভিতরের দিকে তার পাড়ের চিহ্ন দেখেছি আমি। নিউ ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে একটা গল্প সকলেই শুনে থাকবেন, গাঁট্টাগোট্টা সুন্দর একটা ছারপোকা, আপেল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি পুরনো একটা টেবিলের শুকনো পাতার সঙ্গে এসে জোটে, ষাট বছর ধরে তার আগে সেটা এক চাষার রান্নাঘরে পড়ে ছিল, প্রথমটায় কনেকটিকাট-এ, পরে মাসাচুসেট্স-এ, আরও অনেক অনেক বছর আগে গাছটা যখন ফলন্ত ছিল, তখন তার মধ্যে যে ডিম পাড়া হয় সেই ডিম থেকে হয় সে, তা আবার বোঝা যায় বছর বছর একে ঘিরে যে স্তবক পড়ে তাই গুণতি করে; হয়তো কোন বাটার মধ্যে পড়ে গরমের চোটে ফেটে যায়, কয়েক হপ্তা ধরেই সেটা সেখানে কুর কুর করছে, আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এ শুনে পুনরুত্থান আর অমরত্বের উপর বিশ্বাসের জোর পাওয়ার ভাব কার মনে না আসবে? যুগ যুগ ধরে সমাজের নিঃসাড় নীরস কাঠ-কাঠ জীবনের আড়ালে অনেক অনেক চাক স্তবকের তলায় একটা যে ডিম চাপা পড়ে আছে, প্রথমটায় সবুজ ফলন্ত একটা গাছের জীয়নকাঠির মধ্যে বুঝি পাড়া হয় সেটা, আস্তে আস্তে বদলে দিব্যি রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে তার মরণ-কাঠির মতো হয়ে ওঠে তা,—বছরের পর বছর দলে দলে কত লোক ভোজ-সভায় আসনে বসে বুঝি তার কুর কুর শুনে অবাক মেনেছে—কে জানে সমা-জের এই ফঙ্গবেনে দাদন পাওয়া আসবাবপত্রের মধ্যে থেকেই আচম্বিতে কি অপরূপ শোভায় ডানা মেলে মাথা নাড়া দিয়ে উঠবে সে, শেষমেশ নির্ঝঞ্ঝাট সুখের দিন কাটবে তার।

একথা আমি বলছি নে যে রামা শ্যামা এর আগাগোড়া বুঝতে পারবে; শুধু সময়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই কিছু যার ভোর হয় না, সে দিনটার নিশানা তো এই। যে আলোতে আমাদের চোখ বুজে আসে, আমাদের কাছে তা অন্ধকার। আমরা জাগলে তবে তো সকাল। আবার সকাল, আবার দিন হবে। সূর্য তো একটা শুকতারা মাত্র।